শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড ১ম সংখ্যা।	বৈশাখ।	১৩৩২ সাল। ১৮৪৭ শকাব্দাঃ

নববর্ষ।

এই নববর্ষের পুণ্য প্রথম দিনে আমাদের অন্তর্যামী মঙ্গলময় মহাপুরুষকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি এবং তাঁহারই নিকট বিশ্বের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর অতীত হইয়া গেল, হিন্দু-পত্রিকা দ্বাত্রিংশ বর্ষে উপনীত হইল।

নূতন বলিবার কিছুই নাই। গত ৩১ বৎসর ধরিয়া একই ক[illegible]িয়া আসিতেছি। সে কথাটী এই যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের সম্মুখে [illegible]তন-ধর্ম্মের আদর্শ রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ণ আদর্শের অনুগামী হইতে না পারিলেও ঐ আদর্শ যদি সকল সময়ে আমাদের নেত্রপথে থাকে তাহা হইলে আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তা ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

সনাতন ধর্ম্ম কি? যে ধর্ম্ম চিরকাল আছে তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। কোনও কোনও সময় অধর্ম্মও ধর্ম্ম-নাম ধারণ করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম কখনও দুই হইতে পারে না। মানুষের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ এবং মানুষের সহিত ইতর-প্রাণীর সম্বন্ধ—মানুষের সহিত বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহা যে ধর্ম্ম দ্বারা সুব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয় তাহাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। এই সনাতন ধর্ম্মের কেহ স্রষ্টা নাই। ইহা সনাতন—এই ধর্ম্মজ্ঞানের বীজ মানুষের প্রথম আবির্ভাবের দিনেই তাহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছে। অসভ্য বর্ব্বর ও সুসভ্য সামাজিক উভয়েরই হৃদয়ে এই সনাতন ধর্ম্ম-বীজ নিহিত আছে। দেশভেদে কালভেদে এবং পাত্রভেদে এই সনাতন ধর্ম্মের বাহিরাবরণ পৃথক্ হইলেও ইহার মূলতত্ত্ব এক।

ভারতবর্ষ এই সনাতন ধর্ম্মের জন্মভূমি, এবং এই স্থান হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই সনাতন ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে। বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে পৃথিবীস্থ তাবৎ ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই মূলতত্ত্বগুলি সনাতন ধর্ম্মেরই মূলতত্ত্ব। কেবল দেশভেদে ও অধিকারভেদে উহা বিভিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হয় মাত্র।

ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক সনাতনধর্ম্ম। এই ঈশ্বর-বিশ্বাসই মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। কোনও না কোনও আকারে—কোনও মানবই ঈশ্বর-বিশ্বাসে বঞ্চিত নহেন। এই জগতের মূলকারণের বিশ্বাস যেমন এই সনাতনধর্ম্মের অঙ্গ, তদ্রূপ ঐ মূলকারণ চিন্ময় আনন্দময় এবং মঙ্গলময় ইহাও সকল মানুষেরই সাধারণ বিশ্বাস।

ভগবান্ মানুষকে স্বাধীন করিয়া তাহাকেই পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন, তিনি বলপূর্ব্বক মানুষকে কোনও নির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে বাধ্য করেন নাই। উহাতে কোনও আনন্দ নাই, উহাতে মানুষের বিশিষ্টতা নাই, উহাতে মা[illegible] বিশ্বের উপর আধিপত্য চলিত না। মানুষ যদি একবার হৃদয়ঙ্গম ক[illegible] পারে যে মঙ্গলময় বিধাতা তাহাকে পৃথিবীর অধিপতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তব্যপথ অতি সহজ হয়। তখন স্বার্থসঙ্ঘর্ষ আর তাহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। সে সকল মানুষকে, মানুষ কেন, সমগ্র জগৎকে আপন করিয়া লইতে পারে।

এই হইল উচ্চ আদর্শ। এই আদর্শের দিকে যে ব্যক্তি বা সমাজ যত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি বা সমাজ তত উন্নত। এই উচ্চ আদর্শে

উপনীত হইবার জন্যই কায়মনোবাক্যে সত্যের প্রতিপালন, শম, দম প্রভৃতির ব্যবস্থা; এবং এই সমস্তই সনাতনধর্ম্মের মুখ্য অঙ্গ। অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ উচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহুবিধ কাল্পনিক আচারের ব্যবস্থা করিয়া আপনাদিগকে মোহজালে বিজড়িত করে। যথার্থ সনাতন ধর্ম্মবুদ্ধি পবিত্র হৃদয়েই প্রতিভাত হয়। সেই সমস্ত পবিত্র হৃদয়ই ঋষি, মুনি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। তাঁহারা ধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, দ্রষ্টা মাত্র। তাঁহারা তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া নিজেরা যাহা দেখেন, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া অপরকে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অত্যুচ্চ আদর্শ সকলের হৃদয়ে সমানভাবে প্রতিভাত হইতে পারে না। যাহার যতটুকু শক্তি বা অধিকার তাহার অধিক তাহাকে দেওয়া যায় না, দিলেও ফল হয় না। এইজন্যই বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন আশ্রমের ব্যবস্থা। সর্ব্ব দেশে এই ব্যবস্থা রহিয়াছে; ইহা স্বাভাবিক সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ, তাহারা তাহা বুঝুক বা না বুঝুক। কিন্তু এই বর্ণ ও আশ্রমের ব্যবস্থার মুলতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইলে উহা দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের পরিপুষ্টি সাধন হয় না, বরং উহা দ্বারা অধর্ম্মেরই পরিপুষ্টি সাধিত হয় সুতরাং মানব-হৃদয়ের অজ্ঞান দূরীভূত করিয়া জ্ঞানালোকে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত করাই জ্ঞানী লোকের প্রধান কর্ত্তব্য। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ আচার্য্য গুরুই সর্ব্বদেশে সর্ব্বপ্রধান সেবক বলিয়া পরিগণিত হন। খৃষ্টধর্ম্মের পাদ্রীদিগকে ইংরেজীতে (minister) মিনিষ্টার বলে, উহার অর্থ সেবক। রাজমন্ত্রীকেও মিনিষ্টার বলে, উহার অর্থও সেবক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলেই সেবক। যাঁহার সেবাধর্ম্ম যত অধিক, তিনি তত বড় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সেবক। বৈশ্য ধন দ্বারা সমাজসেবক। অজ্ঞানহেতুই অধুনা মাত্র শূদ্রকেই সেবাধর্ম্মের অধিকারী বলা হইয়াছে।

অস্মদ্দেশে ব্রাহ্মণেরা সেবকত্ব পরিহার করিয়াই ব্রাহ্মণত্ব-বর্জ্জিত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা আচণ্ডাল সকলের সেবায় নিরত থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবার জন্য সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিরোধী কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হইত না।

এই নববর্ষের প্রথমদিনে হিন্দু-সমাজের সাধারণের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন যে সকলেই সেবাধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া সেবাব্রতে দীক্ষিত হউন যদি তাঁহারা সেবাধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা

হিন্দুসমাজের ভবিষ্যতের জন্য কাহারও দুশ্চিন্তা-পোষণ করিতে হইবে না। সকলে সেবাব্রত গ্রহণ করিলেই ভারতের সুদিন উপস্থিত হইবে, দুর্দ্দিনের অন্ধকার দূরীভূত হইবে। ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

প্রার্থনা।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান।

যতটুকু দাও মোরে যোড়করে যেন
তুষ্ট হয়ে ধরি ;
দিতে নাহি চাও যাহা তার তরে যেন
দুঃখ নাহি করি ;
তোমারই দেওয়া সুখে তোমারেই যেন
ভুলে নাহি যাই ;
তোমারই দেওয়া দুখ সুখ মনে করে
নিতে যেন চাই ;
দিয়ে যদি নিয়ে যেতে চাও কভু যেন
প্রাণ নাহি কাঁদে।
আপনার কাজে যেন আপনারে ধরি
নাহি পড়ি ফাঁদে।
ভাল হোক মন্দ হোক তোমারই ইচ্ছা
পূর্ণ হোক প্রভু।
আমার সকল ব্যাধি তোমা ছাড়া যেন
নাহি হেরি কভু।
বাহিরের যে আঘাত আসে অহরহঃ
তাহা হতে রাখি
তোমার আনন্দ মোরে বহি অবিরল
রাখে যেন ঢাকি।
তোমার আঘাতে যেন তোমার শরণ
নিতে নাহি ভুলি।

দেখিবারে নাহি পাই তোমা' যদি যেন
ডাকি প্রাণ খুলি।
সকলের চেয়ে যেন তোমারে আপন
জানি এ সংসারে।
সকল বাঁধন কাটি যেন তব পায়ে
বাঁধি আপনারে।

স্বাস্থ্য ও শক্তি।

প্রস্তাবনা।

লেখক—শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্. এম্, এস্।

মঙ্গলময়ী মা জগদম্বার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া, আজ আমরা কর্ম্মে ব্রতী হইলাম। যে দেশের লোকেরা, আমরণ, উঠিতে বসিতে সদা সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করিত, যে দেশের প্রত্যেক আচার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত স্বাস্থ্যতত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়ান থাকিত; যে দেশের লোকেরা নিজ নিজ দেহকে ভগবানের শ্রীমন্দির-স্বরূপ জ্ঞান করিত এবং প্রাণী মাত্রকেই সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করিত—আজ সেই পুণ্য কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে কি ব্যাধি জরা ও মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা!

পাঞ্চভৌতিক দেহের আধি-ব্যাধির বৃদ্ধির সহিত, আজ আমরা মানসিক জড়তাতেও আচ্ছন্ন! আজ ঘরে ঘরে অকালমৃত্যু, ঘরে ঘরে জীবন্মৃত আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়াও আমরা ভয়ে শিহরিয়া উঠি না! আমরা যেন ব্যাধি জরা ও অকালমৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী দৈনন্দিন ব্যাপার মনে করিয়া থাকি! আর আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, সাংখ্যের পুরুষের মত অদৃষ্টকে অনিবার্য্য বলিয়া ধরিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাস করি! আমাদের সেরূপ থাকাকে "বাঁচিয়া থাকা" বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ বাঁচিয়া থাকা, মৃতের অবস্থা হইতেও ভীষণতর!

অকালমৃত্যু ও জরা-ব্যাধির মধ্যে নিত্য বাস করিয়া, আমরা একদিকে যেমন পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছি, অপরদিকে আমাদের অহঙ্কার-বুদ্ধি সর্ব্বদাই আমা-দিগকে ভিতর হইতে বলিয়া দিতেছে—"আমরা যাহা করি, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট

এবং আমরা যাহা বুঝি, তাহাই সব চেয়ে ঠিক্।" তাই, আজ জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ জরা-ব্যাধি ও অকালমৃত্যুতে সর্ব্বশীর্ষ স্থান অধিকার করিলেও, এদেশের লোকেরা চিকিৎসা-বিষয়ে সুচিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শকেই বেশী মূল্যবান্ মনে করে; কাহারো ব্যারাম হইলে, উপযাচক হইয়া সহস্রমুখ হইয়া, "টোট্‌কার" ব্যবস্থা করে,; এবং বর্ত্তমান চিকিৎসা-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত সত্যকে গ্রহণ করা চিত্তের দৌর্ব্বল্য বলিয়া মনে করে!

বর্ত্তমান হিন্দুদিগের মনে মনে, একটা বৃথা অহঙ্কার অতীব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষিত হউন আর অশিক্ষিত হউন, হিন্দুমাত্রেই মনে করেন যে, "আমাদের সবই ছিল; আমাদের যাহা ছিল তেমনি কাহারো হয় নাই বা হইবে না; বর্ত্তমানকালের চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি আজগুবি মাত্র।" এই কথা ভাবিয়া যাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁহারা তাহাই করুন, তাহাতে অপরের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু যে ব্যক্তির হৃদয় এখনো পাষাণবৎ হয় নাই, যাঁহারা এখনো মানবমাত্রকেই সজীব নারায়ণ জ্ঞান করেন, আজ তাঁহাদিগের সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্য, আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

আয়ুঃ অতীব স্বল্প—কর্ম্মক্ষেত্র অতীব সুপ্রসারিত,—কর্ম্মপথে বিঘ্ন অপরিসীম। এ সকল জানিয়াও, আমরা মঙ্গলময়ীর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদের ধ্যান ও ধ্যেয়, জীব ও জীবের কল্যাণ; আমাদের সাধনা—জীবসেবা! যে সকল উদারচেতা হিন্দু প্রত্যেক জীবেই নারায়ণ দর্শন করিতেন, তাঁহারা সাধনার স্থান গিরিগুহার মধ্যে নির্দ্দেশ করেন নাই—এই সংসারাশ্রমের প্রাঙ্গণেই তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কোনও কল্পিত মূর্ত্তিতে বা গ্রথিত মন্ত্রের মধ্যে শ্রীভগবানের সেবার পথ আবদ্ধ করিয়া যান নাই;—তাঁহারা বিশ্বম্ভরের বিশ্বরূপ নিত্য দর্শন করিয়া নর-নারায়ণের সেবার মধ্যেই মুক্তির পথ উন্মুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

আজ আমরা প্রত্যেক আর্ত্ত, পীড়িত, জরা-ব্যাধিগ্রস্ত নরকে দেখিলেই মনে করিব, শ্রীভগবান বুঝি আজ দীন, আর্ত্ত পীড়িতের বেশ ধরিয়া, আমাদের সেবা গ্রহণের জন্য—ততোধিক আমাদিগকে ধন্য করিবার জন্য, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত! আজ আমরা বহুমানসহ আর্ত্তরূপী পীড়িত বেশধারী সেই বিশ্বরূপকে প্রণাম করিতেছি। তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের সেবা করিবার অধিকার দিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন!

আমরা মাত্র এই পাঞ্চভৌতিক দেহেরই সেবা করিবার অধিকার প্রার্থনা করিতেছি। এই দেহকে রোগ ও জরাবিহীন করিবার আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমানে আমাদিগের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা; কারণ, আমরা ত অতি ক্ষুদ্র প্রাণী—আমাদের অপেক্ষা বহুগুণাস্পদ মনীষীরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনং।" স্বাস্থ্যের মত সম্পদ, স্বাস্থ্যের মত শ্রীভগবানের সাধু আশীর্ব্বাদ আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। আজ এই স্বাস্থ্য হারাইয়া, আমরা সব হারা হইয়াছি! স্বাস্থ্য হারানর দরুণ আমাদের দেহ, আমাদের মন, আমাদের চিত্তবৃত্তি সকলই ক্ষীণ। আমরা বলহীন—বলিয়া আজ পরাধীন কর্ম্মহীন, ধর্ম্মহীন। আজ তাই জগতের সভায় আমরা পাংক্তেয় নহি—আমরা অপাংক্তেয়। যদি আমরা জগতের জাতিসংঘের মধ্যে আবার উন্নত-মস্তকে দাঁড়াইবার স্পর্দ্ধা রাখি, তবে অচিরে ভগবানের শ্রীমন্দির এই দেহ খানির জীর্ণ সংস্কার করিয়া ইহাকে সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় করিতে হইবে; সেরূপ করিলে তবে সেই মন্দিরের দেবতাকে জাগ্রত করা সম্ভবপর হইবে। এবং তবেই ষোড়শোপচারে সেই দেবতার ঘরে ঘরে পূজা করা সম্ভবপর হইবে। তবে স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সম্পদ, শ্রী ও শক্তি ফিরিয়া আসিবে এবং তখনই হিন্দুর মুখে জগজ্জননী মা দুর্গার সম্মুখে

"রূপং দেহি জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি" বলা সার্থক হইবে। কি সংসারাশ্রমের নিত্যকর্ম্মক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মসাধনায়, স্বাস্থ্যই প্রধান সম্বল—কারণ সকল শক্তিই স্বাস্থ্যসাপেক্ষ! যেমন দেহে সামর্থ্য না থাকিলে সংসারের দৈনন্দিন কার্য্য করা অসম্ভব, তেমনি সাধনার ক্ষেত্রেও "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ!"

তাই আজ এস বঙ্গবাসি, এস রুগ্ন, জীবন্মৃত, আর্ত্ত বঙ্গবাসি, এস "নিজ বাসভূমে পরবাসী" বঙ্গবাসি, এস শ-বৃত্তি-মুগ্ধ বঙ্গবাসি, একবার মায়ের নামে, ঝাঁপাইয়া পড়। আজ হইতে প্রাতে উঠিয়া "ব্রহ্মা মুরারি" বলা ছাড়িয়া দাও, বল "যে দেশে ব্যাধি, জরা ও অকালমৃত্যুর এত বাহুল্য, সে দেশের প্রথম ও প্রধান প্রার্থনার, ধ্যানের ও ধারণার বস্তু—স্বাস্থ্য ও শক্তি;" এসো বঙ্গবাসি, যখন স্নান করিবে তখন "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" কথা ছাড়িয়া বল "দেশে সুপেয় নাই—বর্ষায় জলাধিক্য, গ্রীষ্মে জলকষ্ট—ইহারই প্রতিকার করা আমাদের প্রধান ধর্ম্ম।" এস বঙ্গবাসি, যখন ভোজনে বসিবে, তখন „জনার্দ্দনকে" স্মরণ করা ছাড়িয়া দাও—স্মরণ কর তোমার কত সংগ্রে কৃষক

ভ্রাতা আজ অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে এবং তুমি যে গ্রাস তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছ, কত হতভাগ্যের অদৃষ্টে তাহা জুটিতেছে না।” পরের গোলামী করিয়া, তাহাদের ঘরে আস্ত লক্ষ্মীকে তুলিয়া দিয়া, নিজে উঞ্ছমাত্র ভোজনে ধন্য হইতেছ—এ ভ্রম বুঝিতে শিক্ষা কর; দেশের স্বাস্থ্য-হানি, বলক্ষয়, ধনক্ষয়রূপ যে ভীষণ ক্ষয়ের স্রোত নিত্যই খরস্রোতা হইতেছে তাহা অনুভব করিতে শিখ। আর যদি জগতে বাঙ্গালীজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাও, যদি জগতে আবার বাঙ্গালীর গৌরব সূর্য্যকে উদিত হইতে দেখিতে চাও, তবে জীবনের ইষ্টমন্ত্র কর “রূপ, জয় ও যশ চাই!”

দেবত্ব।

লেখক—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন।

পিতৃদেবো ভব।

তৈত্তিরীয়োপনিষদি ১।১১।২

মান্যঃ পূজ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বেষাং জনকো ভবেৎ।
অহো যস্য প্রসাদেন সর্ব্বান্ পশ্যতি মানবঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণপতিখণ্ডে ৪৪।৫৯

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পুত্রের কর্ত্তব্য পিতাকে ভক্তি করা, পিতার প্রতি মমতা করা, তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হওয়া। আমার কনিষ্ঠ পুত্র ধ্রুবকুমারের বিষয় বলিয়া অদ্য পাঠক মহোদয়গণকে বিরক্ত করিব। কার্য্যক্ষেত্রের শেষ বার সে ও আমি একত্র ছিলাম—পরিবারবর্গ দেশে ছিল। ধ্রুব তাহার মাতুলালয়ে আহার করিয়া আসিত। একদিন সন্ধ্যাকালে শরীর ভাল না থাকায় সন্ধ্যায় তাহাকে আহারের জন্য গমন করিবার সময় কহিলাম “ব্রাহ্মণকে বলিয়া যাইও যে রাত্রে কিছু খাইব না।” সে যাইবার অনুমান এক ঘণ্টা পরে ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, তখন মনে করিলাম যে “যখন সে ফিরিয়া আসিবে তখন খাবার দোকানও বন্ধ হইয়া যাইবে, অদ্য রাত্রে অনাহারেই যাইবে।” কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কতকক্ষণ পরে সে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া রুটি ও তরকারী আনিয়াছিল।

আমি কহিলাম "তোকে যে খাবার আন্‌তে মানা করেছিলাম রে, আবার আন্‌লি কেন?" ধ্রুব কহিল "বাবা! দুয়ারটা পার হইতেছিলাম (পথের ধারে ঘর ছিল) মনে হোল বাবার খিদে লেগেচে।" পাঠক! মনে করুন কে তাহাকে আমার মনের ভাব জানাইয়া দিয়াছিল? ইহা কি দেবত্ব নহে? তখন তাহার বয়স ৯ বৎসর। তাহার যখন ৬ বৎসর বয়স তখন একদিন কহিয়াছিলাম "ওরে! আমি বৃন্দাবন যাব।" সে বলিল "আমিও যাব বাবা।" "সেখানে তোর মা ছেড়ে কি করে থাবি রে? শুবি কিসে?" উত্তর "আমাকে একটি ছোট মুতরি (হাতে দেখাইয়া) (ট তখনও উচ্চাচরণ হয় নাই, পশ্চিমে "মুটুরি" = পুঁটলী) বেঁধে দেবে—মাথায় করে নিয়ে যাব।" "সেখানে খাবি কিরে? একবেলা যে খেতে হবে?" উত্তর "তাই খাবো।" কতকক্ষণ পরে কহিয়াছিলাম "তুই যখন ঘুমাবি, তখন পালিয়ে যাব।" কহিল "আমাকে যেমন করে কাঁদাবে, আমিও তেমনি করে কাঁদাব।" ইহা কত দূরের কথা ইহা মনে করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয় না কি? যখন আমি তাহার পুত্র হইব, সে পিতা হইবে—তখন সে আমায় কাঁদাইবে! কারণ জীব অনাদি সুতরাং কর্ম্মও অনাদি—

"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।"

বেদান্তদর্শনে ২। ১। ৩৪

এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, তজ্জন্য সে আমার জন্য চিন্তান্বিত থাকে—কোন্ দিন পরপারের ডাক আসে তাহার ঠিক নাই। তজ্জন্য সেদিন লিখিয়াছে—

"বাবা! আমি আপনার জন্য যে কি পর্য্যন্ত চিন্তিত থাকি তাহা আপনাকে কি করিয়া বুঝাইব? পত্র যে দিতে পারি নাই তজ্জন্য আমার উপর আমার নিজেরই সময় সময় রাগ হয়, আর আপনার সংবাদ প্রায়ই পাইয়া থাকি বলিয়াই আপনাকে সময়ে পত্র দিই না। তজ্জন্য এই পত্র লেখার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে ভাল করে বুঝাতে বোধ হয় পারলাম না, কারণ সেরূপ বুদ্ধি আমার নাই। জানি আমি যতই দোষ করি আপনার স্নেহ হইতে কখনও বঞ্চিত হইব না।" জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীষ্মদেব General manager, court of wards estates, Mymensingh; ধ্রুব তাহার আপিসে কার্য্য করিত, কিন্তু স্বদেশী-প্রিয় বলিয়া চাকরি ত্যাগ করিয়া তথায় স্বদেশী দ্রব্যের দোকান আরম্ভ করিয়াছে—তজ্জন্য সময় পায় না। ধ্রুবকুমারের আমার প্রতি অনেক মমতার, ভক্তির কথা আছে; তাহা লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড পুস্তক হয়। দুই একটি মাত্র দিগ্‌দর্শন করিলাম।

জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একবার লিখিয়াছিলাম "দুঃখী লোকের পুত্র বলিয়া বোধ হয় দুঃখ কর।" আমি ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা সঞ্চয় করিতে পারিতাম—তাহা হইলে ১২ আল্মারি সংস্কৃত পুস্তক ক্রয় করিতাম না। যদি বিষয় করিতাম এতদিন রাঁচিতে অনেক বিষয় করিতে পারিতাম—ছোট জমিদার হইতে পারিতাম, কারণ তৎকালে রাঁচিতে রেল হয় নাই—বিষয় খুব সস্তা ছিল। একটি লোক আমায় বাগান বিক্রয় করিতে চাহিয়া ছিল, মুল্য ২০০৲; লই নাই—আর একজন ৩০০৲ মুল্যে লইয়াছিল। রেল হইলে কলিকাতার এক বাবু সেইস্থানে গৃহ করিবার জন্য ১৪০০০৲ টাকা মুল্যে কিনিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য বিষয়ও ক্রয় করি নাই। আমার ভয়, পাছে মৃত্যুর সময় বিষয় কিম্বা টাকার চিন্তা হয়। আজীবন এক বিষয়ের চিন্তা করিলে মৃত্যুর সময় সেই চিন্তা আসিয়া উদিত হইবে—সুতরাং সেইরূপ জন্মও হইবে—ভরত-ঋষির হরিণী-গর্ভে জন্মের মত—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ॥

গীতায়াং ৮।৬

অন্যত্র—

যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥

পঞ্চদশী ধ্যানদীপে ১৩৭।

অন্যত্র—

যতো যাতো ধাবতি দৈব-চোদিতং
মনোবিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়া-রচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥

শ্রীভাগবতে ১০।১।৪২

আসিয়াছি উলঙ্গ, যাইব হাত খুলিয়া; কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না—আর এখানকার টাকা লইয়া গেলেও সেখানে চলিবে না—

"সে বড় কঠিন ঠাঁই।
গুরু শিষ্যে দেখা নাই।"

কেহই সঙ্গে যাইবে না—কেবল কর্ম্ম বা ধর্ম্ম—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যৎ তু গচ্ছতি

মনুঃ

অথবা—

"যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু,
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই,
করম সঙ্গে চলি যায়।"

বিদ্যাপতি—আত্ম-নিবেদনে।

সুতরাং ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিষয় বা টাকা সঞ্চয় করি নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সবজজ ছিলেন—যাহা বিষয়-ভাগ পাইয়াছিলাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর ভার দিয়া কর্ম্মস্থানে ছিলাম—তাহাতে তিনি অনেক জমি বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। এত বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে কিছুই দেখি নাই। বিশ্বাস করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম, সে সময়ে তিনি বক্ষে শাণিত অস্ত্র বিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিষয়ের জন্য বলিতেছি না, তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কহিলাম মাত্র। তাঁহার আত্মা কাঁপিয়া উঠিল না? গ্রামে দুইটি লোক কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন—অর্থের মাদকতা-শক্তিতে তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল—চলনও বাঁকা। তজ্জন্য টাকা সঞ্চয় করি নাই; টাকা থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল, না থাকিলে ভগবানকে প্রাণের সহিত ডাকা যায়। শান্তিশতকে পাঠ করিয়াছি—

"অর্থঃ পাদরজোপমং"

সুতরাং সেইভাবে চিরকাল কাটাইলাম।

তজ্জন্য ভীষ্মকে লিখিয়াছিলাম যে "দুঃখী লোকের ছেলে বলিয়া বোধ হয় দুঃখ কর," তাহাতে সে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি এই—

"বাবা! আপনি কি ভাবেন যে আপনাদের ছেলে বলিয়া আমরা আমাদিগকে কাহারও অপেক্ষা হীন মনে করি? আপনার আদর্শ জীবনের প্রভাব আমাদের দেহ মন ছাইয়া রহিয়াছে এবং আপনার তপঃপ্রভাব আমরা বাস্তবিক যাহা তাহা অপেক্ষা আমাদিগকে অনেক উঁচুঁতে ধরিয়া রাখিয়াছে। ভগবান্

নিজেই বলিয়াছেন যে আমাদের যে জন্ম তাহা "দুর্লভতর"—দুর্লভ নহে—

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

গীতায়াং ৬। ৪২

সুতরাং আমরা অতি ভাগ্যবান্। বড়লোক বা ঘোর সংসারীর কবল হইতে যে ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন সেজন্য আমি তাঁহার চরণে বার বার প্রণাম করি। বর্ত্তমানের অবস্থা দেখিয়া আমরা কোনও দিন মুক্তির আশা করি; কিন্তু বিষয়ীর ঘরে যদি জন্ম হইত তাহা হইলে কে জানিত কোথায় থাকিতাম, হয়ত এসব নামই জানিতে পাইতাম না (১—এবং জন্মিবার পূর্ব্বে যাহা ছিলাম তাহাই থাকিতাম বা তদপেক্ষা হীনচেতা হইয়া পড়িতাম; শেষেরটাই সম্ভব, কারণ বর্ত্তমান জীবনের বৈষয়িক প্রলেপ লইয়াই যাইতাম—বিষয়ের প্রভাব এতই সংক্রামক।"

আমার ভায় ভীষ্মেরও অর্থে লালসা নাই। যখন Head clerk ছিল তখন প্রজাদিগের জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিত, তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে আসিত; কিন্তু সে বলিত "যাতে আত্মা দূষিত হয় তেমন কাজ করব না।" তাহার আত্মার দিকে দৃষ্টি—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদি ২।৪।৫ ও ৪।৫।৬

সে যদি যাচা টাকা লইত তাহা হইলে এতদিন টাকায় মরাই করিতে পারিতাম। এ টাকার লোভ তাহা অপেক্ষা উচ্চ কর্ম্মচারিগণও ত্যাগ করিতে পারেন না—তাঁহাদের সহিত একত্র থাকিয়া দেখিয়াছি। সে নিজে কখনও আত্মপ্রশংসার কথা বলে না—গ্রামের অনেকগুলি লোক লইয়া গিয়া তাহাদিগের জীবিকা দিয়াছে—তাহাদের মুখে শুনিয়াছি। এই জন্যই ময়মনসিংহের কলেক্টর, কমিশনর, মায় বোর্ড অফ্ রেভিনিউর সেক্রেটারি পর্য্যন্ত তাহাকে ভালবাসেন। যে ভীষ্ম সেই ভীষ্ম—তাহার ত্যাগ-স্বীকার প্রশংসার্হ। নূতন নায়েব বাহাল হইয়াছিল, তিনি বাসায় ৫০ টাকা দিতে আসিয়াছিলেন, তাহাতে ভীষ্ম বলে "ওসব কেন? এখানে আসিবার আবশ্যকতা নাই, যাহা কিছু বলিবার থাকে কাছারিতে বলিবেন।" তিনি মনে করিলেন "কম টাকা

(১) ভীষ্মদেব আমার মত প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ করে, তজ্জন্য এ কথা বলিয়াছে।

বলিয়া বোধ হয় মনে ধরে নাই”—পরদিন ১০০ টাকা লইয়া গিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল “তোমাকে কাল্ আস্‌তে মানা করলাম, আবার আজ এসেছ? যদি অমন কর, তা হলে তোমার নামে সস্‌পেণ্ডের রিপোর্ট করব” নায়েব প্রস্থান করিয়াছিলেন। এরূপ অনেক ঘটনা আছে। তাহার আপিসের নিকট, সাহেব অনেকটা স্থান গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য দিয়াছেন, সে যদি নায়েবদিগের নিকট বলে যে “এখানে ঘর করিতে হইবে” তাহা হইলে বিনা খরচে ঘর হয়; কিন্তু সে কথা কখনও বলে নাই। আমার কনিষ্ঠা কন্যা নরেশনন্দিনীর বিবাহ হইয়াছিল, সে যদি একদিন নায়েব ও তহশিলদারগণের নিকট বলিত যে “আমার ভগ্নীর বিবাহ,” তাহা হইলে বিনা খরচায় বিবাহ হইত; কিন্তু নরুর বিবাহের কথা কাহাকেও বলে নাই! এইরূপ তাহার ত্যাগের আদর্শ। সে জানে—

“ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।”

কৈবল্যোপনিষদি ২।

মহানারায়ণোপনিষদি ১০।৫

ত্যাগ না হইলে মনুষ্য সুখী হইতে পারে না—

“——ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।

গীতায়াং ১২।১২

সে ৬০।৭০ জন লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তিরস্কার করিলে কোন কথার উত্তর দেয় না। সে তাহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বাটীর বিগ্রহ শ্রীরাধা-দামোদর পিতৃদেবের সহিত স্বপ্নে কথা কহিতেন; পিতৃদেব দিবাভাগে আহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, বার্দ্ধক্য-বশতঃ (তখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর) তন্দ্রা আসিয়াছিল—দামোদর স্বপ্ন দিলেন “তোমার পৌত্র হইয়াছে।” পিতৃদেব দেখিলেন ছেলে শ্যামবর্ণ হইয়াছে, আনন্দিত হইয়া কি নাম রাখিবেন চিন্তা করিতেছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ভীষ্মস্তব পাঠ করিতেছিলেন, তজ্জন্য “ভীষ্মদেব” নাম রাখিয়াছিলেন। তন্দ্রার অবসানে দরদালানে আসিয়া আমার সেজো ভগ্নী ও পাচিকাকে এ সংবাদ দিয়াছিলেন; তাঁহারা কহিয়াছিলেন “কাল তত্ত্ব করিতে গিয়াছে, এর মধ্যে ছেলে হওয়া কি?” অগত্যা তিনি নিজের পাঠাগারে আসিয়াছিলেন। বৈকালে ৯ ক্রোশ দূর ভীষ্মের মাতুলালয় হইতে নাপিত ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বরাত্রে ভীষ্মের জন্ম-সংবাদ দিয়াছিল। পিতৃদেব তাহাতে কহিয়াছিলেন “এ ছেলে কি

হয় তোমরা দেখ্‌বে।" ভীষ্ম ত্যাগী, পিতৃভক্ত, নিরামিষাশী, অজাতশত্রু প্রভৃতি অনেক গুণযুক্ত। পিতৃদেবের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় নাই। তিনি যাহাকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে। আমায় কহিয়াছিলেন "তুমি সংসারী হইতে পারিবে না"—তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে। বিষয় অনেক ছিল—সংসারে ঔদাসীন্যবশতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রের উপর বিষয়-ভার দেওয়াতে অনেক বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। এখনও কি কি বিষয় আছে তাহারও খোঁজ রাখি না।

বিষ অপেক্ষা বিষয় মন্দ; কারণ বিষ এক জন্ম নষ্ট করে, কিন্তু বিষয় জন্ম জন্মকে নষ্ট করে। (কারণ পূর্ব্বে গীতার ৮। ৬ শ্লোকে কথিত হইয়াছে)—

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্বিষয়ং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া এক-দেহ-হরং বিষম্‌॥

যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে ২৯।১৩

মহাপ্রভুও কহিয়াছেন—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে ৮ অঙ্কে।

দুর্লভ মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়া কি চিরকাল "বিষয়" "বিষয়" চিন্তা করিয়া আত্মার অধোগতি করিব যে চিরকাল বিষয়ীর গৃহে (সংস্কারবশতঃ) জন্ম-গ্রহণ করিব?

কাচমূল্যেন বিক্রীতোহহন্ত চিন্তামণির্ম্ময়া।

মহামূল্য চিন্তামণিকে কাচ বিনিময়ে বিক্রয় করিব? তাহা হইলে আমা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য ও বিধি-বঞ্চিত আর কে আছে? সংসারে কয়দিনের জন্য আসিয়াছি—তাহাই বা কত পরিমাণ দ্রব্য আমার শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইবে?

"Man wants but little here below
Nor wants that little long"

Goldsmith—Hermit.

বিষয় আপাততঃ প্রিয় হইতে পারে কিন্তু মৃত্যু-সময়ে যন্ত্রণাদায়ক—

আপাত-রম্যা বিষয়াঃ পর্য্যন্ত-পরিতাপিনঃ॥

ভারবিঃ ১১। ১২

যখন ত্যাগ করিতেই হইবে তখন পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য নহে কি ?

ইতি ত্যাজ্যে ভবে ভব্যো মুক্তাবুত্তিষ্ঠতে জনঃ ॥

ঐ ১১। ১২

যখন মরিতেই হইবে তখন বিষয়ে চিত্ত আসক্ত করিয়া আত্মার অসদ্‌গতি করি কেন ?

"What is pomp, rule and reign, but earth and dust ?
And live we here we can, yet die we must"

King Henry vi (III part) Act v, scene II.

যাহা হউক আমার দুই পুত্রের ন্যায় পুত্র যেন শত্রুরও হয় যে তিনি সদানন্দে থাকিবেন। এরূপ অনেক পুত্রও দেখা যায় যে পিতার বক্ষে পদাঘাত করিয়াছেন কিন্তু সেই পায়ে কীট হইয়াছে; এরূপ পুত্রও দেখা যায় যে পিতাকে বেত্রাঘাত করিয়াছে—জলে ডুবাইয়াছে—মাথা উঠাইলেই পুনরায় মস্তকে বেত্রাঘাত! তাহার পরিণাম কুষ্ঠ ও অন্ধত্ব! এরূপ শিক্ষকও দেখা যায় যে তিনি পিতাকে প্রহার করিয়াছেন, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেরূপ শিক্ষককে বালকগণের শিক্ষার ভার কি প্রকারে দেওয়া হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না! এরূপ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী দেখিয়াছি যে তাঁহার পিতা আমাদের নিকট দুঃখ করিতেন যেন তিনি "বাজার সরকার।" সেরূপ বড় রাজকর্ম্মচারী পুত্রের পিতা হইতে কামনা করি না—তিরস্কার করিলেও যে পুত্র উত্তর দেয় না—সে পুত্রই ভাল নহে কি ? পুত্র জজ হইলেও পুত্র—

"পিত্রা পুত্র বয়স্থোঽপি সততং বাচ্য এবতু।"

বিষ্ণুপুরাণে।

ভীষ্ম যে পত্র দিয়াছিল তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে "পুত্র অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু এরূপও দেখা যায় যে পিতা অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ; কারণ কুম্ভ নিজ শরীরের আয়তন মত সমুদ্র-জল লইতে পারে; কিন্তু কুম্ভযোনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন! পুত্র আমায় "যোগী" "তপস্বী" বলিল, আমিই বা পরাজয় স্বীকার করি কেন ? কেবল যে ইহাতে পুত্রের প্রাধান্য রাখিয়াছি তাহাও নহে, আমা অপেক্ষা তাহার মহত্ব ও দেবত্ব আছে; কারণ আমার শরীরেও রাগ আছে, কিন্তু তাহার শরীরে কখনও রাগ দেখিলাম না! যেই মাটীর মানুষ সেই মাটীর মানুষ। Longfellow কহিয়াছেন—

"Dust thou art, to dust returnest"

A psalm of life.

কিন্তু পারসী কবি সেখ সাদী কহিয়াছেন—

এ্যায়্ বেরাদর্ চো আকবতে খাক্ অস্ত্।
খাক্ শত্ত পেশ্ আজ্ঞা কে খাক্ শত্তই ॥

গুলস্তান্ II—XI.

অর্থাৎ, হে ভাই! পরিণামে যখন মাটিই হইবে, তখন মাটি হইবার পুর্ব্বে (অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই) মাটি হও।

অন্যত্র—

দিলা তাকে দর্ ইকাস্সে মিজাজে।
কুনী মানিন্দ তিফ্লাঁ খাকে বাজী ॥

জোলে খা।

এই শরীর যেন শিশুর ধূলা খেলা।

নূতন বর্ষ!

লেখক—শ্রীমন্মথকুমার রায় বি, এল, বি, সি, এস।

একটি বরষ, গেলরে চলিয়া, কালের স্রোতে ভেসে;
বাড়িল বয়স, কমে গেল দিন, আসিল শমন ঘেঁসে।
যত যায় দিন, তত আয়ু ক্ষীণ, কতজন ভাবে তাহা—
আশার স্বপে, বিভোর সকলে, মনে মনে কহে আহা—
এমন সুন্দর, জীবন আমার, এমন কৈশোর-খেলা,
এমন যৌবন, স্ফূর্ত্তির জোয়ার, এমন আনন্দ-মেলা—
এমন পূর্ণ, প্রৌঢ়ের সংসার, ধন জন কত গর্ব্বে,
কে বলে বাতুল, হেন সুখসৌধ, কখনো ভাঙিয়া পড়বে!
যত যায় দিন, তত আয়ু ক্ষীণ, তত যেন বাড়ে আশা,
তত যেন নর, দৃঢ় ক'রে বাঁধে, সংসারে মায়ার বাসা!
হায়রে অবোধ, বিমূঢ় মানব, মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করে—
যত যায় বর্ষ, তত যায় দিন, শরীর ভাঙিয়া পড়ে?
কেহ কি কখনো, ফিরিয়া পশ্চাতে, গণনা অন্তরে করে,
কি কর্ম্ম করিয়া, কাটাইল কাল, কি হবে জীবন-পরে?

যে জন্য জগতে, মানব জনম, হলো কি সিদ্ধি তার,
করেছে কি কিছু, পাথেয়-সঞ্চয়, উত্তরিতে পারাবার ?
ভাবে কি মানব, কখনো ক্ষণিক, এ জীবন নহে নিত্য—
এ সংসারে আসা, কর্ম্মস্রোতে ভাসা, বুঝিতে তাঁহার তত্ত্ব,
যাঁহার ভজনা, জীবনের ধর্ম্ম, যিনি শুধু সত্য ধন,
যাঁহারে ভজিলে, কর্ম্মেতে খুঁজিলে, সার্থক জীবন-রণ !
ধন-জন-মায়া, সব মিথ্যা ছায়া, আজ আছে কাল নাই,
তবুও অজ্ঞানে, সর্ব্ব মনঃ প্রাণে, কেবল তাহাই চাই।
কোথা রবে পড়ে, সুত-সুতা-নারী, কোথা রবে বাড়ী বিত্ত ?
কোথা রবে মান, পদের গৌরব, যখন ছাড়িবে সত্য—
এ দেহ-পিঁজর, আত্মা বিহঙ্গম ? তাহা কি ভাবিরে মনে
কভু ফিরে বুঝি, কেবল সে ধর্ম্ম, যাইবে আত্মার সনে।
হায়, হায়, কবে বুঝি সেই সত্য, করিব ভজনা হরি,
গেল গেল দিন, হলো আয়ু ক্ষীণ, কেমনে পাইব তরী ॥

হিন্দুমহাসভা ও ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন।

লেখক—সম্পাদক।

আজ কয়েক বৎসর হইল হিন্দুমহাসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কাশীস্থ হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় ইহার কর্ণধার। হিন্দুমহাসভার প্রধান উদ্দেশ্য—যে সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আদিস্থান ভারতবর্ষ, তাহাদের মধ্যে একতাস্থাপন করা। প্রচলিত ভাষায় হিন্দু শব্দে যাহা বুঝা যায়, তাহা অপেক্ষা হিন্দুমহাসভার 'হিন্দু'শব্দের অর্থ ব্যাপক,—অর্থাৎ হিন্দুমহাসভার মতে 'হিন্দু'শব্দ দ্বারা বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী এবং চাতুর্ব্বণ্যসমাজের সকলকেই বুঝাইবে, হিন্দুমহাসভায় আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই স্থান থাকিবে।

অনেকের এরূপ ধারণা যে হিন্দুমহাসভা অত্যন্ত বিপ্লববাদী, অর্থাৎ তাহার পরিচালকগণ প্রচলিত হিন্দু আচার প্রভৃতি নিষ্পেষিত করিয়া হিন্দুসমাজে

একাকারের প্রবর্ত্তন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন! এ ধারণা ভ্রমমূলক। হিন্দুমহাসভার কর্ণধার মহামান্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মা উভয়েই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় ইহা নয় যে শাস্ত্রাদির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া হিন্দুসমাজে একটী মহাবিপ্লব আনয়ন করেন; কিন্তু তাঁহারা সকলবর্ণের হিতকামী। অপর পক্ষে যাঁহারা হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের অভ্যুদয়কামী, তাঁহারা মনে করেন যে হিন্দু-মহাসভা উচ্চবর্ণের লোকদিগেরই প্রতিনিধি, উহাতে নিম্নবর্ণের কোনও স্থান নাই। এরূপ ধারণাও ভ্রান্তিমূলক।

বৈদিক পুরুষসূক্তে মানবমাত্রকেই পুরুষের অঙ্গস্বরূপ বলা হইয়াছে, এবং পুরুষসূক্তের চারিবর্ণ যে কেবল বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেই রহিয়াছে তাহা নহে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে উহা কোনও না কোনও আকারে সকল সমাজেই রহিয়াছে। যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে সমগ্র মানব-সমাজই সনাতন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে, যাহা সম্ভবপর তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা সমীচীন। এবং সেইজন্য ভারতে যে ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের উৎপত্তি ও যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সহিত এই মহাসভার সম্বন্ধ সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ভগবান্ বুদ্ধদেব। তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে তিনি কখনও সনাতনধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির অবমাননা করেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মকে বরাবরই সনাতনধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছে। চীন, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, জাপান, জাভা, কাম্বোডিয়া, শ্যাম, ব্রহ্ম, সিংহল ইত্যাদি বহুদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেশভেদে আচারাদির ভেদ-সত্ত্বেও মূলতত্ত্বগুলি একই রহিয়াছে। যে ভাবেই দেখুন, রাজনৈতিক ভাবেই হউক, সামাজিক ভাবেই হউক, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে পারিলে আমাদের ও তাঁহাদের উভয়েরই মঙ্গল। বৌদ্ধেরা এখনও ভারতবর্ষকে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করেন এবং গয়া, কাশী, কপিলাবস্তু প্রভৃতি স্থানকে তাঁহাদের পুণ্যতীর্থ জ্ঞান করেন।

স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী একবার শ্যামদেশে গমন করিয়াছিলেন। সে সময় একজন প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু

বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আমার ভাগ্যে ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মস্থান, তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিস্থান এবং তাঁহার মহানির্ব্বাণ-প্রাপ্তিস্থান দর্শন ঘটে নাই। ভারতবর্ষকে আমরা পবিত্রক্ষেত্র জ্ঞান করি, আপনি সেই দেশ হইতে আসিয়াছেন, আপনাকে দেখিয়াই আমার যেন মনে হইতেছে যে আমি তথাগতের জন্মস্থান ভারতভূমি দর্শন করিলাম। আপনি আমার পূজার্হ।" এখন দেখুন, যাহারা ভারতের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধান্বিত তাহাদের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া তাহাদের ও আমাদের বল বৃদ্ধি করা সঙ্গত কিনা। জৈনধর্ম্মেরও আদিস্থান ভারতবর্ষ এবং উহা ভারতের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে! জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা মহাবীরও ক্ষত্রিয়কুলেই জন্মগ্রহণ করেন। বেদোক্ত 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' এই মহাবাক্য মহাবীরের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। জৈনধর্ম্মের বিধান সনাতনধর্ম্মেরই বিধান। আচারে অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও সনাতনধর্ম্মের মূলমর্ম্ম জৈনধর্ম্মে বিদ্যমান। এতদ্দেশের ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে জৈন। মাড়োয়ারীরা অনেকেই জৈন। ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় সমাজের মেরুদণ্ড,—শাস্ত্রানুগত বৈশ্য তাঁহারাই। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করায় সমাজের ক্ষতি। জৈনগণ যে হিন্দুসমাজেরই লোক, তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। এইরূপ সম্প্রদায় সকলকে ত্যাগ করিলে হিন্দুসমাজ আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হইবে। জৈনগণের সহিত সৌহার্দ্দ-স্থাপন সর্ব্বথা হিন্দুসমাজের মঙ্গলকর।

শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানক হিন্দুরই সন্তান; তিনিও ক্ষত্রিয়। তাঁহার শিক্ষায় সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্ব পরিত্যক্ত হয় নাই। নানকের ভক্তিবাদ গুরু-গোবিন্দসিংহের সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যবহৃত হইয়া একটু নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্ব হইতে উহা দূরে যায় নাই। শিখ-সম্প্রদায় হিন্দুর শৌর্য্য-সমৃদ্ধির নিদর্শন। শিখসমাজ হিন্দুসমাজের শাখা, নূতন জিনিষ নয়। শিখসমাজকে হিন্দু বলিয়া মনে করিতে আপত্তি হওয়ার কোনও কারণ নাই। ঘরের ছেলেকে পর মনে করিলে লাভ ত নাইই, বরঞ্চ যথেষ্ট ক্ষতি। এ সকল কথা এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে, শিখসমাজের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনে হিন্দুসমাজের বল-বৃদ্ধি হইবে।

মহামতি রামমোহন রায় নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীর অগ্রগামী সন্তান। তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। রামমোহনের অবলম্বন বেদের জ্ঞানকাণ্ড—উপনিষৎ। উপনিষদুক্ত ধর্ম্ম যে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মের শিরোভাগ তাহা কোনও হিন্দুসন্তান অস্বীকার করিতে পারেন না। বহিরাবরণ বা খোলসের ভেদ থাকিলেও

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্বের উপরই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তাহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মগণ হিন্দু—ইহা খুব সত্য। আচার ব্যবহারের পার্থক্য বিশেষ নাই, থাকিলেও ধর্ম্মের তত্ত্বতঃ ভেদ হয় না। ব্রাহ্মসমাজে বর্ণভেদের আদর নাই। লক্ষ্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলা যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণ-বিচারের অতীত—একথা হিন্দুশাস্ত্রেরই কথা। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের বর্দ্ধিত শাখা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, সুতরাং ব্রাহ্মগণকে দূরে রাখা উচিত নয়। পরস্পরের সম্মিলনে সমগ্র সমাজের কল্যাণ ঘটিবে।

মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্যসমাজ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহার মত বেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আচার অনুষ্ঠানে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও 'আর্য্য'গণ ও 'হিন্দু'গণ একই বেদোক্ত ধর্ম্মের সাধনা করেন। হিন্দুগণ যদি আর্য্যসমাজকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে স্বীয় শরীরের অঙ্গ কর্ত্তনই করিবেন। আর্য্য ও হিন্দুর সম্মিলনে দেশের মঙ্গল হইবে। হিন্দুসমাজ এখন বর্জ্জননীতি পরিত্যাগ করিয়া সমন্বয়নীতি গ্রহণ করুন, অন্যথা ধ্বংসের প্রতীকার সম্ভব হইবে না। আর্য্যসমাজী মহামতি লালা লাজপত্ রায় এবার কলিকাতায় হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে সভানেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশ-হিতৈষী লোকেরা ইহাতে আশ্বস্ত হইয়াছেন। ভারতের সনাতনধর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায়গুলিকে এখন একসূত্রে বাঁধিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আচার-ব্যবহারগত পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মূলতত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইবে—ঐ সকল সম্প্রদায়ই সনাতন হিন্দুসমাজরূপ মহাবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা মাত্র। উহাদের মধ্যে যে মূলতঃ সংযোগ আছে, তাহারই উপর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে—স্বগত ভেদ পরিহার করিতে হইবে—সমন্বয় করিতে হইবে—সামঞ্জস্য করিতে হইবে।

অনুন্নত জাতিবিষয়ক প্রশ্ন হিন্দুসমাজে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। আত্মদ্রোহে সমাজের সর্ব্বনাশ হয়—আত্মকলহে ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত হয়—একথা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। মূর্খ পতিত ভ্রাতাকে যদি আমি গৃহে স্থান না দেই, সে স্থানান্তরে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে—ইহা ঠিক্। মানুষের এই সহজ ভাবের উপর জোর চলে না। তাহাকে ভাল করিব—উন্নত করিব—যোগ্যতা-অনুসারে ধীরে ধীরে তাহাকে গৃহকর্ম্মে—ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার দিব—ইহাই ভাল পথ। আর যদি কঠোর বর্জ্জননীতি অবলম্বন করি, তবে তাহাতে যে ফল ফলিবে, তাহা কাহারও কল্যাণকর হইবে না,

দেখিতেছি—বর্জ্জননীতির ফল ভাল হইতেছেও না। সামঞ্জস্য চাই, একদিক্ দেখিলে চলিবে না। হিন্দুমহাসভা এই সামঞ্জস্যের—এই সমন্বয়ের গান গাহিতেছেন। এই পথে চলিলে যে অনিষ্টের প্রতীকার হইবে—বল-বৃদ্ধি হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। হিন্দুমহাসভা আশা করেন সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুসন্তান হিন্দুমহাসভার পতাকাতলে সমবেত হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবেন।

ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন দেশের আর একটী অনুষ্ঠান। হিন্দুমহাসভার পূর্ব্বেই ইহার আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু ইহা কেবল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সমাজের জিনিষ। বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলী ও ধর্ম্মানুরাগী বিষয়ী ব্রাহ্মণগণ ইহার কর্ম্মী। এবার বর্দ্ধমানে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। তাহিরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর ইহার নেতৃত্ব করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার যত্নেই ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের কার্য্য পরিচালিত হয়। ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন, যাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রকৃতপথ হইতে রেখামাত্রও দূরে সরিয়া না যায়, সেদিকে ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের বিশেষ লক্ষ্য আছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে দেশের মঙ্গল হইবে—এরূপ বিশ্বাস যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগের অভিসন্ধি ও বিশ্বাসের প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করি। কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে যে সকল নূতন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সমাধানকল্পে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন কি করিবেন তাহা জানিতে না পারিলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হিন্দুমহাসভা ভারতীয় সনাতনধর্ম্মমূলক ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে চাহেন, উদ্দেশ্য ধর্ম্মরক্ষা, আত্মরক্ষা ও বলবৃদ্ধি। ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনও হয়ত বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে একপ্রাণতা বা সদ্ভাব স্থাপন করিতে চাহেন, কিন্তু কি উপায়ে ঐ কার্য্য সাধন করিবেন তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন কেবল ব্রাহ্মণগণের। ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজরূপ বিরাট্ পুরুষের উত্তমাঙ্গ। কিন্তু কেবল একটী অঙ্গের ভাল মন্দ ভাবিলেই ত চলে না, সর্ব্বাঙ্গের ভালমন্দের চিন্তা করিতে হয়। অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য করিলে কার্য্যের সুবিধা হয়—একথা স্বীকার করি। তবে সকলেরই লক্ষ্য এক হওয়া উচিত। সমন্বয়নীতির অনাদর করিয়া বর্জ্জননীতির সমাদর করিলে তাহা যে বর্ত্তমান সময়ে কল্যাণকর হইতে পারে না—ইহা অবশ্য ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের পরিচালকগণ অবগত আছেন। ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখার প্রীতি-সম্মেলনের

আকাঙ্ক্ষা করেন, শুধু এইটুকু শুনিলেই পিপাসা মিটিবে না, কার্য্যে উহার পরিচয় পাইলেই সমাজ কৃতার্থ হইবে। ধনী ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের নিকট বর্ণাশ্রমি-সমাজ অনেক আশা করে। ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন তাহাদের সে আশা পূর্ণ করিবেন কি না জানি না। হিন্দুমহাসভায় কি ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের কোনও প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন ? বিভিন্নক্ষেত্রে যাঁহারা একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগ থাকা আবশ্যক। যদি উদ্দেশ্যের ভেদ থাকে, তবে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের সে কথা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণাশ্রমি-সমাজকে বলা উচিত। বিরোধ থাকে সামঞ্জস্য করুন্, দোষ থাকে সংশোধন করুন্, কিন্তু সনাতন হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্দেশ্যগত বা লক্ষ্যগত ভেদ রাখিবেন না—সকলে এক উদ্দেশ্যে ধাবিত হউন্, সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। উদ্দেশ্যগত ভেদ লইয়া কার্য্য করিলে কিরূপ ফল হইবে তাহার মীমাংসা ভবিষ্যৎই করিবে ইহা সত্য, কিন্তু ভেদদৃষ্টি যে তত্ত্বতঃ অনিষ্টই করে—ইহা নিঃসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সমন্বয়-যাত্রায় হিন্দুজাতির ধ্রুবতারা হিন্দুশাস্ত্র। বেদাদিশাস্ত্রে সনাতনধর্ম্মের যে মূলতত্ত্বগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির রাখিয়া দেশকালপাত্রভেদে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচার পদ্ধতির সাময়িক পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও ভীত হইবার কারণ নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বাহ্যাচার চিরদিন একরূপ ছিল না, নাই, থাকিতেও পারে না। হিন্দুশাস্ত্রে যুগভেদে, দেশভেদে, অবস্থাভেদে, এমন কি বংশভেদে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বাহ্যাচারের প্রভেদ ও পরিবর্ত্তনের কথা আছে। সে সমস্ত উপেক্ষণীয় নহে। সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাহিরের "খোলস বদল করা" নূতন কথা নয়। হিন্দুশাস্ত্রেই আছে—কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাঃ ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ। দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ মতাঃ। সত্যযুগে মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র, ত্রেতায় গৌতমের, দ্বাপরে শঙ্খলিখিতের এবং কলিতে পরাশরের শাস্ত্র বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইহা হইতে বুঝা যায়—শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য সনাতন, চিরদিনই স্থির থাকে, বাহিরের আচার-ব্যবহার দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত হয়। যাহা হয়, প্রয়োজনমত তাহা হউক্। সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্বের সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভাব-সমূহের সমন্বয় হউক্। ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের সহিত হিন্দুমহাসভার মিলন হউক্। উন্নত হইতে অবনত অস্পৃশ্য পর্য্যন্ত সকলে আসুন্—সামঞ্জস্য সাধন করুন্—সনাতনধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করুন—আত্মরক্ষা করুন। ঐ শুনুন্ বেদ বলিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত।"

সনাতনধর্ম্মের মূল তত্ত্ব।*

লেখক—সম্পাদক।

ইদং শাশ্বত-ধর্ম্মস্য জন্মস্থানং মতং বুধৈঃ
পুণ্যভূর্ভারতং বর্ষং, নাম্না সিন্ধু-নদস্য হি
সিন্ধুতীর-নিবাসাংশ্চ নরান্ বৈদেশিকাঃ পুরা
হিন্দুরিত্যাখ্যয়া প্রাহুর্জিহ্বাঽপাটবদোষতঃ।
তস্মাৎ সনাতনো ধর্ম্মো ভারতীয়োঽপরৈর্নৃভিঃ
হিন্দুধর্ম্ম ইতি প্রোক্তো ভারতীয়ৈস্ততঃ পরম্।
তস্যৈব মূলতত্ত্বানি রত্নানীব মহান্তি বৈ
কৃৎস্নে প্রকাশ্য জগতি কৃতার্থাস্তু শুভা সভা। ১

পরমেশ্বর-বিশ্বাসো ভক্তিশ্চেশ্বর-পাদয়োঃ
কায়েন মনসা বাচা সত্যসংসেবনং পরম্,—
পরদ্রব্যে লোষ্টদৃষ্টির্মাতৃদৃষ্টিশ্চ যোষিতি—
আত্মজায়াতিরিক্তায়াং হিংসাত্যাগঃ শমোদমঃ
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সেবাচ ক্ষমাস্তিক্যং দয়াধৃতিঃ
বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচঞ্চ ক্রোধত্যাগো নৃসেবনং
চিন্তয়া কার্য্যতশ্চৈব পরমঙ্গল-সাধনম্।
এতৎ শাশ্বত-ধর্ম্মস্য লক্ষণং সমুদাহৃতম্।
এষু চিত্তং সমাধায় ব্রতমেতন্মহত্তরং
সাধয়ত্বিয়মিষ্টার্থং সদা শুভকরী সভা। ২

শাশ্বতস্যাস্য ধর্ম্মস্য স্তম্ভভূতঃ স্মৃতঃ খলু
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এব ন স্বাতন্ত্র্যমতোঽর্হতি।
শাশ্বতস্যাস্য ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বৈঃ সমং সদা
বর্ণাশ্রমানুকূলস্য ধর্ম্মস্যাস্তু সমন্বয়ঃ।
সম্প্রদায়গতো ভেদো যথাপ্নোতি সমন্বয়ং

কলিকাতা নগরীতে হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির ভাইস্-চেয়ারম্যান রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি C. I. E. কর্ত্তৃক পঠিত।

সম্প্রদায়িষু সৌহার্দ্দং যথা নিত্যং বিবর্দ্ধতে
সামঞ্জস্যঞ্চ সর্ব্বত্র যথা স্থানং প্রপদ্যতে
এষা সংসৎ তথা কৃত্বা সাফল্যং যাতু সাম্প্রতম্। ৩

সনাতনে ধর্ম্মবিধৌ সেবাধর্ম্মো মহান্ মতঃ।
যঃ সেবতে সদা লোকান্ স শ্রেষ্ঠো ধার্ম্মিকঃ স্মৃতঃ।
সেবা চতুর্ব্বিধা প্রোক্তা তাস্বাদ্যা জ্ঞানদানতঃ,
দ্বিতীয়ার্ত্তত্রাণরূপা চতুর্থী কায়িকা মতা,
কৃত্যাদ্যর্জ্জিতবিত্তস্য পরার্থে ত্যাগ উচ্যতে
সেবা তৃতীয়া, সেবায়াং কুশলো ধার্ম্মিকাগ্রণীঃ। ৪

পৃথিব্যাং মানবঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রাণিষ্বেষঃ স্বরাড়্মতঃ,
ভূতেষু সদয়ঃ কার্য্যো ব্যবহারস্ততো নৃভিঃ।
শাশ্বতস্যাস্য ধর্ম্মস্য ভারতীয়স্য নিশ্চিতং
সদয়-ব্যবহারোঽয়ং পুণ্যমঙ্গমিতীরিতম্। ৫

দেশকালব্যক্তিভেদাদ্ বহিরাবরণানি হি
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য ভিদ্যন্তে বহুধা খলু,
তেষাং ভেদেঽপি ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বং ন ভিদ্যতে
বহিরাবরণেভ্যস্তু ভিন্নং তত্ত্বং বিবিচ্য বৈ
সামঞ্জস্যেন কর্ত্তব্যং ধর্ম্মজীবন-যাপনম্।
তন্মূলতত্ত্বং বিস্মৃত্য প্রাণভূতং মহত্তরম্
বহিরাবরণে যত্নো ন কার্য্যো হিতমিচ্ছুভিঃ।
সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষানলঃ সর্ব্বশুভান্তকঃ
যথা ন লভতে বৃদ্ধিং তথা কার্য্যং হি সংসদা। ৬

জগত্যাং বহবঃ সন্তি ধর্ম্মাচারাঃ পৃথগ্বিধাঃ
সর্ব্ব এবানুবর্ত্তন্তে তে সনাতনধর্ম্মকম্,
কেচিৎ স্পষ্টতয়া কেচিত্তথাস্পষ্টতয়া চ তে।
উপজীবন্তি ধর্ম্মস্য মূলান্যস্য মহান্তি হি,
তেষু তেষু চ ভিন্নেষু সম্প্রদায়েষ্ববস্থিতম্—
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বং যথা যথা—
বিকাশং লভতে ক্ষিপ্রং তথা সংসৎ করোত্বিয়ম্। ৭

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্যন্তর্যামিবৎ স্থিতঃ।
ইদং তথ্যং মানবানাং সর্ব্বেষাং মনসি স্ফুটং
যথা স্যাদঙ্কিতং, চিত্তং ভবেৎ তদ্ভাবভাবিতং
যেন যেন হি রূপেণ, তথা সংসৎ করোত্বিয়ম্। ৮

ঘৃণ্যো ধর্ম্মবিরোধশ্চ বিরোধঃ সাম্প্রদায়িকঃ
তৌ নিমিত্তমনর্থানাং সদাজ্ঞানবিজৃম্ভিতৌ।
জ্ঞানালোকসহায়েন দূরীকৃত্যাজ্ঞতাতমঃ
সভা কৃতার্থতাং যাতু হিন্দূনাং হিতকারিণী।
পরার্থং স্বার্থং মন্যেত, স্বার্থং প্রাহুরনর্থকম্,
জ্ঞানী স্বার্থাবিরোধেন পরার্থামুপসেবতে।
পরার্থ-স্বার্থয়োর্লোকে বিরোধো নাস্তি কশ্চন,
দ্বয়োঃ সমন্বয়ং কৃত্বা কৃতার্থাস্তু শুভা সভা। ৯

সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ,
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মাস্তু কশ্চন দুঃখভাক্।
শুভং মিত্রস্য ভূয়াম্নঃ শত্রোরস্তু শিবং সদা
দুষ্টস্যাপ্যশুভং মাভূৎ শিষ্টঃ প্রাপ্নোতু মঙ্গলম্।
মানবাঃ সর্ব্বদেশীয়াঃ সর্ব্বধর্ম্মপরাঃ খলু
সম্প্রদায়েষু সর্ব্বেষু বসন্তো হিতমিচ্ছবঃ
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বং নিশম্য তৎ
জ্ঞাত্বাবলম্ব্য তিষ্ঠন্তু ধর্ম্মমার্গে নিরন্তরম্।
কৃতকার্য্যাস্ত্বিয়ং সংসৎ সর্ব্বান্ প্রজ্ঞয় মানবান্
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বং সুনিশ্চিতম্।
ভগবৎপাদয়োর্যাচে যদুনাথোঽহমানতঃ।
পূর্ণামাশামিমামীশঃ করোতু করুণাময়ঃ। ১০

ওঁ শান্তিঃ।

বঙ্গানুবাদ।

পণ্ডিতদিগের মত এই যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই শাশ্বত (সনাতন) ধর্ম্মের জন্মস্থান। প্রাচীন সময়ে বিদেশীয় লোকেরা সিন্ধুনদের তীরবাসী মনুষ্যদিগকে জিহ্বাজড়তাবশতঃ "হিন্দু" নামে অভিহিত করিত। তজ্জন্য ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্ম ভিন্ন-দেশবাসিগণ কর্তৃক হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে লাগিল। ক্রমে ভারতবাসীও সনাতনধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম-নামে অভিহিত করে। সেই সনাতন-ধর্ম্মের অমূল্য রত্নস্বরূপ মূলতত্ত্বগুলি জগতে সম্যক্ প্রচার করিয়া এই কল্যাণ-করী সভা ধন্যা হউন।

পরমেশ্বরে বিশ্বাস, ভগবচ্চরণে ভক্তি, কায়মনোবাক্যে শ্রেষ্ঠবস্তু সত্যের সংসেবন, পরদ্রব্যে বিরাগ, স্বীয় স্ত্রী ভিন্ন সমুদায় স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃজ্ঞান, অহিংসা, শম, দম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেবা, ক্ষমা, আস্তিক্য, দয়া, ধৃতি, বাহ্যা-ভ্যন্তর শৌচ, অক্রোধিতা, নরসেবা, চিন্তা ও কার্য্য দ্বারা পরহিতসাধন, এইগুলি শাশ্বত ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। এই সকলে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া এই শুভকারিণী সভা এই মহত্তর ব্রত সাধন করুন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মও এই সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ, সুতরাং উহার স্বতন্ত্রতা সঙ্গত নহে। এই শাশ্বত ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমন্বয় আছে। যাহাতে সাম্প্রদায়িক ভেদের সমন্বয় হয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হয়, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য সাধিত হয়, এই সভা তাহা করিয়া সাফল্য-মণ্ডিতা হউন।

সনাতনধর্ম্মে সেবাধর্ম্ম মহৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বদা জন-সাধারণের সেবা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক। সেবা চতুর্ব্বিধ :—প্রথমতঃ জ্ঞানদ্বারা সেবা; দ্বিতীয়তঃ ভীত বা উৎপীড়িত ব্যক্তির রক্ষণ; তৃতীয়তঃ কৃষি-বাণিজ্যাদি উপায়ে অর্জ্জিত অর্থ অন্যের উপকারার্থে দান; এবং চতুর্থতঃ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সেবা। যিনি সেবায় কুশল, তিনিই ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও অপর প্রাণীদিগের সম্রাট্‌স্বরূপ। অতএব ইতর প্রাণীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করা মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য। এইরূপ সদয় ব্যবহার ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম্মের পবিত্র অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়।

দেশকালপাত্রভেদে সনাতনধর্ম্মের বহিরাবরণের বহু ভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু

বহিরাবরণের অর্থাৎ বাহ্য আচার-ব্যবহারের ভেদে ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের কোন ভেদ বা বৈলক্ষণ্য হয় না। বহিরাবরণ হইতে মূলতত্ত্ব ভিন্ন পদার্থ, ইহা বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব সামঞ্জস্যসাধন করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ মহত্ত্বর মূলতত্ত্বগুলি ভুলিয়া শুধু বহিরাবরণে যত্নপ্রদর্শন মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি সর্ব্বপ্রকার অশুভের আকর, অতএব যাহাতে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, সভা তাহাই করুন।

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের বহু ধর্ম্মাচার প্রচলিত আছে; উহারা সকলেই সনাতনধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করে। কোন ধর্ম্মাচার স্পষ্টভাবে এবং কোনটী বা অস্পষ্টভাবে সনাতনধর্ম্মের মহৎ মূলতত্ত্বগুলির অনুবর্ত্তন করিয়া জীবিত আছে। সেই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অবস্থিত সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি যে যে উপায়ে শীঘ্র বিকাশ লাভ করে, হিন্দুমহাসভা তাহাই করুন।

ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে বিদ্যমান আছেন; যে যে উপায়ে সকল মানবের মনে এই তথ্য স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয় এবং তাহাদের চিত্ত সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, সভা তাহাই করুন।

ধর্ম্মবিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘৃণার্হ; উহা অজ্ঞানবিজৃম্ভিত এবং অনর্থের হেতু। হিন্দুদিগের হিতকারিণী এই সভা জ্ঞানালোক-সাহায্যে অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত করিয়া কৃতার্থতা লাভ করুন।

পরার্থকে স্বার্থ মনে করিতে হইবে; পণ্ডিতেরা স্বার্থকে অনর্থকর বলিয়াছেন। জ্ঞানী স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিবেন। পৃথিবীতে পরার্থে ও স্বার্থে কোন প্রভেদ নাই। এতদুভয়ের সমন্বয় করিয়া এই মঙ্গলকারিণী সভা কৃতার্থ হউন।

সকলের মঙ্গল হউক, সকলে নিরাময় হউক; সকলে মঙ্গল দর্শন করুক, কেহই যেন দুঃখী না থাকে। আমাদের মিত্রগণের মঙ্গল হউক, আমাদের শত্রুরও সর্ব্বদা মঙ্গল হউক। দুষ্ট লোকেরও যেন অশুভ না হয়; শিষ্ট লোক মঙ্গল লাভ করুন। সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকে সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি শুনিয়া, বুঝিয়া ও অবলম্বন করিয়া নিরন্তর ধর্ম্মপথে অবস্থিতি করুক। এই সভা সকল মানবের মধ্যে সনাতনধর্ম্মের অপরিবর্ত্তনীয় মূলতত্ত্বগুলি সম্যগ্রূপে প্রচার করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করুন। ভগবচ্চরণে বিনত যদুনাথ ইহাই প্রার্থনা করিতেছে, করুণাময় ঈশ্বর তাহার এই আশা পূর্ণ করুন।

গীতা-ধর্ম্ম।

(কাব্য)

লেখক—শ্রীমন্মথকুমার রায় বি, এল্, বি, সি, এস।

(২)

জলদ-গম্ভীর স্বরে, কহিল সন্ন্যাসী, ওরে
মিছা কি ভাবিস তুই বসিয়া এ স্থানে,
মানুষ, মানুষ মত, সত্য কর্ম্মে হও রত,
নিরাশার ঘন মেঘ দূর করি প্রাণে।

ভাবিলে ভাবনা বাড়ে, হৃদয় আকুল করে,
থাকে না উদ্যম স্ফূর্ত্তি জীবনের কাজে,
বহু কর্ম্ম আছে হেথা, জীবন নয়রে বৃথা—
কর্ম্ম করি হও কর্ম্মী এই ধরা মাঝে।

দেহ মন সমর্পিয়া ফলাফল না ভাবিয়া
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর সমাপন,
যত টুকু আছে শক্তি, অন্তরে লইয়া ভক্তি
নিয়োগ করিয়া কর স্বধর্ম্ম সাধন।

অন্নের কারণ কেন, চিন্তাকুল হও হেন,
আহার যোগায়ে তিনি রেখেছেন তোর,
যে জন জন্মের আগে, নিজ কৃপা-অনুরাগে
মায়ের বক্ষেতে রাখি সুধাময়ী লোর,

জীবের জীবন তরে করেন ব্যবস্থা ওরে;
তিনি কি ভুলেছে তোরে জনমের পর?
রয়েছে ধরিত্রী ভরা অন্ন রাশীকৃত করা,
লও তুলে মুষ্টি পুরে, হয়ে যত্নপর।

বিহঙ্গ কুরঙ্গ যদি মৎস্য পক্ষী কীট আদি
আহার করিয়া লাভ যাপিছে জীবন,

তোর কি আহার নাই, এই ধরাধামে ভাই ?
বসুন্ধরা কিহে মরু তোমার কারণ ?

আছে ভূমি আছে শস্য, শ্রম কর অবিমর্ষ
রহিবে না চিন্তা-ভার জঠর-কারণ,
যথায় তরুতে ফল, সরিতে শীতল জল,
তথায় কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা রহে অবারণ ?

শ্রম কর চেষ্টা কর, দাঁড়াও করিয়া ভর—
আপনার কর্ম্মশক্তি—হ'ও না অলস,
কাপুরুষ বলি তারে, যে কেবল হাহাকারে
কাঁদিয়া লভিতে চায় অমৃত-কলস।

যত্ন বিনা কোথা সিদ্ধি ? লভিয়াছ শক্তি-বুদ্ধি,—
বিধাতার মহাদান মানব-মণ্ডলে ;
কর সৎ ব্যবহার, ধর্ম্মপথ করি সার,
সফল হইবে জন্ম এই ধরাতলে।

যাও যাও কর কর্ম্ম, মানিয়া গীতার ধর্ম্ম
নিষ্কাম নিস্পৃহ হয়ে, কর্ত্তব্যে কেবল,
লভিবে আনন্দশান্তি, রহিবে না চিন্তা-শ্রান্তি,
বিভুর কৃপায় হবে সাহসী সবল।

শুনিয়া সন্ন্যাসি-বাণী, অন্তরে বিস্ময় মানি,
কহিনু যুড়িয়া কর—কেমনে সাধিব,
আমার জীবন-কার্য্য, সংসার বিশাল রাজ্য,
কোথায় সে শক্তি-বুদ্ধি-সহায় পাইব ?

যদ্যপি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, জীবনের সার মর্ম্ম,
আপনি ত্যজিয়া কর্ম্ম, কেন ধর্ম্মপ্রাণ ?
নহে কি কলত্র-পুত্র সংসারে মঙ্গল-সূত্র,
তাহা কি সকল ছল, অসার সমান ?

সন্ন্যাসী হাসিয়া ধীর, কহে কথা সুগম্ভীর,
জ্ঞানপথ কর্ম্মপথ নরে দুই রয়,

কেহ ধরে জ্ঞান-পথ, কেহ ধরে কর্ম্ম সৎ,
কর্ম্মে জ্ঞান, জ্ঞান হ'তে ভক্তি উপজয়।

আমিও কর্ম্মের পথ, ধরেছি, শুনহে মত,
কর্ম্ম ছাড়া নাহি হয় কোনই সাধনা,
সহস্র কর্ম্মের ধারা, যে যেমন পায় সাড়া—
সে মত সে করে কর্ম্ম, পূরাতে কামনা।

সংসারে বিষয়ে ডুবে, আছে কর্ম্ম বহু ভবে,
সংসারীর কর্ম্ম-ধর্ম্ম অতীব কঠিন,
যে জন সে পথ ধরে, নিষ্ঠায় সুকর্ম্ম করে,
শোকে দুঃখে রোগে ক্ষোভে না হ'য়ে মলিন,—

সত্য কর্ম্ম-বীর তিনি, তার তুল্য নাহি জানি
অন্য কেহ আছে আর সর্ব্ব নর মাঝে;
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, নির্ব্বিকার শান্তপ্রাণ,
অভিভূত নাহি হয় ভয়-হর্ষ-লাজে।

সেই মত হ'য়ে বীর, সুখে দুঃখে রহি স্থির,
কর কর্ম্ম আপনার, কর্ত্তব্যের জ্ঞানে,
ঈশ্বরে রাখিবে চিতে, চলিবে সত্যের পথে,
চাতুরী-ছলনা-মিথ্যা রাখিবে না প্রাণে।

এমন কহিল যবে, সন্ন্যাসী প্রশান্তভাবে,
গদ গদ কণ্ঠে তবে কহিনু বচন,—
আপনি আমার গুরু, সর্ব্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু,
আপনার পদে প্রভু লইনু শরণ।

ধর তবে এই দীক্ষা, জীবনের সার শিক্ষা—
"ঈশ্বরে সঁপিয়া প্রাণ, সুকর্ম্ম-সাধন"
হইবে মঙ্গল তব, সতত সহায় রব—
যখন পড়িবে দায়ে, করিবে স্মরণ।

আসিয়া আশীস দিব, সত্য পথ চিনাইব,
যতটুকু আছে শক্তি, জ্ঞান-রশ্মি দিয়া,

আসল হৃদয় খাঁটি,　　তবে যায় ফল কাটি—
জীবনে কালিমা যত'—এমন বলিয়া—
নিমেষে কোথায় যেন,　　বায়ুগর্ভে বাষ্প হেন
হইলেন অন্তর্ধান মহান্ পুরুষ,
আমিও সে নীতি ধরি,　　বাহিতে জীবন-তরী
উঠিনু, মুছিয়া বলে চিন্তা অপৌরুষ ॥

ভক্তি-কথা।

লেখক— শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গোপীদিগের মনের ময়লা দূর হইয়াছে কিনা ইহাই পরীক্ষার্থ ভগবান্ গোপীদের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন। বস্ত্র অপহৃত হইলে তাহারা জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইল। কেহবা জলে নিমগ্ন হইল। কিন্তু, সেই নীরের অভ্যন্তরেও তাহারা নীরদবরণ রাধারমণকে দেখিতে পাইল। তখন তাহারা বুঝিল জলে, স্থলে, শূন্যে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র সেই কালবরণ নীলরতন। যখন তাহারা লজ্জা, ভয় ত্যাগ করিল, তখনই ভগবানকে প্রাপ্ত হইল। লোক-নিন্দা-ভয় স্ত্রীজাতির অতিশয় ভীতিপ্রদ। পর-পুরুষ-সংসর্গ যদি হঠাৎ কেহ দেখে, তাহাতে স্ত্রীজাতির মৃত্যু তুল্য লজ্জা জন্মে। সুতরাং তাহা স্ত্রীজাতির, বিশেষতঃ কুলবালার ত্যাগ করা সহজ নহে। তবে যাহারা সাধারণী বেশ্যা হয়, সে রমণীরা, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। গোপীদিগের সে ভাব নহে. তাহারা বহু জন্ম কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবানকে পতিভাবে ভজনা করিয়া ছিল, পরে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের অমানুষিক লীলা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি জন্মে। তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া জানিতে পারে। অলৌকিক কার্য্যকলাপ মনুষ্যে সম্ভবপর নহে, বলিয়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং তাঁহাতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল। ভগবানে আত্মবিসর্জ্জন যদি দোষের হয়, তবে গুণের বিষয় কি হইবে? যদি কেহ বলেন, যে, মনুষ্যলীলায় অতটা ভাল দেখায় না। সাকারের লীলা ব্যতীত

বৈচিত্র্য থাকে না। তিনি প্রতি অবতারে সাঙ্গোপাঙ্গ, পার্ষদ লইয়া লীলা করেন। তাহা সাধারণ মায়িক জীব বুঝিতে পারে না।

যতদিন পর্য্যন্ত চিত্ত শুদ্ধ না হয়, ততদিন ভগবল্লীলা বা গোপী-প্রেম বুঝা কঠিন। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন কৃষ্ণ-বিষয়ক রতি, ভগবৎ-প্রেম অসম্ভব। উহা কেবল দোকানদারি। আমি তোমায় কিছু দিতেছি, প্রভু তুমি আমায় কিছু দাও। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বর ধারণা এইরূপ। যতদিন মাথায় এই সব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের বিরহ-জনিত উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে? ভগবান যখন প্রীতির বস্তু হন, তখন সকল বিষয়ের আসক্তি চলিয়া যায়। ইহা না হইলে গোপীরা কুল, শীল, লজ্জা, স্বজন-বান্ধব, পতি, পুত্র ত্যাগ করিতে পারিত না। ভগবৎ প্রেমের এমনই আকর্ষণ যে, মানব আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। সংসারের সকল বন্ধন তখন ছিন্ন হইয়া যায়। তখন তাহার দেহেন্দ্রিয়ের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব বা লক্ষ্য থাকে না। প্রচণ্ড নদী স্রোতে যেমন প্রস্তর খণ্ড পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়, ভগবৎ প্রেম, সেইরূপ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বীয় প্রবাহ অভিমুখে আকর্ষণ করে। তখন সমস্ত মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া যায়। মৃত্যু বলিয়া কোন ভয় হয় না। তখন জীবের আত্মা অননুভূত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যায়। সমস্ত প্রবৃত্তি ঘুমাইয়া পড়ে। এক বস্তু ভিন্ন মন প্রাণের আর কিছু লক্ষ্য থাকে না।

সর্ব্বত্যাগ না করিতে পারিলে, গোপীপ্রেম বুঝিতে চেষ্টা করাই উচিত নহে। কাঞ্চন, নাম, যশ প্রভৃতির কামনা পর্য্যন্ত ত্যাগ না করিলে উহা বুঝিতে চেষ্টা করাও উচিত নহে। যতদিন পর্য্যন্ত আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র না হয় ততদিন পর্য্যন্ত উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই এই গোপীপ্রেম-শিক্ষা। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা সে প্রেমোন্মত্ত-তার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরমলক্ষ্য মুক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান। এখানে গুরু, শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর, স্বর্গ সব একাকার। ভয়ের ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র নাই, আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই মনে থাকে না। যুক্তি, তর্ক, প্রমাণ কিছুই সেখানে টিকে না। প্রবল প্রবাহে সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। ভুক্তি, মুক্তি, স্বর্গ, সমস্তই তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। যে ভগবৎ প্রেমের অধিকারী তদপেক্ষা আর ভাগ্যবান কে? তাদৃশ প্রেম অতি

দুর্লভ, দেব-বাঞ্ছিত। এজন্য দেবগণ, গোপীদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গোপীদিগের অপার্থিব প্রেম, যাঁহারা সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় লীলা বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা মহাপাপী।

মহর্ষি নারদ ভক্তিসূত্রে দেখাইয়াছেন যে, গোপীদিগের প্রেম অপার্থিব। তিনি ঊনবিংশ সূত্রে দেখাইতেছেন—নারদস্তু—

তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।

ভগবানে সমুদয় কর্ম্ম অর্পণ করা এবং তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতার নাম ভক্তি। একাদশ সূত্রে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছেন—

যথা,—ব্রজ-গোপিকানাং।

যদি প্রেমের লক্ষণ দেখিতে চাও, তবে ব্রজগোপীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আহা! কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! আহা! প্রেমের গুরু গোপিকাগণ ভগবানের জন্য কিনা ত্যাগ করিয়াছে? মান বল, লজ্জা বল, ভয় বল, ভগবানের জন্য তাহারা সকলি জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছে। কুলস্ত্রীগণ ঘোর নিশীথ সময়ে প্রাণসম পতিকে ত্যাগ করিয়া; লজ্জা-ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া পাগলিনীর ন্যায় বনে বনে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ইহা কি সাধারণ ব্যাকুলতা? ইহার তুলনা কোথায় পাইবে? আবার বিরহই বা কত? যে মুখ-চন্দ্রিমা একবার দেখিলে জীবন সার্থক হয়, যাঁহাকে দেখিবার জন্য মহর্ষিগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হন, মনের সাধে কতবার গোপীগণ সেই মুখ-চন্দ্রিমা দর্শন করিয়াছে; তথাপি ক্ষণিক অদর্শনে প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে। এই তো প্রেমের লক্ষণ, এই তো প্রেমের স্বভাব। এতো আর তোমার আমার প্রেম নয় যে, সকালে একবার উপাসনা করিলাম তো সমস্ত দিনের কাজ গোছাইলাম। গোপীগণ কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়াই জানিত, সাধারণ নায়ক বোধে তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হয় নাই। মাহাত্ম্য-জ্ঞান ব্যতীত যে প্রেম, সে ব্যভিচারীর প্রেম। গোপীদিগের প্রেম যদি তাহাই হইবে, তবে পরম বৈরাগী নির্দ্দোষ-চরিত শুকদেব গোস্বামী মহাশয় কখনই ইহার আদর করিতেন না; ভব-বিরিঞ্চি-আদি দেবগণ গোপীপ্রেম প্রার্থনা করিতেন না। আর আসন্ন মৃত্যু জানিয়া গঙ্গাতীরবাসী রাজা পরীক্ষিৎ, এই ব্যভিচারীর প্রেমের কাহিনী কেনই বা শুনিবেন? এবং সর্ব্বস্বত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ যে, গোপীপ্রেম আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা কি কখনও ব্যভিচারীর প্রেম হইতে পারে? গোপীদিগের প্রেম, যে, ব্যভিচারীর প্রেম নহে, তাহার প্রমাণ মহর্ষি নারদ দিতেছেন। নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎ সুখে সুখিত্বং। ২৪ নাঃ সূত্র।

কামকিঙ্করেরা কখনও প্রিয়তমের সুখে সুখী হয় না। তাহারা আপনার সুখই অন্বেষণ করে। গোপিকাদিগের প্রেম ব্যভিচারীর প্রেম নহে, গোপীগণ কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশেষরূপ অবগত ছিল। তাহারা তাঁহাকে ভগবান বোধেই ভাল বাসিয়াছিল। ব্যভিচারীর প্রেম কামমূলক, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, কামনা-পরবশ হইয়াই অপরের সহিত প্রেম করে। আপনার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই তাহার উদ্দেশ্য। যে আপনার সুখই সতত অন্বেষণ করে, সে কখনও পরের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করে না। কিন্তু গোপীদিগের প্রেম সেরূপ নহে, তাহারা রাধাকৃষ্ণের সুখেই সুখী, তজ্জন্য তুচ্ছ বোধে জীবন বিসর্জ্জন দিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে। ইহাই গোপীপ্রেমের অদ্ভুত বৈচিত্র্য। ইহা যাঁহারা না বুঝিবেন, তাঁহারা যেন গোপীপ্রেম বুঝিবার চেষ্টা না করেন। ভক্তিশাস্ত্রে প্রেম তিন প্রকার কথিত আছে, সাধারণী, সামঞ্জসা ও সামর্থ্যা। তুমি মর, তাতে ক্ষতি নাই, আমার সুখের উপায় করিয়া দাও,—ইহাই সাধারণী, ইহাই ব্যভিচার প্রেমের লক্ষণ। আমিও সুখে থাকি, তুমিও সুখে থাক,—ইহাই সামঞ্জসা প্রেমের লক্ষণ। আমি মরি ক্ষতি নাই, তুমি আমার সুখে থাক, ইহাই সামর্থ্যা প্রেমের লক্ষণ। ইহাই গোপীদিগের প্রেম। ধিক্ সে পাষণ্ড! যে, এ প্রেমকে ব্যভি-চারীর প্রেম কহে। এতাদৃশ প্রেম বুঝা দূরে থাক, অনুভব করাও মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। যদিও মনুষ্যলোকে দেখা যায়, পতির জন্য পত্নী বা পত্নীর জন্য পতি অসহ্য বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহা প্রেমপদবাচ্য হইলেও কাম-সম্পর্ক-শূন্য নহে। যদি বল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রাসলীলায় গোপীদিগকে চুম্বন আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তবে তাহা কাম-গন্ধ-শূন্য হইল কিরূপে? সত্য বটে, কিন্তু কামের একটি নাম আছে মন্মথ, অর্থাৎ যিনি মনকে ব্যাকুল করেন তিনিই মন্মথ, কাম। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জিত-মন্মথ, মন্মথ। অর্থাৎ তিনি কামেরও মনকে ব্যাকুল করিতে পারেন। সুতরাং তাহার মন ব্যাকু-লিত করে, এমন কিছুই জগতে নাই। তিনি যে, কামপরতন্ত্র হইয়া গোপী-দিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন এমত কল্পনা করাও দোষাবহ। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যদি কাহারও অধর চুম্বন করিয়া থাকেন, তবে সে তো চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে, সেতো জন্ম-মৃত্যুর পরপারে গিয়াছে; তাহাতে আনন্দ ব্যতীত দুঃখ কি, দোষই বা কি? লোক-পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন, আমরা যদি এই ব্রজধামের তরু, লতা, গুল্ম হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলেও ভগবচ্চরণ-রেণু-স্পর্শে চরিতার্থ হইতে পারিতাম। সেই ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ যদি কাহারও অধর-চুম্বন করিয়া থাকেন, তবে সেটা দোষের কারণ বলা যাইবে? যাঁহার নিকট স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন ভেদ নাই, যিনি জীবের জীবন, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্ব্বর্ত্তী, যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, যিনি বিশ্বরূপ, তিনি যদি কাহাকেও চুম্বন করিয়া থাকেন, তবে তাহা স্বীয় অবয়বেই করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। কারণ, যখন তিনি ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, তখন সবই তাঁহারই মূর্ত্তি বলিতে হইবে। এইটুকু মনে প্রাণে ধারণা করিলে তখন আর কিছুই দূষ্য বোধ হইবে না। মনই দোষের আকর, মনকে অগ্রে পবিত্র কর দেখি, তখন আর ভগবল্লীলা কিছুই দূষ্য বোধ হইবে না। রাধা তাঁর স্বীয় প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিকে তিনি প্রীতি প্রদান করেন বলিয়া রাধারমণ। ভগবৎ প্রীতি এ জগতে প্রার্থনা না করে কে? মায়ামুগ্ধ মানবকুল, স্বীয় পাপী মন দিয়া পবিত্র ভগবল্লীলা দূষিত বলিয়া নিরীক্ষণ করে। আত্মা ও মন পবিত্র হইলে, বিশুদ্ধ ভগবল্লীলা যথার্থরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়। সামান্য ঐন্দ্রজালিকের মিথ্যা-বিড়ম্বিত শিরশ্ছেদাদি যখন আমাদের মনে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তখন মায়াধীনের বিচিত্র ইন্দ্রজাল আমরা সামান্য জ্ঞানে কিরূপে ভেদ করিব?

তাঁহাতে সবই সম্ভবে, অসম্ভব তথায় কিছুই নাই। অদৃষ্টাধীন ক্ষীণশক্তি মানবের পক্ষে সম্ভব অসম্ভব বিচার চলে, ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব। যদি বল, তিনি যখন মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া জগতে লীলা প্রচার করিতে আইসেন, তখন তাঁহার মনুষ্য-সমাজ-প্রচলিত রীতিনীতি-বহির্ভূত কার্য্য করা ভাল নহে। সুতরাং পরস্ত্রী-স্পর্শাদি তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। ঠিক্ কথা, কিন্তু ভগবান্ লোক-শিক্ষার্থ ও ভক্তানুগ্রহার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আমরা যেমন কাল, দেশ ও নিমিত্তের অধীন, তিনিও সেইরূপ হইয়া ভক্তদিগকে অনুগৃহীত করেন। যে, যেভাবে তাঁহাকে চাহে, তিনি সেইভাবে তাহাকে ভজনা করেন। গোপীগণ পূর্ব্বজন্মে কঠোর তপস্যা-বলে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং তাহার প্রেম প্রার্থনা করে। তিনি তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হন। লোক-শিক্ষা যেমন তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন, ভক্তানুগ্রহও তদ্রূপ আবশ্যক। ভক্ত গোপীদিগের বাসনা পূর্ণ না করিলে, তাঁহার ঋণ শোধ হয় না। সুতরাং কৃষ্ণাবতারে তাঁহাকে গোপীদিগের প্রেম-ভিক্ষা পূর্ণ করিতে হইল। তবে, তাহা সাধারণ নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নহে। কারণ, প্রেম ও কাম, স্বর্গ নরকবৎ পার্থক্য-সম্পন্ন। একটিতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের প্রীতি-ইচ্ছা, অপরটিতে আপনার ইন্দ্রিয়ের প্রীতি-ইচ্ছা। নারদ ভক্তিসূত্রেও ইহাই

প্রদর্শন করিয়াছেন। সা ন কাময়মানা নিরোধ-রূপত্বাৎ। নাঃ সূঃ ৭। ভক্তি দ্বারা কোনও কামনা পূর্ণ করা যায় না। কারণ উহা নিরোধরূপা। উহা সমস্ত কামনা রোধ করে। ধন, মান, যশ প্রভৃতি লাভের জন্য যিনি পূজা অর্চ্চনাদি করেন, তিনি নীচ ব্যবসায়ী মাত্র। তাঁহাতে ভক্তির লেশ মাত্রও নাই। কারণ, ভক্তি উদিত হইলে সমস্ত কামনা দূর হইয়া যায়। তখন ভক্ত ভগবৎ সেবা ব্যতীত মুক্তিও তুচ্ছ জ্ঞান করে।

নিরোধ কাহাকে বলে? ভগবান নারদ ঋষি, তাহাই বলিতেছেন "লোক-বেদ-ব্যাপার-সন্ন্যাসঃ। ৮

(ক্রমশঃ)

গীতা-নাটকম্।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দশম দৃশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস এই উভয়ের মধ্যে আমার পক্ষে যেটী শ্রেয়ঃ আমাকে নিশ্চয় কোরে বল। আমি এত দীর্ঘকাল মধ্যে এখনও নিজ কর্ত্তব্যতা স্থির কর্ত্তে পার্চ্ছি না।

শ্রীকৃষ্ণ। কৌন্তেয়! কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস উভয়ই মুক্তির কারণস্বরূপ. তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, দ্বেষ নাই, যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও স্বর্গাদি-সুখ-কামনা-রহিত, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। এতাদৃশ পুরুষই অনায়াসে সংসার-বন্ধন হ'তে মুক্তি লাভ করেন। মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতীত কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ করা অসম্ভব। যিনি ভগবানে ফল অর্পণ কোরে কর্ম্মফল-কল্পনা-ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হন না। ভগবান জীবের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই অথবা কর্ম্মফল-সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই। অজ্ঞানরূপ মায়াই সমস্ত কার্য্যে কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হোয়ে থাকেন। পরমেশ্বর বিভু কোন জীবের পাপপুণ্য

গ্রহণ করেন না। জ্ঞানবান পণ্ডিত, বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গো, হস্তী, কুকুর সকলেতেই তিনি সমদৃষ্টি কোরে থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রিয়বস্তু-লাভে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না; কেননা তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন, ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্মেই অবস্থিত। কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়-বিষয়োৎপন্ন ভোগ-সুখে আকৃষ্ট হন না, কেননা তত্তাবৎ দুঃখকর ও অনিত্য। মন হ'তে বাহ্য বিষয়-চিন্তা সকল বিতাড়িত কোরে চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টিকে ভ্রূ মধ্যে সংস্থাপন-পূর্ব্বক প্রাণাপান বায়ুকে নাসা মধ্যে রুদ্ধ কোরে যিনি মন ইন্দ্রিয়কে জয় কর্ত্তে পারেন এবং ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধকে স্বায়ত্ত করেছেন, বিষয়-বিরাগী সেই মনন-শীল ত্যাগী পুরুষ সদা মুক্ত জান্‌বে। যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগে আরোহণ কর্ত্তে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁর সহায়; আর যিনি তাতে আরোহণ করেছেন, কর্ম্ম-ত্যাগই তাঁর সহায়। অতএব তুমি কর্ম্মযোগই অবলম্বন কর।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ হে! কর্ম্মযোগই যদি কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কি আজীবনই কর্ম্ম কর্ত্তে হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! যে পর্য্যন্ত চিত্ত-শুদ্ধি হোয়ে প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, তাবৎ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। হে পাণ্ডব! বেদ ও শ্রুতিতে যাহাকে সন্ন্যাস কহে, ফল-ত্যাগ হেতু তাহাই যোগ জান্‌বে। যোগারূঢ় হ'তে হ'লে কর্ম্মই তার কারণস্বরূপ। জীবাত্মা স্বয়ং নিজেকে সংসার হ'তে উদ্ধার করেন। মানব এমন আত্মাকে অবসন্ন কোরবে না। যেহেতু আত্মাই আত্মার মিত্র এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। যে আত্মা নিজেকে জয় কোরেছে সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং যে তাহা জয় কর্ত্তে পারে নাই—সেই আত্মাই পার্থিব রিপুর ন্যায় আত্মার পরম শত্রু। সর্ব্বপ্রাণীতে যাঁর সমদৃষ্টি, তিনিই শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জ্জুন। মধুসূদন! তুমি যে আত্মার সমত্বরূপ যোগতত্ত্ব বর্ণন কর্ল্লে, মন স্বভাবতঃ যেরূপ চঞ্চল তাহাতে বোধ হয় তাদৃশ দীর্ঘকালস্থায়ী ভাব আয়ত্ত হবে না। হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ ঘোর চঞ্চল, বিষয়ে প্রমত্ত, দৃঢ় ও বলবান। বায়ু-নিগ্রহের ন্যায় সেই মনের নিগ্রহ আমার পক্ষে অসম্ভব জ্ঞান হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। মহাবাহো! মন যে চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ তাতে সংশয় নাই; কিন্তু কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহা কালে নিগৃহীত হয়। বায়ু

চিত্ত অবশীভূত যোগ লাভ করা তার পক্ষে দুর্ঘট। যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত ক'রেছে, সে যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগ লাভ কর্ত্তে সমর্থ।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়েও যোগাভ্যাসে বিশেষরূপে সচেষ্ট নহেন বা চিত্ত-চাঞ্চল্য-দোষে যোগ-ভ্রষ্ট হ'য়েছেন, তিনি যোগ-সিদ্ধি প্রাপ্ত না হোয়ে কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হবেন? তত্ত্বজ্ঞান-বিমূঢ় ও কর্ম্মোপাসনা উভয় ভ্রষ্ট পুরুষ কি বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় না? হে মধুসূদন। আমার এই ভ্রমের অপনোদনে তুমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ নহে!

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহ বা পর উভয় লোকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না! শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতার কখন দুর্গতি হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাগণের প্রাপ্য লোক প্রাপ্ত হোয়ে বহুকাল তথায় বাস করেন এবং পরে ভূলোকে পবিত্র শ্রীমন্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন অথবা দুর্লভ যোগীর কুলে জন্ম নিয়ে পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ ভক্তিযোগ-যুক্ত বুদ্ধি লাভ কোরে মুক্তির জন্যে সাতিশয় যত্ন করেন। তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব অর্জ্জুন তুমি যোগী হও। ব্রহ্ম লাভ কর্ত্তে হ'লে যোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

গীত।

তপস্বী কি কর্ম্মী জ্ঞানী সকলেতে আমি,
সর্ব্ব হতে শ্রেষ্ঠ যোগী, যোগী হও তুমি।
নিশ্বাসের ঊর্দ্ধগতি প্রাণ কহে তায়,
অপান সংজ্ঞাতে বায়ু নিম্নদিকে ধায়।
নিম্ন ঊর্দ্ধ স্থির গতি হয় যে ক্রিয়ায়
অপূর্ব্ব প্রক্রিয়া কহে প্রাণায়াম তায়।
হেন প্রাণায়াম-সিদ্ধ হয় সেই জান
ইন্দ্রিয়-সংযমে তিনি ধরে প্রাণে প্রাণ।
কর্ম্মফল সদা যিনি জ্ঞানে উপেক্ষিয়া
করেন নিয়ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য মানিয়া।
তিনিই সন্ন্যাসী সত্য অনিত্য জগতে,
যথার্থ যোগীই তিনি পার্থ! মোর মতে।
নিরগ্নি হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম পরিহরি

পর-উপকার-ব্রত সদা ত্যাগ করি
গৈরিক বসন পরি কর্ম্ম ছাড়ি শুধু
কভুনা "সন্ন্যাসী," "যোগী," প্রকৃত অসাধু।

অর্জ্জুন! মুক্তির জন্য অসংখ্য মনুষ্য মধ্যে একজন জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করেন। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ভগবানের এই অষ্টবিধ প্রকৃতি এবং তাহারা অপরা বা নিকৃষ্টা। কিন্তু উহা ব্যতীত হে মহাবাহো! উৎকৃষ্টা চৈতন্যময়ী জীবরূপা পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎ ধারণ কোরে আছে, তাহাকে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। সমুদয় ভূত এই প্রকৃতিদ্বয় হ'তে উৎপন্ন হয়েছে। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ আমিই। আমা হতে কোন পদার্থ পরমার্থতঃ শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র নাই, সকল ভূতই আমাকে অবলম্বন কোরে স্থিত বা বর্ত্তমান র'য়েছে। কৌন্তেয়! আমি জলে রসরূপে, চন্দ্র সূর্য্যে প্রভা, বেদ সকলে ওঙ্কার, আকাশে শব্দ ও পুরুষগণে পুরুষত্ব বা তেজঃস্বরূপে বর্ত্তমান আছি। সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক যতরূপ পদার্থ আছে, সমুদয় আমা হ'তে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু আমি ঐ সকলে লিপ্ত নহি, উহারা আমাতেই অবস্থান কর্চ্ছে। আমার স্বভাবভূতা এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রকৃতি অতিক্রম করা অতি দুষ্কর। কিন্তু যাহারা আমারই শরণাগত ও আমার ভজনা করে, তারাই অপার মায়া হ'তে উত্তীর্ণ হয়। অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীই আমার প্রিয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কেননা জ্ঞানী সর্ব্বদাই আত্মস্থ এবং আমি ভিন্ন শ্রেষ্ঠ ফল-কামনা তার নাই। এতাদৃশ মহাত্মা বড়ই বিরল। অবিবেকিগণ আমার ঐশ ভাব না জেনে আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন করে। আমি সাধারণের নিকট প্রকাশিত হই না; কেননা অজ্ঞেরা সদা যোগমায়াচ্ছন্ন থাকায় আমাকে জানে না।

অর্জ্জুন। হে পুরুষোত্তম! যে ব্রহ্মের কথা আপনি বল্লেন তাহা কি? অধ্যাত্মই বা কাকে বলে? কর্ম্ম কি? অধিযজ্ঞ, অধিভূত ও অধিদৈবই বা কিরূপে চিন্তনীয়? অধিযজ্ঞ কিরূপে দেহ মধ্যে ও বাহিরে অবস্থিত? আর মৃত্যুকালে হে মধুসূদন, সমাহিত-চিত্ত যোগীর নিকট তুমি কি উপায়েই বা জ্ঞানগম্য হও?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! ভাল প্রশ্নই কোরেছ! তোমার ন্যায় প্রজ্ঞাবানের উপযুক্ত প্রশ্নই হ'য়েছে। পার্থ, তবে শোন! যিনি পরম অবিনাশী তিনিই

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের স্বভাবই অধ্যাত্ম। সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি-ও-বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদি-রূপ ত্যাগকেই কর্ম্ম কহে। হে জীব-সত্তম! নশ্বর পদার্থই অধিভূত, হিরণ্য-গর্ভনামা পুরুষই অধিদৈব, বিষ্ণুর স্বরূপ আমিই অধিযজ্ঞ পুরুষ, জীবদেহে অধিষ্ঠিত আছি। যিনি মৃত্যুকালে আমাকে চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমারই স্বারূপ্যভাব প্রাপ্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৌন্তেয়! আজীবন সর্ব্বদা চিন্তা জন্য, মরণকালেও যে যে ভাবনা করে, সে সেই ভাব-রূপ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি আমাকে চিন্তা কর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ কর্ল্লে আমাকেই প্রাপ্ত হবে সন্দেহ নাই। যে সাধক যাবদীয় ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ কোরে ক্রমে মনকে হৃদয়ে আবদ্ধ কোরে স্বীয় প্রাণ-বায়ুকে মস্তকে অবরুদ্ধ করতঃ আত্মার যোগ ধারণ করেন এবং ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ কর্ত্তে কর্ত্তে আমাকে স্মরণ কোরে থাকেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হ'তে সর্ব্বভূত-লোক-নিবাসিগণই আবর্ত্তনশীল জান্‌বে, কেবলমাত্র আমাকে প্রাপ্ত হ'লে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ বা পুনর্জ্জন্ম হয় না। যাহা প্রাপ্ত হ'লে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় তাহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম।

অর্জ্জুন। মধুসূদন। পুনর্জ্জন্মটাকে আপনি এত ঘৃণাকর ব'লে সিদ্ধান্ত কর্চ্ছেন কেন? পুনর্জন্মে জীবের দৈহিক ও মানসিক উন্নতিও ত হ'তে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন, সৎকর্ম্ম দ্বারা জীবের ঊর্দ্ধগতি এবং অসৎ কর্ম্মে অধো-গতি হয়। পুনর্জন্ম লইতে হ'লেই গর্ভ-যাতনার ভোগ আছে; তারপর পরজন্মে মনুষ্যকুলে জন্ম না হয়ে যদি হিংস্র জন্তু ও কীট পতঙ্গাদি কুলে জন্ম হয়, সেটা কি ঘৃণাকর অধোগতি নয়? দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে নিজ কর্ম্মদোষে বা কর্ম্মের অভাবে যে নীচগামী হয়, পুনর্ব্বায় মনুষ্য-জন্ম লাভ করা তার পক্ষে দুরূহ। অতএব মানবজন্ম লাভ কোরে যাতে নীচগামী হতে না হয়, সকল মনুষ্যেরই সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা ও যত্ন করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

THE RELIGION ETERNAL.

THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES.

In the second day's sitting of the Hindu Mahasabha in Calcutta Rai Bahadur Sj. Jadunath Mazumdar, C. I. E. Vedanta-Vachaspati read out Sanskrit slokas specially composed by him for the occasion. Following is the English version of the slokas :—

1. According to sages, this excellent land Bharatabarsha is the birthplace of the Religion Eternal (Sanatan Dharma). Foreigners, owing to defect of tongue, designated the people living on the banks of the Sindhu (Indus) as Hindoos. Hence the Religion Eternal of Bharatabarsha was designated as "Hindoo Religion" by those foreigners and afterwards by the people of Bharatabarsha themselves. May this auspicious assembly achieve its object by preaching the precious fundamental principles of the Religion Eternal throughout the world.

2. Belief in God, devotion to Him, practice of Truth through mind, body and speech, looking upon other people's property as worthless clod and upon woman other than one's own wife as mother, nonviolence, control of senses both externally and internally, pursuit of knowledge, forgiveness, belief in the next world, kindness, patience, external and internal cleanliness, restraint of anger, service of mankind, doing good to others in thought and deed have been held to be the signs of the Religion Eternal. May this auspicious assembly achieve its noble end by concentrating its attention on the fundamental principles of the Religion Eternal.

3. The rule of caste and successive stages in life (Varnasrama Dharma) is subordinate to the Religion Eternal and therefore does not deserve independence of it. May the said Varnasrama Dharma be always in harmony with the principles of Religion Eternal. May this assembly attain success by making efforts so that friendliness may grow among different sects and so that the solution of conflict of interests may be effected properly.

4. It is well-known that Service is the best form of the Religion Eternal. He who serves others has been held the best religious man. Service is of four kinds—First, by the gift of knowledge, secondly by the protection of the weak, thirdly by the gift of wealth earned religiously from agriculture, trade and arts etc, fourthly by bodily service. He who is proficient in service has been held to be the most virtuous man.

5. Man is the most glorious creature on the face of the earth. He is the ruler of all creatures. It follows that he should show kindness to all creatures. Kindness to lower animals has been held to be a meritorious act in the Religion Eternal.

6. The external guise of the Religion Eternal varies according to differences of time, country and individual, but in spite of this difference of environments, the fundamental principles do not at all differ. Everyone should live a true religious life by keeping in mind the fundamental principles of the Religion Eternal in the midst of external environments. No one who wishes well of mankind should pay undue attention to environments, ignoring the vital fundamental principles of the Religion Eternal. Let this assembly proceed in such a way that no sectarian dispute which is fatal to all good may ever arise.

7. There are various forms of Religion in the world but in their fundamental principles they are all akin to Religion Eternal (Sanatan Dharma). They all have their being in the fundamental principles of the Religion Eternal ; some distinctly, others indistinctly. Let this assembly do what may lead to the unfolding of the fundamental principles of the Religion Eternal, in all religious denominations.

8. God is the internal Ruler of all creatures. Let this assembly try to impress upon the minds of all men this fundamental truth and adopt all those means by which their minds may be influenced by this belief.

9. Hateful are religious and sectarian disputes. They spring from ignorance and bring on evil. Let this assembly of the Hindus achieve its object by dispelling darkness of ignorance by the light of knowledge. One should regard doing good to others, as doing good to one's own self. Wise men always held selfishness to be an evil. The wise should always find a solution of conflicts of interests between self and others, as in reality there is no such conflict. Let this assembly achieve its object by solving this apparent conflict of one's self and others.

10. Let everyone enjoy good, let everyone be free from danger, let everyone see what is good, let no one suffer from misery, let our friends enjoy what is good, and so let our enemies. May even the wicked be free from evil, let the virtuous enjoy good, let people of various countries and different religious denominations live wishing well of each other and walk in the path of true religion, after acquainting themselves with the fundamental principles of the Religion Eternal. May this assembly fulfil its object by preaching to the entire mankind the fundamental principles of the Religion Eternal. May Merciful God fulfil this hope of humble Yadunath, who is praying at His feet for the same.

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড
২য় সংখ্যা।

১৩৩২ সাল।
১৮৪৭ শকাব্দাঃ

হিন্দু-সমাজের সমস্যা।

লেখক—সম্পাদক।

(১)

হিন্দু-পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা হিন্দুসমাজের বহুবিধ সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছি, হিন্দুসমাজের জাগরণ যে একেবারেই হয় নাই—একথা বলা যায় না। উচ্চ নিম্ন সকল বর্ণের মধ্যেই জাগরণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে, কিন্তু সকল দিক্ রক্ষা করিয়া সকল স্বার্থের সামঞ্জস্য করিয়া অতীত ও বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সমবেত চেষ্টার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

কিরূপ প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিলে হিন্দুসমাজের কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহার জন্য এ পর্য্যন্ত কোনও তীব্র যত্ন পরিদৃষ্ট হয় নাই। সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া আমরা সম্প্রতি বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব।

হিন্দুসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রথম ব্রাহ্মণসমাজে দৃষ্টি পড়ে। দেখা যাউক্ ব্রাহ্মণসমাজ তাহার নিজেদের জন্য এবং সমাজের অপরাপর বর্ণের জন্য কি করিতেছেন।

সমস্ত ভারতের ব্রাহ্মণগণ প্রাধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, পঞ্চগৌড় ও পঞ্চ-দ্রাবিড়। পঞ্চগৌড় যথা—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল। পঞ্চদ্রাবিড় যথা—কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র।

বাঙ্গালার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আগত, এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক বাঙ্গালায় আছেন। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ প্রাধানতঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন কাশী পঞ্চনদ প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশের বহু ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। আর আচার্য্য ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, ভট্ট ব্রাহ্মণ ও তদ্ব্যতীত বর্ণক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন।

এখন আমরা দেখিব যে বাঙ্গালায় এই ব্রাহ্মণগণের উন্নতির জন্য কি কি অনুষ্ঠান বিদ্যমান আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসমাজের সমবেত চেষ্টা দ্বারা কোনও অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইত না। খণ্ডভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চায় উৎসাহ-দান, সামাজিক কুকর্ম্মের শাসন, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু সাধারণভাবে সমবেত যত্নের কোনও পরিচয় পাওয়া যাইত না। তৎকালে যাহা ছিল, তাহাদ্বারা অনেক সময় সুফল পাওয়া যাইত, কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ফলে নিরপরাধ লোকও নির্য্যাতিত হইত এবং অযথা দলাদলির সৃষ্টি হইত। কৌলীন্য-মর্য্যাদা ভঙ্গ করা লইয়া তখন প্রায়ই দলাদলি হইত। একজন শ্রোত্রিয় কুলীন-কন্যা বিবাহ করিল, অমনি তাহার শাসন আরব্ধ হইল। অথচ আভিজাত্যবান্ লোকও যদি ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার হইতে দূরে থাকিতেন, যদি মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত অথবা দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতেন, তাহা হইলেও তিনি সমাজের মস্তকে পদ-স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন। পূর্ব্বকার ঐরূপ চেষ্টা হইতে সমাজে একতার বাধা পড়িত, সম্মিলনের কোনও চেষ্টা হইত না। এইরূপ ব্যাপারের ফলে সমাজ ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িত। শ্রোত্রিয়েরা কুলীনকে কন্যা দান করিবেন অথচ নিজেরা কুলীন-কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না, এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তনের ফলে বহু শ্রোত্রিয়বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; বহু শ্রোত্রিয়বংশ কলঙ্কিত হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রোত্রিয়েরা "ভরার মেয়ে"—অর্থাৎ অজ্ঞাত-কুলশীলা মেয়ে ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতেন,

ইহাতে তাঁহাদের বংশের অবনতি হইত, কিন্তু শ্রোত্রিয়ের পত্নী ঐ 'ভরার মেয়ে'র গর্ভে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিত, তাহাকে বিবাহ করিতে কুলীনেরা বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করিত না।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজে শাস্ত্র-চর্চ্চা ছিল, বহু ধনাঢ্য লোকে ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মত্র ভূমি বৃত্তি প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণেরাও শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন, ছাত্রগণকে বিদ্যা-শিক্ষা দিতেন, এ সব ছিল, এখনও সেরূপ দাতা যে নাই তাহা নহে। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে গৌরীপুরের স্বদেশপ্রেমিক ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় পণ্ডিতগণের বৃত্তি প্রদান করিবার উদ্দেশে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার ঐ টাকার সুদ হইতে বাঙ্গালার কতকগুলি অধ্যাপককে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। এ প্রথার কল্যাণকারিতা সম্বন্ধে অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সকলেই জানেন এই মহাত্মা আজীবন-সঞ্চিত লক্ষাধিক টাকা সংস্কৃতশাস্ত্রের আলোচনা ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সাহায্যার্থ দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর অধ্যাপকগণকে "বিশ্বনাথ-বৃত্তি" প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা একান্তই আবশ্যক যে, ব্রাহ্মণসমাজের যতই দোষ, ত্রুটী, বিচ্যুতি বা অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করিতে বাধ্য। হিন্দুর গৌরবের সামগ্রী হিন্দুশাস্ত্র। এই হিন্দুশাস্ত্রের সংরক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণগণ যে পূর্ব্বাবধি প্রচুর প্রযত্ন স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং অধুনাও যে যত্ন স্বীকার করিতেছেন, তাহা হিন্দুসমাজের সর্ববিধ জাতিরই চিন্তা করা উচিত। ব্রাহ্মণগণের হস্তে শাস্ত্র-রক্ষার ভার ছিল, তাঁহারা তাহা রক্ষা করিয়াছেন, অন্যের উপর সে কার্য্যের ভার ছিল না সুতরাং তাহারা তাহা করিতে পারেন নাই, একথা সত্য হইলেও বলা যায় কার্য্যের জন্যই ব্রাহ্মণেরা ধন্যবাদের পাত্র। ভার থাকিলেও কি তাহা প্রতিপালন করা সহজ? ব্রাহ্মণেরাই কি তাহা সর্ব্বথা প্রতিপালন করিতে পারিয়াছেন? বোধ হয় সর্ব্বতোভাবে পারেন নাই, তবে যাহা পারিয়াছেন তাহার জন্য প্রশংসাভাজন না হইবেন কেন? এইটুকু সকল বর্ণেরই স্বীকার করিতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস যে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য ব্রাহ্মণগণই দায়ী।

তাঁহারা মনে করেন যে ব্রাহ্মণগণ অন্য জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, নিজেরা শাস্ত্র অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাহাকেও উঠিতে দেন নাই, সকল জাতির উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন, সর্ববিধ অধিকার আপনাদের করায়ত্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যায় প্রভুত্বের ফলে দেশ অবনত হইয়াছিল। পশুপতি হলায়ুধ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনকে বলিলেন যে এখন শাস্ত্রানুসারে যবনের অধিকার হইবে, আপনি পলায়ন করুন। তদনুসারে রাজা পলায়ন করিলেন, দেশ যবনাধিকৃত হইল। সুতরাং বাঙ্গালায় পরাধীনতার জন্য ব্রাহ্মণেরাই দায়ী। ব্রাহ্মণেরা আইন্ প্রণয়ন করিতেন, তাঁহারা যাহাকে যাহা করিতে বলিতেন তাহারা তাহাই করিত, সুতরাং ব্রাহ্মণেরা দেশের অবনতির মুখ্য কারণ।

এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতে চাই। প্রথম ধরুন—বেদে স্ত্রীশূদ্রের অধিকার নাই, ইহা ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতার চরম দৃষ্টান্ত। এখানে আমরা বলিতে চাই যে এক সময় কোনও অজ্ঞাত কারণে স্ত্রীশূদ্রের বেদে অধিকার নাই—এরূপ একটী নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা উহার সামঞ্জস্য-সাধনার্থে যে চেষ্টা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে প্রাচীন ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হওয়া সুবিধাজনক নয়, অথচ ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। তাঁহারা মহাভারত, রামায়ণ, মহাপুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে সমগ্র বেদের সারমর্ম্ম এমন কি উপনিষদের মন্ত্র গুলি অবিকল সঙ্কলন করিয়া দিলেন। ঐ সমস্ত শাস্ত্রে স্ত্রীশূদ্রের অব্যাহত অধিকার থাকিল, কিন্তু বেদে অধিকার নাই—এই প্রাচীন সংস্কারও সংরক্ষিত হইল। এই কৌশলে ব্রাহ্মণগণ সমগ্র হিন্দুসমাজকে বৈদিক সত্যের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীশূদ্রের বেদে অধিকার নাই ইহার আর একটী কারণ ছিল; তৎকালে বৈদিক সাহিত্যের যুগের অবসান হইয়াছিল। রামায়ণ মহাভারতের সংস্কৃত রীতি তখন চলিতেছিল, সে সময় ব্যাকরণের বৈদিকভাগের প্রচার বিরল হইতেছিল। সে সময় কতিপয় ব্রাহ্মণ বৈদিক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া বেদ পাঠ করিতে পারিতেন, সকলেও পারিতেন না। সেইকালে সাধারণ লোকে বৈদিক ব্যাকরণ জানিত না। স্ত্রীশূদ্রেরা আদৌ জানিতেন না, সেজন্য স্ত্রীশূদ্রদের বেদ-পাঠ তখন সম্ভব ছিল না। এখন সে শাসন নাই, অথচ লোকে বেদ পাঠ করিতে চায় কৈ? যাহা কিছু পাঠ করেন তাহা এদেশের

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণের লোকেরাই, সুতরাং ঐ দোষের জন্য ব্রাহ্মণগণ দায়ী নহেন, বরং তাঁহারাই সাধারণকে প্রকারান্তরে বেদ শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুসমাজের উদারনীতির স্রোত যে কখনই পরিবর্ত্তিত হয় নাই—একথা বলিতে পারি না। রক্ষণশীল ও উদারনীতিক উভয় প্রকার লোক চিরদিনই সমাজে ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। সকল সমাজেই রক্ষণশীল লোক কতকগুলি থাকেন। যখন রক্ষণশীলদলের প্রাবল্য হয়, তখন অনেক অনুদার অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। আবার যখন উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রাবল্য হয় তখন অনেক উদার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়। আমরা তর্ক করিতে গিয়া অনেক সময়—অনুদার কার্য্যাবলীর দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করি, কিন্তু উদার কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিতে একেবারেই বিস্মৃত হই। কতিপয় অনুদার কার্য্যের জন্য একটী বিশাল জাতির উপর দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হই না। শ্রীরামচন্দ্র যে তপস্বী শূদ্র-যুবকের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা মনে করি, কিন্তু বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিয়া ছিল সে যে তপস্বী হইয়াছিল, সেদিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি না। কতিপয় দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত বা কতকগুলি সাময়িক অকার্য্যের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমরা সমগ্র জাতির উপর দোষারোপ করি ইহা সঙ্গত নহে।

ব্রাহ্মণ-সমাজের বহু গুণ আছে, আবার বহু দোষও আছে। সেই দোষগুলির সংস্কারের জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে চাই। কৌলীন্যপ্রথা ব্রাহ্মণসমাজের বহু অনিষ্ট সাধন করিতেছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজ ইহার জন্য কি করিতেছেন? তাঁহারা সামাজিক আচার-ব্যবহারে নানাবিধ খুঁটী নাটী বাড়াইয়া লইয়া এমন অবস্থায় পড়িয়াছেন, যে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কার্য্যের শক্তি তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যভার তাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন যে তাঁহাদের গতি-শক্তি তিরোহিত হইয়াছে, এখন শ্বাস-রোধের উপক্রম হইয়াছে। স্বকৃত কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণসমাজ এখন বিপন্ন। এ সম্বন্ধে আমার একটী গল্প মনে পড়িতেছে। এক সময়ে আমি আরা গবর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম, তখন আমার এক ভৃত্য ছিল তাহার নাম ছিল ভিখু। ভিখু বেশ শিষ্ট শান্ত ছিল। একদিন ভিখু বলিল যে তাহার বিবাহ হইয়াছে, সে আমাকে দেখাইবার জন্য তাহার স্ত্রীকে আনিতে চায়। আমি বুঝিলাম ভিখু কিছু পাইবার প্রত্যাশা করে। আমি বলিলাম 'বেশ,

তোমার স্ত্রীকে আনিও, দেখিব।' তাহার পর একদিন ভিখু তাহার স্ত্রীকে আনিল, আমি কিঞ্চিৎ মুখ দেখানি দিলাম। দেখিলাম, ভিখুর স্ত্রী কাঁসার অলঙ্কার পরিয়া আসিয়াছে। তাহার পায়ে অনূ্যন ১০। ১২ সের ওজনের কাঁসার মল। সে অলঙ্কারের ভরে বাধ্য হইয়া মরালগামিনী হইয়া পড়িয়াছে। আমার মনে হইল, এই দুর্ব্বিহ অলঙ্কার-ভার দিয়া ভিখু তাহার স্ত্রীর পলাইবার পথ এমন ভাবে রুদ্ধ করিয়াছে যে, বেচারী বাধ্য হইয়া কায়ক্লেশে কোনও মতে চলিতেছে। ভিখুর সমাজ যেমন গুরুভার অলঙ্কারের ব্যবস্থা করিয়া নারীগণের গতিশক্তি রোধ করিয়াছে, ব্রাহ্মণগণও তেমনি স্বকৃত নিয়মশৃঙ্খলে এরূপ ভাবে বদ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহাদের আর চলিবার উপায় নাই, এই আচার-ব্যবহারের খুঁটীনাটীর ভার তাঁহাদিগকে এরূপ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, ঐ বন্ধন-গুলির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্যোগ আয়োজন করাও তাঁহাদের পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখন ঐ সকল বন্ধনচ্ছেদন করার প্রয়োজন হইয়াছে, নচেৎ ব্রাহ্মণসমাজের প্রাণ-স্পন্দন অধিককাল অনু-ভূত হইবে না। জালবদ্ধ সিংহ যেমন স্বীয় পরাক্রমে বাগুরাবন্ধন ছিন্ন করিয়া বহির্গত হয়, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজকেও তেমনই নিয়মের খুঁটীনাটীর নাগপাশ-চ্ছেদন করিয়া বাহির হইতে হইবে।

এস্থলে সংক্ষেপে কতিপয় বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। ব্রাহ্মণগণ নিয়ম করিলেন - তাঁহারা অপরজাতির পক্ক অন্ন-গ্রহণ করিবেন না। বেশ কথা। স্বতন্ত্রতা-রক্ষার জন্য বা আত্মশুদ্ধি-সংরক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণগণের এই চেষ্টা। অনেকে মনে করেন—এটা শাস্ত্রসঙ্গত। সত্যই ব্রাহ্মণেরা অপরবর্ণের অন্ন-গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা বলি—এ কথাটা আদৌ সত্য নহে। ব্রাহ্মণ অপর ত্রিবর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অন্ন গ্রহণ করিতেন ইহা শাস্ত্রসদাচার-সমর্থিত। এক শূদ্রের অন্ন-গ্রহণ সম্বন্ধেই মতভেদ। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সকল শূদ্রের অন্ন-ভক্ষণের ব্যবস্থা নাই, কিন্তু—"শূদ্রেষু দাস-গোপালকুলমিত্রা-র্দ্ধসীরিণাম্" ভোজ্যান্নতা সকল ব্রাহ্মণের পক্ষেই বিহিত ছিল। মনু যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি সংহিতাকার ঋষিগণ দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, আত্মনিবেদক প্রভৃতি শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ভোজ্য এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন।

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।

কুশীলবঃ কুম্ভকারঃ ক্ষেত্রকর্মক এবচ,
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্বা স্বল্পং পণং বুধৈঃ।
(কূর্ম্মপুরাণ)

পৌরাণিক গ্রন্থেও এই শ্রেণীর প্রমাণের অভাব নাই।

কুন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তবঃ,
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি।

এ বিষয়ে মহামুনি পরাশর বেশ ভাল কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন—

তাবদ্ ভবতি শূদ্রান্নং যাবন্ন স্পৃশতি দ্বিজঃ।
দ্বিজাতি-কর-সংস্পৃষ্টং সর্ব্বং তদ্ধবিরুচ্যতে।

যাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ না স্পর্শ করেন তাবৎকাল পর্য্যন্তই শূদ্রপক্ক অন্ন 'শূদ্রান্ন' থাকে, যখন দ্বিজাতির করস্পর্শ লাভ করে তখন শূদ্রান্নও হবিঃ হয় অর্থাৎ দেবদেয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ ভাল কথা হিন্দুর শাস্ত্রেই আছে। অগ্নিপুরাণে স্পষ্টাক্ষরে বলা আছে—

শূদ্রাস্তু যে দানপরাঃ ভবন্তি, ব্রতান্বিতা বিপ্রপরায়ণাশ্চ,
অন্নং হি তেষাং সততং সুভোজ্যং ভবেদ্ দ্বিজৈর্দৃষ্টমিদং পুরাতনৈঃ।

দান-নিরত বিপ্রপরায়ণ ব্রতান্বিত শূদ্রের অন্ন দ্বিজগণের সুভোজ্য। বস্তুতই একথা সত্য যে যাহারা সদাচারসম্পন্ন নহে সেই সকল মুর্খ ভ্রষ্টাচার শূদ্রের অন্ন সদাচার ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিবেনই বা কেন?

এই সকল শাস্ত্রের কথা অনেকে জানেন, কিন্তু মানেন না। তাঁহারা নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণেরা নীরোগ সদাচার ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন শূদ্রের পক্ক অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্তু শৌচাচারবিহীন গণিকা-রত উপদংশ-পীড়াগ্রস্ত নামমাত্র ব্রাহ্মণের পক্ক অন্ন—এমন কি হোটেলের শূদ্র-প্রকৃতিক ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণ করিয়াও আভিজাত্যের গর্ব্বে স্ফীতবক্ষে বিচরণ করিতেছেন। যদি অনাচারীর অন্ন-গ্রহণে পাপ থাকে, যদি রোগার্ত্তের অন্ন ভক্ষণ করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, যদি অপবিত্র মলিন ব্যক্তির পক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে সাত্বিকভাবের হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার সকলই ঘটিতেছে। কেবল 'ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিতেছি' বলিয়া মনে যে একটা গর্ব্ববোধ বা আত্মপ্রসাদ তাহাই লাভ হইতেছে। এইভাবে শাস্ত্র পালন করিয়া যদি ব্রাহ্মণসমাজ নিজেদের সদাচার ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপরায়ণ

মনে করেন তাহা হইলে তদপেক্ষা হাস্যকর আত্ম-প্রতারণা আর কি হইতে পারে জানি না। অপরের অন্ন ভক্ষণ করিব না এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া ব্রাহ্মণগণ এখন "পাচকের জাতিতে" পরিণত হইয়াছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ-সমাজের ক্ষতি হইয়াছে কি লাভ হইয়াছে তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মণের পতনই দেখিতেছি। পাচক ব্রাহ্মণগণ যে কি ভাবে ব্রাহ্মণের পবিত্রতা রক্ষা করেন তাহা অনেকের অগোচর নহে, এরূপ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধন কি সঙ্গত নহে ?

এ প্রসঙ্গে লাভ-ক্ষতির চিন্তা করিলে কিরূপ মনে হয় ? একটী গল্প মনে পড়িল। একজন কায়স্থ ও একজন ব্রাহ্মণ একসঙ্গে বিদেশে যাত্রা করেন। উভয়ের উদ্দেশ্য বিদেশ থেকে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে আনা। এক গ্রামের লোক, এক সঙ্গেই যাত্রা করেন। পথে স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মণ বলিলেন এখানেই এক দোকানে আহারের ব্যবস্থা করা যাক্, কায়স্থ বলিলেন তাহাই হউক্। তখন উভয়ে একসঙ্গে নিকটস্থ নদীতে স্নান করিতে গেলেন। স্নানের পর কায়স্থ বলিলেন 'আমি জল লইয়া যাই,' ব্রাহ্মণ বলিলেন 'আমি শূদ্রের জল খাই না, সুতরাং আমিই জল লইয়া যাইব। ব্রাহ্মণ জল লইয়া গেলেন, ব্রাহ্মণের পাক-স্থানে অন্য জাতি যাইতে পারে না, সুতরাং কায়স্থ মহাশয় সেখানে আদৌ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দোকানীর নিকট হইতে চাউল ডাইল ইত্যাদি লইয়া ব্রাহ্মণই পাকশাক করিলেন, নিজে আহার করিলেন এবং কায়স্থের জন্য ভাত বাড়িয়া দিলেন। কায়স্থ আহার করিয়া বলিলেন 'আমি এঁটো পরিষ্কার করিব, আপনি বিশ্রাম করুন্।' দোকানী এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বলিল "ব্রাহ্মণ ঠাকুর। আপনি জিতিলেন না ঠকিলেন ? এই ব্যক্তির বহুবিধ সেবা আপনি করিলেন, আর এ ব্যক্তি শুধু এঁটো পরিষ্কার করিয়া নিষ্কৃতি পাইল। দেখিতেছি এ ব্যাপারে আপনারই হা'র হইল।" কথাটা নিতান্ত বৃথা নয়। এ ব্যাপারে লাভ ত ব্রাহ্মণের হয়ই নাই, ক্ষতিই হইয়াছে যথেষ্ট। ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের জল তোলা, পাক করা প্রভৃতি কার্য্যেই অনেক সময় কাটিয়া যায়। সদাচার রক্ষা করিতে গিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক-স্নান-ভোজন প্রভৃতিতেই সকল সময় অতিবাহিত হয়। স্বীয় সমাজের ও অন্যান্য সমাজের হিত-চিন্তা করিবার সময় থাকে না। ইহা কি প্রার্থনীয় ?

এই সকল স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন ছেদন করিতে হইবে। এই সকল বন্ধনে

বদ্ধ থাকিলে মানুষের আত্মহিত বা পরহিত কিছুই করিবার সাধ্য থাকে না, একথা ব্রাহ্মণদিগের ভাবিবার দিন আসিয়াছে। এইরূপ বহু বন্ধন আছে, সে সকলের আলোচনা করিবার সময় ও স্থান দুইয়েরই অভাব।

ব্রাহ্মণগণ নিজেদের সমাজে যে সব সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবেন—সেগুলি শাস্ত্রসঙ্গত হওয়া আবশ্যক, একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু শাস্ত্রের অক্ষরার্থ গ্রহণ না করিয়া মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিলেই যথার্থ উপকার হয়—একথা এ প্রসঙ্গে না বলিলে অন্যায় হয়। অক্ষরে অক্ষরে শাস্ত্রবচন পালন করা যে বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভব—অন্ততঃ তাঁহাদের সেরূপ স্বাধীনতা যে নাই—একথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। দেশকালপাত্রানুসারে চলিতে হইবে, বাল্যকালের পাদুকা বার্দ্ধক্যে পায়ে লাগিবে কেন?

সংস্কার-সাধনে যেমন শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তেমনই অন্যান্য বর্ণের হিতে বাধা না পড়ে, পক্ষান্তরে তাহাদেরও কল্যাণ সাধিত হয়, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। শুধু আপনার আচার ও রান্নাঘর লইয়া ব্যস্ত থাকিলে বর্ত্তমানকালে আত্মরক্ষার কোনও সম্ভাবনা নাই। নানাবিধ জটিল কারণে বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে, হিন্দুর লোকসংখ্যা জন-বল হ্রাস পাইতেছে। নিভৃত পল্লীতে নিরাপদে বাস করা দরিদ্র হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে—এসব কথা ভুলিয়া কেবল 'ছুৎমার্গ' লইয়া সময়ক্ষেপ করিলে ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা যাইবে না, ইহাই ভাবিবার দরকার।

ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের সকলের ভালমন্দ ভাবিবেন। কেবল স্বার্থচিন্তা বা স্বার্থপরতা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে; ব্রাহ্মণ ভূদেব, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক। সমাজের উচ্চ-নিম্ন সকলের কল্যাণ-চিন্তা ব্রাহ্মণই করিয়া আসিয়াছেন, এখনও ব্রাহ্মণকেই উহা করিতে হইবে।

বেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রম সমাজের উত্তমাঙ্গরূপে (মুখরূপে) কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় বাহুরূপে, বৈশ্য উরুরূপে এবং শূদ্র পাদরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। যাঁহার স্থান যত উচ্চে, তাঁহার দায়িত্ব তত অধিক। বাহুতে বেদনা হইলে, উরুতে আঘাত লাগিলে, পাদে কণ্টকবেধ হইলে, সে সকলের জন্যই মস্তককে চিন্তা করিতে হয়। চিন্তার ভার বুদ্ধিকেন্দ্রের উপর। সমা-জের ও সর্ববিধ মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা করিবেন ব্রাহ্মণ। কারণ তিনিই জ্ঞান-রক্ষক। সুতরাং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কেবল আত্মরক্ষা নহে, আত্মরক্ষা ও বর্ণা-শ্রমসমাজ-রক্ষা ব্রাহ্মণেরই কার্য্য। সে কার্য্য করিতে হইলে ব্রাহ্মণগণকেই

অগ্রবর্ত্তী হইয়া হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অমঙ্গলের প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের ক্ষতিকর যে সকল কূট কৌশল চতুর্দ্দিকে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। পদদ্বয় যদি বাতগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য হয়, হস্তদ্বয় যদি কার্য্যক্ষম না থাকে, উরুদেশ যদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মেরুদণ্ড যদি সবল ও উন্নত না থাকে, তবে মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তির উন্নতি-সাধন করিয়াও বিশেষ লাভ হইবে না। যাহার সর্ব্বাঙ্গ বাতগ্রস্ত, তাহার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যরক্ষার আশাও একভাবে দুরাশা।

আমরা বলি, ব্রাহ্মণসমাজের সম্মুখে এখন বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। একটু আধটু রোগ নয়, সর্ব্বাঙ্গে রোগ—প্রবল রোগ। ব্রাহ্মণ এ সময় আপনার তপস্তেজঃ, জ্ঞানবল, বিশ্বপ্রেম প্রদর্শন করিয়া দেশের বর্ণাশ্রমসমাজ রক্ষা করুন। নিজের সমাজে যে দোষ ত্রুটী প্রবেশ করিয়াছে তাহা পরিহার করিয়া আত্ম-শোধন করুন—সমাজের—দেশের কল্যাণ করুন, আর বিলম্বের সময় নাই। তপস্বী ব্রাহ্মণ এখন রন্ধনগৃহে আবদ্ধ থাকিবেন না। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের প্রাণপণ চেষ্টায় রক্ষিত হিন্দুসমাজ এখন বিপন্ন। তিনি আত্মস্থ হউন্, সকলে আশ্বস্ত হইবে, তিনি অগ্রসর হউন্, সকলে অভয় লাভ করিবে। তিনি কর্ত্তব্য পালন করেন, সকলে নবীন জীবন লাভ করিবে। ইহা মিথ্যা নহে, স্তুতি নহে, সত্য।

ব্রাহ্মণ-সমাজ কি করিতেছেন, কি করিতে চাহেন, দেশ—বর্ণাশ্রমিসমাজ তাহা জানিতে চায়। হিন্দুসমাজে যে বিষম সমস্যা-সমূহের উদয় হইয়াছে, তাহাদের সমাধানকল্পে ব্রাহ্মণসমাজ কি করিতেছেন, কি করিতে চাহেন, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। আমরা মনে করি, শাস্ত্রের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপর সমাজ সমুহের স্বার্থরক্ষার অবিরোধে ব্রাহ্মণগণ স্বীয় সমাজের উন্নতি-সাধনে যত্নবান্ হউন্, ইহাই একমাত্র পন্থা। বারান্তরে আমরা অন্য কথার আলোচনা করিব।

মরণে।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান।

জীবনের সুখ-দুঃখে লুকাচুরি খেলা
করিয়াছ প্রেম-রসে বন্ধু নিত্য বেলা;
দারুণ বিচ্ছেদ ভাবি উঠিলে কাঁদিয়া
বুকে মোর স্পর্শ দিয়ে নিয়েছ টানিয়া,
পান্থ আমি ভ্রান্ত হয়ে পেয়েছি যন্ত্রণা
পথে নিয়ে দিয়াছ গো মধুর মন্ত্রণা।
এ বিশ্বের নিত্য নব বিচিত্র সজ্জায়
দেখা দিয়ে জুড়ায়েছ সন্তপ্ত হিয়ায়।
সত্য কিরে মিলনের লীলা অকস্মাৎ
বিচূর্ণিবে মরণের ভীম বজ্রাঘাত?
নহে নহে, নহ তুমি অত অকরুণ
জাগিয়াছে চিত্ত ভ'রে পিপাসা দারুণ—
জীবনে পেয়েছি তোমা বিচিত্র মিলনে,
মরণ-তিমিরে এসো গাঢ় আলিঙ্গনে।

ঘরের কথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

এক্ষণে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের উন্নতি হইলেও ধর্ম্মবলের অভাবে আমরা চরিত্র বলে বলীয়ান হইতে পারি নাই। ব্যবহারে, বাক্যে, ব্যবসায়ে, কার্য্যে, শিক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই কপটতা, চরিত্রহীনতার পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। দিন দি শান্তি সন্তোষ অন্তর্হিত হইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে ঘোর অশান্তি দেখা দিতেছে দানবীর, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীরগণ অদৃশ্য হইতেছেন, সেইস্থানে বাক্যবীরেরা অধিষ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরে মনের তৃপ্তি হয় না। যাহা খাঁটী, তাহাই মনের প্রার্থিত, আপাত চমৎকারিতায় মনের তৃপ্তি মিটে না। বসুধা আজও

রত্নশূন্য হয় নাই, এখনও এমন ব্যক্তি জগতে আছেন, যিনি পরহিতার্থে, স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান এমন কি জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে পারেন। ত্যাগীই পরের উপকার করিতে পারে, আন্তরিকতা না থাকিলে কোন বিষয়েই সাফল্য লাভ করা যায় না। উত্তেজনাবশতঃ যে কার্য্য করা যায়, তাহার শেষে ঘোর অবসাদ আইসে। ধনে, মানে, পদগৌরবে যদি কিছু লাভ হইয়া থাকে, ব তাহা ধনী ও শিক্ষিত সমাজেই হইয়াছে। যাহারা আহার্য্য শস্য এবং র উপকরণ উৎপাদন করিতেছে, তাহারা কি লাভবান হইয়াছে? তে দেখা যায়, তাহারা বিক্রেয়লব্ধ অর্থ পাইতেছে। কিন্তু অনুসন্ধান জানা যায়, তাহাদের হস্তে তাহার একটী পয়সাও থাকে না। মহা- জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা প্রভৃতির মনস্তুষ্টি করিতেই স সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। শক্তিশালীর নিয়মযন্ত্রে তাহারা নিষ্পেষিত হইতে থাকে। উহাদের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবার কেহই নাই। উহারা অনশনে, ব্যাধিতে দলে দলে জীবন ত্যাগ করিলেও আহা! বলিবার কেহই নাই। অথচ, ধনী ও শিক্ষিতের তুলনায় উহারাই অধিক। অধিকের অবনতি, অল্প-সংখ্যকের যেখানে উন্নতি, সে উন্নতি গণ্য নহে এবং সমাজের মঙ্গল-প্রদ নহে।

অশেষ কর্ত্তব্য লইয়া মানব জগতে আইসে, কিন্তু কর্ত্তব্য-সাধন হইয়া উঠে না। শক্তি সত্বেও কেহ কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হন, কেহবা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কেহবা পথহারা হইয়া বিপথে পতিত হন। কিন্তু, কর্ত্তব্য-পালনের জন্য সবাই দায়ী। বস্তুতঃ মানবের আত্মম্ভরিতা, এবং সুখ-সাধনেচ্ছা বলবতী ওয়ায় প্রকৃত সুখ-শান্তি পাইতেছে না। পরকে সুখী করিতে না পারিলে খনও নিজে সুখী হওয়া যায় না। স্বজাতি স্বজাতিকে, মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে না শিখিলে, কখনই মনুষ্য-সমাজ উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। পরস্পর সমবেদনাই জাতীয় উন্নতির মূল। সঙ্কীর্ণ গৃহে দুইচারি জন ইংরেজের মৃত্যুর প্রতিশোধ-স্বরূপ, ভারতে ইংরেজের আধিপত্য-বিস্তার, ইহা সবাই অবগত আছেন। আত্ম-গঠন, সমাজ-গঠন না হইলে জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিতে হইবে। খলতা, কপটতা, বিদ্বেষ, অসূয়া, অভিমান, ক্রোধ, লোভ, অবিশ্বাস প্রভৃতি কণ্টকবৃক্ষ গুলি সমূলে ছেদন করিতে হইবে। দোষের অনুকরণ বর্জ্জন করিতে হইবে। নিঃস্ব কৃষকদিগের উন্নতি-সাধনে যত্ন করিতে হইবে। বাণিজ্য, শিল্প,

কৃষির উন্নতি-সাধনে চেষ্টা করিতে হইবে। ধনবল বৃদ্ধি হইলে, লোকে উপযুক্ত আহার্য্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান পাইলে, নিশ্চয়ই মৃত্যু-সংখ্যার হ্রাস হইবে। দারিদ্র্যই ভারতের মৃত্যু-সংখ্যা-বৃদ্ধির হেতু, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। দারিদ্র্য দূর হইলে, মৃত্যু-সংখ্যাও কমিবে। পরায়ত্ত সমস্তই দুঃখের কারণ, স্বাধীনতাই সুখ, এই কথাটী মনে রাখিয়া পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। আজ ভারত সর্ব্ব বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী বলিয়া ভারতের দুঃখ-অমা-নিশা প্রভাত হইতেছে না। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাহাতে আমরা প্রস্তুত করিতে পারি এবং ব্যবহার করি, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কথা অপেক্ষা কার্য্য সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। নিজের ও জগতের হিতের জন্য কার্য্য করিয়া যাও, ফলের আশা করিও না। কার্য্য করিতে থাক, ফল আপনিই মিলিবে। আশা রাখ, বাসনা বাড়াইও না। তাহা হইলে মনোবেদনা পাইবে। তুমি কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্ম করিয়া যাও, ফল আসে আসুক। তাহার জন্য লালা-য়িত হইও না। জগতের একটী অণু, পরমাণুও নিষ্ক্রিয় নহে, তবে তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে কেন? শরীরের বশবর্ত্তী হইয়াও তোমায় কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কর্ম্মই করিতে হইবে; মনুষ্যনামের পরিচয় দিতে হইবে। নিজের পায়ে বলসঞ্চয় করিয়া চলিতে শিখিতে হইবে হাত ধরিয়া কতদিন কে, কাহাকে চালাইতে পারে? অবিশ্রান্ত দেহি দেহি করিলে ভিক্ষাও মিলে না, ক্ষুধাও মিটে না। সুতরাং প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একজন ভিক্ষা করিয়া যদি দৈনিক পাঁচ টাকা পায় তদপেক্ষা মাসিক এক টাকা বেতনভোগী গোরক্ষকও শ্রেষ্ঠ। সে তাহার নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উহা উপার্জ্জন করে। স্বাধীনবৃত্তিবলে জীবিকার্জ্জনই শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করাও নিন্দার্হ নহে। ভারতে জীবিকার্জ্জনের পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতেছে। বাণিজ্য ভারতে নাই বলিলেই চলে, অন্য দেশ অপেক্ষা বোম্বাইবাসীরা বাণিজ্যে নিপুণ, সুতরাং তাহারা ধনী। বাণিজ্যেই দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়। তাহার নিম্নে কৃষি। কৃষিকার্য্যও মন্দ নহে, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিকার্য্য করিতে পারিলে, তাহাতেও অর্থ-লাভ হয়।

তাহার নিম্নেই রাজসেবা, চাকুরী। চাকুরী মুসলমানদিগের রাজত্বকালে অর্থকরী ছিল এবং তাহাতে প্রতিপত্তিও ছিল। ইংরেজ-শাসিত ভারতে ইংরেজ-দিগের স্বজাতি-প্রীতি সমধিক। তজ্জন্য তাঁহারা অধিকাংশ কার্য্য এবং উচ্চ বেতন ও বিবিধ সুবিধা স্বজাতীয়দিগকেই দিতে ইচ্ছুক। তারপর এখন সুয়েজখাল

ও বাষ্পীয়পোত-সাহায্যে ইংরেজদিগের যাতায়াত অল্পদিনে এবং স্বচ্ছন্দে ঘটিতেছে। এমত স্থলে অধিকসংখ্যক ইংরেজের ভারতে আগমন সহজেই আশা করা যায়। সুতরাং দেশীয় লোকের রাজসেবার পথও রুদ্ধপ্রায় হইয়া চলিল। মনুষ্য-গণনায় দেখা যাইতেছে, মৃত্যুর হার বেশী হইলেও মনুষ্য-সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হইত, এখন তদপেক্ষা খুব বেশী পরিমাণ ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু বহির্বাণিজ্য ও লোকাধিক্য-নিবন্ধন, তাহাতেও আহার্য্য শস্য প্রয়োজনানুরূপ মিলিতেছে না। সুতরাং ভারতে অধিকাংশ লোক অর্দ্ধাশনে জীবন-যাপন করিতেছে। উপযুক্ত আহার্য্যাভাবে দেহ বলহীন, ক্ষীণ হইতেছে। বলহীন দেহ সহজেই ব্যাধির জীবাণু অধিকার করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে তাহাই ঘটিতেছে। দলে দলে লোক মৃত্যুকে বরণ করিতেছে। হীনশক্তি-মিথুনজাত শিশুকুল, অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে। বাসভূমি শ্মশানে পরিণত হইতেছে। রাজা স্বাস্থ্য-বিভাগে যাহা দান করেন, তাহা তেত্রিশ কোটির তুলনায় সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর তুল্য। এদিকে দেশীয় ধনিগণেরও তাদৃশ লক্ষ্য নাই। জীবিকা-সমস্যা ও জীবন-সমস্যা যুগপৎ ভারতের পক্ষে সমুপস্থিত। যাহা দুই চারিটী চিকিৎসালয় আছে, তাহাও নগরে, কিন্তু সুদূর কুটীরবাসী দরিদ্রের একবিন্দু ঔষধের প্রত্যাশা নাই।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত যুবকদল জীবিকার্জ্জনের উপায়ান্তর অদর্শনে অসৎ পথে পতিত হইতেছেন। দেশে ঘোর অশান্তি উৎপন্ন হইতেছে। তজ্জন্য রাজা কঠোর হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। মানবের মনে প্রথমেই প্রাণৈষণা, বাঁচিবার ইচ্ছা উদিত হয়। পরে ধনৈষণা, ধনোপার্জ্জন-ইচ্ছা। অর্থ ব্যতীত জীবিকা-নির্ব্বাহ হয় না, জীবন থাকে না। সুতরাং ধনোপার্জ্জন-স্পৃহা মানবচিত্তে বলবতী না হইয়া পারে না। এখন এখানে এই দুটীই সমস্যা-জনক হইয়া উঠিয়াছে। যদিও স্বীকার করা যায়, দেশের উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এখন অসংখ্য কর্ম্মী লোকের প্রয়োজন আছে; বেকার যুবকদল সেই সব কার্য্যে নিযুক্ত হউক। কিন্তু দেখিতে হইবে প্রথম তাহাদের নিজ জীবনের রক্ষার উপায়। পরে দেখিতে হইবে বিবাহিত হইলে, তাহাদের আরও কিছু আবশ্যক। উহাদের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ দেশীয় বিপুল ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করা আবশ্যক, যে ধনভাণ্ডারের সাহায্যে উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াও ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি দেশে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে।

প্রথমে ধন-ভাণ্ডারের অর্থ, ধনী ব্যবসায়ী এবং মধ্যবিত্তেরা দিবে। পরে জনসাধারণে যথাযোগ্য চাঁদা ধরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। এমত ব্যক্তিগণ উক্ত অর্থের রক্ষক, পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক হইবেন, যাঁহারা ধার্ম্মিক, অর্থনীতিজ্ঞ, নির্লোভ, সচ্চরিত্র এবং দক্ষ। নচেৎ অশেষ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, সচরাচর ঘটিতেও দেখা যায়। চরিত্র-বল ব্যতীত, ব্যবসায় বাণিজ্য, যৌথ-কারবার কিছুই চলিতে পারে না, সাধারণের বিশ্বাসভাজনও হওয়া যায় না।

শুধু ভারতে নহে, লোকাধিক্য-নিবন্ধন, সকল দেশেই জীবিকা-সমস্যা সমুপস্থিত হইয়াছে। এ সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা না করিলে ক্রমশই অশান্তির বৃদ্ধি হইবে। তাহাতে ধনীর ধন অপহৃত হইবে, কত ব্যক্তি আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইবে। উক্ত সমস্যার সমাধানের উপায় যৌথকারবার, রেল-পথনির্ম্মাণ, খনির কার্য্য, ব্যবসায় প্রভৃতি দেশে বিস্তার করিয়া স্বদেশী লোকদিগকে পালন করা; অথবা বেতন ধার্য্য করিয়া দেশের হিতকর কার্য্যে বহুল লোক নিযুক্ত করা। আর দেখা যায় পশ্চিমদেশীয় কিম্বা উড়িষ্যাবাসী জনগণ দেশের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ঠাকুরপূজা, ভাত রাঁধা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্যই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। ইহা ভিন্ন পেয়াদাগিরি, ডাক-পিয়োনি, ট্রামের কার্য্য সমস্তই বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য জাতিতে করিতেছে। বাঙ্গালীরা কষ্টসহিষ্ণু নহে, কিছু অলস ও সৌখীন। বিশেষ বাবু-নামধারী মনুষ্যেরা ঐরূপ। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিতে ক্ষম, এক্ষণে তাহাদেরই আধিপত্য বাড়িতেছে। কৃষি, বাণিজ্য, কলকারখানা সর্ব্বত্রই শ্রমজীবী লোক আবশ্যক। সুতরাং তাহারা এখন বুঝিয়াছে, তাহাদের শ্রমলব্ধ ধনেই দেশ সমৃদ্ধ হইতেছে। এজন্য তাহারা সকল স্থানেই সময়মত দলবদ্ধ হইয়া পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। একখানি বাঁশ চালা করিতে হইলে বাবুর পক্ষে একজন মজুর চাই। অযথা অভিমান এবং বিলাসিতা অধিকাংশ লোককে শ্রম-বিমুখ বা বাবু করিয়া তুলিতেছে। অনেকটা ইহা পাশ্চাত্যশিক্ষা ও অনুকরণের ফলও বটে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির এখন মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনও দুর্লভ হইয়াছে, কিন্তু একজন সূত্রধর কাঠ কাটিয়া মাসিক উহা স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করে। সুতরাং বুঝা যায়, কার্য্যকরী বিদ্যার গৌরবই সমধিক।

বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিতে পারিলে যদি দৈনিক এক জোড়া বস্ত্রও প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে সূতার মূল্য ও পারিশ্রমিক বাদ দিয়া যদি বার আনা লাভও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মাসিক ২২৲।২৩৲ টাকা লাভ হয়।

২০৲ টাকার কেরাণীগিরি অপেক্ষা উহার সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা ভিন্ন স্বর্ণকারের কার্য্য, নক্‌সার কার্য্য, পাথরে খোদাই কার্য্য, ধাতু ও প্রস্তরের মুর্ত্তি-গঠন কার্য্য বিশেষ অর্থজনক। বহনযোগ্য নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু প্রতিগৃহে লইয়া গিয়া বিক্রয় করাও মন্দ কার্য্য নহে। খনিজ মৃত্তিকা বা নূতন ধাতু হইতে ব্যবহার্য্য পাত্রাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলেও অর্থাগম হইতে পারে। অবশ্য তাহাতে মূলধনের প্রয়োজন। মাড়োয়ারি, ভুটিয়া, সিন্ধুদেশীয় মুসলমানগণ, পার্শি, কাবুলী প্রভৃতি জাতিরা যে মত ব্যবসায় বুঝে, অন্যান্য জাতিরা ততটা বুঝে না। বাঙ্গালাদেশের স্বর্ণবণিক্‌, তিলি, সাহারাও ব্যবসায় বেশ বুঝেন। এক্ষণে কোন কোন স্থানে বাণিজ্য-শিক্ষার স্কুল-কলেজ হইতেছে। স্থানে স্থানে যৌথকারবারও দৃষ্ট হইতেছে। ফল কথা, বেকার-সমস্যার সুমীমাংসা না হইলে কিছুতেই দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না। দিন দিন চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, নরহত্যা প্রভৃতির বৃদ্ধি হইবে। অভাবে স্বভাব নষ্ট, এই প্রবাদ বাক্যটি ধ্রুব সত্য। যদিও রাজা কঠোর লৌহময় হস্তে শাসন করিতেছেন, তথাপি লোকের চরিত্র সংশোধন হইতেছে না। কারাগারে যে সমস্ত বীভৎস-লীলা হয়, তাহা লেখনী লিখিতে অক্ষম। উহা শোধনাগার না হইয়া দূষণাগারে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য বৃটিশ আইনের দোষ নাই, কিন্তু ব্যবস্থার দোষে দোষ ঘটিতেছে। সে সব দোষের উল্লেখ করা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে।

অনেকে বলেন ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও চরিত্র-বল না থাকায় সমাজে বিবিধ অনর্থ ঘটিতেছে। একথা সত্য বটে, কিন্তু খাইতে না পাইলে, মানবের তখন হিতাহিত, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বোধ থাকে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে উদরের জ্বালার সুব্যবস্থা করা আবশ্যক। সে ব্যবস্থা করিতে হইলে সবাইকে সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। "ধনেন বলবান্‌ লোকঃ" ধনই প্রকৃত বল। অর্থমনর্থং ভাবয় চিন্তং" ওসব সন্ন্যাসীদের কথা, সংসারীর নহে। অর্থ ব্যতীত জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত চলে না, আর কথা কি? সুতরাং বেকার সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ধন-বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। ধনীর অর্থে ধনী নিজে সুখী, আর সমাজের অর্থে সমাজের সাধারণেই সুখী হইতে পারে। জমিদারের সহিত রাজার রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট থাকায়, ফল এই হইয়াছে যে, কতকগুলি অল্পসংখ্যক লোক বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। কিন্তু উক্ত রাজস্ব প্রজার সহিত নির্দ্দিষ্ট হইলে গরীব কৃষিজীবীরা দুবেলা দু'মুঠা ভাত খাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত। দরিদ্র কৃষিজীবীর দল

বিবিধ অত্যাচারে ক্রমশঃ নিঃশেষ হইতেছে। পরে চাষ করিবার লোক মিলিবে না। তেড়িকাটা বাবুদের দ্বারা তাহা হইবে না। সুতরাং তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর, নচেৎ ঘোর দুর্দ্দিন সমুপস্থিত হইবে। তাহাদের অশিক্ষিত ভাষা, মলিন বস্ত্র, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কারণে সভ্যতাভিমানী ব্যক্তি তাহাদের নিকট যাইতে চাহেন না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তাহারাই অন্ন-বস্ত্রের উৎপাদক।

ভারতের এতাদৃশ দুঃসময়ে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ-রাহু উদিত হইয়া সুখ-সুধাংশুকে গ্রাস করিতেছে। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান যিনিই হউন, তাঁহাকে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমরা একই দেশবাসী এবং বৈদেশিক রাজার একই আইনে শাসিত ও শৃঙ্খলিত। সেস্থলে বিরোধ না করিয়া সমবেত-ভাবে চেষ্টা করিলে সকল বিষয়েই সুযোগ ও শুভ মুহূর্ত্ত আসিতে পারে। একই স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া আমরা একতার পতাকাতলে মিলিত হইতে পারিব না কেন? যাঁহারা একতায় বাধা প্রদান করেন, তাঁহারা সমাজদ্রোহী। জীবন-মরণের সমস্যা ঘুচাইতে হইলে যে মতে হউক, একতা আমাদের চাই। গোঁড়ামী ত্যাগ করিয়া অবিরোধে স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠান সাধন কর, বিরোধ আপনিই সরিয়া যাইবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ব্যতীত কিছুতেই ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দিন ঘুচিবে না, উহা ধ্রুব সত্য। মহাত্মা গান্ধী এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই উভয় জাতির মিলনের জন্য প্রিয়তম জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আর একটি কথা, ভারতে শিক্ষা-বিস্তার। এদেশে স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠা হইবার পর যে পরিমাণ লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তেত্রিশ কোটি নর-নারীর পক্ষে তাহা নগণ্য। সুতরাং শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। আর একটি কথা, ভারতে বহুলভাবে চিকিৎসার বিস্তার এবং দাতব্য চিকিৎসা-লয় ৫।৭ খানি গ্রামের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রার্থনীয়। এখন যে পরিমাণ চিকিৎসক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছে, হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, উহা দশ হাজার মনুষ্যের প্রতি একটি। সুতরাং এখনও বহু চিকিৎ-সক আবশ্যক।

ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার বহুল বিস্তার পক্ষে জনসাধারণের চেষ্টা করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও এদেশের প্রকৃতির অনুকূল নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাও অবৈজ্ঞানিক নহে। ধাত্রী-বিদ্যা ও অস্ত্র-প্রয়োগবিধি যাহা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গচ্যুত হইয়াছে, এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার

শিক্ষা চলিতেছে। আর একটি কথা, বিজ্ঞান-চর্চ্চা। বিজ্ঞানের বহু প্রচার হওয়া আবশ্যক, যাহাতে কল কব্জার জন্য আমরা আর বৈদেশিকদিগের মুখাপেক্ষী না হই। পরমুখাপেক্ষিতা অত্যন্ত দুঃখকর। যে দেশ হইতে যেটুকু শিক্ষা আবশ্যক, সেদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া লইয়া তাহার সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। বিদ্যাই শিক্ষার বিষয়—আচার-ব্যবহার শিক্ষার বিষয় নহে। একদেশের আচার-ব্যবহার অন্যদেশের অনুকূল নহে। ইহা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতা, জাতিভেদলোপ প্রভৃতি রীতি সমাজে প্রচলন করিতে চাহেন, তাঁহারা সমাজ-বৈরী। ভারতে হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি জাতি ঘৃণিত পণপ্রথা-অত্যাচারে ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন। ভ্রাতা, ভ্রাতার কণ্ঠ-শোণিত পান করিতেছে। এমতে দরিদ্র-বহুল সমাজকে নিঃস্ব করা নিতান্ত অবৈধ। উক্ত ঘৃণিত প্রথার উচ্ছেদ করিতে কোন শক্তিশালী জননায়ক এপর্য্যন্তও অদম্য যত্ন করেন নাই। কিন্তু উক্ত অত্যাচার এখন এতই প্রবল হইয়াছে যে, অসহবোধে অনেকে রাজার নিকট অত্যাচার-নিবৃত্তি জন্য আইন চাহিতেছেন।

রাজনীতির আলোচনা অবশ্য-কর্ত্তব্য, কিন্তু সমাজনীতির আলোচনাই বিশেষ-রূপ কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত অত্যাচার নিবারণের উপায় আছে, কিন্তু সমাজের অত্যাচারের প্রতিবিধান দুঃসাধ্য। তবে মনুষ্যকৃত বিধি-বিধান, বা অত্যাচার মানবসমূহের প্রযত্নে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তবে সমাজ মধ্যে এমন শক্তিশালী মানব চাই, যাঁহার আহ্বানে অসাড় দেহে স্পন্দন আরম্ভ হয়। কত শত বার মহামনীষী মহাত্মাদের আহ্বানে লক্ষ লক্ষ লোক জাগিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে। তবে সেটা ধর্ম্মের দিকে, অন্যদিকে ভারতীয় লোকের আর তাদৃশ ভাবপ্রবণতা দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্ম ভারতের অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। সামাজিক ভাবের পরিবর্ত্তনও কখন কখন হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মান্দোলনের তুলনায় তাহা নগণ্য। পারিবারিক অত্যাচার, সামাজিক অত্যাচার, প্রবলের অত্যাচার, শাস্ত্রীয় অত্যাচার, অশাস্ত্রীয় অত্যাচার, পৌরোহিত্য-অত্যাচার, আভিজাত্যের অত্যাচার, স্নেহের অত্যাচার, বিধান-জনিত অত্যাচার, বংশ-মর্য্যাদার অত্যাচার ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারে মানবসমাজ নিষ্পেষিত হইতেছে। বিপন্ন মানব-সমাজকে রক্ষার চেষ্টা না করিলে সমাজ ধ্বংস পাইবে। ইহার পর নিদারুণ ব্যাধির অত্যাচার, তন্নিমিত্ত অকাল মৃত্যুর অত্যাচার। অনুপায়—বাধা-বিপত্তি যথেষ্ট, কিন্তু প্রতিকারের

পথ নাই। একবারে পথ নাই এমত নহে, তবে পথ করে কে? মানুষের মধ্যে, মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানব দুর্লভ। দেবপ্রকৃতি মহামনা ব্যক্তি ব্যতীত, স্বার্থ-সাধন-তৎপর ব্যক্তি দ্বারা কখনও সমাজের হিতসাধন হইতে পারে না।

জন্মমাত্রেই মানবের তিনটী বাসনা অন্তরে জাগরূক হয়। প্রথমেই প্রাণ রক্ষার উপায়-অন্বেষণ। কিরূপে বাঁচিয়া থাকা যায়? এই ইচ্ছাই প্রথমে মানব-মনে উদিত হয়। দ্বিতীয় ধন-বাসনা, বাঁচিয়া থাকিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং জিজীবিষার পরই ধন-বাসনার উদয় সঙ্গত। তৃতীয় জীবনের বাসনা, অর্থাৎ অকালে মৃত্যু না হয়, জগতের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া দীর্ঘ জীবন ভোগের পর যেন মৃত্যু হয়, ইহা মানবের তৃতীয় কামনা। এখন তিনটি বাসনাই মানবের অপূর্ণ থাকিতেছে। সুতরাং ক্ষীণশক্তি মানব, জীবন-সংগ্রামে কিছুতেই জয়ী হইতে পারিতেছে না। প্রতি পদে তাহার পরাজয় হইতেছে। এই জন্যই আমি বলিতে চাই সর্ব্বাগ্রে মানবের তীব্র অভাব অভিযোগের মর্ম্মস্পর্শী রোদনের প্রতিকার করাই কর্ত্তব্য। মানবের বাঁচিবার উপায় হইলে, তখন রাজনীতির চর্চ্চা সঙ্গত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, যে আমরা অধিক-পরিমাণ রাজকীয় শক্তি পাইলে, তখন দেশের অভাব অভিযোগ দূর করা সহজসাধ্য হইবে, নচেৎ নহে। রোগী এখন তখন, ঔষধ হিমালয়ের কন্দরে—এমত স্থলে রোগী বাঁচে কিরূপে?

মানব বাঁচিলে, তবে পরে তাহাদের রাজনীতি-চর্চ্চা। এখন জীবন-রক্ষার দিকেই সমধিক মনোযোগী হইতে হইবে। অনশনে, জলপ্লাবনে, অগ্নিদাহে, ব্যাধির অত্যাচারে, হিংস্র জন্তুর প্রতাপে দিন দিন ভারত শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল, এখন কেবল রাজনীতি চর্চ্চা প্রীতিপ্রদ নহে। সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্ব-প্রযত্নে, অর্থে, সামর্থ্যে অগ্রে মানবমণ্ডলীর রক্ষার উপায় করিতে হইবে। ইহা পরের কথা নহে, ইহাই আমাদিগের ঘরের কথা। আজ আমি বিশেষ দুঃখের সহিত সেই ঘরের কথাই বলিতে উদ্যত হইয়াছি। সব বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইল না। যদি আবার কখনও সময় পাই, তখন প্রিয় পাঠকদিগের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিব। প্রবল শক্তিশালীরাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতেছে। দুর্ব্বলেরা দলে দলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি-তেছে। সহরে দুই চারিটি সৌধ দর্শনে বা দুই চারি খানি মটর গাড়ী দেখিয়া মনে করিও না যে, দেশ সমৃদ্ধ হইয়াছে। দরিদ্রের তুলনায় ভারতে ধনীর সংখ্যা অঙ্গুলির অগ্রে গণনীয়। সুতরাং যাহারাই ভারতের অবয়ব-স্বরূপ,

তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। আর বেকার-সমস্যার আশু মীমাংসা করিতে হইবে। এবিষয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ভাবিতেছেন, কিন্তু সমবেত চেষ্টার অভাবে চিন্তার ফল কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। আশা করি, এই ঘরের কথাটি সবাই মনে প্রাণে চিন্তা করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভূমানন্দের বারতা।

লেখক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্।

কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর

* * * *

হু হু করি তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতই আর্ত্ত কলরবে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জীবন-মৃত্যুর অবিচ্ছেদ্য নর্ত্তনের সঙ্গে যে বেদনাভরা আর্ত্ত কলরব শোনা যায়, জীবনের অন্তহীন প্রবাহ-তরঙ্গে যে ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস ধ্বনিয়া উঠে—মানবের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ব্যথার, অশান্তির, অপরাধের, অপূর্ণতার যে হাহাকার যুগে যুগে রণিয়া উঠে, তাহাতে শান্তিবারি সিঞ্চন করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ আদিমকাল হইতে সাধনা করিয়া আসিয়াছে। এই দুঃখাভিঘাত-নিবৃত্তির সন্ধান-পথে মানবের মনে নিজের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে, ভগবানের সম্বন্ধে যে অনন্ত জিজ্ঞাসার সূচনা হইয়াছিল, তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই বেদান্তের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়। বৈচিত্র্যময় জগতের অনন্ত রূপ-পরিবর্ত্তন কোন্ আধারে সম্ভাবিত হয়, এই জিজ্ঞাসা চিন্তা-শক্তির উন্মেষের অব্যবহিত পরেই মানুষকে অধীর করিয়াছিল—যে চিন্তার ধারা মানুষকে অপ্রত্যক্ষের জিজ্ঞাসায় উন্মুখ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা।

এই জিজ্ঞাসা সকল মানুষেরই সহজ সম্পদ। চিন্তাশক্তি যার আছে, তার এই জিজ্ঞাসা না থেকে পারে না। প্রত্যক্ষের পশ্চাতে কি আছে তা জানবার

আকাঙ্ক্ষা চিৎসম্পন্ন মানবের জন্মগত অধিকার, আর তারই বলে আদিম পশু-মানব তার পশুত্ব অনেক পশ্চাতে ফেলে দেবত্বের সন্ধানে এতদূর আগুয়ান হ'তে পেরেছে।' দার্শনিকতা এই অপ্রত্যক্ষের অনুসন্ধানের নামান্তর মাত্র। আদিম মানুষ পাহাড়ের, নদীর পূজা করিত—সে পূজার দ্বারা সে অজ্ঞাতভাবে অপ্রত্যক্ষকেই অর্ঘ্য দান করিত। প্রত্যক্ষের পিছনে কি যেন কি একটা ধরবার জন্য মানুষ প্রথম হ'তেই চেষ্টা করেছে—তার ফলে সে অনেক কল্পনা করেছে যা আজ আমাদের কাছে নিছক আজগুবি বলে মনে হয়, কিন্তু সকল সত্য-সন্ধানের ভিত্তিই সেই আজগুবি কল্পনা, আর তাহাই দার্শনিকতার শৈশব উন্মেষ।

তার পর কি, আবার তার পর কি? এ জিজ্ঞাসা আমরা কেহই না করে থাকতে পারি না। এই জিজ্ঞাসাই 'দর্শন'শাস্ত্রের ভিত্তি। এই হিসেবে আমরা সকলেই দার্শনিক। অপ্রত্যক্ষের জন্য অনুসন্ধিৎসা আমাদের অল্পবিস্তর সকলের আছে। রূপের পিছনে অরূপের সন্ধান আমরা সকলেই করে থাকি। বর্ত্তমান আগত প্রত্যক্ষ নিয়ে আমরা চুপ করে বসে থাকিতে পারি না; আমাদের ইহাই স্বভাব—আমাদের সদাই আগ্রহ তাহা পাবার জন্য যাহা ভবিষ্যৎ, যাহা অনাগত, যাহা অপ্রত্যক্ষ। অপ্রাপ্তকে পাবার এষণাই মানুষকে অভ্যুদয়ের পথে পরিচালিত করে। পার্থিব অপার্থিব সকল উন্নতিরই প্রেরণা হচ্ছে অনাগত অপ্রাপ্ত পূর্ণতর অবস্থার পরিকল্পনা। যা পেয়েছি তা সব নয়, আরও আরও বাকি আছে, এই ভাবনা আমাদের অহরহঃ টেনে নিয়ে যাচ্ছে অবস্থা হ'তে অবস্থান্তরে—বিরাম নেই, শ্রান্তি নেই, যাহা সুদূর, যাহা অপ্রকাশিত, তাহাই পাবার জন্য আমরা চলেছি—চলেছি।

দর্শনশাস্ত্রের প্রয়াস প্রত্যক্ষের পশ্চাতে যে অপ্রত্যক্ষ আছে তার সন্ধান করা। এই পরিদৃশ্যমান বৈচিত্র্যময় বিশ্ব-সংসারের প্রত্যক্ষ বহুত্বের পিছনে যে অপ্রত্যক্ষ সত্তা—যে একত্ব আছে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের অন্তরালে যে শাশ্বত চিরন্তন সত্য লুক্কায়িত আছে, দর্শনশাস্ত্র তাহাই অনুসন্ধান করে। যে প্রেরণার বশীভূত হয়ে আমরা প্রাপ্ত ছাড়িয়া অপ্রাপ্তের প্রতি ধাবমান হই, সেই একই প্রেরণার বশীভূত হয়ে দার্শনিক অপ্রত্যক্ষের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে—চিন্তাশক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দার্শনিক তত্ত্ব-সমূহে উপনীত হন। তিনি বলেন, যে জগৎ আমরা দেখি তাহা পরিবর্ত্তনশীল, অস্থায়ী, তাহা থাকে না—তাহা মিথ্যা। যাহা চিরন্তন, যাহা অপরিণামী,

তাহা অপ্রত্যক্ষ, তাহা গুপ্ত, তাহা প্রত্যক্ষের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নানা রূপান্তরের মধ্যে তাকে ধারণ করে। সেই সত্য ভূমা, সেই সত্য এক, সেই সত্য ব্রহ্ম, তাহাই কেবল সৎ, তাহাই কেবল আছে। তাহাতেই এই জগৎ বিধৃত ও সত্তাযুক্ত।

দার্শনিক সন্ধান দেন অবিনশ্বর সম্পূর্ণ সত্যের, যার আলোকে আমরা সত্য শিবসুন্দরের সাক্ষাৎ পাই—যে জ্ঞান লাভ করে আমরা অশান্তির জগতে শান্তি খুঁজিয়া পাই—মৃত্যুর ভিতরে অমৃতত্বের আভাষ পাই। প্রকৃত দর্শন তাই আদরের জিনিষ, সান্ত্বনার বস্তু। যে জিজ্ঞাসা আমাদের মনে সতত জাগরিত হয়—অপ্রত্যক্ষ জানিবার যে প্রবল তৃষ্ণা আমাদের আছে, তাহার সমাধান দর্শনশাস্ত্র করে বলেই পণ্ডিতবর Schopenheaur বলেছিলেন "উপনিষদ্ আমার জীবনে শান্তি দিয়েছে, মরণেও আমায় শান্তি দেবে।"

অবশ্য স্বীকার করতে হ'বে যে দর্শনশাস্ত্র—শুধু দর্শন কেন? উচ্চ অঙ্গের কাব্য, শিল্প, আর্ট—অনেকস্থানে সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। তবে সে দোষ তাদের নয়, দোষ আমাদের অক্ষমতার। সাধনা ও শিক্ষার অভাবে আমি যদি কিছু বুঝতে না পারি; তার জন্য দায়ী আমার সাধনা ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। সকল জিনিষই আয়ত্ত করা শিক্ষা-ও-সাধনা-সাপেক্ষ। বেদান্ত, আধ্যাত্মিক কবিতা, তানসেনের গম্ভীর ধ্রুপদ সাধারণের বোধগম্য নয় বলে তাদের উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। দর্শনের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। প্রকৃতির রাজ্যে যে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ছড়ান আছে, তাহাই কি সকলে সমানভাবে উপভোগ করতে পারে? সেই অবাধ সৌন্দর্য্যের উপাসক কয়জনই বা হয়? যাদের জন্মগত ভাবুকতা আছে বা যাদের সাধনা-সিদ্ধ বোধ আছে, কেবল তারাই সে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায়। কি দর্শন, কি কাব্য, কি সঙ্গীত, কি আর্ট, উপভোগ করিতে হইলে চাই জন্মগত অনুভূতি, না হয় সাধনা-সিদ্ধ বোধ। পৃথিবীর কোন বড় জিনিষই জলের মত সোজা নয়। আকাশের মত স্বচ্ছ জিনিযের মহিমা বোঝবার জন্যও সাধনার প্রয়োজন।

অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দুর্ব্বোধ্যতা কতক পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী। আমরা কেবল তাহাই বুঝিতে পারি, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর ভিতর সমঞ্জসীভূত হইতে পারে। অর্থাৎ আমি আগে হ'তে যে সব জিনিষ জানি, তাদের সঙ্গে নূতন কোন জিনিষকে যদি খাপ না খাওয়াইতে পারি, সে নূতন জিনিষকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে জন্মান্ধ, তাকে সূর্য্যরশ্মি যে

কি, তাহা বোঝাবার প্রচেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। বর্ণান্ধকে বর্ণ কি, তা বোঝান অসম্ভব। দর্শন সন্ধান করে অতীন্দ্রিয় বস্তুর—যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা চক্ষু কর্ণের অতীত, যাহা অবাঙ্‌মানস-গোচর—দর্শন তাহার কথা বলে—আমাদের পক্ষে দর্শন সেইজন্য দুর্বোধ্য না হইয়া পারে না—কেননা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে কেবল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ অবলম্বিত অনুমানিত বস্তু-সমষ্টি, যার সঙ্গে দর্শন-সিদ্ধ অতীন্দ্রিয় অজ্ঞেয় বস্তুকে খাপ খাওয়ান নিশ্চয়ই সহজসাধ্য নয়।

বিচার—তর্ক—বিশ্লেষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ বস্তুর আলোচনা যেমন সহজে হয়, অতীন্দ্রিয় বস্তুর তেমন সহজে হয় না। অতীন্দ্রিয় বস্তু অনুভবসিদ্ধ—বিচার-সাপেক্ষ নয়। একটা আভাষ, একটা অব্যক্ত দ্যোতনা অন্তরের অন্তরে উদয় হয়, যা হইতে যিনি দার্শনিক, যিনি কবি, যিনি দ্রষ্টা তিনি অজ্ঞেয়, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে অনুভূত করেন। আমাদের সে দর্শন নাই, সে সাধনা নাই, সে ভাব নাই—তাই আমাদের অনুভূতির মধ্যে অতীন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ বস্তু সহজে ধরা দেয় না। তাই দর্শন আমাদের কাছে এত দুর্বোধ্য।

আমাদের সকলেরই মধ্যে অব্যক্ত অপ্রত্যক্ষ বস্তু পাবার জন্য একটা এই যে আকুলতা আছে, যার জন্য আমরা বুঝতে পারি এই ব্যক্ত ব্যথাতুর অপূর্ণ জগতের পিছনে একটা অজানা কিছু আছে, যা আমরা ধরতে পারি না, যার মধ্যে এ জগতের ব্যথা, কালিমা, অপূর্ণতা কিছুই নেই।

এই অসীমের আভাষ, অনন্তের ইঙ্গিত—তাহার সহিত দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন ভাবের প্রাবল্যের মধ্য দিয়া। ভাববিমুগ্ধতার মধ্য দিয়া তিনি অসীমের যে আভাষ ফুটিয়ে তোলেন, তাহা তিনি অনুভব করেন তাঁর মর্ম্মের ভিতরে। তাঁর প্রাণের তন্ত্রীতে অসীম যে সুর ঝঙ্কৃত করে, তাহার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই তাঁর কবিতায়। জটিল যুক্তি তর্কের বিশ্লেষণের তিনি ধার ধারেন না—সহজ সরল অন্তর্বেদনার সঙ্গে—ভাবের মাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তিতে—অসীমের সহিত তাঁর যেন একটা পরিচয় আছে যার আভাষ, তাঁর কবিতার প্রতি ছন্দে পাওয়া যায়। কখনও বা সে পরিচয় তিনি ফুটিয়ে তোলেন জ্বলন্ত সহজ বিশ্বাসের মধ্যে সহজ বোধের অনুভূতিতে :—

ওদের কথায় ধাঁ ধাঁ লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি,
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
　　এই তো সব সোজাসুজি।

আবার কখনও একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসা অসীমকে আরও অন্তরঙ্গভাবে জানবার একটা তীব্র আবেগ তাঁর কবিতায় ঝঙ্কৃত হয়।

"গীতাঞ্জলি।" ৬৬ পৃষ্ঠা।

সুদূর।

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূর-পিয়াসী!
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশে চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী,
আমি সুদূরের পিয়াসী!
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি!
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি!

একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আকুলতা কি যেন কি পাবার জন্য, যাহা সুদূর, যাহা অজানা, যাহা অচেনা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তার একটা আবেশময় মূর্চ্ছনা বেশ পাওয়া যায়। ধরি-ধরি ধরিতে-না-পারি এমনি একটা ভাব তিনি ফুটিয়া তুলেছেন। যাহা অনুভূতির জিনিষ, ভাষায় যার স্বরূপ প্রকাশ পায় না—একটা কুহেলিকার আবরণ তাতে থেকেই যায়। যার অভিব্যঞ্জনা হয়, শুধু ভাবের তন্ময়তার মধ্যে সেই অনন্ত অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ নির্দ্দেশ করেছেন 'অর্থহারা ভাবে ভরা ভাষায়', অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া। তাঁহার সূক্ষ্ম সজাগ অনুভূতি তাঁকে সুদূর অজানার নেশায় ভরপুর করে রেখেছে—তাঁর তন্ময়তা আছে—অন্তরঙ্গ ভাবের আবেশে তিনি অনুভব করেন—

জীবন মরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্য-মর্ম্মর সম মর্ম্ম-ব্যাকুলতা,
ইহ-পরকালব্যাপী সুমহান্ প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা মহত্বের গান,
বৃহৎ বিষাদ-ছায়া বিরহ গম্ভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয় রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন,
নির্জ্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন।

(আকাঙ্ক্ষা)

(ক্রমশঃ)

গীতা-নাটক।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সংগীত।

বাসুদেবে মন বুদ্ধি করিলে অর্পণ
নিশ্চয় আমায় পাবে কুন্তীর নন্দন।
একাগ্র অভ্যাস যোগে অর্জ্জুন অন্তরে
ইষ্ট-মন্ত্র-সহ দিব্য পুরুষ-প্রবরে
করিলে একান্তে ধ্যান, লাভ করা যায়
সনাতন নিত্য ধন অনিত্য ধরায়।
অব্যক্ত অব্যয় জ্ঞানে বেদে যারে মানে
যাহা লভি জীব নাহি জন্মে পুনর্ব্বার,
হে পার্থ! পরমা গতি জান তাঁকে জ্ঞানে
তাহাই পরম ধাম জানিবে আমার।
জগতে যে কিছু তুমি কর নিরীক্ষণ—
সমস্ত বিভূতি মম জানিবে অর্জ্জুন।
থাকি না সে সবে আমি, অর্জ্জুন ধীমান্,
আমাতেই সবে তারা করে অবস্থান।
ত্রিগুণে মোহিত পাপী জানে না আমার
গুণাতীত ভাব পার্থ, নিত্য নির্ব্বিকার।
বহু জন্মান্তরে বিশ্বে বাসুদেব-জ্ঞান,
হেন সুদুর্লভ জ্ঞানী মৎপদ পান।
মনোমত কামবদ্ধ জ্ঞানহারা যারা
ভ্রমে মম পূজা করে ভিন্ন দেবে তারা।
তবু সেই দৃঢ়ভক্তি সে দেব-পূজার
সর্ব্ব-অন্তর্যামী থাকি দেই ফল তার।

হে ধনঞ্জয়! আমি স্বীয় মায়ারূপ প্রকৃতিকে স্বায়ত্ত কোরে নিজ নিজ স্বভাবে এই অবশ ভূতগণকে উৎপাদন কোরে থাকি। উদাসীন পুরুষের মত কর্ম্মাদিতে নির্লিপ্ত থাকায়, সৃষ্টি-আদি ক্রিয়া সকল আমাকে বন্ধন কর্ত্তে পারে না। আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি সচরাচর জগৎ উৎপন্ন কোরে থাকেন এবং ঐ কারণেই নানারূপে পুনঃ পুনঃ জগতের পরিবর্ত্তন ঘটে। বিচারবিহীন মূঢ় আমার সর্ব্বভূতে মহেশ্বররূপের পরমভাব না বুঝে আমাকে মনুষ্যজ্ঞানে দেহধারী দেখে অবজ্ঞা করে। তারা জগৎ-সৃষ্টি স্বৈরিতা-সম্ভূত

ব'লে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাহা নয়। কৌন্তেয়, তুমি যে কর্ম্ম কর, ভোজন কর, হোম কর বা দান কর, অথবা তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে অর্পণ কর। পত্র, পুষ্প, ফল, জল যিনি ভক্তিপূর্ব্বক যা আমাকে দান করেন, আমি তাহাই গ্রহণ কোরে থাকি। অর্জ্জুন! কোন ব্যক্তি ঘোর দুরাচার হোয়ে যদি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাকেও সাধু ব'লে জানবে; কেননা সৎপথে তার মতি হয়েছে। তুমি প্রতিজ্ঞা কোরে বল্‌তে পার আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হয় না। পার্থ! পাপযোনিসম্ভূত জীবগণ এবং স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, তারাও আমার শরণাগত হ'য়ে পরমগতি লাভ করে—বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণগণ ও ভক্তিমান রাজর্ষিগণ যে পরমা গতি লাভ কর্ব্বেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

একাদশ দৃশ্য।

কুরুসৈন্য-ব্যূহ।

দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও ভীষ্ম।

দুর্য্যোধন। গুরুদেব! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ত কোন সাড়া শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না! মহারথী কি মহাভিমানে সমরেচ্ছা একেবারে ত্যাগ কল্লেন? দেখুন, গুরো! আমি কিন্তু কারও উপরোধ বা অনুরোধে বা আদেশে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দেব না; প্রার্থনা করি, আপনি কিম্বা পিতামহ ভীষ্মদেব আমাকে সেরূপ কোন আদেশ কর্ব্বেন না।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! "অতি দর্পে হতা লঙ্কা" এ কথাটা তোমার স্মরণ ক'রবার জন্য পূর্ব্বে অনেক বার বলেছি! তা তুমি একেবারেই বিস্মৃত হও। তোমারই বা দোষ কি দিব? মায়াপাশে তুমি এত আবদ্ধ হ'য়েছ যে তোমার সদসৎ হিতাহিত বিবেক-বুদ্ধি মোটেই উদিত হচ্ছে না। স্থির হও! ধীর মনে চিন্তা কর। গুরুজনে অবজ্ঞা ক'র না। গুরুবাক্য কখনও অহিত-কর হয় না। বৎস! ভয় পরিত্যাগ কর, চিত্তবিকলতা দূর কর। মানুষের এমন একটা অবস্থা বা সময় আসে, যখন সে লোক-লজ্জা, ভয়, সদাচার, সমাজ—সব ভুলিয়া যায়। আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। সে বিস্মৃতির ফল ভাল কি মন্দ, ভঙ্গুর কি অক্ষয়, অমৃত কি গরল, তা মানুষ তখন বুঝতে

পারে না। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই তুমি ভগবানের অধীন। ভগবানের নিকট তোমার অশেষ কর্ত্তব্য। তুমি শোকেই অধীর হও, আর সুখেই উন্মত্ত হও, কখনও ভগবানকে বিস্মৃত হ'ও না। মহাত্মা বিদুর তোমার হিত-সাধনার্থ তোমাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান কোরেছেন. কিন্তু তুমি অনাদর প্রদর্শন কোরে তাঁর বাক্যে কর্ণপাত কর নাই। তন্নিবন্ধনই এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়েছে।

ভীষ্ম। উপস্থিত সৈন্যগণের পরিচর্য্যা সুনিয়মিত হচ্ছে কিনা তাই পরিদর্শন কর। অভাব অভিযোগ থাকিলে তার প্রতিবিধান কর। এ সময়ে দম্ভে দর্পে আত্মহারা হ'য়ো না। দম্ভ দর্প ক'রবার সময় পেলে তখন করিও। যাতে উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও সৈন্যগণ—যাঁরা তোমার জন্য জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হ'য়েছেন, তাঁদের তথ্য অবগত হ'তে পার সেই চেষ্টা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয়পক্ষের সৈন্য-সামন্ত উপস্থিত হয়েছেন, তখন অচিরাৎ যুদ্ধই কর্ত্তে হবে নিশ্চয় জানিও। বৃথা কল্পনা কোরে মনে মনে জয়লাভ ক'রো না। তুমি কালের গতি পর্য্যালোচনা কর। কুরুরাজ! এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সমুপস্থিত হবে! দেখ, দেখ, এক্ষণেই ভয়প্রদ দুর্নিমিত্ত সমুদায় উপলক্ষিত হচ্ছে—শ্যেন, গৃধ্র, কাক, কঙ্ক ও বক ইহারা সমবেত হ'য়ে বৃক্ষাগ্রে নিপতিত হচ্ছে এবং হৃষ্টমনে সংগ্রামের প্রতীক্ষা কচ্ছে। আমি প্রতিনিয়ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সন্ধ্যা নিরীক্ষণ কর্চ্ছি; সূর্য্যদেব উদয় ও অস্তকালে কবন্ধ-পরিবৃত হচ্ছেন এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেতলোহিত-প্রান্ত, বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত পরিধি-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হচ্ছেন। এতাবৎ এবং আরও নানাপ্রকার সংগ্রামসূচক পূর্ব্বলক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। অতএব তুমি যে সংগ্রামের আয়োজন করেছ, তারই প্রতি লক্ষ্য রাখ; বিনা সংগ্রামে সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করবে, মনে তার কল্পনাও যেন না আসে। অতি সত্বরই ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হবে। তুমি সমুপস্থিত সমস্ত যোদ্ধৃগণের এবং অন্যান্য জনগণের যথোচিত পরিচর্য্যার ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাক।

দুর্য্যোধন। যে আজ্ঞে! পিতামহ! আমি আপনার আজ্ঞানুযায়ী কর্ত্তব্য-পালনে যত্নবান হলেম।

দ্বাদশ দৃশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

ষ্ঠির। বাসুদেব! যুদ্ধারম্ভের আর কত দেরি? সৈন্যগণের ব্যূহ রচনা করাও ত সময়-সাপেক্ষ। কৌরব সেনাগণ ত তুমুল সংগ্রামের জন্য সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হ'য়ে অপেক্ষা কর্চ্ছেন। আমাদের সেনাগণও উৎফুল্লিত হ'য়ে উদ্যোগী হচ্ছেন। ধনঞ্জয়! বৃহস্পতি বলেছেন শত্রু-সৈন্যাপেক্ষা নিজ সৈন্য অল্প হ'লে তাদিগকে বিস্তারিত ও অধিক হ'লে তাদিগকে সংযত ক'রে সংগ্রাম কর্ব্বে। অধিক সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম কর্ত্তে হ'লে অল্প সৈন্যদিগকে সূচীমুখাকারে সন্নিবেশিত কর্ব্বে। আমাদের সৈন্য পরপক্ষীয় সৈন্য অপেক্ষা অল্প। অতএব বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ব্যূহ রচনা কর।

অর্জ্জুন। মহারাজ! দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন সমস্তই ব্যবস্থা কর্ব্বেন। যিনি সমরে সমীরণের ন্যায় শত্রুগণের দুঃসহ, যুদ্ধোপায়ে বিচক্ষণ ও যোদ্ধৃগণের অগ্রগণ্য, সেই ভীমসেন আমাদের অগ্রগামী হোয়ে রিপু-সৈন্যের তেজোরাশি বিনষ্ট করবেন। ভীমকর্ম্মা ভীমসেন রোষাবিষ্ট হলে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত কর্ত্তে সমর্থ হয়, এ ভূমণ্ডলে এমন পুরুষ নাই। অতএব আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা শীঘ্রই সমস্ত ব্যূহ রচনা ক'রে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হচ্ছি। আপনি এখন নিজ শিবিরে অবস্থান করুন। (যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! তুমি আমার বাক্যে নিতান্ত প্রীত হ'চ্ছ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। এক্ষণে আমি তোমার হিতাভিলাষে পুনরায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বাক্য বল্‌ছি তা শ্রবণ কর; মহর্ষি সুরগণও আমার প্রভাব অবগত নহেন। যিনি আমাকে অনাদি জন্মবিহীন ও সকল জীবের ঈশ্বর ব'লে জানেন, তিনি মোহ-বর্জ্জিত ও বিগতপাপ হ'য়ে থাকেন। প্রাণিবর্গে যে সমস্ত ভাব লক্ষিত হয়, সমস্তই আমা হ'তেই উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। সৃষ্টির অগ্রে ভৃগু আদি সপ্ত মহর্ষি প্রভৃতি ও মনুগণ আমারই প্রভাবসম্পন্ন এবং আমারই মানসপুত্র। যিনি আমার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য সম্যক্ বিদিত আছেন, তিনি নিসংশয়ে সম্যক্ দর্শন-যুক্ত হ'য়ে থাকেন। আমি জগতের উৎপত্তি-কারণ; আমা হইতেই সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হ'য়ে থাকে এবং তারাই প্রেমসহকারে আমার আরাধনা করেন ও চিত্ত-প্রাণ অর্পণ কোরে আমাকে বিদিত হন ও সর্ব্বদা সদালাপ

ও কীর্ত্তন কোরে পরম সন্তোষ ও সুখলাভে আমাতেই আসক্ত থাকেন। তাদের প্রতি সানুগ্রহ ও কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি কোরে তাদের আত্মাতে আবির্ভূত হোয়ে প্রদীপ্ত জ্ঞানানল দ্বারা তাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি। সংশয়াত্মক সদা বিষয়-বুদ্ধিরত সংসারী ব্যক্তি আমাকে জানবার চেষ্টাও করে না।

অর্জ্জুন। ভগবন্! তুমি পরমব্রহ্ম, তুমি পরমপবিত্র ও পরমধাম। তুমিই আদি দেব, তুমিই শাশ্বত, অজ ও বিভু। ভৃগু আদি মুনি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ ও ব্যাসদেব প্রভৃতি তোমাকে এইরূপই বর্ণনা করেছেন এবং তুমি স্বয়ং নিজ মুখে ঐ রূপ আমাকে বল্‌ছ। কেশব! আমাকে তুমি যা যা বল্লে আমি তা সত্য ব'লে স্বীকার কর্চ্ছি। দেব-দানবগণ কেহই তোমার প্রভাব জানেন না। ভগবন্! তুমি যে বিভূতি দ্বারা চরাচরে ব্যাপ্ত আছ, সে সকল দিব্য আত্ম-বিভূতি সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন কর। যোগিন্! আমি তোমাকে সর্ব্বদা কোন্ পদার্থে কিরূপ বিভূতি দ্বারা কি ভাবে চিন্তা কর্লে তোমাকে জান্‌তে পার্‌ব, বল। হে জনার্দ্দন! তুমি পুনরায় ত্বদীয় আত্মযোগ ও বিভূতি সবিস্তারে আমার নিকট বর্ণনা কর। যেহেতু তোমার বচনামৃত-শ্রবণে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।

অর্জ্জুনের গীত।

এস প্রাণ মন দুই জনে,
অতি গোপনে অতি সাবধানে,
ডাকি প্রাণ-মন ভরে রাধিকাহৃদি-রঞ্জনে;
ওরে উভয়েতে যুক্তি করে,
বাঁকা শ্যাম গিরিধরে ডাকবো আদরে—
করব বিধিমতে পদ-পূজা ভক্তিকুসুম-দানে,
দুইজনে ঐক্য হ'লে, কার্য্য-সাধন অবহেলে হইবে বলে
পঞ্চভূতে কি করিবে, রাখ্‌ব তাদের শাসনে।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! আমার বিভূতি সমস্ত অসাধারণ এবং অসীম। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গুলি আমি তোমাকে বল্‌ছি, যেহেতু আমি অনন্ত। গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ। আদিত্যগণ মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণ মধ্যে আমি সূর্য্য, মরুদ্‌গণ মধ্যে মরীচি, দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে মন এবং ভূতগণ মধ্যে আমিই চেতনা। রুদ্রগণ মধ্যে আমি শঙ্কর, রক্ষোযক্ষগণ মধ্যে আমি কুবের, বসুগণ মধ্যে অগ্নি, পর্ব্বত-গণ মধ্যে আমিই সুমেরু। হে পার্থ! পুরোহিতগণ মধ্যে আমিই বৃহস্পতি,

জলাশয় মধ্যে আমি সাগর। মহর্ষিগণ মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্য মধ্যে একাক্ষর ওঁকার, যজ্ঞ মধ্যে জপ এবং স্থাবর মধ্যে আমিই হিমালয়। বৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণ মধ্যে নারদ। নরগণ মধ্যে আমিই নরাধিপ, গাভীগণ মধ্যে কামধেনু, সর্পগণ মধ্যে বাসুকি এবং কামনা-সমূহ মধ্যে আমিই কামশক্তি, নিয়মকারীদের মধ্যে আমি যম। দৈত্যগণ মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, পশুগণ মধ্যে সিংহ এবং পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়। বেগবান্‌দিগের মধ্যে আমি বায়ু, নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা। বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা, বিতণ্ডাত্রয় মধ্যে আমি বাদ। অক্ষরগণ মধ্যে আমি অকার, সমাস-সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব। কর্ম্মফলদাতৃগণের মধ্যে আমিই অন্তর্যামী ভগবান্। নারীগণ মধ্যে আমি বাক্, শ্রী, কীর্ত্তি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। বৃষ্ণিগণ মধ্যে আমিই বাসুদেব, পাণ্ডবগণ মধ্যে আমি অর্জ্জুন এবং মুনিগণ মধ্যে আমিই ব্যাস। হে পরন্তপ, আমার বিভূতির সীমা নাই। আমি যা কিছু তোমাকে ব'ল্লাম, তাহা সেই অনন্ত বিভূতির কিয়দংশ মাত্র। যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত এবং বলশালী, সেই সেই প্রাণীই আমার অংশ হ'তে উদ্ভূত জান্‌বে। অর্জ্জুন! আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জগৎ জানবার তোমার প্রয়োজন নাই। আমার একাংশে এই সমস্ত ধারণ কো'রে আমি অবস্থান কচ্ছি।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! যুদ্ধস্থলে কুরুপাণ্ডবের সংবাদ কি আর কিছু রাখ? যদি নূতন কিছু থাকে, বল।

সঞ্জয়। মহারাজ! ঐ মহামুনি ব্যাসদেব আগমন কর্চ্ছেন। উঁহার নিকট সমস্ত অবগত হ'তে পা'রবেন।

(ব্যাসদেবের প্রবেশ)

ধৃতরাষ্ট্র। মুনিবর এসেছেন! কি ভাগ্য! আমি জন্মান্ধ হো'য়েও মহামুনির কৃপায় বঞ্চিত নই, তাই সৌভাগ্য মনে করি।

ব্যাসদেব। মহারাজ! মনঃ-প্রাণের কি একতা কর্ত্তে পেরেছেন? মহামতি সঞ্জয় ত আপনাকে যথাযথ সংবাদ দিতেছেন?

ধৃতরাষ্ট্র। তপোধন! মহামতি সঞ্জয়ের কিছুমাত্র ত্রুটী নাই। বড় আশা কর্চ্ছি আপনার কাছে কিছু কিছু বৃত্তান্ত শুন্‌তে পাব।

ব্যাসদেব। মহারাজ! কি বৃত্তান্ত আর বল্‌ব? কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম এই ঘোর সংগ্রামে নিশ্চয়ই কলেবর পরিত্যাগ ক'রবেন। তোমার পুত্র ও অন্যান্য পার্থিবগণের মৃত্যুকাল আসন্ন হ'য়েছে। তাহারা এই সংগ্রামে পরস্পর সমবেত হো'য়ে বিনষ্ট হবে তাহার সন্দেহ নাই। পুত্রগণের বিনাশ-দর্শনে শোকাকুল হ'য়ো না। তুমি কালের গতি নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা কর। বরং জীবিত উন্মার্গগামী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা আমাদের কর্ত্তব্য।

ধৃতরাষ্ট্র। তপোধন! আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন কর্ত্তে অভিলাষ না কর্ল্লেও আপনার তেজঃপ্রভাবে এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করব।

ব্যাসদেব। মহারাজ! এই সঞ্জয় তোমার নিকট সমস্ত যুদ্ধ-বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন কর্ব্বেন; একমাত্র সঞ্জয়ই এই যুদ্ধ হ'তে বিমুক্ত হ'য়ে জীবিত থাক্‌বেন। আমি কৌরব ও পাণ্ডবগণের কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র বিখ্যাত করব। তুমি শোকাকুল হ'য়ো না। এদের অদৃষ্টে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে। তুমি কিম্বা আমি ইহা নিবারণ কর্ত্তে কখনই সমর্থ হব না। নিশ্চয় জানিও যেস্থানে ধর্ম্ম সেইখানে জয়। মহারাজ! কাল বিশ্বসংহার কোরেই পুনরায় লোক-সমুদয় সৃষ্টি কোরে থাকেন; কোন বস্তুই নিত্য নহে। কলি তোমার পুত্র[illegible] জন্মগ্রহণ কোরেছে। অমঙ্গল যেন মূর্ত্তিমান হোঁয়ে তোমার রাজ্যরূপ পা[illegible] কোরেছে। অন্য দ্বারা এককালে তোমার ধর্ম্ম লোপ হয়েছে; এক্ষণে [illegible] পুত্রগণের ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে সমর্থ থেকেও কর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম। লোক[illegible] অবশ্যই হবে; কদাচ তাহার অন্যথা হবে না। অতএব বৃথা শোক কোরে পাপের ভাগ বর্দ্ধিত ক'রো না।

ধৃতরাষ্ট্র। মহর্ষে! আমি আপনার ন্যায় স্থিতি ও বিনাশ সম্যক্ বিদিত হয়েছি। সমুদয় লোকই স্বার্থ-সাধনে বিমোহিত। আমিও সেই লোক মধ্যে পরিগণিত। হে মহর্ষে, পুত্র সকল আমার বশীভূত নয়। অতএব আমার ইচ্ছা—আপনিই তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের মহামান্য।

ব্যাসদেব। মহারাজ! আর আমি এখানে কালক্ষেপ কর্ত্তে পারি না। সঞ্জয় আপনার অভিলাষ পূর্ণ ক'রবেন, এবং সমগ্র সংশয় নিরাকরণ ক'রবেন! রাজন্! বহুল বল-সংগ্রহ কর্ল্লেই যে নিশ্চয় জয়লাভ হয়, তাহা নহে; জয়ের স্থিরতা নাই, সমরে জয় পরাজয় উভয়ই হয়, অতএব এ বিষয়ে দৈবই বলবান। (প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র। (চিন্তাযুক্তভাবে) সঞ্জয়! সংগ্রামানুরক্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহীপালগণ রাজ্য-লাভার্থে জীবন উপেক্ষা কোরেও পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁরা লোক সংহার কোরে কেবল যমালয় পরিপূর্ণ করবেন, তথাচ কিছুতেই নিবৃত্ত হবেন না। তাঁরা পার্থিব ঐশ্বর্য্যলাভের অভিলাষী হ'য়ে কোন

ক্রমেই ক্ষান্ত হবেন না—তন্নিমিত্ত ভূমিই বহুগুণ-সম্পন্ন ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে। সঞ্জয়! যে ভারতবর্ষে এই সমুদায় সৈন্য একত্র হয়েছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুতনয়গণ যাহা গ্রহণে নিতান্ত লোলুপ হয়েছে এবং যার প্রতি আমার চিত্ত নিতান্ত অনুরক্ত আছে, তাহার বৃত্তান্ত যা কিছু জান, বল।

সঞ্জয়। মহারাজ! পাণ্ডবগণ ভারতবর্ষ-গ্রহণে নিতান্ত অভিলাষী নহেন। দুর্য্যোধন ও শকুনি উহা গ্রহণ কর্ত্তে একান্ত অভিলাষী হয়েছেন। অন্যান্য জনপদেশ্বর ক্ষত্রিয়গণ এই ভারতবর্ষ গ্রহণ ক'রবার মানসে কেউ কাকে ক্ষমা করবেন না। এই ভারতবর্ষ দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত মনু, দেবনন্দন পৃথু, মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযাতি প্রভৃতি নরপতি ও দিলীপ প্রভৃতি অন্যান্য বলবান ক্ষত্রিয়বর্গের নিতান্ত প্রিয়। তার কারণ আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র এই ভারতে যাহা আছে, তাহা ত্রিভুবনের আর কোনও স্থানে নাই। এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য, হিমালয় প্রভৃতি কুলপর্ব্বত ব্যতীত বহু পর্ব্বত আছে। ঐ সমুদয় পর্ব্বত জনসমাজে অবিজ্ঞাত। অনেক লোকেরা ঐ সকল পর্ব্বতে বাস করেন। মহারাজ, এই ভারতে গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, ইরাবতী, বেত্রবতী, কাবেরী, সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন আরও বহু সংখ্যক নদ ও নদী আছে। ঐ সমুদয় মহাফলপ্রদা নদী লোকের মাতৃস্বরূপা এবং আর্য্য, ম্লেচ্ছ ও অন্যান্য সঙ্করজাতি এই সকল নদীর জল পান কোরে থাকে। এতদ্ভিন্ন শত শত অপ্রকাশিত নদী আছে। মহারাজ! এই ভারতে বহুসংখ্যক জনপদ আছে তার আর কত নাম করব। আপনি ত সবই জ্ঞাত আছেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পাঞ্চাল, গান্ধার, দ্রাবিড়, নিষধ, কাশী, বিন্ধ্য, মালব ও অপরাপর বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর জনপদ নানাবিধ সুকৃতিসম্পন্ন বহুবিধ লোকের দ্বারা অধ্যুষিত। মহারাজ! হিমালয়ের দক্ষিণে এবং সাগরের উত্তরে এই ভারতবর্ষ বিরাজিত। এখানকার প্রজাগণ ভারতীয় নামে প্রসিদ্ধ। মনু প্রজাগণের ভরণ করিতেন বলিয়া ভরত নামে অভিহিত। এই ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মস্থল। অন্য স্থানের মনুষ্যদিগের কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা নাই। ধর্ম্মার্থকোবিদ রাজগণ এতাদৃশ ভূমির নিমিত্ত উৎসুক হয়েছেন। উদ্যমশীল ক্ষত্রিয়গণ ধন-সম্পত্তি-লোলুপ হ'য়ে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছেন। ভূমিই দেব ও মানবগণের কামনানুরূপ পরমগতি হয়েছে। যেমন কুক্কুরগণ পরস্পরের নিকট হ'তে আমিষ-গ্রহণের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, ক্ষত্রিয়গণ বসুন্ধরা ভোগাভিলাষে সেইরূপ হয়েছেন। কেহ কামনা কোরে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি লাভ কর্ত্তে পারে না। সুতরাং কুরুপাণ্ডবেরা সাম, ভেদ, দান বা দণ্ড দ্বারা ভূমি পরিগ্রহ কর্ত্তে যত্নবান হয়েছেন। ভূমির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখ্‌লে ভূমিই মাতা, পিতা, পুত্র প্রভৃতির অবলম্বন ও স্বর্গস্বরূপ হয়। মহারাজ! স্বীয় দুশ্চরিত্রতা-নিবন্ধন অশুভ ঘটে। মুর্খেরা তাহা লক্ষ্য না কোরে অন্যের প্রতি দোষারোপ করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার নিন্দনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল লোকের বধার্হ হয়।

(ক্রমশঃ)

আত্ম-কথা।

গীত।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসু।

পাগল পাগল বলে আমায় ;
পাগল ব'লে গালি খেয়ে কি ফল ফলিবে তায়।
এ সংসারে পাগল হ'য়ে সং সাজিয়ে কিবা হয়,
মিছে ভূতের বেগার খেটে মরি, আর পাপের বোঝা বই মাথায়।
সংসার-লালসা ভুলে, কেবা কিসে পাগল হয়
তার সার কথা কেবা জানে, আমি কি তাই জানি হায়!
নহি ঈশ্বর-অনুরাগী, অথবা সর্ব্বত্যাগী—
শ্মশান দেখে ভয়ে মরি, কিন্তু গৃহে থাকা দায়।
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, জীবন ত যায় প্রায়
আমার সকলি ত বৃথা হ'লো, দিব কি আর পরিচয়।
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, ডুব্‌ছি ত পাপের ভরায়,
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, কর্চ্ছি এখন হায় হায়।
জননী ভারত ভূমে মা, অবহেলে ঠেলেছি পায়,
আমার এ কূল ও কূল দুকূল গেল, শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায়।

নীলাম্বরের কথা।

বহুরূপ তারা।

লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, এম, বি, এ, এ।

মিরা ১৯ মার্চ্চের পর হইতে সূর্য্য-সান্নিধ্য লাভ করায় আমরা আর উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। হিসাব মত ২৬ ডিসেম্বর মিরার স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইবার কথা ছিল, কিন্তু আমরা ২২ ডিসেম্বরের পর আর উহার জ্যোতির্ব্বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখিতে পাই নাই, ঐ দিন উহার স্থূলত্ব ৩'৬৫।

সুতরাং মিরা এবারে ৪র্থ শ্রেণীর তারায় স্থূলত্ব লাভ করিয়াছিল, এবং আটদিন মাত্র ঐ পূর্ণ স্থূলত্ব উপভোগ করিয়া ৩১ ডিসেম্বর ৩.৮৩ স্থূলত্বে পরিণত হয়। কিন্তু ঠিক কোন্ দিন হইতে মিরার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কেননা ২৫ হইতে ৩০ ডিসেম্বর আমরা এখানে না থাকায়, পরন্তু ঐ সময়ে আকাশের অবস্থাও ভাল না থাকায়, পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। অতঃপর সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত মিরা ১৬ জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৩.৮৩ স্থূলত্বেই বিদ্যমান ছিল, ১৭ জানুয়ারী হইতে মিরা যথাক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম আকাশে ক্রমে সূর্য্যের নিকটে গমন করিতে থাকে। ২৬ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আমরা উহাকে খালিচক্ষে দেখিয়াছি, ঐ দিন উহার স্থূলত্ব ৫.১০ ছিল অতঃপর দ্বিচক্ষু দূরবীণে উহাকে ১৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি; তখন উহার স্থূলত্ব ৫.৯২ হইয়াছিল। নিম্নে মিরার পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ প্রদত্ত হইল; স্থানাভাববশতঃ প্রতিদিনের পর্য্যবেক্ষণ না দিয়া যে যে দিন উহার জ্যোতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে কেবল তাহাই প্রদত্ত হইল :—

সন ও তারিখ।			স্থূলত্ব।	মন্তব্য।
১৯২৪।	সেপ্টেম্বর	২৭	৯.২৯	ক্ষীণতম জ্যোতিঃ। দূরবীণে দৃষ্ট।
	অক্টোবর	৩	৯.১২	"
	"	৭	৯.০০	"
	"	১৯	৮.৯১	"
	"	২০	৮.৮৮	"
	"	২১	৮.৮২	"
	"	২২	৮.৭৮	"
	"	৩১	৮.৭০	"
	নভেম্বর	২	৮.৫৮	"
	"	৪	৮.৪৯	"
	"	১০	৭.৮১	"
	"	১২	৭.৬০	"
	"	১৩	৭.৩০	"
	"	১৫	৭.২০	"
	"	২০	৭.০০	দ্বিচক্ষু দূরবীণে দৃষ্ট।
	"	২১	৬.৮৮	"
	"	২২	৬.৭৮	"
	"	২৩	৬.৫৭	"

সন ও তারিখ।			স্থূলত্ব।	মন্তব্য।
১৯২৪।	নভেম্বর	২৪	৬'২৬	খালিচক্ষে দৃষ্ট।
	"	২৯	৫'১০	"
	"	৩০	৫'০১	জ্যোতিঃ সামান্য হ্রাস পায়।
	ডিসেম্বর	১	৪'৯৩	
				—৫ দিন ৪'৯৩ স্থূলত্বে বিদ্যমান ছিল।
	"	৭	৪'৬২	৬ ডিসেম্বর পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই।
	"	৮	৪'৪০	
	"	১০	৪'৫০	জ্যোতিঃ সামান্য হ্রাস পায়।
	"	১১	৪'৪০	
	"	১২	৪'২৭	
	"	১৩	৪'৩৩	জ্যোতি সামান্য হ্রাস পায়।
	"	১৪	৪'২২	
	"	১৬	৪'১৭	
	"	১৭	৪'১৩	
	"	১৮	৪'০৩	
				—৪ দিন ৪'০৩ স্থূলত্বে বিদ্যমান ছিল।
	"	২২	৩'৬৫	
				—উপরে বর্ণনা দ্রষ্টব্য।
	"	৩১	৩'৮৩	
১৯২৫।	জানুয়ারী	২	৩'৯৩	
	"	৩	৩'৯০	
	"	৪	৩'৮৩	
	"	৫	৩'৯৩	
	"	৯	৪'০৩	
	"	১০	৩'৯৩	
	"	১৩	৩'৭৪	
	"	১৬	৩'৮৩	
	"	১৭	৩'৯৩	
	"	১৯	৪'০৩	
	"	২৩	৩'৯৩	
	"	২৬	৪'০৩	
	"	৩০	৪'১৩	
	"	৩১	৪'০৩	

১৯২৫।	ফেব্রুয়ারী	২	৪'০৫	খালিচক্ষে দৃষ্ট।
	,,	৪	৪'১৩	,,
	,,	৮	৪'২৭	,,
	,,	১১	৪'৩০	,,
	,,	১৩	৪'৪১	,,
	,,	১৬	৪'৫০	,,
	,,	১৯	৪'৮৩	,,
	,,	২১	৪'৯৩	,,
	,,	২২	৫'০১	,,
	,,	২৬	৫'১০	জ্যোতি সামান্য বৃদ্ধি।
	,,	২৭	৫'০১	দ্বিচক্ষু দূরবীণে দৃষ্ট।
	মার্চ্চ	২	৫'১৯	,,
	,,	৫	৫'২৯	,,
	,,	৮	৫'৩৮	,,
	,,	১৩	৫'৬০	,,
	,,	১৬	৫'৭৭	,,
	,,	১৭	৫,৮৪	,,
	,,	১৯	৫'৯২	,,

১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাসের হিন্দু-পত্রিকায় বকরাশির 'চাই' তারাটীর বিবরণ এবং ১৯২৪। ১৭ অক্টোবর পর্য্যন্ত উহার পর্য্যবেক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৫ ডিসেম্বর উহার পূর্ণ স্থূলত্ব লাভ করার কথা ছিল কিন্তু ১১ ডিসেম্বর আমরা উহাকে ৬'২০ স্থূলত্বে উপনীত হইতে দেখিয়াছি ; ইহার অধিক উহার জ্যোতিঃ আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং চাই এবারে উহার পূর্ণ স্থূলত্ব লাভ করে নাই। গত বৎসর উহার জ্যোতিঃ ৪'৮০ স্থূলত্বে উপনীত হইয়াছিল। ১৭ অক্টোবরের পর হইতে চাই তারার পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সন ও তারিখ।			স্থূলত্ব।	মন্তব্য।
১৯২৪।	অক্টোবর	২০	৯'৫	দূরবীণে দৃষ্ট।
	,,	২২	৯'৬	জ্যোতিঃ সামান্য হ্রাস।
	,,	২৪	৯'৪	

সন ও তারিখ।			স্থূলত্ব।	মন্তব্য।
১৯২৪।	অক্টোবর	২৫	৯'৫	জ্যোতিঃ সামান্য হ্রাস
		২৬	৯'৩	
		৩১	৯'২	
	নভেম্বর	১	৯'১	
		২	৮'৯	
		৩	৮'৮	
		৫	৮'৭	
		৯	৭'৮	অত্যন্ত দ্রুত জ্যোতির্ব্বৃদ্ধি
	”	১০	৭'৬	
	”	১১	৭'৫	
	”	১২	৭'৩	
		১৪	৭'১	
	নভেম্বর	২০	৬'৭	
		২৩	৬'৬	দ্বিচক্ষু দূরবীণে দৃষ্ট
		৩০	৬'৫	
	ডিসেম্বর	৩	৬'৪	
		৯	৬'৩	
		১১	৬'২	স্থূলতম জ্যোতিঃ।
		১২	৬'২	
		১৩	৬'৩	--৭ দিন ৬'৩ স্থূলত্বে বিদ্যমান ছিল।
		২০	৬'৪	
		২৩	৬'৫	হ্রাস বৃদ্ধির সহিত দীর্ঘকাল তারাটী
১৯২৫	জানুয়ারী	২৭	৬'৫	৬'৫ স্থূলত্বে বিদ্যমান ছিল।*
	”	৩১	৬'৬	দূরবীণে দৃষ্ট।
	ফেব্রুয়ারী	১	৬'৭	
		২২	৭'৪	

* চাই তারাকে আমরা ১৭ জানুয়ারী পর্য্যন্ত পশ্চিম গগনে সন্ধ্যার পরে দেখিতে পাই; তৎপরে চাই সূর্য্য-সান্নিধ্য লাভ করায় ১০ দিন অদৃশ্য ছিল। ২৭ জানুয়ারী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শেষরাত্রে পূর্ব্বগগনে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯২৫।	ফেব্রুয়ারী	২৪	৭'৫	
	„	২৫	৭'৭	
	„	২৮	৭'৮	
	মার্চ্চ	৩	৭'৭	জ্যোতিঃ সামান্যপরিমাণে বৃদ্ধি।
	„	৪	৭'৮	
	„	৫	৭'৯	
	„	৬	৮'০	
	„	৭	৭'৯	জ্যোতিঃ সামান্যপরিমাণে বৃদ্ধি।
	„	৮	৮'০	
	„	৯	৮'১	
	„	১৯	৮'৭	
	„	২১	৮'৬	জ্যোতিঃ সামান্যপরিমাণে বৃদ্ধি।
	„	২৯	৮'৮	
	„	৩১	৮'৯	
	এপ্রিল	৪	৯'৪	
	„	৫	৯'৫	
	„	১২	৯'৬	
	„	১৫	৯'৯	
	„	১৭	১০'৩	
	„	১৮	১০'৪	
	„	২০	১০'৫	

হ্রদ সর্প রাশির R তারাটীর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে খালিচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজকাল সন্ধ্যার পরে পূর্ব্বাকাশের দক্ষিণ ভাগে উহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। উহার পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ ঃ—

১৯২৪।	নভেম্বর	২৯	৯'১৪	দূরবীণে দৃষ্ট।
	ডিসেম্বর	২৩	৮'৯৫	„
১৯২৫।	জানুয়ারী	৩	৮'৭৭	„
	„	২৭	৮'১৩	„
	ফেব্রুয়ারী	১৬	৭'৯২	„
	„	২২	৭'৪৩	„
	„	২৬	৭'৪৩	„
	মার্চ্চ	৬	৭'৬৪	দ্বিচক্ষু দূরবীণে দৃষ্ট।
	„	১৬	৭'৫৪	„
	„	১৯	৭'৫৪	„

সন ও তারিখ।		স্থূলত্ব।	মন্তব্য।
১৩২৫। মার্চ্চ	২১	৭'৩৩	”
”	২২	৭'৩৩	”
”	২৫	৭'১৩	”
”	২৬	৭'০০	”
”	২৮	৬'৯৩	”
”	২৯	৬'৯৩	”
”	৩০	৬'৫৩	”
এপ্রিল	৩	৬'২৩	”
”	১১	৫'৮৫	”
”	১৪	৫'৬৬	খালিচক্ষে দৃষ্ট।
”	১৯	৫'৪৬	”
”	২৪	৫'২৮.	”

হ্রদ সর্প রাশির V. তারাটী এখনও ক্ষীণ জ্যোতিতে বিদ্যমান আছে। উহার সন্নিকটে যে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্ষুদ্র তারাটীর কথা পৌষ মাসের হিন্দু-পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে নানাস্থানে অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি ঐ তারাটী পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে; কিন্তু V তারার জ্যোতিতে আচ্ছন্ন থাকায় উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। হারভার্ড মানমন্দিরের অধ্যক্ষ উহার যে ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন তাহাতে ঐ তারাটীর চিত্র স্পষ্ট মুদ্রিত আছে। দক্ষিণ ভারতের নিজামরাজের একটী উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি ও গ্রন্থাদি সমন্বিত মানমন্দির আছে। ঐ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ অধ্যাপক M. Bhaskaran মহাশয়কে তাঁহাদের বৃহৎ ২৫ইং দূরবীণে ঐ তারাটীকে দেখিতে ও উহার ফটোগ্রাফ লইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে আমরা পূর্ব্বেই উহার ফটোগ্রাফ লইয়াছি ও ঐ ক্ষুদ্র তারাটীকে দেখিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

V. Hydrae is Lalande 20918 and is the same as no. 5581 in Burnham's General catalogue of Double stars. Burnham gives for distance and position angle 46″ and 186°, and states that the principal star (V. Hydrae) is very red, As the relative position has not changed since the time of its first measurement (viz, 1903), it is highly improbable that the star is a binary. I should think that you failed to notice it before on account of the brightness of the principal star and the companion showed itself when the primary (V Hydrae) became faint, As V. Hydrae was not expected to go down below the 10th magnitude, the companion star was not shown in Hagen's map and in the Harvard chart.

নিরুপায়।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান তত্ত্বনিধি।

কামনার তীর্থঘাটে সাধনার তরী—
যাবে বলে দিলে পাড়ি আনন্দে শিহরি
যাত্রী বড় করিয়াছে মনে
লভি কাম্য ধনে
আপনার কল্পলোকে সুবর্ণ-মন্দিরে
চিরতৃষা মিটাইবে তরী যদি ভিড়ে।
আজি হেরে অর্দ্ধ পথে ব্যর্থ বুঝি পুলক-কল্পনা
একি বিড়ম্বনা!
স্থানে স্থানে এথা হোথা উঠিয়াছে বালুকার স্তর,
স্থানে স্থানে বাধিতেছে নিরমম মৃত্তিকা-কঙ্কর!
প্রতিকূল স্রোতোবারি প্রতিকূল প্রমত্ত পবন!
স্থানে স্থানে তীব্রবেগে বাধিছে কখন!
জীর্ণ তরী ভগ্ন হাল ছিন্ন পাল বড় নিঃসহায়
ঘূর্ণিপাকে ঘুরে ঘুরে বারম্বার হয় ক্ষতকায়!
চারিদিকে ভয়ঙ্কর অন্ধকার উঠিতেছে মাতি,
নাহি কোন সাথী!
এ দুস্তর দূর পথে হয়ে নিরুপায়
ভাবিতেছে হায়—
কোন প্রেম-উৎস হতে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
এ সঙ্কটে তরী যাবে লয়ে
কোন শুভক্ষণে এসে অদম্য জোয়ার
এ বিপদে করিবে উদ্ধার।
সে চির কল্যাণময় কাম্য তীর্থ-তীরে
কবে যাত্রী বাঞ্ছিতের পদপ্রান্তে নোয়াইবে শিরে

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩৩২ সাল। ১৮৪৭ শকাব্দাঃ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

লেখক—সম্পাদক।

বিগত ২রা আষাঢ় মঙ্গলবারে দারজিলিং নগরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। বিগত দুই বৎসর হইতে তাঁহার দেহ বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হইয়া জীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছিল। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিরাম ছিল না। শরীর আর টিকিল না। তাঁহার বয়ঃক্রম সবে ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের জন্য আজ সমস্ত দেশ শোক-সন্তপ্ত। কলিকাতা মহানগরীতে যেরূপ লোকারণ্য তাঁহার মৃতদেহের সৎকারার্থ—শ্মশানে সমাগত হইয়াছিল, এরূপ ইতঃপূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। চিত্তরঞ্জনের মহাত্যাগ তাঁহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিল। রাজনৈতিকক্ষেত্রে সর্ব্ববিষয়ে চিত্তরঞ্জনের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য ছিল না, কিন্তু সেই হেতু আমাদের পরস্পরের সৌহার্দ্দের বিচ্যুতি ঘটে নাই, কখনও মনোমালিন্য হয় নাই। তিনি ভাবুক, সুকবি, ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন।

যাহারা তাঁহার ভিতরের কথা না জানিত, তাহারা যেমন তাঁহার অনেক অপূর্ণতার সংবাদ রাখিত না, তেমনি তাহার মহত্বের খবর রাখিত না। তাঁহার হৃদয় সাগরের ন্যায় প্রশস্ত প্রশান্ত ও গভীর, কিন্তু কোন কারণে উদ্বেলিত হইলে, তাহার উচ্ছ্বাস পর্ব্বত-চূড়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিত। মুনিদিগেরও মতিভ্রম আছে। চিত্তরঞ্জন কার্য্যক্ষেত্রে অনেক ভ্রম করিয়াছিলেন, এবং তাহা তিনি নিজেও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশের ও ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালে তাঁহার দেহের অবসান হওয়ায়, তাঁহার সুমার্জ্জিত সংস্কারের ফল তাহাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

বহু মতভেদ সত্বেও চিত্তরঞ্জনের জন্য যে এত শোকোচ্ছ্বাস, তাহার কারণ তাঁহার মহাত্যাগ। দেশের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এইজন্য দেশবাসী তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত। মৃত্যু যে জীর্ণদেহ-ত্যাগ মাত্র, একথা অতি সত্য! কিন্তু এই সত্যের জ্ঞানাভাবে মানব আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে শোকসাগরে নিমগ্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা গীতাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই দুর্ব্বলতা হইতে একেবারে মুক্ত নহেন।

মৃত্যু যে হইয়াছে, সে কি চিত্তরঞ্জনের, না তাহার দেহের? চিত্তরঞ্জন জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণেচ্ছু হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনুরক্তজন, কাহারও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। তাঁহার বর্ত্তমান দেহ দ্বারা স্বারাজ্যপ্রাপ্তির কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারিতেন না, এই জন্যই নূতন দেহের প্রয়োজন। এ সব গূঢ় রহস্য বুঝিলেও, মহামায়ার প্রভাবে আমরা সকলেই সাময়িক মোহবশতঃ মৃত্যুকে মহাশত্রু জ্ঞান করিয়া শোকে অভিভূত হই। হৃদয় যখন শোকাচ্ছন্ন থাকে, তখন তত্ত্বজ্ঞানের কথা তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাকবি কালিদাস মানব-হৃদয়ের এই ভাব অতি সুন্দররূপে সুললিত ভাষায় নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন,

"স তথেতি বিনেতুরুদার মতেঃ
প্রতিগৃহ্য বচঃ বিসসর্জ মুনিং।
তদলব্ধ-পদ-হৃদি শোক-ঘনে
প্রতিযাতমন্তিকমস্য গুরোঃ॥

ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর অজের সান্ত্বনার জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ জনৈক মুনি-শিষ্য প্রেরণ করিয়া অজকে প্রবোধ দিলেন, কিন্তু অজের মন প্রবোধ মানিল না। তাঁহার হৃদয় শোকে পরিপূর্ণ ছিল, অন্য কোন পদার্থের জন্য সেখানে স্থানের

অভাব ছিল। সুতরাং গুরুর উপদেশ শোকপূর্ণ হৃদয়ে স্থান না পাইয়া পুনর্ব্বার মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট প্রতিগমন করিল।

কাহার সাধ্য যে আজ চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণকে প্রবোধ দিয়া সুস্থ করে। শোকাপগম কালসাপেক্ষ। যাহা হউক, অদ্য আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই, যে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে যে কেবল তাহাদের সন্তাপ হইয়াছে তাহা নহে, সমস্ত দেশবাসীরই হইয়াছে। কারণ তাহাদের প্রিয়জন স্বদেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া অকালে দেহপতন করিয়াছেন। পত্নী, পুত্র, কন্যার কথা তিনি ভাবেন নাই; হৃদয় হইতে তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়া সেইস্থানে মাতৃভূমিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ছেদন করিয়া তিনি অসীমের দিকে ছুটিয়াছিলেন। আজ তাঁহার ত্যাগের জন্য তাঁহার পরিবারবর্গ গৌরবান্বিত। যে দেশে এরূপ স্বার্থত্যাগ বিদ্যমান, সে দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভয়ের কোন কারণ নাই।

যিনি মৃত্যুর মৃত্যু,

মৃত্যু যাঁহার ভয়ে বিকম্পিত,

মৃত্যু যাঁহার আদেশে জীর্ণ দেহ ধ্বংস করিয়া আত্মাকে শান্তি প্রদান করে,

মৃত্যু যাঁহার বিধানে বিশ্বহিত-সাধনে আত্মাকে নব নব কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া যায়,

সেই অদ্বিতীয় অমৃতময় পুরুষ মহাত্মা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিয়া তাঁহার শিব সংকল্পের সিদ্ধি সম্পন্ন করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভূমানন্দের বারতা।

লেখক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পেয়েছেন বাহ্য জগতের অন্তর্নিহিত সত্য-শিব-সুন্দরের, যাহার অনুভূতিতে বিরহ-বেদনা-বিরোধ-ক্লিষ্ট অপূর্ণ জগতে পূর্ণতার আভাষ পাওয়া যায়—আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়।

* দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর
ভাষাশূন্য অর্থহারা।

ভূমার সন্ধান পেয়েছেন বলে তিনি বিশ্বচরাচরে ছোট বড় সকলের মধ্যে দেবতার সামগান শুনতে পান। অন্তরের টানে ভূমা তাঁকে টানে।

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে—

অন্তর্দৃষ্টির বলে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। বিশ্বচরাচর পরিবৃত করিয়া আছে একই সত্তা—সুখ-দুঃখের মধ্যে, উত্থান-পতনের মধ্যে, পাপ-পুণ্যের মধ্যে, ক্ষুদ্র-বৃহতের মধ্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অনুস্যূত রহিয়াছে একই বিরাট মহান্ সত্য। তাই তিনি সন্ধান পেয়েছেন এই জগতের মধ্যে একটা শান্তিময় সামঞ্জস্যের, যার প্রভাবে সকল বিরোধ, সকল অভাব, সকল মলিনতা, সকল অপূর্ণতার পিছনে তিনি দেখতে পান পূর্ণের পরশ।

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

যদি চিনি যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা;
ছোট বড় হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা;
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা;
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।
বিশাল বিশ্বে চারিদিক হ'তে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।

* * * *

যেথা আছি আমি আছি তাঁর দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে!
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী!

তাঁর কাছে—

যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকণার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মাঝে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে।
বড় ছোট কিছু নাই সকলই মহৎ।

(প্রকৃতির পরিশোধ)

পরমাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বেদান্তের এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঝঙ্কৃত হয়েছে। তিনি কাকেও অবহেলা করেন নাই। নীচ পতিত পদদলিতের মধ্যে তিনি সত্যের আলোক দেখান। তাঁর দেবতা—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করবে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারমাস,
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে।

(গীতাঞ্জলী)

নিন্দা দুঃখ অপমানে
যত আঘাত খাই
তবু জানি কিছুই সেথা
হারাবার ত নাই।

থাকি যখন ধূলার পরে
ভাবতে না হয় আসন তরে,
দৈন্য মাঝে অসঙ্কোচে
প্রসাদ তব চাই।

দর্শনশাস্ত্রে ভূমার ধারণা একধারে বিশ্ব-অতীত, আর এক একধারে বিশ্বময়। প্রথম হিসাবে ভূমা—নির্গুণ ব্রহ্ম যাহা অজ্ঞেয়, যাহা নামরূপময় জগতের অতীত—যাহা নিশ্চল—নিরবদ্য নিষ্ক্রিয়—অপ্রাপ্য—অবাঙ্‌মানসগোচর, যাহা শুধু 'নেতি নেতি' মুখে নির্দ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় হিসাবে ভূমা সগুণ ব্রহ্ম—তিনি এক হইয়াও বহুত্বপূর্ণ জগতের আধার। তিনিই আপনাকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া বহুর মধ্যে অনুস্যূত হইয়া বহুকে ধারণ করিয়া আছেন। অনন্ত হইয়াও অনন্ত সান্তরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন—অসীম হইয়াও সীমার রূপে ধরা দেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিশ্বাতীত নির্গুণ ব্রহ্মরূপে ভূমাকে কল্পনা করেছেন সেখানে তিনি ভূমার নিবিড় রহস্যটুকু আবৃত করে রেখেছেন একটা অনির্ব্বচনীয় প্রহেলিকার মধ্যে—সেখানে তাঁহার মধ্যে আমরা দেখতে পাই খানিক আবছায়া ভাব, খানিক সন্দিগ্ধ অস্পষ্টতা যার জন্য তাঁকে অনেকে mystic কবি বলে। তাঁর আনন্দ কিন্তু ভূমার সেই বিশ্বরূপ কল্পনাতে যে রূপেতে ভূমা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে আছে—সেখানে তাঁর ভাব সহজ সুন্দর—সেখানে তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল মধুর।

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে, কত গন্ধে,
কত গানে, কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
তোমায় আমায় মিলন হ'লে সকলি যায় খুলে
বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।

সীমার মধ্যে অসীমতার সঙ্গতি তিনি সাধন করতে পেরেছেন বলে শত অপূর্ণতার মধ্যেও এই মর্ত্ত্য জগতে তিনি আনন্দের সঙ্গীত শুনেছেন—অসুন্দর জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যের আভাষ পেয়েছেন। তাঁর চক্ষে দ্বন্দ্ব, বিরোধ, অশান্তি, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, মৃত্যু সকল অসম্পূর্ণতাই একটা পূর্ণতর অবস্থার দ্যোতক, সূচনা।

তাই তাঁর অগাধ বিশ্বাস ভবিষ্যৎ মঙ্গল বিধানের উপর—তাই তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারেন

জীবনে যত পূজা
হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি সারা।
যে ফুল না ফুটিতে
পড়েছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে, হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণার তারে বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

(অসমাপ্ত)

যাহা ভূমা তাহা শাশ্বত। তাই রবীন্দ্রনাথ মরণকে ভয় করেন না।

শেষের মধ্যে অশেষ আছে
এই কথাটি, মনে
আজকে আমার গানের শেষে
জাগচে ক্ষণে ক্ষণে।

আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তাই আমরা মরণকে ডরাই। আমরা ভাবি এই বুঝি শেষ। কিন্তু আমাদের প্রাণ চায় আরও, আরও। কত আশা অতৃপ্ত থাকে, কত কাজ অসমাপ্ত থাকে, কত আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে, কত আদর্শ অপ্রাপ্ত থাকে; মৃত্যু যদি সকলের শেষ হয় তবে মৃত্যু ভয়ঙ্কর। কিন্তু তা তো নয়—যাহা সত্য তাহা অমৃত। যাহা ভূমা তাহা সত্য। আমাদের অধিষ্ঠান ভূমার মধ্যে। আমার সৎ ভূমার সতের সঙ্গে একাত্মগত। ভূমার সত্তাতেই আমার সত্তা সম্ভাবিত। তাই মরণ আমার নাই। মরণ অবস্থান্তর মাত্র। সম্পূর্ণতা লাভের সহায় মরণ। এ সীমাবদ্ধ জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্ত থেকে যায়, মরণের পরে যে অনন্ত জীবন আসে সকলের সম্পূরণ সেখানে

হয়। রবীন্দ্রনাথ মরণের মধ্যে এই অনন্ত জীবনের আলোক আমাদের দেখাচ্ছেন। এ জীবনের সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধ, সকল গ্লানি, সকল অসম্পূর্ণতা মরণের পূত ধারায় ধৌত হয়ে যায়—তারপর অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ।

এই অনন্ত জীবনের আনন্দ-সংবাদ আমরা বিশেষভাবে পাই রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুর পরে' কবিতার ভিতর, যার প্রতি পংক্তিতে তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস ফুটে উঠেছে—

আজিকে হয়েছে শান্তি
জীবনের ভুল ভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক ধুক
তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।
যাহা কিছু ভাল মন্দ
যত কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।
বল শান্তি বল শান্তি,
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই।
হেথায় সে অসম্পূর্ণ
সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার
সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত;
জীবনে যা প্রতিদিন
ছিল মিথ্যা অর্থ-হীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি
তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থ-পূর্ণ করি;

হেথা যারে মনে হয়
শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল,
সেথায় কি চুপে চুপে
অপূর্ব্ব নূতন রূপে
হয় সে সফল,
চিরকাল এই সব
রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে
সে হয় ত আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।
যা হ'বার তা হ'ক
ঘুচে যাক্ সর্ব্বশোক
সর্ব্ব মরীচিকা।
নিবে যাক চিরদিন
পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্ত্য জন্ম-শিখা।
সব তর্ক হ'ক শেষ
সব রাগ সব দ্বেষ
সকল বালাই।
বল শান্তি বল শান্তি
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হ'ক ছাই।

তাই তিনি অভয় দিতে পারেন। জীবনের আর মৃত্যুর পরের অবস্থার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, ইহা আমাদের প্রাণের কথা হ'তে পারে না। আমাদের অন্তরের ভিতরে অমৃতত্বের একটা আবছায়া অনুভূতি আছে যার দরুণ মৃত্যুর পরেও মৃতের যে কোন রকমের অস্তিত্ব আমরা ধারণা না করে থাকতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই ধারণার আকার দিয়েছেন—

ভাল বাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভাল
তবুও মরিতে হ'বে এও সত্য জানি।
*   *   *
শেষ করে যেতে হ'বে শেষ দৃষ্টি মোর শেষ কথা
এমন একান্ত করে যাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোন খানে আছে কোন মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হ'য়ে যেত কালো।

আমরা অমৃতের সন্তান এই বাণী রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন—

নাই তোর নাই রে ভাবনা
এ জগতে কিছুই মরে না।

তাই তিনি বলেন 'মা শুচ'

মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কাঁদি
জীবন তো মৃত্যুর সমাধি—

বলিয়াছি তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভূমার সেই রূপের একটা সহজ পরিচয় আছে যেরূপে ভূমা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাই তিনি সারা প্রকৃতির মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ আবেগ, একটা সজাগ অনুভূতি দেখতে পান। সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে তাহাদের অভ্যুত্থান, অবস্থান্তর বিলয়ের মূলে তিনি

সন্ধান পান সেই ভূমার চেতনাময় স্পন্দনের। জগৎ তাঁর কাছে জড় নয়—প্রাণময়, চেতনাময়, অনুভূতিময়, ভূমানন্দের টানে সে যেন

"মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়।"

সমস্ত প্রকৃতি যেন ভূমার প্রকাশের ব্যথায় আন্দোলিত, উচ্ছ্বসিত। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি অনেক কবিতারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রাণময় জগতের সন্ধান দিয়াছেন।

শুধু তাই নয়; প্রাকৃতিক জগতের নির্ব্বাক চঞ্চলতার মধ্যে কখন প্রশান্ত, কখনও রুদ্র, কখনও সৌম্য, কখনও তাণ্ডব, কখনও স্নিগ্ধ, কখনও ভৈরব, প্রকৃতির এই অনন্ত রূপ-লীলার নর্ত্তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভূমার অনন্ত ভাব-ব্যঞ্জনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখতে পান। তাঁর অন্তরের মধ্যে যে সজাগ অনুভূতি আছে, যে অনন্ত ভাব-উন্মাদনা আছে, প্রকৃতির অনন্ত লীলা-তরঙ্গের মূর্চ্ছনার ভিতরে তার প্রতিধ্বনি তিনি শুনতে পান। তাই প্রকৃতির সঙ্গে তার একটা অন্তরঙ্গ সহানুভূতি আছে—প্রকৃতির প্রতি তার একটা আন্তরিক টান আছে—

আমারে ফিরায়ে লহ ওহে বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
সিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্ত ভাগে,

* * * *

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকা সনে

আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ-যুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র-ফুল-ফল-গন্ধ-রেণু; তাই আজি
কোন দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে সিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর; তোমার অন্তরে
কি জীবন রসধারা অহর্নিশি ধরে।

(বসুন্ধরা)

সমুদ্রের প্রতি—

অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলমন্দ্রের মত; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তা-তপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি'
সর্ব্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা,
বল তারে 'শান্তি'! 'শান্তি'! বল তারে 'ঘুমা', 'ঘুমা', 'ঘুমা'।

যে ভূমার পরিচয় তিনি অন্তরের অতি নিভৃত কোণে পেয়েছেন, প্রকৃতির মধ্যে তিনি তাকে অনন্ত বিচিত্ররূপে দেখতে পান; তাই সেখানে তার অনন্ত রূপ, অনন্ত সৌন্দর্য্য—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোক ঝলসিছ নীল গগনে
আকুল পুলকে উছলিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।

কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত
তব অসংখ্য কাহিনী
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

চিত্রা

অন্তর মাঝে ভূমার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু জ্ঞাতার নিজের অস্তিত্বের মধ্যে। অভিজ্ঞতার অনন্ত ভাবের আধার যে স্থির অখণ্ড একত্বময় জ্ঞ-স্বরূপ সত্তা আছে রবীন্দ্র তাকেই বলছেন ।

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর-বাসিনী—

আর সেই জ্ঞ-স্বরূপ সত্তার মধ্যে অভিজ্ঞতার প্রবাহে যে অনন্ত রূপের লহরী তরঙ্গিত হ'তে থাকে রবীন্দ্রনাথ তাহা দ্যুলোকে ভূলোকে অযুত আলোকে ঝলসিত দেখেন। তাই তাঁর অন্তর ও বাহিরের সঙ্গে সব সময়ে একটা আনন্দের আদান-প্রদান চলতে থাকে। তিনি তাঁর কল্পলোকের ভাবরাজিকে বহিরাবরণে সজ্জিত করেন। তিনি আমাদের ভাবোন্মাদনার জ্বলন্ত—জাগ্রত মূর্ত্তি ফুটিয়েছেন—মানবের সৌন্দর্য্য-পিপাসা, সৌন্দর্য্য লাভের আকুল বাসনার শরীরী রূপ দিয়েছেন—অন্তরের অখণ্ড অথচ নানাত্ব-সংজ্ঞক ভাব-তরঙ্গের বহিরাকার দিয়াছেন—অন্তর্নিহিত ভাবকে বিশ্বের মধ্যে হিল্লোলিত দেখেছেন।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চরে হরষে,
বিকশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে

বিশ্বব্যাপী জন্ম-মৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায় ;
করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগান্তরের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে স্পন্দন।
(প্রাণ)

রবীন্দ্রনাথ আপনার মধ্যে বিশ্বকে স্পন্দিত দেখেন। তাঁহার অন্তরের অনুভূতির মধ্যে বিশ্বের সত্তাকে সঞ্চারিত দেখেন। বিশ্বের সত্য তাঁহার সত্যের সহিত একময় হইয়া যায়। বিশ্ব তাঁহার মধ্যে একান্তভাবে মিশিয়া যায় ; জগৎপ্রীতিতে তাঁর প্রাণ ভরিয়া যায়।

শুধু প্রকৃতি নয়, দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট অপূর্ণ জগতের মধ্যেও তিনি ভূমার পুলক-সিহরণের আভাষ পান, তাই তিনি জগৎ মাঝারে লুটিতে যান, জগতের সঙ্গে কোলাকুলি করতে যান। সমগ্র জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ তাঁহার অনুভূতিতে ভূমানন্দের সংবাদ আনিয়া দেয়। তাঁর কল্পনা ভূমার সন্ধানে মহাসাগরের আহ্বানে প্রকৃতির ব্যাপকতার মধ্যে, বিশ্ব-মানবতার মধ্যে, তটিনী হইয়া পুলক-স্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে—

আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

*　　*　　*

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান

*　　*　　*

ওরে অগাধ বাসনা অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই,

জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই
যত প্রাণ আছে ঢালিতে বারি
যত কাল আছে বহিতে পারি
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি
তবে আর কিবা চাই
পরাণের সাধ তাই
কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

(নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

ভূমার সহস্ররূপ জগতে ফুটে উঠেছে। তাঁর চোখে জগৎ ভূমার সত্তায় বাস্তব—মিথ্যা নয়, অলীক নয়, মায়াময় নয়। বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন চলেছে যার রেশ আমাদের সহস্র অনুভূতির সঙ্গে ছন্দে ছন্দে রণিত হয়। যুক্তি তর্কের কথা নয়, বিশ্বের বাস্তবতা আমাদের বেদনাময় অনুভূতির জিনিষ—আমাদের সমস্ত কর্ম্মের প্রেরণা আমরা পাই বিশ্ব হইতে। যে বিশ্ব আমাদের ভাবের ভিতরে, আমাদের বাসনার ভিতরে, আমাদের কর্ম্মের ভিতরে স্পন্দিত হয় সে বিশ্ব মিথ্যা নয়, অলীক নয়, শুধু মায়া নয়। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্ট তাঁর Critique of Practical Reason এও আমাদের প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা আছে, যে সহজ বোধ আছে, তারই উপর ভিত্তি স্থাপন করে বাহিরের জগতের বাস্তবতা প্রতিপন্ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

* * *

লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্ম্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ব বসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।
যুগ যুগান্তর ধরে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতেরে মাতৃ-ক্রোড় মানি;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই করনা বিশ্বাস।

লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।

তাঁহার সহজ বোধের মধ্যে জগৎ প্রতিফলিত হয় অতি অন্তরঙ্গভাবে, অতি প্রিয় পরিচিতের মত

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি

*　*　*

পুলকে পূরে প্রাণ, শিহরে কলেবর
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর।
এসেছে রবি শশী এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরাণ পূরে গেল, হরষে হ'ল ভোর,
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।

(প্রভাত-উৎসব)

কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে, শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধময় ধরণীর অনন্ত বৈচিত্র্যময় লীলাতরঙ্গের মাধুর্য্যভরা অশ্রান্ত কল্লোল-গীতিতে যে অফুরন্ত আনন্দের লহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে ব্যথাতুর জগতের সার্থকতা দেখিতে পান। বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া যে রূপ লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে কবি নিত্য বিরাজমান অক্ষয় অব্যয় আনন্দময়ের সন্ধান পাইয়াছেন। এই সৌন্দর্য্যের চরম অনুভূতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পেয়েছেন জগতের অন্তর্নিহিত সত্য-শিব-সুন্দরের, যাহার অমৃত পরশে বিরহ-বেদনা-ক্লিষ্ট অপূর্ণ জগতে পূর্ণতার আভাস পাওয়া যায়—আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়।

তাই তিনি　　বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুঃখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর এ ধরাতল—কে

সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভাল বাসেন। তিনি এই সুন্দর ভুবন ছাড়িয়া যেতে রাজি নন

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

(প্রাণ)

নিখিলের প্রতি তাঁর এই ভালবাসা তাঁর অনেক কবিতাতে ফুটিয়া উঠেছে। একই সত্য, একই ভগবান বিশ্ব-নিখিলকে ধারণ করে আছে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। আমার মধ্যে যে সত্য আছে বিশ্বের মধ্যেও সেই সত্য আছে। সমত্ব বিনা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে আদান প্রদান চলতে পারে না— Idealistic দর্শনের ইহাই ধারণা। রবীন্দ্রনাথ এই ধারণার প্রতিধ্বনি করেছেন—

'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর।'
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।

তাই বিশ্বমানবতার প্রতি তাঁর অগাধ সহানুভূতি, অফুরন্ত ভালবাসা। মানবের দুঃখে তাঁর সমস্ত চিত্ত বেদনায় ভরিয়া উঠে। মানবের দুঃখে তাঁর বিশ্বপ্রীতি জাগিয়া উঠে—

কবি তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজ দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।
এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়,
বিজন বিষাদ-ঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে।

* * * *

স্বার্থ-মগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হ'তে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হ'বে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা!

এবার ফিরাও মোরে।

বিশ্ব-প্রীতি তাঁকে মানব-সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হ'বে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হ'বে আশা—

তিনি বৈরাগ্য চাহেন না—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

(মুক্তি-সাধন)

তিনি সেবা দিয়া, প্রেম দিয়া বিশ্বসংসারকে আপনার করিয়া রাখিতে চান।

নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে
সকল প্রেমের স্মৃতি।

(অনন্ত প্রেম)

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-প্রেমিক। বিশ্ব-প্রেম বিনা সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই বাণীর কোন সার্থকতা থাকে না। উপনিষদের এই মহান্ সত্য চৈতন্যদেব দেখাইয়াছিলেন বিশ্বপ্রেমের শুভ্র আলোকে। তিনি জগতে প্রেমের বন্যা বহাইয়া অদ্বৈত সত্যের প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ দেখেছিলেন—পাপী, তাপী সকলকেই তিনি তাঁর প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গনে টেনে নিয়েছিলেন। বৈষ্ণবের বৈরাগ্য স্বার্থত্যাগে, বিশ্বপ্রেমে। বৈষ্ণব আপনাকে জগতের মধ্যে বিলিয়ে দেন, আপনার স্বার্থের মধ্যে আপনাকে বাঁধা রাখেন না।

যে সত্যই সর্ব্বজীবের মধ্যে ব্রহ্ম কল্পনা করতে পারে, সর্ব্বজীবের প্রতি স্বতঃই তার আন্তরিক ভালবাসা না থেকে পারে না। সর্ব্বজীবকে হিংসা করা, এমন কি তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকাও তার পক্ষে অসম্ভব। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পক্ষে তাই বিশ্বপ্রেম কৃষ্ণপ্রেমের নামান্তর মাত্র।

প্রেম অনুভূতির চরম প্রকাশ। দুইয়ের অত্যন্ত নিবিড় মিলনের আবেগময় ব্যাকুলতার নাম প্রেম। প্রেমের অনন্ত রূপ—অনন্ত উচ্ছ্বাস বৈষ্ণব কবিগণ দেখিয়েছেন। কিন্তু সকলেরই তলে আছে প্রেমাস্পদের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের আকাঙ্ক্ষা অথবা বেদনাভরা অগাধ আনন্দ। অন্তরঙ্গ পরিচয় হ'তে যে একাত্মবোধ জন্মায় তাহা হ'তেই প্রেমের বিকাশ হয়। প্রেমের ভিতর দিয়া প্রেমিক আর তার প্রেমাস্পদের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়—দ্বৈতময় একাত্ম-বোধ জন্মে। দুইয়ের এমন চেতনাময় যোগ আর কিছুতে হয় না—প্রেমের বন্ধনে যুগলের যে অপূর্ব্ব মিলন হয়, তাতে এক আর একের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলেও আপনার বিশিষ্টতার চেতনা হারায় না। তাই প্রেমের ভিতর দিয়ে দুইয়ের যে সংযোগ হয় তাহা একধারে যেমন অপূর্ব্ব, বিচিত্র—অন্যধারে তেমন সরল, সুন্দর।

দর্শনের কথা যোগ-সাধন বিনা সত্যকে, ভূমাকে জানা যায় না। জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞাতার যে যোগ হয় জ্ঞান তাহার ফল। বুদ্ধি, বিচার তর্কের পর্দ্দার আঁড়াল—সাধারণতঃ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান রেখে দেয়। আমরা তাই সত্যের স্বরূপ দেখতে পাই না। সাধনার দ্বারা, সংযমের দ্বারা বিচার তর্কের পর্দ্দা সরিয়ে দিয়ে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের যে সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ পরিচয় পায় তাহারই নাম যোগ অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একান্ত সংযোগ।

প্রেম এই একান্ত সংযোগের প্রকৃষ্ট উপায়। প্রেমের ভিতরে যে যুগল মিলন হয় তাহা সঙ্কোচ-বিহীন, বাধাহীন, স্বচ্ছ, তরল, গভীর। প্রেমিক যেমন

আপনার চেতনাটুকু বজায় রেখে প্রেমাস্পদের ভিতর আপনাকে একবারে ডুবিয়ে ফেলতে পারে, এমনটি আর কিছুতেই হয় না। তাই যোগ-সাধনার শ্রেষ্ঠ সোপান হচ্ছে প্রেম।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের নিবিড় অন্তরঙ্গ অনুভূতির মধ্য দিয়া ভূমানন্দের সংবাদ পেয়েছেন। ভাবের বিচারবিহীন আনন্দ অনুভূতির মধ্যে, প্রেমের ঐকান্তিক একাত্মতার মধ্যে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-সম্বলিত বিশ্বের ভিতরে যে অপরূপ আনন্দময় সৎ বস্তু আছে তিনি তাহার আভাষ পেয়েছেন। সমগ্র জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ তাঁহার অনুভূতিতে ভূমানন্দের সংবাদ জাগিয়ে তুলেছে। তাঁর অগাধ কল্পনা সমগ্র জগতের মধ্যে, সমগ্র মানবতার মধ্যে, ভূমার সর্ব্ব-ব্যাপকতার মধ্যে পুলক-স্রোতে ছুটিয়া চলেছে।

উপনিষদ্ ব্রহ্মকে কল্পনা করেছে রসস্বরূপে। রসো বৈ সঃ। আনন্দ-নির্ঝরের পুলক-সিহরণ স্বষ্টির আরম্ভ। প্রেমের বিপুল আনন্দ অনুভূতির উন্মেষ একময় ব্রহ্মের মধ্যে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করবার যে এষণা জাগিয়ে ছিল তাহাই স্বষ্টির মূল। যুগল না হ'লে প্রেম হয় না। প্রেমাস্পদ না থাকলে প্রেমের অঞ্জলি গ্রহণ করবে কে? স্বষ্টির পূর্ব্বের একান্ত সঙ্গহীন ব্রহ্ম তাই প্রেমোন্মাদনায় রস-বিলাস-লালসায় আপনাকে যুগলরূপে প্রকটিত করিলেন। উপনিষদে ইহাই বিশ্বস্বষ্টির রহস্য। রস-বিলাস-লালসাই বিশ্ব-প্রকাশের কারণ। আনন্দেই বিশ্বের জন্ম। আনন্দ-বিলাসই স্বষ্টির অনন্ত লীলা-তরঙ্গের অনন্ত অপরূপ প্রকাশ। আদি ব্রহ্মের রসলীলা-বিলাসের জন্য, যে যুগলের প্রকাশ হয়েছিল—সেই যুগলের অনন্ত বিরহ মিলনের অনন্ত লীলা বিশ্ব জগতের মধ্যে নানা রূপেগন্ধেশব্দেছন্দে বিকশিত হয়েছে—তাই সারা স্বষ্টির মধ্যে একটা অফুরন্ত পুলক-স্রোত বহে যাচ্ছে—স্বষ্টি যেন অনন্ত বিরহ মিলনের অনন্ত বাসরসজ্জা।

প্রেমের পুলক-হিল্লোলে বিশ্ব চরাচর ছুটিয়াছে ভূমার সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষায়—নব নব সাজে নব নব আভরণে সজ্জিত হয়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বের বিস্তৃত রূপ-মালঞ্চ যেন রূপসী তন্বীর অভিসার সাজের মত বাঞ্ছিত বিশ্বকবির প্রেম প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া আছে।

অতি নিবিড় বেদনা বন মাঝারে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজেরে.
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
　　আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজেরে।

সজ্জিতা ধরণীর ঋতুউৎসব মাঝে প্রেমের যে গোপন পরশ কবি আপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিয়াছেন, তাহারই অরুণ-কান্তি কবির কাব্য-শতদলকে সহস্রভাবে বিকশিত করিয়াছে।

চেতনা আমার কল্যাণ রস সরসে
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়-প্রান্তে
উদার ঊষার উদয়-অরুণ-কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের প্রেরণা দেখতে পেয়েছেন নির্ব্বিকল্প প্রেমের আনন্দের অনুভূতির মধ্যে। তাঁহার সাধনা গান তাই প্রেমের অঞ্জলি। বিশ্বের সমগ্র সত্তাকে অবাঙ্মানস-গোচর যিনি আনন্দের লীলা-বিলাসে বহু করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রেমের বহু বিচিত্র অভিব্যঞ্জনার মধ্যে বিকশিত দেখিয়াছেন। সুখে দুঃখে, মানে অপমানে, আপনার নিজস্ব অনুভূতির সমগ্র বৈচিত্রে বিশ্বের আনন্দ সিহরণে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের লীলায়িত তরঙ্গ-হিল্লোলে কবি তাঁর বিশ্বকবির সহিত প্রেমের আনন্দলিপিকা গাইয়াছেন।

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধে বরণে এস গানে
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে
এস চিত্তে সুধাময় হরষে
এস মুগ্ধ মুদিত দুনয়ানে
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।

অনন্তকাল ধরিয়া কবি তাঁর প্রেমাস্পদকে নব নব রূপে মিলনের অনুরাগে শতরূপে শতবার ভাল বাসিয়াছেন

তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
আমরা দুজন ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
* * * *
পুরাতন প্রেমে নিত্য নূতন সাজে।

শুধু এ জীবনে নয়—দেশ-কাল-পাত্র অতিক্রম করিয়া অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া কবি তাঁর মহাকবির মিলন অভিসারে চলিতেছেন

কবে আমি বাহির হ'লেম তোমার গান গেয়ে
সে তো আজকে নয়, সে তো আজকে নয়
জীবন-মরণে নিখিল ভুবনে,
যখনি যেখানে লবে,
চির জনমের পরিচিত ওহে
তুমিই চিনাবে সবে।

প্রেমের বিচিত্র মহিমা। প্রেমের আনন্দ-স্ফুরণে জগৎ অনন্ত মধুময় হইয়া উঠে। প্রেমের নিকষে সব সোনা হইয় যায়। প্রেমের ধর্ম্ম দূরকে নিকট করা, পরকে আপন করা, আপনাকে ভুলিয়া পরেতে মিশিতে পারা। জগতের সকল বিরোধ, সকল দ্বন্দ্বের কারণ আপনাকে নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে বন্ধ রাখা। প্রেম এই বন্ধন ঘুচিয়ে দেয়, ক্ষুদ্রত্বের অপরিসর গণ্ডি প্রসারিত করে—বন্ধন মুক্ত করে লয়।

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে
মুক্ত কর হে বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ভূমাকে প্রেমের অঞ্জলি দিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। নিবিড় প্রেমের অভিষেকে তিনি ভগবানকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁর চোখে তাই সারা বিশ্ব সুন্দর মধুময়—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

শুধু তাই নয়—প্রেমের আনন্দ-স্পর্শে সকল বিরোধ—সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়, সকল বন্ধ টুটিয়া যায়।

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

বৈষ্ণব কবিগণের মত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-দেবতাকে প্রভু বন্ধু সখা স্বামিরূপে বরণ করিয়া প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি—মান অভিমান বিরহ মিলন—পূজার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিয়াছেন। তিনি তাঁর দেবতাকে দূর সজ্জিত

মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে আনিয়া আপনার অন্তরবেদিতে বাঞ্ছিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দেবতা জেনে দূর রই দাঁড়ায়ে
আপন জেনে আদর করিলে
পিতা বলি প্রণাম করি পায়
বন্ধু বলে দুহাত ধরিলে।

বন্ধু-সখা-স্বামীর প্রতি যে প্রেম তাহাই প্রেমের চরম অভিব্যক্তি। এমন সব-ভুলানো মাতোয়ারা প্রেম আর কিছুতেই হয় না। সে প্রেমের মধ্যে বিচার থাকে না, যুক্তি থাকে না, হিসাব থাকে না—থাকে শুধু মর্ম্মান্ত অনুভূতি—প্রেমাস্পদের সহিত আত্মহারা মিলনের বেদনা-ভরা মধুর বিলাস।

প্রেমিক আর কিছু চায় না—চায় শুধু প্রেমাস্পদের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলতে। শ্রীরাধা এই প্রেমে আত্মহারা হইয়া লাজ কুল মান যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহু-বন্ধনে আপনাকে একেবারে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য এই প্রেমের অনন্ত বিলাস-লালসায় অনন্ত মিলনের সন্ধানে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া সমুদ্রের অনন্ত কল্লোলিত তরঙ্গের মাঝে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। প্রেমাস্পদের জন্য—প্রেমাস্পদকে সমগ্র ভাবে লাভ করিবার জন্য প্রেমিকের অনন্ত আকুলতা—অনন্ত আকাঙ্ক্ষা। প্রেমাস্পদকে তৃপ্ত করিবার জন্য তার অতৃপ্ত ব্যাকুলতা—তার সমস্ত অনুভূতিকে সে চেতনা-দীপ্ত রাখে পাছে প্রেমাস্পদের আসিবার শুভ মুহূর্ত্তটুকু তার চোখে ধরা না পড়ে। তন্ময় হইয়া মর্ম্মের সকল তন্ত্রীকে সজাগ রাখিয়া প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিক অভিসার-সজ্জায় বসিয়া থাকে। যখন আবার সে প্রেমাস্পদের শুভ আগমন-বার্ত্তা জানতে পারে, তখন প্রেমিকের অনন্ত ভাবনা কোন্ উপযুক্ত উপচারে সে তাকে অভিনন্দিত করবে। তারপর যখন সত্যি তার প্রেমাস্পদ আসে তখন তার সকল আবেগ—সকল আকুলতা—সকল ব্যাকুলতা—সকল সঙ্কোচ ভাসিয়া যায় বিপ্লব-আনন্দের প্রস্রবণে—তখন তার অনুভূতিতে আর কিছু থাকে না; থাকে শুধু আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ,—যে আনন্দের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে যায়; সমস্ত জগৎ তার চোখে মধুময় আনন্দময় হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমলীলার অনন্ত অনন্তরূপ দেখিয়েছেন। তিনি যেন বেতসলতার মত কখন নম্র, কখন লীলায়িত, কখন লজ্জাবনত। কখনও আবার

লজ্জাহীনা অভিসারিকার মত প্রেমের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া সকলের অলক্ষ্যে অন্ধকারে পথ চাহিয়া আছেন

দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাহি যে বার বার,
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।

কখনও তিনি প্রেমাস্পদকে পাবার জন্য অভিসারে চলিয়াছেন—

একলা আমি বাহির হ'লেম
তোমার অভিসারে
সাথে সাথে কে চলে মোর
নীরব অন্ধকারে।

কখনও তিনি মিলনের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হেলায় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া কান্ত-বিরহের দারুণ দুঃখে গাহিয়াছেন—

সে যে পাশে এসে বসে ছিল
তবু জাগিনি,
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল,
ওরে হতভাগিনী।

আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অনুভূতি বৃহৎ অনুভূতির আনন্দ-আবাহনকে যখন ব্যর্থ করিয়া দেয়, কবির চিত্ত তখন দুঃখের বেদনায় গাহিয়া উঠে

শুধু আসন পাতা হ'ল আমার
সারাটি দিন ধরে,
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা
তারে ডাকব কেমন করে,
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে হয়নি আমার পাওয়া।

নিপীড়িত হৃদয়-বেদনার ভারে অজানিত আকাঙ্ক্ষার সহস্র পাশে বদ্ধ হইয়া কবি আকুল আবেশে কাঁদিয়াছেন—

কোথায় আলো ওরে কোথায় আলো,
বিরহানলে জ্বালরে তারে জ্বালো।

*   *   *   *

সত্য বেদনার তীব্র দাহনে কবি গাহিয়াছেন—

বেদনা দুতী গাহিছে ওরে প্রাণ,

তোমার লাগি জাগেন ভগবান
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে।

কবি তার চারিদিকে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে বিরহ মিলনের আনন্দ দোলায় দোলায়মান হইয়া জীবন-দেবতার পথ রচনা করিয়াছেন। শরৎ আকাশের নির্ম্মল নীল পথে জলধারার কলস্বরে ভরা ভাদরের আকাশ ভাঙ্গা বাদল বরিষণে, জাগ্রত বসন্ত দ্বারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেবতার রথ-ঘর্ঘর শুনিয়াছেন। জগতের আনন্দ-যজ্ঞে কবি তাঁর বাঁশরীর ঝঙ্কার তুলিয়াছেন। বিশ্ব-কবির বিশ্ব-বীণায় যে সুর ওঠে, সেই সুর কবি প্রাণ পূরিয়া শুনিয়াছেন, তাহাই কাব্যে গাহিতে গিয়া কবি বেদনায় ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন—

গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে,
জানিনে কোন্ বিপুল বাণী বাজে ব্যাকুল সুরে।

আবার কখনও প্রাণের মাঝে প্রেমিকের সাড়া পাইয়া তাহারই মৃদু-মধুর মূর্চ্ছনায় কবি সোহাগভরে বলেন—

ফুলের মত আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ, এই যে তোমার দান।

আবার কখনও তিনি তাঁর সার্থকতা দেবতার মাঝে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁর জীবন-দেবতাও প্রেমিকের মত কবির গানে যে আপনার আনন্দের সুধা পান করেন, তাহাও ভক্ত কবি সৃষ্টিভরা প্রেমের পরিচয়ে দেখিতে পেয়েছেন—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ-প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী,
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক গীতি ;
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন বলিয়া, প্রেমের মধুর আলোকে জীবন-দেবতাকে দেখিয়াছেন বলিয়া, রবীন্দ্রনাথ স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারিয়াছেন আনন্দের বিলাস-লালসায় ভূমা তাঁহার সীমাবদ্ধ জীবনকে বিচিত্র অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছেন। যে বিলাস-লালসায় আদি ব্রহ্ম আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অনন্ত সৃষ্টি-লীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কবির প্রেমোন্মাদ-বিলাসের মধ্যে তাহার সার্থকতা পেয়েছেন। কবি তাঁর প্রেমে প্রেমাস্পদকে সার্থক করেন, নিজেও কৃতার্থ হন। চিরন্তন প্রেমের মন্দিরে কবির কাব্য-গাঁথা বহুভাবে বহুরূপে তাঁহার অন্তর-দেবতার প্রেমে মানবী প্রীতির পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছে।

কবি তাঁর জীবন-দেবতার অভিসারে ছুটিয়াছেন, কিন্তু জীবনের শত কোলাহল অন্তরের শত অপূর্ণতা, শত মলিনতা অন্ধকারে জীবন-দেবতাকে মাঝে মাঝে ঢাকিয়া রাখে—যাহা জীবন-দেবতার সহিত মিলন-আকাঙ্ক্ষার সাধনায় যে চিরন্তন বিরহ যাহা বৃকভানুসুতা রাধার মর্ম্মবেদনায় ধ্বনিত হইয়াছে—যাহা যুগে যুগে—

সুখ-দুঃখ-নীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী মিনতির স্বরে
বাঁশরীর ব্যথাপূর্ণ তান কুঞ্জে কুঞ্জে
তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান হৃদয়-সাথীরে।

শ্রান্তিহীন উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত-দীর্ণ গীতিস্বর—যুগে যুগে অনন্ত বিরহ কবি গাহিয়াছেন 'তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে।'

যে অন্তরের মলিনতার অন্ধকার তাঁর জীবন-দেবতাকে আঁড়াল করিয়া রাখে, কবি জানেন তাঁর জীবন-দেবতাই সে আঁড়াল সরাইয়া দিয়া তাঁহার অন্তরে পূর্ণরূপে প্রতিভাত হ'তে পারেন, তাই তিনি আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া বলিয়াছেন—

কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনও যে আছে বাকি
মনের গোপনে।

তাই তাঁর প্রার্থনা—

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
বাসনা যখন বিপুল ধূলায়

অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র ওহে অনিদ্র
রুদ্র আলোকে এস।

তিনি জানেন তাঁর মলিন অহঙ্কার, তাঁর জীবনের ক্ষুদ্রতা, তাঁর জীবন-দেবতার সহিত মিলন-পথের বাধা। তাই ভক্তকবি ভক্তি-রসসিঞ্চিত অঞ্জলি-সম্ভারে নব নব নৈবেদ্যের অর্ঘ্য নিবেদনে দেবতাকে তাঁহার সকল মলিনতা, সকল অহঙ্কার ঘুচাইয়া দিতে বলিয়াছেন। তিনি দেবতার যে আভাষ জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে পাইয়াছেন, জগতের কোলাহল, জীবনের পঙ্কিল সঙ্কীর্ণতা সেই দেবতাকে সম্পূর্ণভাবে অন্তরের অন্তরে পাইতে দেয় না; তাই কবির প্রাণে অনন্ত বিরহের অতৃপ্ত ব্যর্থতার বুকভরা হতাশায় বলিয়াছেন—

তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই
দুঃখ সুখের অনেক বেড়া
ধন জন মান;
আঁড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাষে দেও দেখা,
কাল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা।

তিনি তাই পরিপূর্ণ মিলনের কল্পনায় গাহিয়াছেন—

শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দ্দা
ঘুচায়ে দাও তার;
না থাকে তার মান অপমান
লজ্জা সরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্ব ভুবনময়!

* * * *

এ দয়া যে পেয়েছে, তার
লোভের সীমা নাই,
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই।

এই দয়া পাবার আশায় তিনি যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার কাব্যে নানাভাবে নানারূপে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার আকুল নিবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে—

একটি নমস্কারে প্রভু
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমারই সংসারে ;
একটি নমস্কারে প্রভু
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হ'ক
নীরব পারাবারে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সমস্ত অভিব্যক্তিকে এক অনন্ত আনন্দের সঙ্গীতে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন। শূন্যে, জলে, স্থলে সর্ব্বঠাঁই হইতে উৎসারিত অন্তহীন কল্লোল-গীতি কবি-চিত্ত নিপীড়িত করিয়া ভূমানন্দের অমৃত-স্রোতে নিত্য নিস্যন্দিত হইতেছে। বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে যে আনন্দ-স্বরূপ জ্যোতিষ্মান পুরুষ ব্যক্ত অব্যক্ত মূর্ত্ত অমূর্ত্ত অপার রহস্যময়ী সৃষ্টির বিচিত্র বিধানে আপনাকে বিবৃত করিতেছেন, তাহার আনন্দের ধ্বনি কবি আপনার বীণার কলতানে শুনিতে পান। আপনার হৃদয়ের ব্যক্তিগত প্রেম-অনুভূতি জীবন-দেবতার লীলায় মধুর হইয়া বিশ্ব-প্রেমের সাগর-হিল্লোলে ভূমানন্দে আত্মহারা হইয়া মহামিলনের উল্লাস-তরঙ্গে কবির সকল সুর নদী-ধারার মত আনন্দ-পারাবারে বিলীন হইয়াছে। লীলানন্দে বিরাজমান বিশ্ব-কবি বিশ্বকে অমৃতময় করেছেন। তাঁহার প্রেমে আকুল হইয়া কবি ব্যষ্টি-বন্ধনের পাষাণ-শৈল ভেদ করিয়া প্রেমের বন্যায় জগৎ চরাচরকে মধুময় দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-জীবনের মধুরতা হইতে জীবন-দেবতার আনন্দ-মিলনে মুক্ত হইয়া বিশ্বপ্রেমের আনন্দ-মন্দিরে ভূমানন্দের অমৃত স্পন্দনে শেষ পরিণতি লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

যে বাণী একদিন উদাত্ত স্বরে সঙ্গীত হইয়াছিল—

মধুবাতা ঋতায় চ মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

ভূমানন্দে বিভোর হইয়া কবি সকল ব্যথা—সকল বেদনা অপনীত করিবার জন্য আবার সেই সঙ্গীতে প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব
মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়
মধুর মধু গানে তটিনী বহিয়া যায়।

আজ যেন প্রেমের মন্দাকিনী-ধারায় স্বার্থ-বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়—মলিনতার আঁড়াল ঘুচে যায়। ভূমার আনন্দে ব্যক্তি বিশ্ব চরাচরের মধ্যে ছড়িয়ে ভূমার সন্ধান পায়। ভূমার সহিত মিলনের আনন্দে যেন বিশ্ব মধুময় হয়,—যেন

জগৎ জুড়ে উদারস্বরে
আনন্দ-গান বাজে।

উচ্ছ্বাস।

(আকাশের প্রতি।)

লেখক—সম্পাদক।

(১)

আমি যে সারাটি নিশি
জেগে আছি,
আমি যে তোমার পানে
চেয়ে আছি,
হে আকাশ! হে অসীম, হে মোর সুন্দর।
হে গগন! হে অনন্ত, হে মোর অম্বর॥
নীরবে মজিতে তব
নীরব সঙ্গীতে,

ভৈরব (১) ঝঙ্কার তব
নীরবে ভুঞ্জিতে ॥
স্বর্গ-মন্দাকিনী (২) কুল কুল কুল ধ্বনি,
ধ নি স গ ম ধ (৩) আকুল পরাণ-ধ্বনি,
কভু উঠে কভু নামে, কভু স্থির আছে,
বিশ্ব-জয়ী সুর তব তালে তালে নাচে।
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারা নিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(২)

আমি একা নাগো, জাগিছে বিশ্ব-জগৎ,
শুভ্রকেশ সোণামাখা জাগিছে পর্ব্বত,
প্রশান্ত সাগর জাগে কল কল স্বরে,
হাসে নাচে উর্দ্ধে ধায়, বরিতে তোমারে।
তরুলতা জাগে সব, হেলিয়া দুলিয়া,
পাখী সব জেগে উঠে, কণ্ঠ কাঁপাইয়া।
সকলি জাগিছে এবে ভূলোক দ্যুলোকে,
অরুণ উঠিছে জেগে, রাগের পুলকে।
ঊষারাণী দেয় দেখা, সিন্দূর পরিয়া,
তোমার সঙ্গীত-তরে, পুলকিত হিয়া।
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত।
জেগে আছি সারা নিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(৩)

গাও, গাও, তবে ধর, বিশ্ব-প্রেম তান,
শুনিয়া তোমার গান, জুড়াই পরাণ।

(১) প্রভাতকালীন রাগ, (২) ভৈরব রাগের মূর্ত্তি মহাদেবের জটা মধ্যে মন্দাকিনী কুল কুল ধ্বনি করিতেছেন। (৩) ভৈরব রাগের স্বরলিপি।

গাইবে না ? তা' কখনো হবে না হবে না,
মন মম কিছুতেই তাহা মানিবে না।
ওহে কলাবৎ, সর্ব্বস্ব করেছি পণ,
এই বসুন্ধরা মাঝে আছে যত ধন,
দিলাম তোমায়, শুনিব তোমার গান।
তাতেও হবে না ? তবে লহ এই প্রাণ।
আগে গান শেষে প্রাণ, তাতেও হবে না ?
ছি! ছি! এত অপমান, এত বিড়ম্বনা।
যদি জানিতাম, হে নির্দ্দয়, হে নির্ম্মম,
প্রশস্ত হৃদয় তব, তবুও অধম,
কভু না হতেম প্রার্থী, তোমার দুয়ারে,
মানে মানে থাকিতাম, আপনার ঘরে।
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারা নিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

নচিকেতা-উপাখ্যান।

লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার বি, এ।

পিতা ঔদ্দালকি ব্রাহ্মণগণকে বৃদ্ধ নিরিন্দ্রিয় গাভী দান করায় পুত্র নচিকেতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমাকে কাহায় দান করিবেন ?" পিতা উত্তর করিলেন "মৃত্যুকে"। তখন নচিকেতা যমপুরে গেলেন, তথায় তিনি তিন দিবস অনশন ছিলেন, পরে যমসহ সাক্ষাৎ-লাভ। যম নচিকেতাকে তিনটী বর দিলেন, কারণ তিনি যমপুরে তিন দিন অনশন ছিলেন এবং তজ্জন্য যম তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রথম বরে পিতার প্রসন্নতা, দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্যা যদ্দ্বারা স্বর্গ-সুখ-ভোগ ঘটে। তৃতীয় বরে নচিকেতা যমের নিকট মোক্ষলাভের উপায় আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার

করিয়া তাহাকে নানা ঐশ্বর্য্যভূষিত করিতে চাহিলেন, কিন্তু নচিকেতা নির্ব্বন্ধাতিশয্য-সহকারে সকল দান—দীর্ঘায়ুঃ, পুত্র পৌত্র, বহুশত ধন, ভূমি, দুর্লভ দ্রব্য, স্বর্গসুখ অস্বীকার করায় তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি আত্ম-জ্ঞান-জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্রহ্মবিদ্যার্থী। তাঁহার শ্রদ্ধা-নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া যম তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করিলেন।

এই উপাখ্যান হইতে আমাদের মনে কয়েকটী কথার উদয় হয়। আমরা জানি প্রাচীনকালে একটা গল্প বা উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া উচ্চ সত্য প্রচার করার প্রথা বহু প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

উপাখ্যানে নিম্নলিখিতগুলি প্রণিধানযোগ্য।

১। এ উপাখ্যানে যম ও মৃত্যু সমানার্থক।

২। ঔদ্দালকির নচিকেতাকে মৃত্যুকে দানের ইচ্ছা।

৩। নচিকেতার যমলোকে গমন।

৪। তথায় যমসহ তিন দিন অদর্শন।

৫। যম-দর্শন।

৬। যম কর্ত্তৃক নচিকেতাকে নানা-ঐশ্বর্য্যদানক্ষম অগ্নিবিদ্যার দান।

৭। আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নচিকেতাকে তদ্দানে অনিচ্ছুক যম কর্ত্তৃক নানা সুখ-সম্পদ স্বর্গসুখ দানের প্রলোভন প্রদর্শন; নচিকেতার তদ্‌গ্রহণে উপেক্ষা ও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য কঠোর প্রার্থনা।

৮। সর্ব্বশেষে নচিকেতার প্রার্থিত মুক্তিসাধক তত্ত্বজ্ঞান-প্রাপ্তি।

যম—সংযম; বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ দ্বারা মনের একাগ্রতা সম্পাদন, মনের গভীরতম প্রদেশে গমন। তদ্‌দ্বারা যে অবস্থা ঘটে তাহাতে মানুষ বাহ্যজগদ্‌-ব্যাপারে মৃত, তখন সে জড়জগৎ হইতে মনকে অপসারিত করিয়া অন্তর্জগতে সমাহিত হয়।

অনেকের জানা আছে যে মানুষের শরীর-প্রবাহী প্রাণধারা ঊর্দ্ধগামী হইতে হইতে এমন স্থানে উপনীত হয় যখন মৃত্যু ঘটে। যেস্থানে জীবন-ধারা ঊর্দ্ধগামী হইলে মৃত্যু ঘটে তাহাকে death-point বা মৃত্যুস্থল বলে। সাধক সদ্‌গুরুর সাহায্যে জীবনধারাকে সংযত করিয়া ঊর্দ্ধগামী করিয়া বিনা বিপদে ঐ স্থান অতিক্রম করিতে পারেন। তখন সাধকের জীবনে অনেক ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা উপনীত হয়। উহার পূর্ব্বেও তাহার অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে।

যোগৈশ্বর্য্যকে বিভূতি বলে। আমরা উপাখ্যানে পাই যমলোকে গমন করিয়া নচিকেতা প্রথমতঃ যম-দর্শন পান না। প্রত্যেক সাধকের জীবনে ঐরূপ ঘটিতে পারে। মনঃসংযম আরম্ভ করিলেই সংযমের উচ্চধাপে তখনই উঠা যায় না বা death-point এ পৌঁছান যায় না; কঠোর সাধনা করিলে ক্রমশঃ ঘটে। যম-দর্শন ঘটিলে যম তাঁহাকে নানা অদ্ভুত ক্ষমতাপ্রদ অগ্নিবিদ্যা দান করেন। সাধকও চিত্তসংযমের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে এমন শক্তি লাভ করিতে পারেন যদ্দ্বারা তিনি প্রকৃতির রাজ্যের অনেক নিগূঢ় তথ্য জানিতে পারেন এবং আরও অনেক শক্তি লাভ করিতে পারেন যদ্দ্বারা প্রভূত সুখ ভোগ করিতে পারেন। সুখ ও স্বর্গ একার্থক। চিত্তসংযম-পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে মন যেদিকে ফেলা যায় সেইদিকে অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়। চিত্তের উপরও ক্ষমতা লাভ করা যায়। চিত্তের সংযমহেতু বিক্ষিপ্ততা কমিতে থাকে, মনে একটা আনন্দ উঠিতে থাকে, জগতের সুখ-দুঃখের প্রতি উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা লাভ হয়। কিন্তু তখনও মোক্ষদায়ক আত্মজ্ঞান বহুদূরে। তাই প্রথম নচিকেতা যমের নিকট তত্ত্বজ্ঞান চাহিলেও পান নাই। সাধকও বিভূতি লাভ করিয়া তৃপ্ত হইলে আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। যোগৈশ্বর্য্য বিভূতি উপেক্ষা করিয়া আরও চিত্ত-সংযম পথে অগ্রসর হইলে বহু প্রলোভন—মানসিক যুদ্ধ অতিক্রমের পর তত্ত্বজ্ঞানের লাভ হয়। ভগবান বুদ্ধদেবের সাধনকালে মারসহ যুদ্ধ ঐ সত্যকে প্রকাশ করিতেছে। চিত্তসংযমের বহু উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিলে ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইতে থাকে—বন্ধনের পর বন্ধন ছিঁড়িতে থাকে। এই তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা কত কে বলিবে—এই তত্ত্বজ্ঞানের গভীর হইতে গভীরতর স্তরের আবিষ্কারই ধর্ম্মজগতের ক্রমবিকাশ। ব্রহ্ম অনন্ত—তাঁহার তত্ত্বও অনন্ত—মানুষের বিশেষত্ব সে চিত্তসংযমের দ্বারা এই অনন্ত সাগরে ডুব দিয়া—কত উচ্চ হইতে উচ্চতরত্ব আবিষ্কার করিতেছে, ইহার শেষ নাই। হায়! নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্ কই, যিনি যমপুরে গমন করিয়া রত্নলাভ করিয়া আবার জগতে বিতরণ করিয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠা করেন।

অগ্নিবিদ্যা সম্বন্ধে যে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় ইহার দ্বারা জড়জগতে অনেক ক্ষমতা লাভ করা যায়। ইহা কিরূপ বিজ্ঞান? অগ্নি অর্থে কি? অগ্নি কিরূপ শক্তি? আত্মতত্ত্বজ্ঞান অগ্নিবিদ্যার স্বর্গের অনেক উপর।

অগ্নিবিদ্যা দ্বারা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান ও তদুপরি কর্তৃত্ব লাভ করা হয়। এ সব বিষয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আলোচনা করিয়া উপাখ্যান-নিহিত মূল কথা সাধারণো প্রকাশ করিলে আমরা উপকৃত হইতে পারি এবং আর্য্য ঋষিগণের মনের গভীরতাও হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইতে পারি। আশায় উদ্গ্রীব রহিলাম।

নীলাম্বরের কথা।

বহুরূপ-তারা।

লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম, বি, এ, এ।

পশু রাশির T. তারাটী ১৮৮২ খৃঃ অঃ Safarik কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তৎপরে ১৮৯৯ খৃঃ অঃ হইতে ১৯০৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত Wendell আঠাশ বার উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করেন যে উহার জ্যোতিঃ মাত্র ০'৩২ অংশ কম বেশী হয়, অতঃপর উহার পর্য্যবেক্ষণ পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু আজ-কাল কিছুদিন হইতে আবার উহার পর্য্যবেক্ষণ লওয়া হইতেছে। আমরা ১৯২৪ খৃঃ অঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত ১৩ বার উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে ৮'৫ হইতে ৯'১ স্থূলত্বে কমবেশী হইয়াছে। আমেরিকার ওহিও প্রদেশের পেলটেয়ার সাহেব ১৯২৩ খৃঃ অঃ ৯ই নভেম্বর উহাঁকে ৮'১, ১৯২৪ খৃঃ অঃ ২৬শে জুলাই ৮'২ ও ৩০শে আগষ্ট ৮'৩ স্থূলত্বে দেখিয়াছেন সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে তারাটী ৮'১ হইতে ৯'১ পর্য্যন্ত স্থূলত্বে কম বেশী হয়। কতদিনে যে এই কমবেশী সমাধা হয় অথবা উহার কমবেশী হইবার কাল-পরিমাণ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অন্তর্গত কিনা তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

পশু রাশির S তারাটী ১৮৭৪ খৃঃ অঃ ক্রুগার কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন উহার জ্যোতিঃ ৭'৪ হইতে ১১'২ স্থূলত্বে হ্রাস বৃদ্ধি হইত বলিয়া জানা গিয়াছিল। ইটালি দেশের রোম নগরের ভাটিকান মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ Rev. father Hagen, উহার হ্রাস বৃদ্ধির কাল পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ২ বৎসর বলিয়া স্থির করেন কিন্তু ১৮৯৯ হইতে ১৯০৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত হারভার্ড মান-মন্দিরের পর্য্যবেক্ষণে উহার কাল পরিমাণ অনিয়মিত irregular বলিয়া স্থির হয়।

কিন্তু আমাদের মনে হয় যে হেগেন সাহেবের সিদ্ধান্তই সম্ভবতঃ ঠিক। আমরা ১৯২৩ খৃঃ অঃ ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি ঐ পর্য্যবেক্ষণের ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমাদের পর্য্যবেক্ষণ কালের মধ্যে তারাটী ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৪ খৃঃ অঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৮'৪ স্থূলত্বে উপনীত হয় তৎপরে ক্রমে হ্রাস হইয়া কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে ১৯২৫ খৃঃ অঃ ২২ মার্চ্চ তারিখে ১১'৬ স্থূলত্বে পরিণত হইয়াছে তার পর তারাটী ক্রমে সূর্য্যের সান্নিধ্য লাভ করিয়া পশ্চিমাকাশে অস্ত গিয়াছে। আমরা ১৩ই এপ্রিলও উহার পর্য্যবেক্ষণ লইয়াছি কিন্তু ঐ দিন উহাকে দেখিতে পাই নাই। শীঘ্রই তারাটী শেষরাত্রে পূর্ব্বাকাশে দেখা দিবে যদি আকাশের অবস্থা ভাল থাকে তাহা হইলে পর্য্যবেক্ষণের ফলে বুঝিতে পারা যাইবে যে উহার জ্যোতিঃ আরও ক্ষীণ হইয়াছে কিম্বা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সন ও তারিখ			স্থূলত্ব	সন ও তারিখ			স্থূলত্ব
১৯২৩	সেপ্টেম্বর	৫	৯'৭	১৯২৪	অক্টোবর	৩	৯'৩
	অক্টোবর	১০	৯'৩		"	১৯	৯ ৩
	নভেম্বর	৭	৯'০		ডিসেম্বর	২	৯'৯
	ডিসেম্বর	১০	৮'৫	১৯২৫	জানুয়ারী	২২	১০'৬
১৯২৪	জানুয়ারী	৩১	৮'৫		ফেব্রুয়ারী	১৫	১১'০
	ফেব্রুয়ারী	২৭	৮'৪		"	২৬	১১'৩
	মার্চ্চ	৭	৮'৬		মার্চ্চ	১৩	১১'৪
	এপ্রিল	৫	৮'৬		"	২২	১১'৬
	সেপ্টেম্বর	১	৯'৩		এপ্রিল	১৩	অদৃশ্য

১৩৩১ সালের পৌষ মাসের হিন্দু-পত্রিকায় বৃষরাশির SU তারাটীর কথা বলা হইয়াছে। উহার সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য আমরা হারভার্ড মান-মন্দিরের অধ্যক্ষের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলাম তাহার ফলে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা লিখিত হইল।

১৯০৮ খৃঃ অঃ ১৩ই জুলাই হারভার্ড মান-মন্দিরের গৃহীত ফটোগ্রাফের প্লেট পরীক্ষা করিয়া কুমারি ক্যানন এই তারাটীকে বহুরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন সেই সময়ে হারভার্ড মান-মন্দিরের ১৪০ সংখ্যক সার্কুলারে ও পরে ১৫১ সংখ্যক সার্কুলারে উহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ যে খুব বেশী তাহা আবিষ্কারের সময়েই জানা গিয়াছিল কিন্তু কতদিন অন্তর উহার জ্যোতির হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা তখন জানা যায় নাই।

১৮৮৫ খৃঃ অঃ ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ১৯০৮ খৃঃ অঃ ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঐ তারাটীর নিকটস্থ আকাশের গৃহীত চারিশত আট খানি ফটোগ্রাফের প্লেট পরীক্ষা করিয়া কুমারী বার্ণস্ স্থির করেন যে ঐ তারাটী উত্তর কিরীট-রাশির R. তারার স্বজাতি। এই শ্রেণীর তারাগুলি দীর্ঘকাল পূর্ণ স্থূলত্বে উজ্জ্বল থাকিয়া অকস্মাৎ একদিন ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে ও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং দুই মাস হইতে এক বৎসর কাল ঐ অবস্থায় থাকিয়া উহার জ্যোতিঃ আবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং ২ বা ৩ মাসের মধ্যে পূর্ণ স্থূলত্বে উপনীত হয়। পূর্ব্বোক্ত ২৩ বৎসরকালের মধ্যে গৃহীত ৪০৮ খানি ফটো প্লেটে মাত্র চারিবার ঐ তারাটীকে ক্ষীণ জ্যোতিতে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। ১৮৯১ খৃঃ অঃ ২২শে ফেব্রুয়ারীর প্লেটে উহার প্রথম ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ১২'৪ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ঐ সময়ে কতদিন উহা ক্ষীণ ছিল তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই কারণ ঐ তারিখের পর হইতে ১৩ই নভেম্বর পর্য্যন্ত আর কোন ফটোগ্রাফ লওয়া হয় নাই। ১৩ই ভেম্বরের প্লেটে উহার স্থূলত্ব ১০'৩ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কবে উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল এবং তারাটী ১২'৪ হইতেও ক্ষীণ য়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না। ১৮৯৮ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর হইতে ১৮৯৯ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসর উহার ২য় বার ক্ষীণ জ্যোতিঃ ১৯০৪ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯০৫ খৃঃ অঃ আগষ্ট পর্য্যন্ত ৩য় বার এবং ১৯০৮ খৃঃ অঃ নভেম্বর মাসে উহার ৪র্থ বার ক্ষীণ জ্যোতিঃ জানিতে পারা যায়। ১৯০৯ খৃঃ অঃ ৬ই সেপ্টেম্বরের প্লেটে ঐ তারার চিহ্ন পাওয়া যায় না কিন্তু ঐ প্লেটে ১২'৫ স্থূলত্বের তারার চিহ্ন উঠিয়াছিল। কুমারী ক্যানন ১৯০৮ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর হইতে ১৯০৯ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৬ইং দূরবীণে উহাকে দেখিতে পান নাই, ক্যাম্বেল সাহেবও ঐ সনের ১০ ও ২২ এপ্রিল ১৫ইং দূরবীণেও উহাকে দেখিতে পান নাই অথচ তিনি ১৪'০ স্থূলত্বের অন্য তারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে ব্রুসের ফটো তোলা দূরবীণে গৃহীত দুই খানি উৎকৃষ্ট প্লেটে ১৫'৫ স্থূলত্বের তারার চিহ্ন উঠিয়াছিল কিন্তু SU তারার কোন চিহ্ন উঠে নাই। ১৯০০ খৃঃ অঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯০৪ খৃঃ অঃ ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত গৃহীত একশত বার খানি প্লেটে উহার ১০'৩ স্থূলত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বলিতে হইবে যে উহার স্থূলতম জ্যোতিঃ ১০'৩ ও ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ১৫'৫ হইতেও ক্ষীণ।

হারভার্ড মান-মন্দিরে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে
SU তারার পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ।

সন ও তারিখ		স্থূলত্ব	মন্তব্য
১৮৯০ ডিসেম্বর	২৯	১০'২	পূর্ণ স্থূলত্বে দৃশ্য।
১৮৯১ ফেব্রুয়ারী	১৩	১১'৮	হইতেও ক্ষীণ ও অদৃশ্য।
" "	২২	১২'৪	ঐ ঐ
" "	১৩	১০'২	পূর্ণ স্থূলত্বে দৃশ্য।
১৮৯৮ অক্টোবর	১৬	১০'২	
" ডিসেম্বর	১৫	১১'৩	হইতেও ক্ষীণ ও অদৃশ্য।
" "	২৩	১২'৭	ঐ ঐ
১৮৯৯ জানুয়ারী	১২	১২'৯	ঐ ঐ
" "	১৮	১২'৪	ঐ ঐ
" মার্চ্চ	২৯	১২'৮	ঐ ঐ
" "	৩০	১২'৭	ঐ ঐ
" এপ্রিল	১	১২'৯	ঐ ঐ
১৮৯৯ মে	১৬	১১'৮	হইতেও ক্ষীণ ও অদৃশ্য।
" অক্টোবর	১১	১৫'৫	ঐ ঐ
" "	১৪	১২'৫	ঐ ঐ
" "	২৭	১৩'০	ঐ ঐ
" নভেম্বর	২৫	১২'৪	জ্যোতিঃ বৃদ্ধি দৃশ্য।
" "	৩০	১২'৫	ঐ ঐ
" ডিসেম্বর	১৩	১২'৪	ঐ ঐ
১৯০০ ফেব্রুয়ারী	১৫	১০'৩	পূর্ণ স্থূলত্বে দৃশ্য।
১৯০৪ এপ্রিল	১২	১০'৩	
" সেপ্টেম্বর	১৫	১১'৪	হইতেও ক্ষীণ ও অদৃশ্য।
" অক্টোবর	১৫	১১'৭	ঐ ঐ
" "	২২	১১'৩	ঐ ঐ
" নভেম্বর	১৪	১২'৩	ঐ ঐ
" "	১৬	১৩'৯	ঐ ঐ
" ডিসেম্বর	১১	১২'৪	ঐ ঐ
" "	১৪	১১'৮	ঐ ঐ
" "	২৮	১১'৮	ঐ ঐ
১৯০৫ জানুয়ারী	২৮	১২'৪	ঐ ঐ

১৯০৫	মার্চ্চ	৪	১১.৮	হইতেও ক্ষীণ ও অদৃশ্য।
"	এপ্রিল	৬	১০.৯	ঐ ঐ
"	আগষ্ট	৩১	১০.৫	ঐ ঐ
"	সেপ্টেম্বর	৮	১০.২	পূর্ণ স্থূলত্বে দৃশ্য।
১৯০৮	এপ্রিল	১৬	১০.২	
"	নভেম্বর	৫	১২.৪	হইতেও ক্ষীণ ও অদৃশ্য।
১৯০৮	আগষ্ট	২২	১২.০	ঐ ঐ
"	সেপ্টেম্বর	৬	১২.৫	ঐ ঐ

নারায়ণ ঠাকুর।*

লেখক—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

ভাটপাড়া কাঁটালপাড়ার ঠাকুর বংশের সিদ্ধ পুরুষ নারায়ণ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব সম্প্রতি মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। এই নারায়ণ ঠাকুরের জীবন-কথা অনেকে জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যবোধে আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।

নারায়ণ ঠাকুরের আদি বাস ছিল খুলনা জেলার ধূলিপুর পরগণার অন্তঃপাতী ধলবেড়ে গ্রাম। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য হিন্দুরাজত্ব বলিয়াই তিনি তথায় বাস করেন। যে বিল্বমূলে তিনি সিদ্ধ হন, সেখানে স্মরণ চিহ্নরূপে একটি বেদী বিদ্যমান আছে; এখনও তথাকার অধিবাসীরা সেখানে মানত করিয়া থাকেন, দুগ্ধ মিষ্টান্ন দিয়া পূজা করিয়া যান। সেই পীঠস্থানটি অনেকে দর্শন করা পুণ্যজনক মনে করেন।

নারায়ণ ঠাকুরের পিতামহ গদাধর মিশ্র কান্যকুব্জ হইতে সস্ত্রীক শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন; পথিমধ্যে বগড়ী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বিষ্ণুনামক একটি শিশু পুত্রকে তথায় কোন গৃহস্থের গৃহে রাখিয়া দেন। শ্রীক্ষেত্রে যে পুত্রটি জন্মেন, তিনিই নারায়ণ ঠাকুরের পিতা জনার্দ্দন মিশ্র। কান্যকুব্জে গদাধর মিশ্রের পিতার নাম ছিল মহাবীর মিশ্র।

"গদাধরস্য দ্বৌ পুত্রৌ খ্যাতৌ বিষ্ণুজনার্দ্দনৌ"

বিষ্ণুর সন্তানেরা বগড়ী অঞ্চলে এখনও বাস করেন। দেবকৃষ্ণ বেদান্ত-তীর্থ প্রভৃতি তাঁহারই বংশধর। ইঁহারা গোস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত।

---

* ভাটপাড়া নারায়ণ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসবের দিনে প্রদত্ত বক্তৃতাবলম্বনে লিখিত।

নারায়ণ ঠাকুরের প্রণীত "ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরী" নামক স্মৃতিগ্রন্থ আমাদের সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। সেই মত যজুর্ব্বেদী আমাদের ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঠাকুরের স্বহস্ত-লিখিত কাব্য-প্রকাশের যে টীকা আমাদের বাটীতে আছে, তাহাতে ১৫৯৩ শকাব্দ লিখিত আছে। পণ্ডিত শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের প্রমাণে ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের লেখা।

এ অঞ্চলে ঠাকুরের কুম্ভকযোগে আকাশপথ দিয়া গঙ্গাস্নানের কথা প্রবাদের মত প্রচলিত। ইঁহার অলৌকিক সাধনার মাহাত্ম্যে বাঙ্গলার প্রায় অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ ইঁহার বংশধরগণের শিষ্য। সেই প্রাচীনকালের মালাচন্দনগ্রাহী কুলীন সন্তানেরা এবং অপরাপর ব্রাহ্মণেরা দলে দলে আসিয়া যাঁহার পদতলে প্রণত হইলেন, শিষ্যত্ব-স্বীকারে তাঁহার সাধনার গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন—ইহাতে তাঁহার অলৌকিকত্ব ছিল ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই। ইঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠঃ শিবরামঃ ত্যজ্যঃ। মধ্যম রাঘবরাম। কনিষ্ঠ রামনাথ।

ধূলপুর হইতে ঠাকুর প্রত্যহ কুম্ভকযোগে আকাশপথ দিয়া ভাটপাড়ার ঘাটে গঙ্গাস্নানার্থ আসিতেন। ঊষাকালে স্নান শেষ করিয়া প্রত্যূষে আবার চলিয়া যাইতেন। একদিন ভাটপাড়ার হালদার বংশের আদিপুরুষ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন। ঠাকুরের অবতরণ দেখিতে পাইয়া বলেন—"আপনি এত কষ্ট করিয়া গঙ্গস্নানে আসেন কেন? আমি বসবাসের ব্যবস্থা করিতেছি; এইখানে বাস করুন এবং আমাদের পুত্রদের মন্ত্র দান করুন।" ভাটপাড়ার জমিদার হালদারবংশের বংশধরগণ (অংশুপ্রকাশ, অব্জপ্রকাশ) প্রভৃতি আজিও ভাটপাড়ায় বাস করিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন, ঠাকুর বাৎস্য গোত্রের কোন জ্বলদ্‌ব্রহ্মতেজা ব্রাহ্মণের কন্যা লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। মৃত্যুকালে তিনি সিদ্ধ মন্ত্র আপনার পুত্রকে না দিয়া পুত্রাধিক জামাতা নারায়ণ ঠাকুরকে দান করেন। বলা বাহুল্য, আপনার পুত্র তেমন উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়াই সিদ্ধমন্ত্রলাভের অধিকারী হইলেন না। এরূপও শোনা যায়, এই মন্ত্রের ফলেই বংশধরগণের এরূপ সর্ব্ববিধ অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। ঠাকুরের বর আছে এই বংশধরের কাহাকেও সর্পে দংশন করিবে না, ব্যাঘ্র কুম্ভীরে খাইবে না, কাহারও দস্যুহস্তে প্রাণ যাইবে না।

ঠাকুর শেষ বয়সে সিদ্ধ হন। প্রথম বয়সে একবার সিদ্ধ হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখন তিনি সফলকাম হন নাই। জগদম্বা গর্ভধারিণীর মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া ছলনা করিয়া যান। অবশ্য তখন তিনি সিদ্ধ হইলে বর্ত্তমান ভাটপাড়ার ঠাকুর-বংশের অস্তিত্বই দেখা যাইত না।

গভীর অমাবস্যা রাত্রি। চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। ঠাকুর শব-সাধনায় ব্যাপৃত। তাঁহার চিত্ত নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপের মত স্থির। কাম ক্রোধ মোহ ভয় জন্মিলে সাধনার ব্যাঘাত হয়। একবার বজ্র কড় কড় ধ্বনি

করিয়া পড়িল, মুষলধারে বর্ষা নামিয়া আসিল। মনে হইতে লাগিল—অন্ধকার হইতে কৃষ্ণবর্ণ প্রেতগণ অট্টহাসি হাসিতেছে, শিবাগণ অদূরে বিকট চীৎকার করিতেছে। ঠাকুরের সমাধি কিছুতে ভঙ্গ হয় না। তখন জগন্মাতা ভবানী গর্ভধারিণীর মূর্ত্তিতে আসিয়া বলিলেন—

“বাবা, যবনে রাজ্য আক্রমণ করিতেছে, গৃহদেবতাকে রক্ষা কর”। ঠাকুর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন! গৃহ-দেবতার অনিষ্টাশঙ্কায় মন কাঁদিয়া উঠিল। উঠিয়া দেখেন, কোথায় মাতা? দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঠাকুর গৃহে ফিরিলেন।

স্বনামধন্য ৺হলধর তর্কচূড়ামণি, ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন, ৺শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই নারায়ণ ঠাকুরেরই বংশধর। এই অধম লেখক সেই বংশের একজন নগণ্য সন্তান।

নারায়ণ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসবে যে গীতটি রচনা করিয়াছিলাম এবং যে গীতটি গাহিয়া নিতাইচরণ ভট্টাচার্য্য সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন, সেই গীতটী পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া আমি বিদায় লইলাম।

নামে যাঁহার বঙ্গ উছলে জয় জয় দেব নারায়ণ
প্রভায় যাঁহার বংশ উজলে পূজি এস মোরা সে চরণ;
একদিন যিনি কুম্ভক-বলে
এই পথ দিয়া যেতেন চ'লে
তিনি আমাদের গোত্র-ভূষণ, তিনি আমাদের নারায়ণ।
শক্তি দিয়া মানুষ গড়ো হে সাধকবর মহাজন
পুণ্য দিয়া সার্থক ক'রো আমাদের এই আকিঞ্চন;
তুমি যে সাধন-বর্ম্মের জোরে
এখনও রেখেছ সুদৃঢ় ক'রে
আমরা “আমরা” তুমি সে কারণ, তুমি আমাদের নারায়ণ।

কাম্য।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দেওয়ান তত্ত্বনিধি।

ওরে মূঢ় তুই ঘূরিয়া মরিলি
কিসের তরে!
এটা ওটা করে, এথা হোথা ফিরে
জীবন ভরে।

ওরে মূঢ়, তুই লালস নেশায়
কত কিছু হায় দিবস নিশায়
পরের কাড়িলে পথেতে কুড়ালে
আঁকড়ি করে।
ওরে মূঢ় তুই মূরিয়া মরিলে
কিসের তরে ?
আপনারে তুই করিবারে সুখী
করিলে কত
ভালো কি মন্দ বিচারি দেখনি
ভাবনি অত.
কত কি বাসনা প্রেরণা সাধনা
কতই সয়েছ জীবনে যাতনা,
আপন সুখের স্বপনে বিভোর
রহিলে তত।
আপনারে তুই করিবারে সুখী
করিলে কত !
আজিকে শ্রান্ত ভাবিয়া মরিস
বেকুব যেন
এতদিন হায় বুকে হাত দিয়ে
দেখিনি কেন !
কিসের লাগিয়া বিধুর পরাণ
কিসের লাগিয়া সজল নয়ান
অচেনা অজানা কি ধন লাগিয়া
ব্যাকুল হেন।'
আজিকে শ্রান্ত ভাবিয়া মরিস
বেকুব যেন !
খেয়ালি সময় না বুঝে আপন
মরম-কথা,
সুখের লাগিয়া সাগর সেঁচিয়া
লভিলে ব্যথা ;
এত বড় ভার শিরে বহি তোর
জীবনের খেলা হবে কিরে ভোর ;
আঁধার না হতে ফির আপনার
আপন যথা।
খোয়ালি সময় না বুঝে আপন
মরম-কথা।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩৩২ সাল। ১৮৪৭ শকাব্দাঃ

বঙ্গ-জননী।

লেখক—পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

ওমা, বঙ্গজননি! সন্তানগণে
অঙ্কে লহ মা উঠায়ে!
তব মঙ্গল কর- পরশনে দাও
হীনতা দীনতা ঘুচা'য়ে!

ধীর সমীরে তব স্নেহরাশি
বহিছে রহিয়া রহিয়া;—
শিরে উন্নত হিমাচল রাজে
অতীতের গাথা গাহিয়া,
নীরব নীলিম গগনে, অনলে অনিলে তপনে,
ঢালো প্রাণে প্রাণে শান্তি-সলিল,
পাপ-তাপ দূরে ভাসায়ে!

তোমারি মহিমা, কল্যাণময়ি !
নিখিল অখিল ব্যাপিয়া ;
তরু লতিকায়, শ্যামল শোভায়,
বিষাদ-আঁধার নাশিয়া !
অসীম মহিমা মগনে, তোমার প্রমোদ-ভবনে,
তব শ্রীচরণ করিব পূজন,
হৃদয়-আসনে বসায়ে।

কি যেন মায়ায় কি যেন ছায়ায়
জননি ! তোমারে ভুলিয়া ;—
কোথা কোন্ দেশে গিয়েছিনু ভেসে,
অলসে নয়ন মুদিয়া ;
এতদিন পরে এসেছি, ভাই ভাই সবে মিলেছি,
সন্তান বলে' তুলে লও কোলে,
সন্তাপ-জ্বালা জুড়ায়ে !!

মিলন-সঙ্গীত।

আজি বাজিছে মিলন-শঙ্খ, নব উৎসাহরূপ-ধারী।
কোটি জীবন-সিন্ধু-কল্লোল-গীতি, পুলকে উঠে ফুকারি ॥

ধীরে জাগিয়া উঠিছে আশা, হৃদয়ের ভালবাসা।
শত হাস্যদীপ্ত উজল আনন, সন্তাপ-দুঃখহারী।

আজি শান্তির বীজমন্ত্রে, সকল জীবন-যন্ত্রে,
মৃদু ঝঙ্কারে তারে সুমধুর সুর, গোপন হৃদয়চারী ॥

আহা ললিত মধুর ছন্দে, নবরূপরস গন্ধে,
কত সজ্জন মনমত্তমধুপ, গুঞ্জরে বলিহারি !!

হের বিতরি সুরভি গন্ধ, বহিছে মলয় মন্দ,
কিবা মঙ্গলসুরে বিশ্বশরণে, বন্দিছে শুকসারী ॥

---

* যশোহরে মহাত্মাজীর শুভাগমনে।

অই বাজিছে বিজয়ভেরী, চল চল বৃথা কেন দেরি,
দূরে উচ্ছল চল সজল জলদ গর্জ্জিছে অম্বুকারি ॥

চারু একতার মণিহারে, প্রাণে প্রাণে শত ধারে,
কিবা করুণ-কোমল বেহাগের রাগে ঝরিছে শান্তিবারি !!!

নীরবে।

নীরব প্রকৃতিরাণী, নীরব ধরণী,
বিস্মৃতি-সাগরে ভাসে চৈতন্য-তরণী।
জগতের নীরবতা পুঞ্জীভূত হয়ে,
রয়েছে নীরব-ধ্যানে বিপুল বিস্ময়ে!
নীরবে কুসুম-শোভা বিকাশে কাননে,
নীরবে অরুণ জাগে পূরব গগনে।
নীরবে ঝরিয়া ফুল পড়িছে ধরায়।
নীরবে মিলায় রবি সায়াহ্নের গায়।
পতির পরম-প্রেম, সতীর হৃদয়ে,
নীরবে ফুটিয়া উঠে লুকায়ে লুকায়ে!
সামান্য অঙ্কুর হ'তে—মেলি শাখাজাল
নীরবে বাড়িয়া উঠে অশ্বত্থ বিশাল!
নীরবে চলে'ছে গ্রহ মহাশূন্য দিয়া।
নীরবে এসেছি, যাব নীরবে চলিয়া !!

ভ্রান্তি।

(১)

থেমে গেল কোলাহল, নীরবিল ধরণী ;
আঁধারে হারায়ে গেনু শরণি।
নিবিড় গহন দেশ,
নিরাশার অবশেষ।
অদূরে বহিছে ধীরে তটিনী
আঁধারে হারায়ে গেনু শরণি!

(২)

কে ডাকে! কাহারে স্মরি, ভ্রমিতেছি অকূলে,
নীরবে দেউটি জ্বলে দেউলে!
বসন্তে সুদূর শাখে
কোকিল পাপিয়া ডাকে,
সুবাস বিতরে চূত-মুকুলে।
নীরবে দেউটি জ্বলে দেউলে ;

(৩)

অজানা অচেনা কোন্ ছায়াময়ী কাহিনী,
হয়েছে মূরতিমতী রাগিণী।
হৃদয়ের চারিপাশে,
অতি সংগোপন ভাষে
আলাপিছে থেকে থেকে চির দিবা-যামিনী,
মরম শরণাগতা চিন্তা সিন্ধুবাহিনী।

(৪)

ভুলিয়া গিয়াছি সেই প্রভাতের মহিমা—
জীবনের ঘনীভূত গরিমা!
যেতে কোন দিব্যদেশে
এ পান্থনিবাসে এসে,
রেণু হারায়েছে তার সত্যময়ী অনিমা,
সসীমে দিয়েছে ধরা, জগতের অসীমা!

(৫)

সুমন্দ হিন্দোল রাগ ভেসে আসে বাতাসে,
মানস দহেনা আর হুতাশে!
ইন্দ্রনীল-শৈল-মূলে
শান্তি-সরোবর-কূলে
বসে' আছি আনমনে তৃপ্তিময় আবাসে।
আপনা পাশরি গেছি এসে হেন প্রবাসে॥

হিন্দু-সমাজের সমস্যা।

লেখক—সম্পাদক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিন্দু-সমাজের সমস্যা যে অতি গুরুতর—একথা সকলেই স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণ-সমাজে'ও এই ব্যাপার লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ব্রাহ্মণসমাজের কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী, তাহাদের স্বীয় সমাজের সংস্কারকল্পে কি করা কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ চিন্তনীয়। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই যে এখন অল্পাধিক পরিমাণে বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইয়াছে তাহা বেশ দেখা যায়। সে সব বিশৃঙ্খলতা বিদূরিত করিয়া শৃঙ্খলাস্থাপন ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই যে একমাত্র প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য তাহাতে সংশয় নাই।

ব্রাহ্মণসমাজের অগ্রণীরা বলেন যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যথাযথ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। যাঁহারা ঐরূপ বলেন—তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্বরূপ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রক্ষার উপায় সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়াছেন কিনা আমরা বিশেষ চিন্তা করিয়াও তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মধ্যে তিনটি জিনিষ আমরা পাই—বর্ণ, আশ্রম এবং ধর্ম্ম। বর্ণ বলিতে কি বুঝায়, আশ্রম বলিতে কি বুঝায় এবং ধর্ম্ম বলিতেই বা কি বুঝায়, তাহা বুঝিলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বুঝা যাইতে পারে। বর্ণ বলিতে আমরা সাধারণতঃ রঙ্ বুঝি। বাচস্পত্য অভিধানে আমরা দেখিতে পাই— কুঙ্কুমে, স্বর্ণে, ব্রতে, শুক্লাদিরূপে, অকারাদ্যক্ষরে, ভেদে, গীতক্রমে, চিত্রে,

তালভেদে, অঙ্গরাগে, গজচিত্রকম্বলে, যশসি, গুণে, স্তুতৌ, ব্রাহ্মণাদিজাতৌ। কেহ কেহ বলেন বর্ণ শব্দ বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন, কাহারও কাহারও মতে 'বর্ণ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। বর্ণ অর্থ—বহিরাবরণ বা বাহ্যরূপ, যাহা দ্বারা আমরা বস্তুর পরিচয় পাই। বর্ণশব্দ যে প্রথম কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণাদি জাতি অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহার নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। শব্দের অর্থ কখনও সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও বা বিস্তার লাভ করে। বর্ণশব্দ প্রথমে শ্বেত কৃষ্ণ প্রভৃতি রঙ্ অর্থেই ব্যবহৃত হইত, পরে উহার অর্থের বিস্তৃতিলাভ ঘটে। ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্রের নাম প্রথমে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে পাই। পুরুষসূক্তে ঐ চারিটী শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা যে জাতি বা বর্ণ অর্থে ব্যবহৃত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদে বর্ণ শব্দের বর্ত্তমান 'জাতি' অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদে যেস্থানে বর্ণ-শব্দের প্রয়োগ আছে সেস্থলে বর্ণশব্দের অর্থ 'গায়ের রঙ্'। বেদে আর্য্যগণ শ্বেতবর্ণ ও অনার্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্বেতকায় ইউরোপীয়গণ যেমন আমাদিগকে কৃষ্ণকায় বলিয়া থাকেন, তেমনই তৎকালে শ্বেতকায় আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে কৃষ্ণকায় বলিতেন।

মনুসংহিতায় জাতি অর্থে বর্ণ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা—ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ।' ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি, পঞ্চম বর্ণ নাই। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণাদি চতুষ্টয় অর্থে বর্ণশব্দের ব্যবহার অপেক্ষা জাতি শব্দের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত।

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের মধ্যে যে বর্ণবিভাগ ছিল না, তাহা বেশ বুঝা যায়। পরন্তু বর্ণবিভাগ যে ছিল তাহাও বুঝা যায় না। বর্ণভেদ যে পূর্ব্বে ছিল না—তাহার স্মৃতিধারা উত্তরকালেও প্রবাহিত হইয়াছে—ইহা বেশ বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই—একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ, দেবো নারায়ণোহ্নেকঃ একোহগ্নির্বর্ণএবচ। অর্থাৎ পুরাকালে এক বেদ, এক দেব, এক অগ্নি ও এক বর্ণ ছিল। মহাভারতেও ঐরূপ দেখা যায়—ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বস্‌ষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্। অর্থাৎ বর্ণের ভেদ নাই, সমস্ত ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সমভাবে সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের সময় পর্য্যন্ত পূর্ব্বে

একমাত্র বর্ণ ছিল, অর্থাৎ বর্ণভেদ ছিল না—এইরূপ অনুস্মৃতি বিদ্যমান ছিল।

ভারতবর্ষে এমন একটী সময় আসিয়াছিল যখন শ্বেতকৃষ্ণ উভয় সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংঘটিত হওয়ায় বাহ্য বর্ণের বা গাত্রবর্ণের দ্বারায় ভেদ নির্দ্ধারণ অসম্ভব হইয়াছিল। সেই সময় বর্ণ বা রঙ্ শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতার বা ভেদের সূচক থাকিল না, তখন গুণকর্ম্ম দ্বারাই ভেদ নিরূপিত হইতে লাগিল। এই জন্যই আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাই—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ"—অর্থাৎ ভগবান্ গুণভেদ ও কর্ম্মভেদ অনুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন—সুতরাং গুণ ও কর্ম্মই ভেদক নির্ণীত হইল।

জাতিভেদ ভাল কি মন্দ—তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে; তবে ইহা স্থির যে গুণকর্ম্মের ভেদ অনুসারে জাতিভেদ নিরূপণ সহজসাধ্য নয়। একথা সত্য যে গুণানুসারে উৎকর্ষ ও দোষানুসারে অপকর্ষের সাধন যুক্তিমূলক বটে, কিন্তু ব্যবহারক্ষেত্রে ইহার ব্যর্থতা পদে পদে প্রতিপন্ন হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে গুণবিচারপূর্ব্বক কাহাকেও ব্রাহ্মণ কাহাকেও শূদ্র করিতে পারা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, তাহা সমাজস্থিতির বা শৃঙ্খলরক্ষার অনুকূলও নহে। সুতরাং বলা যায়—যদি জাতিভেদ রাখিতে হয় তবে উহা বংশানুক্রমিক হওয়াই আবশ্যক। আর যদি ঐ শ্রেণীর জাতিভেদ অনিষ্টকর বলিয়া মনে হয় তবে উহার উচ্ছেদসাধনই কর্ত্তব্য। জাতিভেদ রাখিতে গেলে বংশানুক্রমের সমাদর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, একথা সত্য। বংশানুক্রমিক জাতিভেদ বর্ত্তমানে বহু দোষের নিদান হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা ব্রাহ্মণোচিত গুণকর্ম্মের অধিকারী নহেন, তাঁহারা অপরের নিকট অন্তঃশূন্য প্রাধান্যের দাবী করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। গুণের পূজা সংসারের নিয়ম, গুণহীনকে কেহ সমাদর করিতে চায় না। গুণহীনের সংখ্যাধিক্য ক্রমে সমগ্র জাতির অবমাননার কারণ হইয়া পড়ে, বর্ত্তমানে তাহারই আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

জাতিভেদ-রক্ষার দুইটী উপায়—এক বংশানুক্রম, অপর গুণানুক্রম। পূর্ব্বে ভেদ ছিল না; যখন ভেদ দেখা দিল, তখন বাহ্যবর্ণ লইয়াই ভেদ প্রতিষ্ঠিত হইল। বর্ণের মিশ্রণ হওয়ায় যখন বাহ্যবর্ণ ভেদক থাকিল না, তখন গুণকর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা গেল, আবার যখন তাহা সমাজের কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব প্রমাণিত হইল, তখন সমাজ বংশানুগত ভেদের দিকে ধাবমান হইল। বর্ত্তমানে

সমাজ বংশানুগত ভেদের অসুবিধাই ভোগ করিতেছে। এই বংশানুগত ভেদে যে দোষদর্শন সম্প্রতিই হইয়াছে, তাহা নহে, ইহা বহু পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং বংশানুগত ভেদ যে অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্যও এক সম্প্রদায় শাস্ত্রবিৎ প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বজ্রসূচী উপনিষৎ।

প্রত্যেক যুগে যখন কোন কিছুর প্রতি মানুষের অসন্তোষ জন্মে তখন সাময়িক জ্ঞান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ বিদ্বিষ্ট বস্তুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। বজ্রসূচী উপনিষদের ঋষি তাঁহার গ্রন্থকে দূষণং জ্ঞান-হীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্ অর্থাৎ জ্ঞানিগণের ভূষণ এবং অজ্ঞগণের দূষণ এই বিশেষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ—একথা সত্য কিনা তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে তাহার বিচার করিতে গিয়াছেন তিনি বলেন যে স্মৃতিতে এরূপ উল্লেখ আছে যে ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের শ্রেষ্ঠ, এখন দেখা যাউক্ ব্রাহ্মণ কিরূপ পদার্থ? তিনি প্রশ্ন করিলেন ব্রাহ্মণ কি জীব, অথবা দেহ, কি জাতি, কি জ্ঞান, কি কর্ম্ম কিংবা ধার্ম্মিক? যদি বল 'ব্রাহ্মণ জীব', তাহা হইলে প্রত্যুত্তরে বলা যায়—জীব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি নানা দেহ ধারণ করে, কর্ম্মবশে নানাজন্মে নানা দেহ গ্রহণ করে, সুতরাং জীব ব্রাহ্মণ নহে।' যদি বল দেহই ব্রাহ্মণ, তাহাও নয়; কারণ আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেরই দেহ একরূপ পঞ্চভূতে গঠিত। সকলেরই জরা-মরণাদি তুল্য। যদি বল যে দেহবর্ণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি নিরূপণ করা যায় তাহাও সত্য নয়। কারণ শাস্ত্রে যাহা আছে যে ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ বৈশ্য পীতবর্ণ শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ—এরূপ নিয়ম ব্যর্থ, যেহেতু ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ ও শুক্লবর্ণ শূদ্র দৃষ্ট হয়। আরও বিবেচ্য এই যে দেহ যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে পুত্র যখন মৃত পিতার দেহ দাহ করে তখন তাহার ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে পারে। সুতরাং দেহ ব্রাহ্মণ একথা বলা যায় না। তৎপরে যদি বল জাতিই ব্রাহ্মণ তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ শাস্ত্রমতে জাত্যন্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ মহর্ষি জন্মিয়াছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীগর্ভে জন্মিয়াছিলেন। কৌশিক কুশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, জাম্বুক জম্বুক হইতে উৎপন্ন, বাল্মীকি বল্মীক হইতে এবং ব্যাস কৈবর্ত্ত-কন্যা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, গৌতম শশপৃষ্ঠ হইতে এবং বশিষ্ঠ উর্ব্বশী অপ্সরা হইতে জন্মিয়াছিলেন, অগস্ত্য কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব জাতি ব্রাহ্মণ নহে। যদি বল যে জ্ঞান ব্রাহ্মণ;

তাহাও অন্যায়, কারণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যেও পরমার্থদর্শী অভিজ্ঞ বহু লোক ছিলেন ও আছেন; সুতরাং জ্ঞান ব্রাহ্মণের নির্ণায়ক নহে। যদি কর্ম্মই ব্রাহ্মণ বল, তাহাও অন্যায়। যেহেতু সকল প্রাণীতেই প্রারব্ধ সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য দৃষ্ট হয় এবং সেই কর্ম্ম-প্রেরিত হইয়াই লোকে কার্য্য করে, সুতরাং কর্ম্ম ব্রাহ্মণের নিদান নহে। যদি বল ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ, তাহাও নহে। কারণ অন্যজাতির মধ্যেও যথেষ্ট ধার্ম্মিক দৃষ্ট হয়। ইহার পরে ঋষি স্বয়ং বলিয়াছেন—মুক্ত পুরুষই ব্রাহ্মণ। এস্থলে বেশ বুঝা গেল যে বজ্রসূচী উপনিষদে একমাত্র মুক্ত পুরুষকেই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে সামাজিক ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বস্তুতঃ কিছুই নহে। তাঁহার মতে সামাজিক ব্রাহ্মণাদি ভেদ অনাবশ্যক।

বর্ত্তমানে আমরা ব্রাহ্মণ বলিতে যাঁহারা বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত তাহাদিগকেই বুঝি। তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সগুণ নির্গুণ সবই আছে।

যাঁহারা গোঁড়া হিন্দুনামে পরিচিত তাঁহারা যদি বলেন যে গুণকর্ম্মবিহীন ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে তাহাতে ব্রাহ্মণসমাজ ও অন্য সমাজের কি ইষ্টানিষ্ট তাহা চিন্তা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণসমাজে কৌলীন্যপ্রথা আছে; উহা যে সহস্র দোষের আকর এবং উহা দ্বারা যে কত পাতিত্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহা কি বিচার করা সঙ্গত নয়?

কৌলীন্যপ্রথা জাতিভেদের মত বংশানুক্রমিক হওয়ায় বহু দোষ ঘটিতেছে, অসংখ্য পাপ সমাজে প্রবেশ করিতেছে। অবশ্য একথা সত্য যে কৌলীন্য-প্রথা রাখিতে হইলে উহাকে বংশানুগতভাবেই রাখিতে হইবে; কিন্তু যখন তাহাতে ব্রাহ্মণত্বে মালিন্য-স্পর্শ ঘটিতেছে, তখন ঐ অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় প্রথার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা কি সঙ্গত নহে? ব্রাহ্মণসমাজ যদি স্বীয় সমাজের শুদ্ধিসংরক্ষণে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৌলীন্য পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য ইহাতে সংশয় নাই। আমরা জানিনা, ব্রাহ্মণ-সমাজ এ পর্য্যন্ত কৌলীন্যপ্রথার কবল হইতে স্বসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কি করিয়াছেন?

বর্ত্তমানে আমরা জানিতে চাই যে ব্রাহ্মণসমাজ সেই মন্বাদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যজনাদি ষট্‌কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ হইয়া থাকিতে চাহেন? না, দেশকালানুসারে নূতন কিছু করিতে চাহেন? যদি মন্বাদি শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যগণ্ডীর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারা ব্রাহ্মণসমাজের কল্যাণসাধন করিতে চাহেন তাহা হইলে

তাহা যে অসম্ভব ও অসাময়িক হইকে তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না; সেভাবে জীবনযাপনকারী ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে আছে কিনা জানি না।

মনুসংহিতায় ৪র্থ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের জীবিকা সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—ষট্‌কর্ম্মৈকো ভবত্যেষাং ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ত্ততে। দ্বাভ্যামেকঃ চতুর্থস্তু ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি। কেহ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ৬টী দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। কেহ যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই ৩টী দ্বারা জীবিকার্জ্জন করেন, কেহ যাজন অধ্যাপন দ্বারা এবং কেহ অধ্যাপন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

মহর্ষি মনুর এই আদেশবাণী প্রতিপালন করিয়া চলিতে গেলে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণের চাকরী ব্যবসায় প্রভৃতি সকল ছাড়িয়া কেবল যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ লইয়া থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণসমাজ কি তাহা করিতে প্রস্তুত? আমরা বলিতে চাই যে মহর্ষি মনুর জীবিকাব্যবস্থা বর্ত্তমানে অব্যাহত থাকিতে পারে না; কোনও ব্যবস্থাই অব্যাহত থাকে না, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সমাজ পরিবর্ত্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি মনুর নিয়ম সর্ব্বাংশে বর্ত্তমানে চলিতে পারে না। সত্য, দয়া, পরোপকার, অহিংসা, দান, ভগবদ্বিশ্বাস প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গগুলি চিরদিনই মানবজাতির হৃদয়ে বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু জীবনযাপনের খুঁটীনাটী মানিয়া চিরদিন একভাবে চলিতে হইলে কোনও সমাজের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না—ইহা অতীব সত্য।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে (বর্ত্তমানে কলিকাতার, পূর্ব্বে রাজসাহীর) ভিষক্‌প্রবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রাণাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে আলাপের সময়ে তিনি নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া যে চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি, ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্য নহে। ইহাতে ব্রাহ্মণসমাজের ও পক্ষান্তরে অন্যান্য সমাজের দুর্ব্বলতা সংঘটিত হইতেছে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। এতাদৃশ নিয়মভঙ্গ সমাজের অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে।" বস্তুতঃ মন্বাদি শাস্ত্রে চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণগণকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় নাই। এস্থলে মনুর শাসনের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কিছু বলা হইতেছে না, কেবল যাহা আছে এবং প্রাণাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই উল্লিখিত হইল।

কবিরাজ মহাশয়কে আমি বলিলাম,—আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারাই বংশানুক্রমিক বৃত্তি-ব্যবস্থার ব্যভিচার যে সর্ব্বত্র অমঙ্গলপ্রসূ হয় না তাহা প্রতিপাদিত

হইয়াছে। আপনি চিকিৎসাশাস্ত্রে যেরূপ নিপুণতা লাভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হইতেছে, আপনি যদি স্ববৃত্তি লইয়া থাকিতেন তাহা হইলে আপনার দ্বারা সমাজের এত উপকার হইত কিনা সন্দেহস্থল। আপনি যেমন বৈদ্যবংশে উদ্ভূত না হইয়াও চিকিৎসাশাস্ত্রে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, তেমন ব্রাহ্মণবংশে উদ্ভূত না হইয়াও অপর কাহারও পক্ষে ব্রাহ্মণ-বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা সমাজের উপকার সাধিত হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বন্ধনের শিথিলতায় সমাজের যে উপকার হইতে পারে আপনি তাহার চরম প্রমাণ।”

প্রাচীনকালে জীবিকার্জ্জন সম্বন্ধে এরূপ খুটীনাটী ছিল না। ঋগ্বেদ সংহিতায় ৯ মণ্ডলের ১১২ সূক্তে দৃষ্ট হয় যে মহর্ষি শিশু পবমান সোমের স্তুতিগান করিতে করিতে বলিতেছেন—

নানানং বা উ নো ধিয়ো বিত ব্রাণি জনানাং।
তক্ষণ রিষ্টং রুতং ভিষগ্ ব্রহ্মা সুম্বং তমিচ্ছংতীন্দ্রায়েং দো পরিস্রব।
জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাং,
কার্ম্মারোহ্ম শ্মভিদ্যুভিহিরণ্যং তমিচ্ছতীংদ্রায়েং দো পরিস্রব।
কারুবহং ততো ভিষগ্ উপল প্রক্ষিণী ননা,
নানাধিয়ো বস্তুযবোঽনুগা ইব তস্থিমেংদ্রায়েং দো পরিস্রব।
অশ্বো বোঢ়হা সুখং রথং হসনামুপমন্ত্রিণম্
শেকো রোমণ্বং তৌ ভেদৌ বারিং মণ্ডূক ইচ্ছতীংদ্রায়েং দো পরিস্রব।

এইগুলির মধ্যে ৩য় শ্লোক এখানে প্রাসঙ্গিক। ঋষি ঐ শ্লোকে বলিতেছেন আমি কারু, পুত্র ভিষক্, কন্যা প্রস্তরের উপর যবভর্জ্জনকারিণী। ইত্যাদি। মহর্ষির পুত্র যখন ভিষক্, তখন কবিরাজ মহাশয়ের দুঃখের কোনও কারণ নাই।

এই গেল বৈদিকসময়ের কথা। মনুস্মৃতি-প্রণেতা সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্‌যোগ করিয়াও সফলকাম হন নাই, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিলে জানা যায়—

ঋতানৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন চ
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন।
ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তং অমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতস্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং
সত্যানৃতস্তু বাণিজ্যং তেনচৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।

ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত ও সত্যামৃত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, শ্ববৃত্তি দ্বারা কখনও জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না। ঋত অর্থ উঞ্ছশিল, অমৃত অযাচিতবৃত্তি ; মৃত অর্থ যাচিত, প্রমৃত অর্থ কর্ষণ, সত্যামৃত অর্থ বাণিজ্য ; শ্ববৃত্তি অর্থ সেবা, কদাচ তাহা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না।

ইহা দ্বারা প্রতীত হইল যে ব্রাহ্মণেরা কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারাও জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তবে ব্রাহ্মণ যুদ্ধকর্ম্মে লিপ্ত হইবেন, একথা এস্থলে উক্ত হইল না। পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতির উদাহরণে আমরা জানিতে পারি যে কার্য্যতঃ তাহাও নিষিদ্ধ ছিল না।

ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে যখন যাহার প্রয়োজন হইত, [illegible] [illegible]র প্রবর্ত্তন হইত—এই নিয়ম চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। দেশ-[illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন না করিলে দেশের—জাতির কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়—একথা সকল বুদ্ধিমান্ লোকই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। তবে সমাজে প্রবল বিপ্লব আনয়ন না করিয়া ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যকর ভাবে পরিবর্ত্তন সাধন করিলে তাহাই যথার্থ মঙ্গলের নিদান হয়।

এইস্থানে আমার যুক্তপ্রদেশ-প্রবাসকালের (বহুপূর্ব্বের) একটী ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হইল। একদা কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের গৃহে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বহুলোকের নিমন্ত্রণ হয়। উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বর্ণভেদের বন্ধন যথেষ্ট শিথিল দেখা যায়। আহারের সময় দৃষ্ট হইল যে গালিচার সম্মুখে থালায় আহার্য্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হয় নাই। ইহার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন যে তিনি কায়স্থাদির সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিবেন না, তখন তাঁহাকে স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হইল। আহারান্তে একজন কায়স্থ যুবক বলিলেন 'বর্ত্তমান-যুগের ব্রাহ্মণেরা যাহারা মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়াও শৌচাদি করে না, কখনও স্নানাদি করে না এবং আহারান্তে আচমন করে না তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন আহার করেন, কিন্তু কায়স্থ-স্পৃষ্ট অন্ন আহার করেন না।"

উপরিউক্ত ব্রাহ্মণজাতীয় ব্যক্তি তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তুমি কোথায় এরূপ দেখিলে?" কায়স্থ যুবক উত্তর দিলেন "আপনাকেই অদ্য উহা করিতে দেখিয়াছি।" কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ বলিলেন—ওগো, তুমি কি পাগল হইয়াছ, বলিতেছ কি?' কায়স্থ যুবক বলিলেন 'আমি পাগল হই নাই; আপনি শুনুন—

"আপনি যখন আহার করেন, তখন একটী বিড়াল আপনার পাতের মাছ লইতে চেষ্টা করে, আপনি উহাকে বামহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া আহার করিয়াছেন। ঐ বিড়াল কি স্নান, শৌচ প্রভৃতি নিয়ম মানিয়া চলে? বিড়াল ছুইলে ক্ষতি হয় না, কায়স্থ ছুইলে ক্ষতি হয়, বিড়াল কি কায়স্থ অপেক্ষা উত্তম?" এই কথায় সেখানে হাসির রোল উঠিল। উপরিউক্ত ব্রাহ্মণও সেই হাসিতে যোগদান করিলেন।'

(ক্রমশঃ)

ভক্তি-কথা।

লেখক — শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যমাত্রে সন্ন্যাসের নাম নিরোধ। ভগবান অন্তরের ধন, অন্তর্দৃষ্টি-পরায়ণ না হইলে মনুষ্য তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণের দৃষ্টি একবারে অন্তর-পরায়ণ হইয়া যায়। এজন্য বাহ্য, লৌকিক, বৈদিক কার্য্যে তাঁহাদের মনোযোগ থাকে না। অনন্যভাবে ভগবানের চরণে শরণ লইলে আর কিছু ভাল লাগে না; সুতরাং সকল বিষয়েই উদাসীনতা আসিয়া স্বয়ং উপস্থিত হয়। অপরাপর সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার নাম অনন্যতা। এই অনন্যতার প্রধান শত্রু অহঙ্কার। উহা যতদিন থাকিবে, ততদিন ভগবচ্চরণে অনন্যভাবে শরণ লওয়া ঘটে না। আবার যখন আমি কর্ত্তাও নহি, ভোক্তাও নহি, এই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন ভগবচ্চরণে অনন্যভাবে শরণ লওয়া ব্যতীত উপায় নাই। অহঙ্কার-নিরোধ এবং ভগবানে নিশ্চয় বুদ্ধি দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নচেৎ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।

মানবের মনে একটা প্রশ্ন আইসে, আমরা কত কাল কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে থাকিব? নারদ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধং শাস্ত্ররক্ষণং। ১২ নাঃ সূঃ

যতদিন নিশ্চত বুদ্ধি দৃঢ়রূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ভগবানের চরণে অবিচলিত ভক্তি যতদিন না জন্মিবে, ততদিন শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। কর্ম্ম না করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে জ্ঞানের উদয় হয় না। সুতরাং চিত্ত শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক। মনুষ্যের আত্মা প্রথম অবস্থায় কার্য্য করিয়া আনন্দিত হয়, এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্তির আশা করে। কিন্তু আত্মা যখন ফললাভ করে, তখন আর কার্য্য দ্বারা সুখ পায় না। জ্ঞান-চৈতন্যের অভ্যুদয় হইলে মন আর কর্ম্ম কাণ্ডে পড়িয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে অতিক্রম করে। ভক্তি না হইলে পরমপদ লাভ হয় না। ভগবৎ গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির লক্ষণ। কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান প্রভৃতি শ্রেয়ো-দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, ভক্তগণ একমাত্র ভক্তিবলেই সে সমুদয় লাভ করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদের কোনও বাসনা থাকে না, তথাপি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের পক্ষে সমস্তই সুলভ। কর্ম্মযোগের ফল ভগবৎকৃপা, ভগবৎ-কৃপার ফল ভক্তি, সুতরাং ভক্তিই ফলস্বরূপ। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ মানুষকে কেবল অহঙ্কারী করিয়া তুলে। ভগবান কাঙ্গালের ধন, দরিদ্রের রতন, তিনি অহঙ্কারীর কেহ নন। তিনি দীন-হীনকে বড়ই ভাল বাসেন। ভক্তিই দীনতা আনয়ন করে, সুতরাং ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

রাগাত্মিকা কেবলা ভক্তি হইতে প্রেম জন্মে, ভালবাসার আধিক্য জন্মিলে তখন প্রেম ও প্রেমাস্পদ এক হইয়া যায়। উহাদের আর পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। ইহা বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। যে ব্যক্তি ভগবৎপ্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি অলোকসাধারণ সর্ব্ব-জনপূজ্য। ভগবৎকৃপা ব্যতীত জীবের ভক্তি-লাভ হওয়া সুদুর্লভ।

কিন্তু ভগবান কাহারও প্রতি বিমুখ নহেন। আমরাই ভক্তিহীন, এজন্যই তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত। সর্ব্বত্যাগী না হইতে পারিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সর্ব্বলোকপূজ্যা গোপীগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবানে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। এখন বুঝুন, গোপীপ্রেম কত মহান্, কত উচ্চ। উহা কাম-বিলাস নহে। প্রেমাস্পদের সহিত এক হইয়া যাওয়া। তাদৃশ প্রেম কল্পনা করাও যায় না। সংসার-চিন্তা মানুষকে রজঃ বা তমো-গুণে আবৃত করিয়া ফেলে। কিন্তু ভক্তির উদয় সত্ত্ব ব্যতীত হয় না। ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে মনে সত্ত্বগুণের উদয় হয়। এইজন্য সাধুগণ ইহাকে ভক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভাগবত ১ম, ৮অ, ৩৫

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যাভীক্ষ্ণশঃ, স্মরন্তি নন্দন্তি অবহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজং।

হে কৃষ্ণ! হে মাধব! যাঁহারা তোমার নাম শ্রবণ, তোমার নাম কীর্ত্তন, তোমার নাম গান, তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন, তোমার চরিত্র সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহারাই তোমার সংসারভয়নিবারক চরণাম্বুজের দর্শন প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, ভগবান তাঁহাদের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকেন। আদিপুরাণে ভগবান বলিতেছেন,—

গীত্বাচ মমনামানি, বিচরেন্মম সন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্য চার্জ্জুন।

ভক্তিলাভের উপায় মহাজন ও ভগবানের কৃপা। গঙ্গা পাপ হরণ করেন, শশী তাপ হরণ করেন, কল্পতরু দারিদ্র্য হরণ করেন, কিন্তু সাধুসমাগমে পাপ, তাপ, দৈন্য এই তিনই দূর হইয়া যায়।

মহৎ সঙ্গ দুর্লভ ও অগম্য, কিন্তু অমোঘ। দুর্লভ, কেননা অনেক সুকৃতি না থাকিলে সাধু চেনা যায় না। হয়ত নিকটে একজন মহাপুরুষ বাস করিতে-ছেন, কত দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, আর আমি নিকটে থাকিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। কুক্ষণে এক বন্ধুর মুখে তাঁহার নিন্দা শুনিয়াছিলাম, সেই নিন্দার ভাবই আমার বর্দ্ধিত হইয়া গেল। এইরূপে কত লোক বঞ্চিত হইয়া যায়। এইজন্য সাধু-সঙ্গ দুর্লভ। সাধুর নিকটেও সহজে যাওয়া যায় না। যদি কেহ কেহ স্থানে স্থানে সাধু-সমাগমের কথা শুনিতে পান, যদিও তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তথায় যাইতে পারেন, কিন্তু কয়জন তাহা করিয়া থাকেন? কিন্তু কোনরূপে যদি একবার সাধুসঙ্গ ঘটে, তবে তাহা অমোঘ, নিষ্ফল হয় না। ঈশ্বরের কৃপা হইলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ভগবান দয়া করিয়া যদি তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগকে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করেন, তবেই আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি। নতুবা আমাদের সাধ্য কি যে, সাধু চিনিয়া সঙ্গ করি? কথায় বলে, "তব দয়া বিনে, এ পাপ জীবনে, সাধু ভক্ত জনে, কেমনে চিনিব বল?" কেননা তাঁহাতে ও তাঁহার অনুগত ভক্তে প্রভেদ নাই। ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত এই তিনই এক, একেই তিন। সুতরাং ভক্ত-কৃপা হইলে, তাঁহারই কৃপা হইল মনে করিতে হইবে।

মহাজন-সঙ্গ যেমন ভক্তিলাভের উপায়, কুসঙ্গ তদ্রূপ সর্ব্বনাশের কারণ।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, সর্প, ব্যাঘ্র, কুম্ভীরাদিকে বরং আলিঙ্গন করিও, তথাপি ভগবৎসঙ্গ-বিমুখ পাষণ্ডের সঙ্গ করিও না। অসৎ সঙ্গ, কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ। উহারা তরঙ্গাকারে আসিয়া পরে সমুদ্রের ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে। মানুষের মন স্বভাবতই কাম ক্রোধের অধীন, তারপর যদি আবার সে কুসঙ্গে বাস করে, তাহা হইলে ক্ষুদ্রাকার কামাদি বৃহদাকার ধারণ করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? মায়ার হাত হইতে কে রক্ষা পায়? যে সঙ্গ ত্যাগ করে সেই রক্ষা পায়। সাধুসঙ্গই ভবার্ণবতরণের পোতস্বরূপ। মায়ামুক্ত ব্যক্তি বিধি নিষেধের বহির্ভূত হইয়া যান্। তিনি স্বয়ং ভবসরিৎ উত্তীর্ণ হন এবং লোকদিগকেও উদ্ধার করেন। প্রেমিক ভক্ত স্বয়ং হৃদয়ে রসাস্বাদ করিলেও প্রেমের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পারেন না। কারণ উহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, উহা অনুভবেরই যোগ্য; বোবার রসাস্বাদন তুল্য। তথাপি ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহা গুণহীন, কামনাহীন, প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত, বিচ্ছেদহীন, অতিসূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর অনুভবমাত্র। গুণহীন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কাহারও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে প্রেম করা যায়, তবে তাহা প্রেম নহে। কামনাহীন বলায় বুঝাইল এই যে, ধন, মান, পুত্রাদির আশায় ভগবানে প্রেম অর্পিত হইলে, তাহা প্রেম নহে। অবিচ্ছিন্ন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গুণ দেখিয়া যে ভালবাসা জন্মে, গুণের অভাবে তাহা লোপ পায়; প্রেম তাদৃশ নহে। কামনাজনিত ভালবাসা কামনার পূরণ হইলে লাঘব হয়। ঐ সকল প্রেমে বিচ্ছেদ সম্ভব, কিন্তু, ভক্তের যে প্রেম তাহাতে বিচ্ছেদ নাই। প্রেমের পাত্র হইতে আদান-প্রদানরূপ কোন ব্যাপার থাকে না। আমি কেবল ভাল বাসিয়াই পরিতৃপ্ত, ইহাই প্রেমের রীতি। প্রেমে কোনরূপ ব্যবসাদারী নাই, কোন যাতনাও নাই। ভক্তির প্রগাঢ়তাবস্থায় প্রেমের উদয় হয়। যদ্যপি কথিত আছে, যে, জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ, হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা। বস্তুতঃ ভক্তি সুদুর্লভা হইলেও তৎসাধনে কষ্টসাধ্য ব্যাপার, অর্থব্যয় প্রভৃতি কিছুই নাই, সহজলভ্য। ভক্তি শান্তি ও পরমানন্দরূপা। যিনি ভগবানে ভক্তি করেন, তাঁহার সকল চিন্তা দূর হইয়া যায়। কিছুতেই তাঁহার প্রাণে অশান্তি আনয়ন করিতে পারে না। আর ভক্তি পরমানন্দস্বরূপ, তাঁহাকে ভক্তি করিলে অপার আনন্দে ভাসিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ লোকের বা সমাজের অনিষ্ট চিন্তা করেন না। যাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারা অন্য বিষয় কেন চিন্তা করিবেন?

ভগবান ভিন্ন অন্য বিষয় তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। সুতরাং লোক-ব্যবহার-বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন। তাঁহারা ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত। তাঁহারা, স্ত্রী, ধন, লোক-চরিত্র শ্রবণ করেন না। ভক্তেরা অভিমান, দম্ভ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সদসৎ প্রবৃত্তি ভগবানে আহুতি প্রদান করেন। সুতরাং তাঁহারা সুখদুঃখাতীত, নির্ব্বৈর, শান্ত। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা জগতের ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট ঘটে না। যাবতীয় মানসিক বৃত্তি ভগবদুন্মুখী করিতে পারিলে আর কোনই অশান্তি আসিতে পারে না। ভগবদ্বিমুখতাই সকল অশান্তির মূল।

ভগবন্নাম-গ্রহণে যাঁহাদের অশ্রু, পুলক প্রভৃতি প্রকাশ পায়, তাদৃশ ভগবদ্ভক্তের উৎপত্তিহেতু বংশ পবিত্র হয় ও পৃথিবী পবিত্র হয়। যেখানে হরি-প্রিয় ভক্তজন বাস না করেন সেস্থান নরক-তুল্য। ভক্ত-সমাগমে, তীর্থ প্রকৃত তীর্থরূপে পরিণত হয়, শাস্ত্র সকল সৎশাস্ত্র হয়, এবং কর্ম্ম সুকর্ম্ম হয়। পাপি-সংসর্গ-দূষিত তীর্থ সকল পবিত্র করিতে ভগবদ্ভক্তগণ গমন করেন। যেহেতু তাঁহারা ভগবৎ আশ্রিতহেতু সতত পবিত্র। তাঁহারা ভগবৎসাগরে সতত ডুবিয়া থাকেন। তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না বলিলেই হয়। ভক্ত-সমাগমে পিতৃগণ আনন্দ করেন, দেবগণ নৃত্য করেন। ভগবান বলিয়াছেন, বৎসের পশ্চাৎ ধেনুর ন্যায়, আমি আমার ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকি। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান তিনই এক। ভগবৎপ্রেরিত ভক্তের কৃপায় ভক্তি সুলভা হয়। কৃপাসিদ্ধ ব্যক্তিরা সহজেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। এক ভক্তি ব্যতীত ভগবানকে বশীভূত করিবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং ভক্তিলাভের জন্য, সতত ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রজঃ তমঃ বিলুপ্ত হইয়া সত্বগুণের উদ্রেক হইবে, চিত্ত শুদ্ধ হইবে। মন ভগবদুন্মুখ হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ ভগবানে অনুরাগ-বৃদ্ধি হইবে। উৎকট অনুরাগ জন্মিলেই ভগবান দেখা দিবেন।

বৃথা তর্ক করিয়া সময়াতিপাত না করিয়া ভগবানের মহনীয় মহিমা চিন্তা করাই উচিত। অনন্ত জলনিধি, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, জীবজন্তু, সৌরজগৎ, পৃথিবীর পরিবর্ত্তন, প্রভৃতি চিন্তা করিলে স্বতই মনে ভগবানের মহিমা প্রতিভাত হয়। স্বল্পবুদ্ধি নাস্তিকেরাই তাঁহাকে চিনিতে বা জানিতে পারে না। কিন্তু জীবপূর্ণ জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, স্বতই ভগবানের মহিমা পরিস্ফুট হয়।

হায়! আমরা কি হতভাগ্য! ভগবানকে পাবার অনুরূপ দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বিবেক, মন, অন্তঃকরণ পাইয়াও মায়া-কল্পিত বিষয়প্রপঞ্চে অত্যাসক্ত হইয়া ত্রিতাপতাপে তাপিত, শোকমোহে অভিভূত, অবশভাবে ক্রমশঃ কালের উদরে প্রবেশ করিতেছি। একবারও সেই কালভয়বারণ, কালবরণ, নন্দনন্দনের নাম গ্রহণ করিলাম না, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ একবারও ধ্যান করিলাম না, দুরন্ত কৃতান্ত-ভয়ে ভীত হয়ে, তাঁহার চরণে শরণাগত হইলাম না। হায়! হায়! দিনে দিনে দিন গত হয়ে গেল, কিন্তু দীনবন্ধুর চরণে একদিনও রতি মতি হইল না।

কি দুর্ভাগ্য আমার! আমার ইন্দ্রিয়গণ, মন, বৈরী হয়ে আমার অমূল্য জীবন-রত্ন কালসিন্ধুতলে বিসর্জ্জন দিল। আমি স্বখাত সলিলে নিজ কর্ম্ম-দোষে ডুবিয়া মরিলাম।

জ্ঞানতঃ সুলভামুক্তির্হরিভক্তি সুদুর্লভা।

জ্ঞান হতে মুক্তি সুলভ, কিন্তু হরিভক্তি অতি দুর্লভ। তবে নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ভক্তি সুলভ হইতে পারে। নাম হতেই নামীর রূপ, গুণ ক্রিয়া মনে পড়ে। রূপ, গুণ, ক্রিয়া এই তিনেই বস্তুর সত্তা প্রতীত হয়। এক ব্রহ্ম পদার্থ রূপ-গুণ-ক্রিয়া-শূন্য। ভক্তের ঈশ্বর অনন্ত গুণনিধি। নাম আয়ত্ত হইলে নামীকে বশীভূত করিতে আর বিলম্ব হয় না। নাম সর্ব্বানর্থ নাশ করে, চিত্ত বিশুদ্ধ করে, মায়াপাশ ছেদন করে, অনুরাগ উৎপাদন করে। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। এই শ্লোক হতে বুঝা যায়, যেখানে ভগবন্নাম-গান, সেখানেই ভগবান আছেন। সুতরাং নাম হতে তিনি পৃথগ্‌ভাবে থাকেন না। মায়াবদ্ধ মানব ইহা সহজে বুঝিতে পারে না। কখনও যদি ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ ঘটে, তখন সে বুঝে যে, সে কৃষ্ণদাস। সেও সুকৃতির বল ব্যতীত হয় না। ভক্তির উন্মুখী যে সুকৃতি সেই প্রধান। যাহার বলে জীব ভক্ত-সাধুসঙ্গ লাভ করে এবং শ্রদ্ধাবান হইয়া ভক্তপথ ধরে। নামই সাধ্য আবার নামই সাধন, এক নাম আশ্রয় বলে নামীকে পাওয়া যায়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া যে ভক্তি জন্মে, উহা গৌণ ভক্তি। উহাই পরে চিত্ত শোধন করিয়া মুখ্য ভক্তিতে পরিণত হয়।

কিন্তু নামে রুচি না জন্মিলে ভক্তি সুদুর্লভ। কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অনাদি, চিন্ময়। যেই কৃষ্ণ সেই নাম একই তত্ত্ব। নাম নামী ভিন্ন নহে, নাম চৈতন্য

বিগ্রহ নামীর সহিত বিভিন্ন। ভগবানের নাম, রূপলীলা অভিন্ন, তাঁহাতে জড়ের সম্পর্ক নাই। নাম, রূপ, গুণ, লীলা এই চারিটির মধ্যে নামই আদি, ইহাই সবাকার প্রতীতি। নামেতেই রূপ, গুণ, লীলা ফুটিয়া উঠে, কৃষ্ণের সমগ্র লীলা নামেই বিদ্যমান! বদ্ধ জীব শ্রদ্ধাসহকারে যদি নাম লয়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব বলা যায়। যাহার নামাভাস হয়, সে বৈষ্ণব প্রায়, সে নাম-কৃপাবলে শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। এ সংসারে নামের সমান বস্তু নাই, কৃষ্ণের ভাণ্ডারে নামই পরম ধন। কৃষ্ণ-প্রেমধনই নামের মুখ্য ফল। ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হউক, যাহার মুখ হতে কৃষ্ণনাম বাহির হয়, সে পবিত্র হইয়া উদ্ধার হইয়া যায়। নামাভাসে অন্যান্য শুভ হয় বটে, কিন্তু প্রেমধন পাইতে বিলম্ব হয়। নামাভাস ভেদ করিয়া শুদ্ধ নাম পাইবার জন্য যত্নসহকারে সদ্‌গুরুর সেবা করিবে। যে মুহূর্ত্তে সেই নাম লাভ ঘটিবে, সেই নাম ভজনে সকল অনর্থ নাশ হয়। চিৎস্বরূপ নাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করে। দান, যজ্ঞ, জপ, স্নান প্রভৃতিতে কালাকাল বিচার করিতে হয়, কিন্তু, কৃষ্ণনামে শ্রদ্ধা মাত্রেই অধিকার জন্মে। হরিনামই এই ভীম কলিযুগের ধর্ম্ম, যে অনন্য শ্রদ্ধায় নামাশ্রয় করে, তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। নামে একান্ত রতি জন্মিলে অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান কিছুই করিবে না বা অন্য দেবতার পূজা করিবে না। সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম লইবে এবং ভক্ত-সেবা করিবে, তাহা হইলে অবশ্য কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। নামাভাসেও সর্ব্বপাপ ক্ষয়, চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, প্রারব্ধ ক্ষয় হয়। পাপী অজামিল ইহার আদর্শ দৃষ্টান্ত।

যিনি বৈষ্ণব তিনি জগদ্‌গুরু, জগতের বন্ধু, তিনি সকল জীবের কৃপাসিন্ধু। বৈষ্ণবের কৃপাতেই লোক ভক্তি-লাভের অধিকারী হয়। বৈষ্ণব-দেহে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিদ্যমান, সেই দেহস্পর্শে অন্যের ভক্তির উদয় হয়। বৈষ্ণবের অধরামৃত, চরণ-ধৌত জল এবং পদরজঃ এই তিনই সাধন-সম্বল। ভক্তিলাভের সেতুই ভক্ত, সেই ভক্তসঙ্গ মিলিলে নাম আপনা হতে মুখ হইতে বহির্গত হয়। জ্ঞান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা যোগ যত কিছু আছে নামের তুল্য কিছুই নহে। পরমারাধ্য নামই গুরুরূপে জগতে বিরাজমান। নামের যে অনন্ত শক্তি আছে, তাহাও সুকৃতি ভিন্ন বুঝা কঠিন। কর্ম্মকাণ্ডে বিবিধ ফল-শ্রুতি আছে, কিন্তু নামতত্ত্বে কোনও ফল-শ্রুতি নাই। চৌদ্দলোক ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণ যে ফল না পান, একনামে সে ফল সহজে লাভ হয়। নাম শুদ্ধ সত্বময়, ভাগ্যবান জীব সেই নাম আশ্রয় করেন। নামে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিলে পাপে আর বুদ্ধি থাকিতে

হয় না। পূর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় ও চিত্ত শুদ্ধ হয়। নাম-প্রভাব স্মরণ করিয়া যে পাপে রত হয়, যমযাতনাদি ভোগেও তাহার নিস্তার নাই। হয়ত শুনিয়াছে—নাম বলে যত পাপ হরে, জীবের তত পাপ করিবার শক্তি নাই। এই বিশ্বাসে যদি সে পাপে আসক্ত হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তাদি কোনরূপে তাহার নিস্তার নাই। বৈরাগীর বেশ ধারণ করিয়া কামিনী-কাঞ্চনের আশায় যে দেশে দেশে ভ্রমণ করে, তাহার কোনরূপে নিস্তার নাই। সুতরাং কপটতা বিসর্জ্জন দিবে এবং উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিবে। তাহা হইলে নামই প্রহরী হইয়া পাপবাসনা আর চিত্তে প্রবেশ করিতে দিবে না। কিন্তু নামে দৃঢ়প্রত্যয় হওয়া চাই। দৃঢ়প্রত্যয়ের নামই শ্রদ্ধা। তাহা হইলেই নামে অধিকার হয়। শ্রদ্ধা না হইলে, নামে অধিকার হয় না, রুচিও জন্মে না। দ্বিজত্ব, জ্ঞানিত্ব, মান, যশ, ধন ইহার একটীও নামাধিকারের হেতু নহে। বানরকে বস্ত্র দিলে, সে যেমন তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে, সেইরূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম দিলে নামের অপব্যবহার হয়।

(ক্রমশঃ)

মায়া, ব্রহ্ম লয়ে কেন এত গো বিবাদ ?

লেখক—শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

(১)

মায়া, ব্রহ্ম লয়ে কেন এত গো বিবাদ ?
মায়া যে গো মহামায়া, ব্রহ্মের আকার।
তলে শুয়ে মহাকাল, বুকে শক্তি-পাদ,
এইত ব্রহ্মের খেলা, ব্যক্ত অনিবার॥

(২)

হতে চাহ লীন, মন! ব্রহ্ম-হৃদি মাঝ;
ও হৃদি শক্তির গৃহ, ভাব না ত তাহা।
সে গৃহে যদি গো সাধ করিতে বিরাজ,
চাহিও শক্তির পূজা, মহামায়া যাহা॥

(৩)

তবে কেন ব্রহ্ম হতে মায়া কর দূর ?
মায়ারে করিয়া কায়া, আগে চল মন !
তবে ত ব্রহ্মেতে লীন, করি সব চূর,
শক্তির দাপটে হবে ইহাই সাধন ॥

(৪)

মায়া যে কর্ম্মের ক্ষেত্র শক্তি-সিন্ধু সেই ;
সাকার হলেও মায়া, নিরাকার তেঁই ।
মাতা ত প্রকাশ সেথা স্তন্য বুকে যেই,
মায়া, মাতা, বল মন ! তবে ভিন্ন কই ?

(৫)

তোমার হয়েছে ভারি বিপদ কর্ম্মেতে,
তা বলে মায়া বা কর্ম্ম হয় কি উড়াতে ?
মানি বটে চাই খুব ওদুই ভাসাতে,—
জল যে ভাসাতে গেলে মিলে গো জলেতে ॥

(৬)

নিরগুণ নিরাকার ব্রহ্ম যারে বল,
সেই সগুণ সাকার, কর্ম্মের আকার ।
তবে কর্ম্ম ভিন্ন মন ! কেমনে সে চল ?
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম খালি করহ বিচার ॥

(৭)

যদি বল কর্ম্ম-ফাঁদে চলা বড় ভার,
তোমারে বাহবা দেই, বুঝ বটে সার ।
সার বুঝে অসারেতে তবুও বিকার !!!
এ আকার কদাকার ;—নাহি কি নিস্তার ?

(৮)

আছে, আছে সুনিশ্চিত ; তাই চণ্ডী, গীতা,—
কর্ম্মের প্রণালী দিয়া নির্ব্বাণ প্রচার ।
কর্ম্ম কর, সব ক্রিয়া হবে ফলযুতা,—
তবুও মজাটি, ফলে নাহি অধিকার !!!

(৯)

"দর্শন" দেখায় তোমা সৎচিদানন্দ,
কর্ম্মই নয়নযোগে মিলায় তাহায়।
তখন থাকে না আর কোন কিছু দ্বন্দ্ব,—
ব্রহ্মেতে মায়াতে রহে বিলীন দশায়॥

(১০)

কর্ম্মেতে এন না ভ্রান্তি, সেই মহামায়া.
জেনোগো কর্ম্মই শক্তি, মুক্তির সোপান॥
কর্ম্ম কর সুবিচারি'; সাকারের কায়া
ধীবর জালের মত টেনে তুলে আন॥

(১১)

দেখিবে, গুটাবে যবে, অতি সুকৌশলে,
পুরেছে মনের সাধ; গৃহ পানে মন
ছুটেছে আকুল হয়ে, সব দু'খ ভুলে,
কতক্ষেতে লভেছে বলি' সাধনার ধন।

যজ্ঞে ও পূজায় পশুবলির আবশ্যকতা॥

লেখক—শ্রীমন্মথকুমার রায় বি, এল, বি, সি, এস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অবশ্য সকল মানবের কাছে এই পশুবলির অর্থ এক নহে। যাহারা সাত্ত্বিকভাবে অণুপ্রাণিত তাহাদের নিকট এই পশুবলির অর্থ এক; আর যাহারা রাজসিক ও তামসিকভাবে অণুপ্রাণিত তাহাদের নিকট পশুবলির অর্থ অন্যরূপ।

যাহারা সাত্ত্বিকভাবে চাহে ভজিবারে,
জগৎ-কারণ হরি, ভক্তির সম্ভারে—
ঢালিয়া প্রেমের অর্ঘ্য অশ্রুর অঞ্জলি—
তাহারা করে না কভু অন্য পশুবলি—

তাহারা আপন পশু দেয় বলিদান
যাহাতে মহদ্‌ভাবে দীপ্ত হয় প্রাণ।

যাহারা সাত্ত্বিকভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে চান—তাহারা ভগবানের প্রীত্যর্থে মেষ মহিষ অন্য পশুবলি দেন না—তাহারা বলি দেন নিজেদের মধ্যে যে পশু বা পাশবিক প্রবৃত্তি আছে—তাহাই। তাহারা কেহ পাশবিক প্রবৃত্তি—কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতিকে বলি দিয়া নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন করিয়া ভগবৎপদে নির্ম্মল প্রেমের ও ভক্তির অর্ঘ্য ঢালিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

মানবের মধ্যে পশুভাব ও দেবভাব দুইই বর্ত্তমান। আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি ক্রিয়া সম্বন্ধে মানব ও পশুর মধ্যে প্রভেদ নাই—মানবের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এই যে—

মানবের মধ্যে আছেন শায়িত ঈশ্বর
আত্মারূপী ভগবান কল্যাণ-আকর—
দেবভাব পশুভাব—দুই ভাবে নর
জীবনের কর্ম্মে রত রহে নিরন্তর।

মানবের মধ্যে পশুর স্বাভাবিক ভাব যথা—কামক্রোধ লোভ প্রভৃতি যেমন ক্রিয়া করিতেছে, তদ্রূপ দেবভাব যথা দয়া, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতিও ক্রিয়া করিতেছে। এই দুইভাবে সর্ব্বদা সংগ্রাম চলিতেছে; তাই মানব-জীবন এত উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ—তাই মানবজীবন এত কঠিন পরীক্ষা-ক্ষেত্র। যে মানব যে ভাবের অধিক বশ, সে মানব সেই পরিমাণে অধিক পশুভাবাপন্ন বা দেবভাবাপন্ন হয়—এবং তাহার কর্ম্মের ফলাফল ও জীবনে অধঃপতন ও উন্নতি তদনুযায়ী হয়।

তাই যাহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের অধিকার অধিক, তাহারা নিজেদিগের মধ্যের পশুভাবগুলি বলি দিয়া দেবভাবকে অধিক প্রবল ও জাগ্রত করে।

এই সত্ত্বগুণযুত মানবের পক্ষে পশুবলি অর্থ জীবহত্যা নয়,—নিজেদিগের স্বভাবগত পাশবিক প্রবৃত্তিগুলির বলি। ইহাদের জীবনে এইরূপ পশুবলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আছে।

(ক্রমশঃ)

উচ্ছ্বাস।

(আকাশের প্রতি।)

লেখক—সম্পাদক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

হে আকাশ, ক্ষম যত অপরাধ মম,
প্রাকৃতের ন্যায় তোমা বলেছি "অধম" ;
এ ভব-সংসার মাঝে যারা স্বার্থপর,
পরের নিন্দায় তারা সদাই মুখর।
অধম নহ গো তুমি, অধম যে আমি,
স্বার্থান্ধ হয়েছি আজি, স্বার্থ মাঝে ভ্রমি।
চাহিনা চাহিনা শুনিতে তোমার গান—
যতদিন নাহি পারি দিতে মম প্রাণ।
পেয়েছি পেয়েছি আমি নিগূঢ় সন্ধান,
প্রাণ দিয়া প্রাণ পাব শুনি তব গান॥

নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(৫)

শুনিয়াছি বহুকাল নামরূপ গান—
পার্থিব সঙ্গীত শান্তি নাহি করে দান।
রূপের দীপকে দগ্ধপ্রায় মম প্রাণ
অরূপের রাজ্যে লয়ে কর শান্তি দান।
নামের মোহেতে মুগ্ধ আছি বহুদিন—
অনামের দেশে লয়ে কর মোহহীন।

নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

গীতা-নাটক।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। ভগবন্! তুমি কৃপা কোরে আমার নিকট যে অধ্যাত্মতত্ত্বের পরম গুহ্য কথা বর্ণনা কল্লে তা শ্রবণ ক'রে আমার মোহ দূর হয়েছে। পদ্মপলাশলোচন! তুমি ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় ও তোমার আত্মতত্ত্ব যা ব্যাখ্যা কল্লে তা সমস্তই যথার্থ। পুরুষোত্তম! তোমার ঐশ রূপ দেখে আমি স্তম্ভিত ও কম্পিত হয়েছি। তুমিই সনাতন পরমাত্মা পুরুষ ইহাই আমার ধারণা, তাতে কোন সংশয় নাই। তোমার অদ্ভুত উগ্রমূর্ত্তি দর্শন কোরে ত্রিলোক ব্যথিত হচ্ছে। যাবদীয় যোদ্ধৃবর্গ তোমাতেই প্রবেশ করেছে দেখ্‌ছি। হে বিষ্ণো! তোমার গগনস্পর্শী প্রজ্বলিত মহাতেজস্বী নানাবর্ণ-খচিত বিস্ফারিত মুখমণ্ডল ও বিশাল প্রদীপ্ত নেত্র-সমূহ দেখে আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়েছে, আমি আর অন্তরে ধৈর্য্য ধারণ কর্ত্তে সমর্থ হচ্ছি না। জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

গীত।

অন্তরে অন্তর্যামী, অন্তরের সব জান তুমি,
ব'লে কি জানাব আমি, ওহে দীন দয়াময়।
শুনিয়া অধ্যাত্মবাণী, বিগত মোহ, হ'য়ে জ্ঞানী,
রূপ ঐশ যাচে প্রাণী, জ্ঞানাদৃষ্টে হও হে সদয়।

হে ভগবন্! আমি তোমার নিকট শরণাগত হলেম। এখন আপনি কে এবং কি হেতু এ সমরক্ষেত্রে এ বেশ ধারণ কোরে বিরাজমান কর্চ্ছেন তা আমি সম্যক্ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। যদি অনুগ্রহ কোরে আত্মপরিচয় দেন তবে কৃতার্থ হই। আমাকে যদি আত্মপরিচয় দিবার উপযুক্ত মনে করেন, তবে আমাকে আর অন্ধকারে না রেখে পরিচয় দিয়া আলোকে উপনীত করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত।) আমি সাক্ষাৎ করাল-কাল কাল, পার্থ দেখ প্রতিপক্ষ সৈন্যদল
সংহারে হয়েছি প্রবৃত্ত সকল, সাহায্য বিনা তোমার হবে হত।

অতএব উঠ, যশ তুমি লভ, শত্রুনাশি রাজ্যসমৃদ্ধি সংভোগ
পূর্ব্বে যে তাহারা নিহত সব, সব্যসাচী হও নিমিত্ত তুমি ত।
দ্রোণ ভীষ্ম আদি জয়দ্রথাপর, কর্ম্মসূত্রে আছে যত বীরবর,
জীবনসত্বে হন্তা আমি সবাকার, নিঃশঙ্কে তবে যুদ্ধে জয় কর ত।

অর্জ্জুন! কর্ম্মসূত্রে বাধ্য হোয়ে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধে হত হবে, স্বয়ং মহাকাল আমি তাদের নির্জীব কর্ত্তে প্রবৃত্ত; অতএব তুমি গাত্রোত্থান কর। তুমি আমার নিমিত্তরূপ অস্ত্রের স্বরূপ হ'য়ে যুদ্ধে জয় ক'রে সুখে ও নিরাপদে রাজ্যসমৃদ্ধি ভোগ কর। তোমার বীরত্বের মহাযশ ঘোষিত হবে।

অহং করোমি ইতি বৃথাভিমানং স্বকর্ম্মসূত্রে গ্রথিতোপি নরঃ।

অর্জ্জুন! নিজ কর্ম্মে জীব কষ্ট পায়। লোকে বলে, মূর্খে বলে, ভগবান কষ্ট দিচ্ছেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের মৃত্যুকাল উপস্থিত। অতএব হে অর্জ্জুন! কাকতালীয়বৎ সাময়িক শর নিক্ষেপমাত্রে তারা হত হবে; লৌকিক দৃষ্টিতে বধ কর্চ্ছো বটে; বাস্তবিক তুমি বধ কর্চ্ছো না, তারা ইতিপূর্ব্বেই সূক্ষ্মদেহে হত হয়েছে এবং তজ্জন্য তুমি পাপী হবে না। দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণকে আমি স্বয়ং সূক্ষ্মদেহে বিনাশ করেছি, এক্ষণে বাহ্য দৃষ্টিতে লোকতঃ তুমি তাদের স্থূলদেহ ধ্বংস কর! তাতে ধর্ম্মতঃ পাপ না হোয়ে অদৃষ্টবশতঃ বরং সুখ ও যশ লাভ কর। ক্ষত্রিয়ের এইই ধর্ম্ম। তুমি কেবল নিমিত্তভাগী মাত্র! তোমাকে আমি আর আত্মপরিচয় কি দিব? আমি অবতাররূপে এই যুগে জন্মগ্রহণ কোরে ভূভারহরণ কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি আমারই এক অংশ, এজন্যে তোমাকে নর-নারায়ণ বলে।

অর্জ্জুন। (শ্রীকৃষ্ণের পদ ধরিয়া) কৃষ্ণ হে! তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম কর্চ্ছি। তুমি বায়ুরূপে জীবের জীবন-রক্ষক, যমরূপে সংহর্ত্তা, তেজো-রূপে জগৎ-উত্তাপক, এইরূপ অনন্তরূপে তুমি সংসারে বর্ত্তমান। কে তোমার লীলা বুঝ্বে? মাতুলপুত্র-বোধে তোমার প্রতি নানা অবৈধ বাক্যালাপ যথা—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা প্রভৃতি বাক্যপ্রয়োগ ক'রেছি। আমি আপনার একান্ত শরণাগত ভক্ত ও আশ্রিত। আপনি ব্যতীত আমার আর কেউ নাই। আপনার অনেক ভক্ত আমার মত আছে সত্য, কিন্তু আপনি ব্যতীত আমার আর কেহই নাই। আপনি প্রসন্ন হউন্। বাসুদেব! তোমার নাম কীর্ত্তন কর্লে সকলেই হৃষ্ট, রোমাঞ্চিত ও অনুরক্ত হ'য়ে থাকে।

যেরূপ পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের এবং স্বামী প্রিয়তমার অপরাধ সহ্য কোরে থাকে, সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবে।

স্তুত্যর্থে গীত।

হৃষীকেশ! তব শ্রবণ কীর্ত্তন, মাহাত্ম্যে জগৎবাসী হৃষ্ট-মন'
দিগ্দিগন্তে ধায় যত সুরগণ, সিদ্ধ প্রণমে সর্ব্বৈকান্তিক-মন,
জগৎ-প্রণম্য স্বয়ং না হবে কেন, পাপ-ধর্ম্ম-বিজ্ঞ নর-নারায়ণ।
অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস হন, সদসৎ পরাক্ষর ব্রহ্মার কারণ॥
তুমি আদিদেব পুরুষ পুরাণ, নিখিল জগৎ আধার কারণ,
সৃষ্টিস্থিতি-লয়-সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞান, পরমধাম তুমি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
নমামি পাদপদ্মে সর্ব্বত্র দেব, অসংখ্যবারে পুর পশ্চাতে তব
অনন্তবীর্য্য ভ্রমে প্রমাদ প্রণয়ে, সখা অবিধি ডাকি হয় ক্ষমার্হ মন,
বিহার শয্যাসন ভোজনে কত, করেছি কুকর্ম্ম সর্ব্ব সমক্ষে যত
অপরাধ মম, ক্ষমহে অচ্যুত, না জানি করেছি কত তুচ্ছজ্ঞান,
পিতা পুত্রে, বন্ধু মিত্রে, স্বামী স্ত্রীর দোষ সহ্য করে উপেক্ষি যেমন,
তথা সাষ্টাঙ্গে ভূমে পতিত অর্জ্জুন, রক্ষ শরণাগতে করুণা-নিধান।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! আমিত তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হোয়েছি। তুমি এতাবৎ মোহাচ্ছন্ন থাকায় তা বুঝ্তে পার্চ্ছিলে না। তুমি এখনও নিষ্কাম নও, সেজন্য তুমি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ কর্ত্তে পাচ্ছ না। পাণ্ডুনন্দন! আত্মাই শ্রেষ্ঠ গতি ও শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়। অনন্যতম ভক্তিই ভগবদ্প্রাপ্তির প্রধান কারণ; ভক্তিহীন কোন কর্ম্মেই ভগবানকে লাভ করা যায় না। জন্ম জন্মান্তর কঠোর তপস্যাচরণ কোরেও দেবদুর্লভ আমার এই লোকাতীত অসামান্য রূপ দর্শনে সকলেই অক্ষম। কেবল একান্ত শরণাগত মদ্ভজনপর হোয়ে জাগতিক ব্যাপারে দ্বেষাদ্বেষশূন্যতা অভ্যস্ত থাক্লে এবং সকল কর্ম্ম-ফল "শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু" জ্ঞানে জীবনাবধি কর্ম্মফল দান কর্ত্তে কর্ত্তে অন্তে আমাকে ভক্তিলব্ধজ্ঞানে বা প্রেমভক্তি-ভরে প্রাপ্ত হন। সুপক্ক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে রোপণ কর্লেই যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তা নয়। তাতে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। অতএব ভক্তিপূর্ণ হ'য়ে আমার উপর আস্থা স্থাপন কর্ত্তে পাল্লে অনায়াসে ভবযন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ কোরে আমাকে লাভ করা যায়।

গীত

আমাতে একাগ্রচিত্ত, নিত্যযুক্ত যাঁরা
ভক্তিতে করেন ধ্যান, যোগিশ্রেষ্ঠ তাঁরা।
জিতেন্দ্রিয় আর যাঁরা সমদর্শী হন
সর্ব্বভূতহিতে রত নির্ব্বিকার-মন!
অচিন্ত্য অব্যক্ত, ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ,
ধনঞ্জয়! তাঁরা সবে মোরে প্রাপ্ত হন।
তুমি কেন আর চিন্তা কর চিন্তামণি পেয়ে
ভক্তিযোগে বান্ধা আছি তোমার হৃদয়ে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! যে যে ভক্তগণ নিরন্তর অনন্যমনে ভক্তিযোগে তোমার সাকাররূপের শরণাগত থাকেন এবং যে যে ব্যক্তি তোমার অক্ষর অব্যক্ত নির্গুণ স্বরূপের ধ্যান করেন এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী? আমাকে আপনি যে ভাবে ব্যক্ত কল্লেন সে কেবল আপনার মহত্ব মাত্র। আমি স্বয়ং আমাতে সেরূপ কোণ গুণ উপলব্ধি কর্ত্তে পারি না। যদি আমাকে দয়ার পাত্র মনে করেন তবে শ্রেষ্ঠযোগী সম্বন্ধে যে উপদেশ থাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে, ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ আমার সগুণ রূপের উপাসনা করেন, আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির অধিক ক্লেশ হ'য়ে থাকে, কেননা, নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে অতি কষ্টসাধ্য। তুমি আমাতেই মনবুদ্ধি স্থির কর, তবেই দেহান্তে অভেদভাবে আমাতেই অবস্থান ক'রবে। যদি কেহ আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর্ত্তে না পারে, তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে লাভ কর্ত্তে ইচ্ছা ক'রবে। যদি অভ্যাসেও অপারক হও তবে আমার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান কর। যদি ভগবৎ কর্ম্মানুষ্ঠানেও অপারক হও তবে আমার যোগ আশ্রয় ও সংযতাত্মা হোয়ে সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ কর। যিনি সদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা, দৃঢ়-নিশ্চয়, ও মনবুদ্ধি আমাতে অর্পণ কোরেছেন, ঈদৃশ ব্যক্তিই মদ্ভক্ত এবং আমার প্রিয়। যাঁহার দ্বারা কেহ উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ বিষাদ ও ভয় ত্যাগ কোরেছেন তিনিই আমার প্রিয়। যিনি শত্রু মিত্রে সমদৃষ্টি, মান ও অপমানে সমান জ্ঞানী, শীত, উষ্ণে সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গ-বর্জ্জিত, মৌনী, যৎকিঞ্চিন্মাত্রে সন্তুষ্ট ও স্থিরমতি এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়।

গীত।

"অভ্যাস" হইতে শ্রেষ্ঠ "বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞান"
সেই জ্ঞান হতে শ্রেষ্ঠ স্থিরমনে "ধ্যান"।
"ধ্যান" হ'তে "কর্ম্মফল-ত্যাগ" শ্রেষ্ঠ জান;
সর্ব্বকর্ম্ম-ফলার্পণ কর ভগবান।
নিষ্কাম ত্যাগেতে হয় আসক্তির ক্ষয়
আসক্তি বিনাশে মুক্তি "চিরশান্তিময়"॥

জুন। কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ কি তা আমি জান্তে ইচ্ছা করি। যদি কৃপা হয় আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। কৌন্তেয়! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় অনাদি এবং দেহ ইন্দ্রিয়াদির বিকার ও গুণ সমূহ প্রকৃতি হ'তে উৎপন্ন জান্‌বে। যাবদীয় কার্য্য ও কারণ এবং কর্ত্তৃত্বের হেতুই প্রকৃতি। পুরুষ সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ ব'লেই উক্ত আছে। যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত বিধায় প্রকৃতি হ'তে উদ্ভূত গুণ সকল ভোগ ক'রে থাকেন। এক্ষণে পুরুষ-প্রকৃতি-উৎপন্ন ঐ সকল গুণ সঙ্গদোষেই উত্তম অধম দেহ প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ নিজে দিব্যচক্ষু দ্বারা ধ্যানযোগে আত্মসাক্ষাৎ লাভ করেন। কেহবা সাংখ্যযোগ, কেহবা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে সম্যক্ দর্শন করেন। আবার কেহ কেহ ঐ সকল উপায় না জানায় অন্যের নিকট শ্রবণ কোরে উপাসনা করেন। এরূপ ব্যক্তিরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ভরতর্ষভ! স্থাবর জঙ্গম যে কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় সে সমুদয় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে উৎপন্ন জান্‌বে।

অর্জ্জুন। ভগবান! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কাকে বলে? দয়া ক'রে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! এই শরীরই ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রবেত্তাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ ব'লে জান্‌বে। কৌন্তেয় ইহা ব্যতীত জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান না জন্মিলে জ্ঞেয় কি তাও জানা যায় না। অতএব সর্ব্বদা অভিনিবেশপূর্ব্বক যাতে জ্ঞান লাভ হয় সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! জ্ঞান ও জ্ঞেয় আবার কি? অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন। আমি আপনাকে কত প্রকারেই বিরক্ত কচ্ছি, দয়া কোরে দোষ গ্রহণ কর্ব্বেন না।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, পুত্র-দারা-গৃহাদিতে অনাসক্তি এবং আমাতে অনন্যমনে ঐকান্তিক ভক্তিপ্রদর্শন, নির্জ্জন একান্তস্থানে বাস ও বিষয়ী সামাজিক লোকের সঙ্গত্যাগ, পরমাত্মা-জ্ঞাননিষ্ঠা ও মোক্ষ-সাধনের জন্য অভেদ দৃষ্টি, এ সমস্ত জ্ঞানপদবাচ্য। এদের বিপরীত সমই অজ্ঞান নামে খ্যাত। যাঁহাকে জানিলে অমৃতভোগ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয় তিনি জন্মরহিত, সগুণ পদার্থের অতীত এবং প্রাণেরও অতীত। যিনি এই বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত হো'য়ে অবস্থান কর্চ্ছেন, যিনি স্থাবর জঙ্গম ও ভূত সকলের অন্তরে বাহিরে আছেন। তিনি সূক্ষ্মত্বহেতু অবিজ্ঞেয় এবং জ্ঞানীর অন্তরস্থ, কাজেই অজ্ঞানীর দূরস্থ। যিনি ভূতজগতের সৃষ্টি পালন ও সংহারকর্ত্তা এবং সর্ব্বান্তর্যামী, তিনিই জ্ঞেয়।

অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ। আপনি বল্লেন যে আপনি বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত হো'য়ে আছেন, তবে ভূতগণ কেন তা দেখ্‌তে পায় না?

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডুনন্দন! পূর্ব্বেই ব'লেছি আত্মা স্বীয় প্রকৃতি থেকেও নির্লিপ্ত। আত্মা নির্বিকার, কারণ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক।

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ "

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক-দুঃখেন বাহ্যঃ॥"

কৌন্তেয়! যেমন সর্ব্বলোক-চক্ষু বা সর্ব্বলোক-প্রকাশক সূর্য্য জাগতিক পদার্থসমূহের দোষে দূষিত হন না, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তর্যামী আত্মা সকল দেহে উত্তাপ ও চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হ'লেও দেহের বা কাহারও সুখ-দুঃখাদিতে লিপ্ত হন না; একারণেই ভক্ত ও জ্ঞানী ব্যতীত কেহই আমাকে দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু যাঁরা মৎপরায়ণ হো'য়ে আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকেই ধ্যান করেন ও আমার উপাসনা করেন তাঁরাই কেবল আমাকে দেখ্‌তে পান এবং আমিও তাঁহাদিগকে অচিরে মৃত্যু ও সংসার হ'তে উদ্ধার কো'রে থাকি। জ্ঞান-চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সর্ব্বদাই আমাকে দেখে, অজ্ঞানী দেখ্‌তে পায় না।

পঞ্চদশ দৃশ্য

সঞ্জয়। মহারাজ! যুদ্ধারম্ভ হ'তে ত এখনও কালবিলম্ব বোধ হচ্ছে।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! কি কারণ কত কালবিলম্ব হ'তে পারে? অশুভস্য কাল-হরণম্।

সঞ্জয়। কৃষ্ণ কি লীলাখেলা কর্চ্ছেন, তা তিনিই জানেন। তৃতীয় পাণ্ডবকে নানারূপ উপরোধ অনুরোধ কচ্ছেন। (স্বগত) তা আর বড় বেশী বিলম্ব হবে না, অর্জ্জুনের মোহ-ত্যাগ প্রায় হয়েছে; এখন সামান্যকাল মধ্যেই তাঁহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবেন।

মহারাণী গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। মহারাজ! কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বৃত্তান্ত ত আমি এইক্ষণ কিছুই পাচ্ছি না। আপনার কাছে তাই আবার খোঁজ নিতে এলাম।

সঞ্জয়। মহারাণি! যুদ্ধ ত এখনও আরম্ভ হয় নি। তবে আরম্ভ হবার আর বেশী কাল অপেক্ষা নাই। আপনি অন্তঃপুরে অবস্থান করুন। সংগ্রামের সংবাদ যথাসময়ে আমি জানাব।

ধৃতরাষ্ট্র। মহারাণি! পুত্রগণের প্রতি আর স্নেহাকুলা হ'য়ো না। কালের কুটিল গতি, দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ত্রিভুবনে মহাবীর নামে খ্যাত। তাঁরাও জীবন দান কর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছেন।

সঞ্জয়। গান্ধার-রাজতনয়া! আপনার অপরাধে অসংখ্য বীর এই সংগ্রামে নিহত হবে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি নিষ্ঠুর, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী ও গুরুজনের অবাধ্য। আপনি মাতৃস্নেহ-পরবশ হ'য়ে তাদের দুষ্কার্য্যের প্রশংসা কর্ত্তেন। এখন তারই ফলভোগ কর্ত্তে হবে। যা'হোক অতঃপর দুঃখ পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য-কর্ত্তব্য।

গান্ধারী। তাত বটেই। সঞ্জয়, মা যে কুপুত্রকেও কোলে কোরে থাকে। মা হওয়া যে কি জ্বালা, তা কি জান না? যা হোক, মহারাজকে দেখো।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু-সমাজ-তরী।*

লেখক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ।

উঠিছে কাল তরঙ্গ
কা'র শক্তি করে ভঙ্গ
ছুটিছে করিয়া রঙ্গ
বাঁধ ভঙ্গপ্রায়।১

সে তরঙ্গাঘাতে পড়ি
নিজ ধর্ম্ম রজ্জু ছিঁড়ি
হিন্দুর সমাজ-তরী
ডুবে যায় প্রায়॥২

তরীর আরোহী যাঁরা
অসময় বুঝি তাঁরা
হ'য়ে নিজ লক্ষ্যহারা
করে যে যেমন।৩

কেহ উঠাইয়া হাল
টানিয়া দিতেছে পাল
রাখিতে তরীর চাল
করে প্রাণপণ॥৪

রক্ষাহেতু মনে করি
কেহ গুণ কাঁধে ধরি
রক্ষিতে সমাজতরি
অলক্ষ্যেতে ধায়।৫

অযথা টানাতে রশী
তরণী যে যায় ফাঁসি
না নিরখে তাহা আসি'
হ'য়ে মুগ্ধ হায়॥৬

* উপরিউক্ত পদ্যগুলির অনেক শব্দের ব্যঙ্গার্থ আছে। সুধীগণ তাহা বুঝিয়া লইবেন। বাহুল্যভয়ে ফুট-নোটে তাহা লেখা হইল না।

কেহবা তরঙ্গ-ভয়ে
তরী হ'তে লম্ফ দিয়ে
করে সমাজ-হৃদয়ে
　　কম্পা উৎপাদন।৭

পড়িছে অকূল জলে
মনে করি অবহেলে
কূলে লবে বাহুবলে
　　তরণী মগন॥৮

কেহবা ধারণা করি
বহুকালে জীর্ণ তরি
কুসংস্কারে শীর্ণ ভারি
　　রাখিয়া কি হবে?৯

ভাল বুঝি অন্য তরী
এক পায়ে আশ্রয় করি
অন্য পায় নিজ তরী
　　ডুবাইবে ভাবে॥১০

কিন্তু হায়! তা' কি হয়,
তাঁর দুর্দ্দশা পায় পায়
লিখিয়া কি হ'বে তায়
　　ভাবুকে বুঝুন॥১১

ঐ ভাবে যে তরী-রক্ষা
আদর্শ চরিতে দীক্ষা
নীতি-রীতি কর্ম্মশিক্ষা
　　আকাশ-কুসুম॥১২

নাবিকের মধ্যে যাঁরা
কর্ম্ম-বল লোপ করা
অসময় বুঝিয়া তাঁরা
　　অসীম সাহসে।১৩

তরণী করিতে মগ্ন
সদা অতি সমুদ্বিগ্ন
ঘটায় যা কত বিঘ্ন
তরণীতে বসে ॥১৪

কেহ দেয় করতালি
মুখে বলে রক্ষ কালি!
মনে ভাবে হ'ক বলি
এ সমাজ-তরি।১৫

কেহবা স্বপক্ষ ভায়
কেহবা বিপক্ষ হায়!
কোনো পক্ষ নাহি চায়
কেহ তাহা হেরি ॥১৬

(ক্রমশঃ)

স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ।

লেখক—সম্পাদক।

অল্পকাল মধ্যে ভারতগগন হইতে কতিপয় অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। স্যার্ আশুতোষ চৌধুরী, স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গমাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাহার পর এই সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আবার সম্প্রতি ভারতগগনের চন্দ্র স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতগগন অন্ধকার করিয়া অস্তমিত হইলেন। বঙ্গের আকাশে দুর্দ্দিনের অমানিশা ক্রমে অধিকতর আধিপত্য লাভ করিতেছে; ক্রমে আশার স্থলে আশঙ্কা আসন বিস্তার করিতেছে। জানিনা, পরিণতি কোথায়!

স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেরই রাজনীতিক মন্ত্রগুরুস্থানীয়। সিবিল-সার্ব্বিস হইতে বিতাড়িত বিড়ম্বিত সুরেন্দ্রনাথ যখন স্বদেশের সেবায় প্রথম

মনোনিবেশ করেন, তাঁহার রাজনৈতিক বক্তৃতায় যখন দেশে নবীন ভাবের সাড়া উঠে, যখন ভারতবাসীর প্রাণে নব আশা আকাঙ্ক্ষার প্রথম স্পন্দন উপস্থিত হয়, সে অনেক দিনের কথা।

তখন দেশবাসীর চক্ষুর সমক্ষে মূর্ত্ত উদ্যম, শরীরিণী সাধনা ও জ্বালাময়ী বাগ্মিতার ন্যায় স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশমান ছিলেন। তখন দেশের কর্ণে সুরেন্দ্রনাথের মেঘমল্লার ঝঙ্কৃত হইত। সুদূর পঞ্চনদে বসিয়া তখন সুরেন্দ্রনাথেরই জয়ধ্বনি শ্রবণ করিতাম। তাহার পর ঘটনাপরম্পরার সমাবেশে সুরেন্দ্রনাথ মাতৃভূমির সেবায় এত অধিক আত্মনিয়োগ করেন যে তখন দেশবাসী মনে করিত—'সুরেন্দ্রনাথ ভারতের মুকুটহীন রাজা'। সত্যই সুরেন্দ্রনাথ যেন একজন দিক্‌পাল ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম বস্তুতই প্রশংসনীয় ছিল। সুরেন্দ্রনাথ মাতৃভূমিকে অকপটভাবে ভাল বাসিতেন। তিনি মাতৃভূমির সেবায় আমরণ শ্রম করিয়া গিয়াছেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে একথাও সত্য যে, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী কর্ম্মজীবনে যে কখনও ভ্রান্তপথে পদচারণা করেন নাই তাহা নহে। ভ্রম মানবের সহচর; মানুষ ভ্রমের অতীত হইবে কিরূপে? সুরেন্দ্রনাথেরও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং হয়ত ভ্রম হইয়াছিল। তবে সেজন্য তাঁহার উপর দোষারোপ করা সঙ্গত মনে হয় না। ভারতবাসীর কর্ত্তব্য, সুরেন্দ্রনাথের গুণ গ্রহণ করা। তাঁহার পুজা করাই কর্ত্তব্য, তাঁহাকে নিন্দা করা বা তিরস্কার করা কর্ত্তব্য নহে।

সহযোগনীতি ও অসহযোগনীতির সংঘর্ষে সুরেন্দ্রনাথ শেষজীবনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অসহযোগপন্থা গ্রহণ করেন নাই। সহযোগনীতি অবলম্বন করিয়া তিনি দেশের কল্যাণসাধনে যে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—একথা অস্বীকার করা যায় না। তিনি সরলবিশ্বাসে বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া সহযোগের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, অসহযোগের পন্থায় পদার্পণ করেন না। এজন্য অনেকে তাঁহার উপর অভিসন্ধি ও স্বার্থপরতার কলঙ্কপঙ্ক নিক্ষেপ করিতে চাহেন। আমরা মনে করি, ঐরূপ অপবাদ সত্য নহে। দূরদর্শী সুরেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, দেশ অদ্যাপি অসহযোগনীতি পালন করিবার যোগ্য হয় নাই। অসহযোগের মন্ত্রগুরু মহাত্মাও কিয়দ্দিন পূর্ব্বে এইরূপ আভাষ দিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তৎপ্রা[illegible] স্বরাজ্যদলও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ অসহযোগ অবলম্বনে ক[illegible]

সময় এখনও আসে নাই। সুরেন্দ্রনাথ একথা বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। কংগ্রেসও এখন অসহযোগ স্থগিত রাখিয়া চলিতেছেন। মোটের উপর একপ্রাণতা, হিন্দুমুসলমানে মিলন—একলক্ষ্য নিরূপণ না হইলে, 'সহযোগ' 'অসহযোগ' সকলই মুখের কথা মাত্র। দেশ এখনও সে লক্ষ্যবিন্দুতে উপনীত হয় নাই। সুতরাং, অসহযোগ সমর্থন না করিয়া সুরেন্দ্রনাথ যে গুরুতর পাপ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তিনি সেইভাবেই দেশের কল্যাণে মনোযোগ করুন। উদ্দেশ্য স্থির থাকিলেই হইল। সুরেন্দ্রনাথ যে পথের পথিক ছিলেন, তিনি সেই পথে চলিলে, দেশবাসী তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন কেন? মতভেদ থাকিলেই যে ভিন্নপথযাত্রী দেশসেবককে তিরস্কার বা অবমানিত করিতে হইবে তাহার কোনও কারণ নাই। প্রতিপক্ষের মতান্তরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার গুণভাগ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

সুরেন্দ্রনাথের পরপক্ষ-মত-সহিষ্ণুতা ছিল। সুরেন্দ্রনাথের মতের সহিত আমার মতের সর্ব্বাংশে ঐক্য ছিল না। যে সময় শ্রীমতী আনি বাসন্তীর কংগ্রেসের সভানেতৃত্ব লইয়া মতবিরোধ উপস্থিত হয়, তখন কলিকাতায় ঐ মতভেদের মীমাংসার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে আমি সভাপতি হইয়াছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ সেই সভার সিদ্ধান্ত নতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত মতের প্রতি তাঁহার অন্ধ অনুরাগ ছিল না। উহাই নেতার অন্যতম প্রধান গুণ।

সুরেন্দ্রনাথ শেষজীবনে 'স্যার্' উপাধি গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিপদ স্বীকার করিয়া বেতন গ্রহণ করেন এজন্য অনেকে তাঁহার নিন্দা করেন। আমরা ইহার কোনও সঙ্গত কারণ দেখি না। উপাধি রাজদত্ত সম্মান। উপাধি দেন রাজা। রাজপ্রদত্ত উপাধি প্রত্যাখ্যান করিলে প্রকারান্তরে রাজারই অবমান করা হয়—সুরেন্দ্রনাথ এরূপ মনে করিতেন। তাঁহার এই ধারণা যে ভিত্তিহীন তাহা বলা যায় না। স্যার্ উপাধিগ্রহণে তাঁহার মনের দৌর্ব্বল্য সূচিত হয়—একথা আমরা সত্য বলিয়া মনে করি না। সুরেন্দ্রনাথ যে মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিয়া বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও কিছু অন্যায় করা হয় নাই। সমস্ত দেশেই মন্ত্রিগণ বেতন গ্রহণ করেন। শ্রমজীবিমন্ত্রিগণও বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেতন গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে, কর্ম্মীর দেশপ্রীতির অভাব বা অল্পতা বুঝা যাইবে—এরূপ কোনও নিয়ম নাই। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হইয়া যে দেশের কোনও কার্য্য করেন নাই—ইহা সত্য নয়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে যে স্বরাজদলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে সর্ব্বপ্রথম মেয়র হন,

ইহার সূচনা করেন সুরেন্দ্রনাথ। কলিকাতা মিউসিপালিটীতে বে-সরকারী সভাপতি-নিয়োগের ব্যবস্থা তিনিই করেন। তাঁহার চেষ্টারই সুফল আমরা ভোগ করিতেছি—একথা অসত্য নহে।

আজ সুরেন্দ্রনাথ নিন্দা-ব্যাখ্যার পরপারে। এখন দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—'যশ মৃতের পুরস্কার' এখন একথা আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য।

সুরেন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য প্রাবীণ্য প্রচুর ছিল। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন পুরুষসিংহ দেশে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি পাশ্চাত্যবিদ্যায় যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, প্রাচ্য সংস্কৃতশাস্ত্রে যদি তিনি তদ্রূপ অধিকার লাভ করিতেন, তবে আমরা আরও অধিকতর সুখী হইতাম। দুঃখের বিষয়, তাঁহার কর্ম্ম-জটিল জীবনে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পান নাই। তিনি এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন—"সংস্কৃতভাষাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু জীবনতরণী যে পথে চালাইয়াছি, তাহাতে সংস্কৃতভাষার সেবা করিবার জন্য প্রচুর সময় পাই নাই। এখন আর সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

এ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিবার অবসর আমাদের নাই। বহু সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে তাঁহার কর্ম্মজীবনের বহুচিত্র প্রকাশিত হইতেছে। আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে ভারতের রাজনীতিচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ আচার্য্য—রাজনৈতিকক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ তাপস—অসাধারণ কর্ম্মী স্যার্ সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশসেবা দেশবাসী বিস্মৃত হইতে পারেন না। তিনি যে দেশবাসীর চক্ষু ফুটাইয়াছেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

আজ তিনি পরলোকে। শুধু তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাপন হইবে না। তাঁহার স্বদেশপ্রেম-প্রমত্ত প্রাণ লোকান্তরে থাকিয়াও ভারতের মুক্তিকামনা করিবে এবং ভবিষ্য কর্ম্মিগণের হৃদয়ে নবীন প্রেরণা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে তাহার প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির পথে চালনা করিবে—এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিয়া, তাঁহারই পথে পদচারণা করিতে প্রয়াস পাইব—দেশের মুক্তিসাধনায় আমরণ কর্ম্ম করিব—ইহাই যদি আমাদের সকলের একান্ত কাম্য হয়, আর সেই পথেই যদি আমরা চলি, তবেই তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সমাপিত হইবে, মনে করিতে পারিব। ভগবান্ আমাদের সেই আশা পূর্ণ করুন। ওঁ শান্তিঃ।

"চণ্ডী ও গীতোক্ত নিষ্কামবাদ।"

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মনও ইন্দ্রিয়, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের 'রাজা'; মন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োগ করে। 'মন' জীবের প্রকৃতি, জীব মনের সহযোগেই ইন্দ্রিয়-দ্বারে পরিভ্রমণ করে; মন রিপুর আকর্ষণে ইন্দ্রিয়ের অনুগত হইয়া পড়িলে মনেরও বৈকল্য, চিত্ত-দৌর্ব্বল্য, মনোভ্রান্তি, চিত্তবৈকল্য সঞ্জাত হয়। ইন্দ্রিয়বিকার-জনিত 'পুরুষার্থ' হরণ করে, 'কাপুরুষ' ভীরু দুর্ব্বল অসমর্থ করে।

'মন' প্রকৃতি, 'জীব' পুরুষ; 'জীবই' সকলের রাজা, রাজ্যেশ্বর রাজ-চক্রবর্ত্তী। জীব মনের অধীন অনুগত হইয়া, রিপুর বাসনায় রিপুর অনুগত হইয়া, ইন্দ্রিয়লোলুপ হইলেই সর্ব্বনাশ; মায়া মোহের চক্রে অবিদ্যাচ্ছন্নতার গাঢ় আক্রমণে সংসারচক্রে বিড়ম্বনা লাভ করে। 'জীবের' উহা দুর্জ্জয় নাগ-পাশবন্ধন অবস্থা। 'মন' নানাচক্রে 'জীব'কে বাসনার অন্তর্গত করিয়া 'রিপুর' অধীনে বাঁধিয়া ফেলে।

আবার 'মন'ই মুক্তির উপায়, 'জীবকে' একবার 'ইয়াদ' করাইয়া দিলে, অর্থাৎ জীবকে 'মনন' করাইয়া দিতে পারিলে অর্থাৎ 'জীবের' মনে একবার পূর্ব্বানুভূতি স্মরণ করাইয়া দিতে পারিলে, 'জীব' যে সর্ব্বশক্তিমান পরমব্রহ্ম, তাঁরই 'লীলা' ইচ্ছা সম্পাদনের জন্যই পরমব্রহ্ম হইতে "জীব-ব্রহ্ম" সংসার-চক্রে ব্রহ্মের 'লীলা' ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য আসিয়াছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলে, তখন 'জীব' মনের সাহায্যে বন্ধন-অবস্থা হইতে 'মুক্ত' হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। এই জন্যই মনের দ্বারা ত্রাণ হয় বলিয়াই, 'মন্ত্র' বলা হইয়াছে।

'চণ্ডীতে' ভগবতীর ধ্যান, মন্ত্র, অর্গলাস্তব, কীলক, কবচাদি জীব-চৈতন্যের উদ্বোধ করিবার জন্য প্রকটন করা হইয়াছে। 'দেবীসূক্ত' দ্বারা মহাশক্তি মহামায়ার স্বরূপাবধারণা করাইয়া চণ্ডী পাঠ দ্বারা 'জীব' আত্মোপলব্ধি করিয়া আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিবার উপায় প্রদত্ত হইয়াছে।

'মন' 'ইন্দ্রিয়' 'রিপু' এগুলি শক্তি। 'জীবের' এগুলি 'প্রকৃতি'; সৃষ্টি-মূলে সৃষ্টির ও বীর্য্যশক্তি এবং বীজশক্তিতে এগুলি বিদ্যমান, পঞ্চভূত উপা-দানের অন্তর্গত হইয়া আছে। 'জীব' প্রকৃতি, সৃষ্টির প্রকৃতি হইতে উপাদান সংগ্রহ সঞ্চয় করিয়া সংস্কারগতভাবে ইন্দ্রিয়যোগে অনুভূত করিতেছে।

ইহারই তীব্র তীক্ষ্ণতা, আবেগই 'প্রাণন' করিতেছে, উহাই 'প্রাণ' বলিয়া মনে হয়। আমার 'স্ব' ইচ্ছা আবেগ আমার প্রাণন করিয়াছে, আবার সৃষ্টি-প্রকৃতি হইতে 'প্রাণ' আকর্ষণ করিয়া প্রাণিত হইয়া রহিয়াছে। আমার আত্ম প্রকৃতির প্রাণন-স্বভাব energy, এবং সৃষ্টি হইতে আকৃষ্ট প্রাণ বীর্য্য energy খাদ্য পানীয়রূপে স্থূল ব্যবহারগতভাবে এবং প্রধানতঃ বায়ু দ্বারা প্রাণ ধারণা করিয়া রাখিয়াছি। তৃষ্ণারূপে সলিল-সিঞ্চনে সঞ্জীবীত করিয়া রাখিয়াছি। বাসনা আশা তৃষ্ণা আমার অন্তঃপ্রাণীকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। আমি পূর্ব্ব বাসনানুসারে আমার কাম্য দেহ (Desire Body) দ্বারা 'লিঙ্গ শরীর' পুনরায় স্থূলশরীরে পরিণতি ঘটাইয়া 'কলেবর' ধারণ করিয়াছি। সুতরাং আমার মনে হয় "Energy" আমাদের প্রাণকে পুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। "বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধ-স্থিতাং ভীষণাং ইত্যাদি ভগবতীর ধ্যানও সৃষ্টি-শক্তিবিধায়িনী ভগবৎ প্রকৃতিতে জগতের প্রাণজনয়িত্রী জগজ্জননী মহামায়া মহাশক্তি "দুর্গা" প্রাণ-চৈতন্যরূপিণী। 'রিপু' পরাক্রম মহাশক্তির অন্তর্গত, জগজ্জননী দুর্গার প্রতিমা চিত্রেও অসুররূপে 'রিপু' বিদ্যমান। কেশরি-বিক্রমে, পাশবিকবল-পরাক্রান্ত। পূর্ব্বে বলিয়াছি 'রিপু' জীবকে পশুত্বে পরিণত করে। আবার পশু রিপুপরবশ রিপুপরাক্রান্ত হইয়া প্রবল পাশবতা প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর হিংসা আত্ম-হিংসা করে।

মন ও ইন্দ্রিয়াদি, মন ও ইন্দ্রিয়. পরস্পর ইন্দ্রিয় সংযোগে রিপুর অধীন হইলে এইরূপ পশুর ন্যায় প্রমত্ত অবস্থা হয় ও পরস্পর হিংসা করে।

কিন্তু, 'মন' জীবের অধীন হইয়া কেশরি-বিক্রমে, রিপুকে পরাক্রান্ত করিয়া সংযত করিতে পারিলে; আসুরিক বিক্রম পর্য্যুদস্ত হইয়া 'দেবত্বে' উন্নীত হয়। তখন ইহার একটা সু-ব্যবহার, সু-প্রয়োগ হইতে পারে। মহাঅসুর মহা-সুর হয়।

সুতরাং 'রিপু' পশু নহে, Passion বা 'রিপু' পশুও নহে, দেবতাও নহে, অসুরও নহে, দানবও নহে, উহার ব্যবহার ও প্রয়োগ অনুসারে, ভাবাধিষ্ঠানে উহা সবই। তজ্জন্য আর্য্যগণ উহাকে অসুর পিশাচ দানবাদিও বলিয়াছেন, পশুও বলিয়াছেন, আবার দেবতাও বলিয়াছেন। কেননা 'রিপু'-ভাব সকলেই আছে। উহা আবার সংযোগ মিশ্রণ অনুসারে আংশিকভাবে অর্দ্ধ-পশু, অর্দ্ধ-দানব, অর্দ্ধ-দেবতা। মহিষাসুর, অর্দ্ধ-পশু অর্দ্ধ-দানব, শুম্ভ-নিশুম্ভ দানব ও দেবতা ইত্যাদি অসুর নির্ব্বিশেষে—দানবতা পশুত্ব-দেবত্ব-মনুষ্যত্ব সবই আছে। শৌর্য্যে শূর। শূরত্ব-শৌর্য্য দেবভাব-মণ্ডিত হইয়া "সুর" —

জীব রিপু ইন্দ্রিয়াদি মনেরও কর্ত্তা। জীব কর্ত্তৃরূপে ইন্দ্রিয়াদি মনকে এবং রিপু-ভাবকে দলিত মথিত করিলেই যথেষ্ট হইল না। পরাক্রান্ত করিয়া দমন করিয়া রাখিলেও নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই। বাঘে মানুষে খেলার ন্যায় সুযোগ পাইলেই মানুষের অর্থাৎ 'জীবের' ঘাড় মটকাইবে।

আর তাহাতেই বা ফল কি? সকলেই ত ব্রহ্মের সৃষ্ট? ব্রহ্মের "মায়া"? ব্রহ্মের কাযে জগতের সংসারের ব্যবহারে ত লাগাইতে হইবে?

সুতরাং, জ্ঞান ও গুণযোগে উহাকে শ্রী এবং বিদ্যাসম্পন্ন করিতে হইবে। "শ্রী-বিদ্যা" সম্পন্ন হইলে, কাম ক্রোধাদি রিপুনিচয় যোগেও 'জীব' সংসারার্ণবে শ্রীদুর্গা নাম করিয়া পরিত্রাণ পাইবে। তখন 'জীব' স্ব-শরীরে সর্ব্বদেবতাধিষ্ঠাত্রী সমগ্র দুর্গা প্রতিমার ন্যায় সিংহ-অসুর আয়ুধ-বাহনাদি-সমন্বিত হইয়াও শ্রী ও বিদ্যাসমন্বিত হইয়া সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য সমন্বিত হইবে।

"জ্ঞান" ও প্রকৃতি, প্রকৃতিই "জ্ঞানদায়িনী," প্রকৃতি হইতে আমরা "জ্ঞান ও গুণ" আহরণ করিতেছি। চণ্ডী মন্ত্রে "ওঁ ঐঁ হ্রীঁং ক্লীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং নমঃ মন্ত্রাক্ষর পাওয়া যায়। শব্দাত্মিকা সৃষ্টি-বীজ মন্ত্রাক্ষরা মহামায়া মহাশক্তি প্রণবাত্মিকা পরমামায়া পরমব্রাহ্মী, ব্রহ্মশক্তি। ঐঁ বিদ্যাবীজ, জ্ঞানস্বরূপিণী চৈতন্যরূপিণী, 'হ্রীং' পরাশক্তি, ক্লীং কামবীজ, কামনা-প্রসবিনী কাম্যফলদায়িনী।

মন্ত্রের শক্তি নাই? 'মন' শব্দাত্মিকা শব্দাক্ষরা বীর্য্য-পূত করিয়া ধারণ করিলে, "বীজ" ধারণা করিয়া, স্তব ধ্যান স্তুতি অর্চ্চনা করিলে মন্ত্র-বীর্য্যে, মনঃক্ষেত্রে ধারণা করিয়া মনকে সংযত পবিত্র করিলে মনঃসংযোগে 'আত্মার' উর্দ্ধগতি হয় না? মনঃ-প্রকৃতির যোগে যদি আত্মার অধোগতি হইয়া 'জীব' দানবত্ব, পশুত্ব, জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, মূক, জড়, অন্ধ, কুষ্ঠ, হইতে পারে বিকৃতিবৈকল্য প্রাপ্ত হইতে পারে। নির্ব্বীর্য্য কুৎসিত কুশ্রী কাপুরুষ হইতে পারে। মনঃসংযোগে পূত পবিত্র হইয়া জীব মনের কর্ত্তা হইয়া ইন্দ্রিয়বিজয় মনের অধিকার গৌরবে, রিপু-স্বভাব দানব দলন করিয়া 'ইন্দ্রত্ব' না পাইতে পারিবে কেন? "শূরত্ব" মনের "শৌর্য্যে" লাভ হইতে পারে। মনের বীর্য্যে 'বীরত্ব' লাভ করিতে পারে। মনের পবিত্রতায় 'সুরত্ব' লাভ করিয়া 'কার্ত্তিকেয়' কীর্ত্তিমন্ত হইতে পারে ত? বীর্য্য-শৌর্য্যসমন্বিত পবিত্রমন কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতি হইয়া অসুর দমন করিতে পারে ত? 'মনের' বীর্য্যে শৌর্য্যে 'জীব' পরাক্রমশালী হইয়া ইন্দ্রিয়ের অধিপতি "ইন্দ্র-দেবতা" কেন, বীর্য্য শৌর্য্য পূত পবিত্র মনের অধিপতি হইয়া 'জীব' মহাসুরত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

দাশেন
সংগ্রহ সঞ্চয়

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩৩২ সাল। ১৮৪৭ শকাব্দাঃ

উচ্ছ্বাস।

(আকাশের প্রতি)

লেখক—সম্পাদক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হে আকাশ, শূন্য তুমি, অস্তিত্ব-বিহীন,
অথচ তোমাতে এই বিশ্ব হয় লীন॥
নক্ষত্র তারকা গ্রহ উপগ্রহ যত,
তোমার কর্তৃত্বে সবে হয় বিকশিত।
শূন্যে অ... থাকে অভাবে যে ভাব,
সে ভাবের ভাবনা... মানব-স্বভাব॥
পশু পক্ষী তরু লতা পর্ব্বত পাথার,
নাহি করে অনুভব মহিমা তোমার॥
মানব-সমাজে পুনঃ কয় জনে হায়,
রহস্যের তব স্থির সন্ধান বা পায়?

আহারে বিহারে যারা সদা অনুরক্ত,
তাহাদের কাছে তুমি নাহি হও ব্যক্ত॥
অণুতে অণুতে তুমি আছ বিদ্যমান,
তুমি না থাকিলে সব হ'ত তিরোধান।
সকলি গড়িছ তুমি, সকলি ভাঙ্গিছ,
গড়িছ ভাঙ্গিছ পুনঃ সকলি রাখিছ॥
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

হিন্দু-সমাজের সমস্যা।

লেখক—সম্পাদক।

ভারতবর্ষের বাহিরে বর্ত্তমানে কোনও হিন্দুসমাজ নাই। যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যে অল্পসংখ্যক হিন্দু আছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ভারতবাসী হিন্দুগণের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধই নাই। ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও ভেদের সমষ্টি এত অধিক যে ঐক্যের উপলব্ধি হওয়া কঠিন। কি অঙ্গরাগ, কি বেশবিন্যাস, কি আহার-বিহার, কি আচার-ব্যবহার, বিবাহ-শ্রাদ্ধ পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে এতই ভেদ দৃষ্ট হয় যে একত্বজ্ঞানের—অর্থাৎ 'আমরা সকল হিন্দুই এক'—এই জ্ঞানের উদ্ভব হওয়া নিতান্ত সহজ নয়।

বিভিন্ন প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, এক প্রদেশেরই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান-প্রদান নাই। অধিকন্তু কতকগুলি লোক- যাহাদের সংখ্যা উচ্চ-বংশীয় লোকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক—তাহারা অন্ত্যজ বলিয়া হিন্দু-সমাজের অন্তরঙ্গের মধ্যে গৃহীত হয় না। মুচী, ডোম ও মুর্দ্দাফরাস্ জাতি হিন্দু, কিন্তু তাহাদের হিন্দুর মন্দিরে প্রবেশের অধিকারও নাই। আভিজাত্য সর্ব্বদেশেই আছে; জাতিভেদ কোনও না কোনও আকারে সর্ব্বদেশেই আছে, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনও দেশ নাই যে স্থানে অত্যন্ত হীনব্যবসায়ীরাও

মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পায় না; কিংবা শারীরিক শৌচ সত্বেও তাহাদের স্পৃষ্ট জল সমাজস্থ শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের গ্রাহ্য হয় না। মুচী মেহতরের জল ত আমরা গ্রহণই করি না, অধিকন্তু কোনও আচ্ছাদনের নীচে তাহারা আসিলে, ঐ স্থানের জলও অপবিত্র মনে করি। এই অপবিত্রতার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহার ভিত্তিতে কোনও যুক্তি পাওয়া যায় না।

একজন মুচী ও মেহতরের যদি কোনও সংক্রামক ব্যাধি না থাকে, এবং সে যদি পরিষ্কারপরিচ্ছন্নও হয়, তবু তাহার প্রদত্ত জল গ্রহণীয় হয় না; কিন্তু সমাজে যাহারা 'জলচল' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, তাঁহারা যতই অশুচি বা অপরিচ্ছন্ন থাকুন না কেন, তাঁহাদের জল-গ্রহণে কাহারও আপত্তি হয় না। অথচ তথাকথিত হীনজাতীয় লোক গৃহে প্রবেশ করিলেই জল অপবিত্র হয়।

ভারতবর্ষ ন্যায়ের আদিস্থান এবং বঙ্গদেশেই ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এই ন্যায়ের দেশে এইরূপ অন্যায় 'ন্যায়' বলিয়াই চলিয়া আসিতেছে। শিখজাতি হিন্দুসমাজের এক অঙ্গ। শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তকেরা সামাজিক একতা স্থাপনের জন্য ন্যায়বুদ্ধিপরবশ হইয়া এইরূপ খুটীনাটী উঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং সেই হেতুই শিখসম্প্রদায় সংখ্যায় অল্প হইয়াও একটী পরাক্রান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছেন। যখন পঞ্জাব প্রদেশ মুসলমান্ অধিকারে ছিল, তখন দশমগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহ হিন্দুসমাজের এই খুটীনাটীর অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া উহার বিলোপসাধন করেন। যখন তিনি শিখসম্প্রদায় গঠন করেন, তখন তিনি শিখদিগকে আহ্বান করিয়া বলেন যে—"আমি তোমাদের পিতা বা বাবা, তোমরা আমার পুত্র বা শিষ্য। (শিষ্য হইতে শিখ্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।) তোমাদের মধ্যে কোনও ভেদ থাকিবে না।" এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে পাহুল্ বা অমৃত অর্থাৎ চিনির সরবৎ (তরবারি দ্বারা ঘুটিয়া) পান করিতে দেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—উচ্চনীচ সকল জাতি শিখনামে অভিহিত হন, সকলের নামের আগে 'ভাই' শব্দ থাকে এবং নামের পরে 'সিংহ' শব্দ থাকে। একই গুরুর সন্তান বা শিষ্য বলিয়া 'ভাই', এবং সকল বর্ণকে যোদ্ধৃকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সকলকেই গুরুগোবিন্দ 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। উদ্দেশ্য—সকলকেই সিংহবৎ পরাক্রান্ত করিয়া তোলা। ভারতীয় যোদ্ধৃগণের মধ্যে শিখগণ এখন সিংহতুল্য সাহসী ও বলবান্।

নানক বা গুরুগোবিন্দ বেদাদি শাস্ত্র অগ্রাহ্য করেন নাই—দেবদেবীর অবমাননা করেন নাই। এক বর্ণভেদ-ত্যাগ ভিন্ন হিন্দুর অন্য আচার ব্যবহার

পরিত্যাগ করেন নাই। গোবধের প্রশ্রয় দেন নাই, বরং সে বিষয়ে তাঁহারা এতই বিরোধী ছিলেন যে শিখরাজাদিগের অধিকারকালে গোবধের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল। স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্বের উপর শিখধর্ম্ম উপস্থাপিত হইয়াছিল। গুরূপদেশবাক্য, যাহার সহিত বেদাদি শাস্ত্রের বিরোধ ছিল না, এবং যাহা বেদের অপর নাম 'শব্দ' দ্বারা এখনও অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা পবিত্র বিবেচিত হইলেও শিখধর্ম্মের বেদাদিশাস্ত্রের অমর্য্যাদা-প্রদর্শন দৃষ্ট হয় না। এক অকাল পুরুষের উপাসনা প্রচলিত হইলেও দেবদেবীর অর্চ্চনা তিরোহিত হয় নাই। মনে করুন, যদি হিন্দুসমাজ কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্বের স্থলে স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বের বিধান প্রচলিত হয়; মনে করুন, যদি হিন্দুসমাজের খুটীনাটী পরিত্যক্ত হয়; মনে করুন, যদি সকলেই ধর্ম্মোপদেশ পাইবার অধিকারী বিবেচিত হয়; মনে করুন, যদি সকলেই মন্দির-প্রবেশের অধিকার পায়; মনে করুন, যাঁহারা ধার্ম্মিক সাত্ত্বিক সত্যবাদী পরোপকারী তাঁহারাই যদি ধর্ম্মযাজকের স্থান অধিকার করেন এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন; মনে করুন, যাহারা যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শী এবং দেশরক্ষার উপযোগী. তাঁহারাই যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হন; মনে করুন, যাঁহারা কৃষিবাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকেন—তাঁহারাই যদি বৈশ্য বলিয়া অভিহিত হন; এবং মনে করুন, শ্রমজীবীরা যদি শূদ্র বলিয়া অভিহিত হন; তাহা হইলেই কি হিন্দুশাস্ত্রের, হিন্দুধর্ম্মের ও যুক্তির বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করা হইবে?

মনে করুন, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় গুণকর্ম্মের উপযোগী অধিকার পরিচালন করেন, তাহা হইলে কি শাস্ত্রের ও যুক্তির অবমাননা করা হইবে?

বিবাহাদি কার্য্য বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তাদের স্বেচ্ছাধীন। যে সকল দেশে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় নয়, সে সব স্থলেই কি সকলেই সকলের সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হন? আভিজাত্য সকল দেশেই আছে ও থাকিবে, হিন্দুসমাজেও থাকিবে। কোনও সময়ে যে তাহার ব্যত্যয় ঘটিবে না তাহা নহে, বর্ত্তমানসময়েও তাহা ঘটিয়া থাকে। সামাজিক বন্ধন অতি দৃঢ় হইলে সমাজ টিকিতে পারে না। হিন্দুসমাজের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিলে, চখে জল আসে। সমাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভক্ত করিয়া রাখাতেই এই সমুদয় অনাচারের আবির্ভাব হয়। কত ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণনামধারী অব্রাহ্মণ এবং যথার্থ শূদ্র অপেক্ষা অধম ব্যক্তিগণের হস্তে পতিত হইতেছেন, তাহার সীমা করা যায় না। ইহাতে কি ব্রাহ্মণধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়, না উপেক্ষিত হয়? এইরূপ বিবাহকে কি সবর্ণ-বিবাহ বলা যাইতে পারে?

হিন্দুসমাজে বিধবার বিবাহ হয় না। বঙ্গদেশে এই প্রথা অতিনিম্নজাতীয়-দিগের মধ্যেও যত প্রচলিত আছে, অন্যান্য দেশে তত নহে। বালিকাবিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন না, কিন্তু ঐ বালিকার পিতা যে কয় বার ইচ্ছা হয়, স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতেও পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন,—এটী কি শাস্ত্র বা যুক্তিসঙ্গত ?

বিধবার বিবাহ হইতে পারে না, কিন্তু বিপত্নীকের বিবাহ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য কি কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষে, না পুরুষের পক্ষেও প্রযোজ্য ? পিণ্ড-প্রাপ্তি কি কেবল পুরুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, না স্ত্রীলোকের পক্ষেও ?

ব্রাহ্মণপত্নীরাও শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। তাহাদের এখন উপনয়ন-সংস্কার নাই। স্ত্রী যদি শূদ্রা হইল, তাহা হইলে কোন্ যুক্তি অনুসারে সবর্ণবিবাহ হয় ? সমাজ কি কেবল পুরুষ লইয়া, না স্ত্রীলোক লইয়াও ? দ্বিজত্বে কি কেবল পুরুষেরই অধিকার, না স্ত্রীলোকেরও আছে ?

বর্ত্তমান স্মৃতিকারগণ বলেন যে স্ত্রীলোকের দ্বিজত্বে অধিকার নাই। প্রাচীন-কালে অন্ততঃ ব্রহ্মবাদিনীদিগের উপনয়নাধিকার ছিল। পুরুষ যদি ব্রহ্মবাদী না হইয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন, তবে স্ত্রীলোকও ব্রহ্মবাদিনী না হইয়া উপবীত গ্রহণ করিতে পারিবেন না কেন ? উত্তরে কেহ বলিলেন—'শাস্ত্রে নাই।' অন্ততঃ ব্রহ্মবাদিনীদিগের উপনয়ন শাস্ত্রে ছিল, তাহাও ত এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। আর ব্রহ্মবাদিনী না হইলে স্ত্রীলোকদিগের উপবীত-গ্রহণ প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত না হইলেও যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। আর শাস্ত্র-যুক্তি বিরুদ্ধ হইলে শাস্ত্র-অনুসারেই তাহা অশাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। 'আমরা যে এই সমস্ত কথার অবতারণা করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক, নচেৎ সমাজের কল্যাণ-লাভের আশা নাই।

স্ত্রীজাতি আমাদের মাতা, ভগিনী, কন্যা। মাতা, পিতা অপেক্ষা গরীয়সী ; কিন্তু হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি যে নির্দ্দয় নির্ম্মম ব্যবহার করা হয়—তাহা চিন্তা করিলে, হিন্দুসমাজ যে কেন এত অকল্যাণভাগী হইতেছে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

পুরুষের যেমন শিক্ষা আবশ্যক, স্ত্রীলোকেরও তদ্রূপ শিক্ষা আবশ্যক। শাস্ত্রে স্ত্রী-শিক্ষার বিধান আছে। পুত্রগণ অবিবাহিত অবস্থায় ২০।২৫ বৎসর শিক্ষালাভের সময় পান, কিন্তু কন্যাগণ ১০।১২ বৎসর বয়ঃক্রমেই

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীর স্থান অধিকার করিতে বাধ্য হয়েন। অভিজাতগণের কন্যাদিগেরও শিক্ষা-লাভের সুযোগ হয় না। আজকাল স্ত্রী-শিক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, সে কেবল নামমাত্র। বস্তুতঃ যথার্থ শিক্ষা হয় না। যে সমাজের অর্দ্ধাংশ এইরূপ অশিক্ষিত, সে সমাজের উন্নতি-কামনা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা যে কেবল নিম্নজাতিদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করি তাহা নহে, আমাদের স্ত্রীলোকের প্রতিও কম অত্যাচার করি না। কি শিক্ষা-বিধানে, কি দায়াধিকারে, কি ধর্ম্মাধিকারে, কোনও বিষয়েই আমরা আমা-দিগের স্ত্রীলোকদিগের হিতের দিকে ন্যায়দৃষ্টিপাত করি না। এই ন্যায়ের দেশে কত যে ন্যায়-বিরুদ্ধ আচার পরিলক্ষিত হয়, তাহার বর্ণনা করা সহজ নহে।

কোনও নিম্নজাতীয় ব্যক্তি পদ্মফুল লইয়া আসিলে তাহা দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐ ব্যক্তি জবাফুল আনিলে তাহা দেবপূজায় ব্যবহৃত হইবে না; তাহার আনীত বিল্বপত্র চলিবে, কিন্তু তুলসীপত্র চলিবে না। হীন-জাতির আনীত গঙ্গাজল পূজায় লাগিবে, অন্য জল লাগিবে না। তৎকর্ত্তৃক সিদ্ধ ধান্য বা ব্রীহি ব্যবহার্য্য, কিন্তু তণ্ডুল অব্যবহার্য্য। তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত ঘৃত ব্যবহার্য্য, কিন্তু তপ্ত দুগ্ধ অব্যবহার্য্য। তৎস্পৃষ্ট দুগ্ধ ব্যবহার্য্য, কিন্তু তৎস্পৃষ্ট জল ব্যবহার্য্য নহে। শাস্ত্রীয় শ্লোকরচনা দুঃসাধ্য নহে। "হরিদ্রা গোরসোধান্যং পুনঃ পাকেন শুধ্যতি"—এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

হিন্দুসমাজের দৃষ্টি এখন বাহ্য আচারের প্রতি নিবদ্ধ। যে সমস্ত ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণিত ও সর্ব্বদেশেই নিন্দিত, তৎপ্রতি এ সমাজের আদৌ দৃষ্টি নাই। সত্যকথন সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বশাস্ত্রে প্রশংসিত, অনৃতবচন সর্ব্বত্র নিন্দিত, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখিতে পাই, আদালতে হউক্ বা তাহার বাহিরে হউক্, মিথ্যাকথনের দ্বারা কেহ সমাজে গ্লানি-ভোগ করেন না। পরদারাভিমর্ষণ, পরদ্রব্যাপহরণ ইত্যাদি শাস্ত্রে পাতিত্যজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা বর্ত্তমানে কেহ 'পতিত' বলিয়া গণ্য হয়েন না। দৃষ্টি কেবল খুটীনাটীর প্রতি। এইরূপ করিয়া হিন্দুসমাজ আর কতদিন চলিবে?

কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু-বিরচিত মানবগীতার সামান্য পরিচয়।

লেখক—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু এম, এ, বি, এল।

পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য, শিবাজী মহাকাব্য, মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত প্রভৃতির প্রণেতা কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তিনি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট সুপরিচিত। তাঁহার গ্রন্থরাজি বাঙ্গালাভাষার অমূল্য সম্পদ্। তাঁহারই সুনির্ম্মল লেখনীপ্রসূত উপর্য্যুক্ত 'মানবগীতা' ইহাই মানবগীতার প্রধান পরিচয়। ইহা যে প্রকাশিত হইয়াছে অনেকে বোধ হয় তাহা জানেন না; অথচ আমার মনে হয়, উপস্থিত সময়ে সকলেরই এই সুপাঠ্য কাব্যখানি পড়া উচিত। তাই ইহার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি। বস্তুতঃ মানবগীতার মত সুন্দর গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা আমার পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না।

উপভোগ্য কবিতায় সহজ এবং প্রাঞ্জলভাষায় ইহাতে অনেক দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মানবহৃদয়ে যে সকল চিরন্তন সমস্যার অভ্যুদয় হয়, তাহাদের শাস্ত্র ও দর্শনসম্মত সমাধান অত্যন্ত সরলভাবে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সার্থকতা হইয়াছে নিষ্কামকর্ম্ম-মন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠায়। নিষ্কামকর্ম্মই মানবগীতার মূল সূত্র।

অনেকদিন হইতে দেশের যে দুরবস্থা আসিয়াছে, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে, যে শীঘ্রই আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। আমরা যেন নামিয়াই চলিয়াছি। আজ আমাদের অন্ন নাই, অর্থ নাই, স্বাস্থ্য নাই, সম্মান নাই, ধর্ম্ম নাই। রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মরক আমাদের জন্মভূমির অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের সবই ছিল—অনেকপরিমাণেই ছিল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাণীর বীণা এখানে অশ্রান্তভাবে ঝঙ্কৃত হইত, এখানে স্বাস্থ্য, বাহুবল ধর্ম্মভাব নরনারীর সহজাত সম্পদ্ ছিল। কাহার অভিশাপে যেন ভারতের উদ্দীপ্ত গরিমা ঘন মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে। সোণার ভারত আজ ধূলায় বিসারিত। চারিদিকে অন্ধকার। ঘোর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।

মুর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা বিরাজিত যেথা
তবু অন্নাভাবে লোক অস্থিচর্ম্মসার,

যে দেশে পূজিত বাণী হ'ত গৃহে গৃহে
সেথা কোটি কোটি নর বর্ণ-জ্ঞান-হীন,
যেথা মহামারী করে সর্ব্বধ্বংসী বেশে
জনহীন জনপদ।

(মানবগীতা পৃঃ ১৩৮)

এ সঙ্কট অপসারিত হইবে কি? এ আঁধার কেটে যাবে কি? ভারতের অতীত গরিমা আবার ভাতিবে কি? আবার উঠিবে কি বাণীর সে উদাত্ত বীণার ঝঙ্কার? আমার হাসিবে কি এ ভারত আমাদের?

এমনি শত প্রশ্ন আজ ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। আজ ভারতবাসী বুঝিয়াছে সে কত নিঃস্ব। পৃথিবীর বক্ষে সে কত ক্ষুদ্র, কত হীন, কত কৃপার পাত্র। প্রাণে তাই তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে কেমন করে সে তাহার হারাণ রত্ন ফিরাইয়া পাইতে পারে। কেমন করিয়া আবার জগৎ-সভায় তাহার পূর্ব্বকার গৌরব-আসন উদ্ধার করিতে পারে। আঘাতের পর আঘাত আসিয়া তাহার নিদ্রিত চেতনাকে জাগরিত করিয়াছে। সে তাহার ক্ষতি বুঝিয়াছে। সে জানিতে পারিয়াছে—ভীষণ ব্যাধি তাহার সারা সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাই প্রাণপণে সে খুঁজিতেছে প্রতিকার,—ব্যাধির নিষেধক।

যোগীন্দ্র বাবু দেশের সুসন্তান, দেশের অবস্থা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন। দেশের দুর্ভাগ্যে তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইয়াছে। তাঁহার সজাগ মর্ম্মবেদনার ভিতরে প্রকৃত দেশসেবার যে মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই সুললিত ছন্দে ও ভাষায় মানব-গীতায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। তিনি নূতন কিছুই বলেন নাই। যুগযুগান্তর হইতে ভারতে জ্ঞান-ও-ভক্তি-সমন্বিত কর্ম্মের পূত মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে, তাহারই মহিমা নূতন ভাবে সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার মানবগীতায় গান করিয়াছেন। ভারতকে মোহ-সুপ্তি হইতে প্রবোধিত করিবার জন্য চাই নিষ্কামকর্ম্ম। কর্ম্ম চাই! কর্ম্ম চাই!! শত শত শতাব্দী-সঞ্চিত ভারতের ক্লেদ অপনোদন করিবার জন্য প্রাণপণ কর্ম্মই একমাত্র সাধনা। কর্ম্ম-সাধনা বিনা ভারতের উদ্ধার নাই।

জানিও নিশ্চিত
বৃথা পাঠ, বৃথা পূজা, বৃথা জপ, ধ্যান,

মানব মানব-হিতে কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে
রহে যদি উদাসীন। কর্ম্মহীন হয়ে
ভারতের এ দুর্দ্দশা ;

মানব-গীতা পৃঃ ১৩৭।

কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠাকল্পেই মানব-গীতার রচনা। মানবগীতা কর্ম্ম-গীতার নামান্তর। কর্ম্ম-মন্ত্র ইহার সূচনা, কর্ম্ম-সাধনা ইহার বিষয়, কর্ম্ম-মাহাত্ম্য ইহার প্রতিপাদ্য। জ্ঞান, ভক্তি চাই নিশ্চয় ; তবে কর্ম্মকে অপসারিত করিবার জন্য নয়, নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য। শ্রীভগবান গীতায়ও এই কথা বারবার বলিয়াছেন। কর্ম্ম বিনা জগৎ চলিতে পারে না, কর্ম্ম বিনা মানুষ থাকিতে পারে না। "সৃষ্টি-বাঁধন বেঁধে আপনি ভগবান" অনন্ত কর্ম্মের তরঙ্গে লীলায়িত হইতেছেন। কর্ম্ম বিনা মুক্তি কোথায় ?

মুক্তি নহে জ্ঞানে বৎস ! মুক্তি নহে প্রেমে,
মুক্তি জ্ঞান-প্রেমসহ কর্ম্মের মিলনে।
প্রেমে সমুদ্ভূত বিশ্ব, জ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত,
কর্ম্মে সঞ্জীবিত, তিন বিভূতি বিভুর।
জ্ঞান-প্রেমময় তিনি, কিন্তু কর্ম্মশীল !
বিরাম বিশ্রাম তাঁর নাহি ক্ষণ তরে ;
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, আঁধারে, আলোকে,
অন্তরে, বাহিরে লক্ষি' জীবের কল্যাণ
সাধিছেন সদা কর্ম্ম ; জ্ঞান, প্রেম তাঁর
অনুস্যূত, বিরাজিত প্রতি কর্ম্ম মাঝে।

(মানবগীতা পৃঃ ১৩৫-১৩৬)

যোগেন্দ্র বাবু মানবগীতায় জ্ঞান-ও-ভক্তি-নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিষ্কাম কর্ম্মের সহায়তায় দৈন্য, মালিন্য, ক্লৈব্য, দুঃখ, শোক কেমন করিয়া অপনীত করা যায়, জীবন্ত উদাহরণ দিয়া তাহাই যোগেন্দ্র বাবু এই সুন্দর কাব্যে মধুর ও সরল ভাষায় ও ছন্দে রঞ্জিত করিয়াছেন। অতি সাধারণ একটি আখ্যান অবলম্বন করিয়া এই কাব্য প্রণীত হইয়াছে। আখ্যানের নায়ক অনন্তদেব নিষ্ঠাবান পণ্ডিতের পুত্র, সিদ্ধ যোগীর পৌত্র। যৌবনের মধ্যভাগে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সৌভাগ্যবশে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ললাম-ভূমি হিমাচলের

এক মনোরম নিভৃত শান্তিময় প্রদেশে অনন্ত-ব্রহ্ম-সাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। পঞ্চ বৎসর কাল কঠোর-ব্রহ্মচর্য্য-অবলম্বনে তাঁহার পদাশ্রয়ে থাকিয়া অনন্তদেব শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, একাক্ষর ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন। অনন্তদেব এইরূপে ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান-সাধনায় যথেষ্ট অগ্রসর হইলে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া গুরুদেব তাঁহাকে কর্ম্মব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য সংসারক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। যে কর্ম্ম জগতের উপকার সাধিত করে সে কর্ম্ম উদ্‌যাপিত করিবার জন্য অনেক সাধনার প্রয়োজন। একমাত্র নিষ্কাম স্বার্থশূন্য কর্ম্মই সংসারকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারে। সকলেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্ম্ম করে। সকলেই স্ব স্ব ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডির ভিতর নিবদ্ধ থাকে। তাই সংসারে এত দ্বন্দ্ব, এত বিরোধ, এত অশান্তি, এত অমঙ্গল। একের স্বার্থ আর একের স্বার্থের প্রতিকূল। একজনের নিজস্ব অধিকার আর একজনের অধিকারের বহির্ভূত। অধিকারে অধিকারে বিরোধ, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ বিস্তৃত মানব-ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠাকে মসীলিপ্ত, কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার মূলীভূত কারণ হইতেছে আত্মপর-বিভেদ, আপন পর জ্ঞান বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞান আছে বলিয়াই আমাদের সকল কাজ স্বার্থের ক্ষুদ্র পঙ্কিল প্রবাহের মধ্যে দিয়া পরিচালিত হইয়া এক মহা অনর্থের সৃষ্টি করে। ইহাকে প্রতিহত করিবার জন্য চাই নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্মযোগী, কর্ম্মী সন্ন্যাসী। নিষ্কাম কর্ম্মের প্রধান এবং প্রথম সোপান হইতেছে সেই অমলিন শুদ্ধ জ্ঞান যাহা অবিদ্যা ঘুচাইয়া দেয়, যাহা আত্ম-পরে ভেদজ্ঞান নষ্ট করিয়া দেয়, যাহা সর্ব্বভূতে সমদর্শন প্রতিষ্ঠিত করে। আপনপর ভেদাভেদ যখন চলিয়া যায় তখনই মানব নিষ্কাম কর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়, তখন তাহার স্বার্থ সর্ব্বার্থে পরিণত হয়; আপনাকে যখন সে সর্ব্বভূতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পারে, তখন তাহার সকল কাজ, সকল সাধনা সর্ব্বভূত-হিতায় নিবেদিত হয়, তখন তাহার লক্ষ্য, কামনা আর ক্ষুদ্র স্বার্থে নিবদ্ধ থাকে না; সর্ব্বভূতের মঙ্গলের অনন্ত পরিসরের মধ্যে বিলীন হয়। এক কথায় সে তখন নিষ্কাম কর্ম্মযোগী হয়! শ্রীভগবান গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম্মের অনন্ত গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা অসাধারণ—জগতে সুদুর্লভ। জ্ঞানের চরম, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, যতদিন না লাভ করা যায় ততদিন নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তন অসম্ভব। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি সন্ন্যাসী তিনিই কেবল নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অধিকারী। ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের অভাব নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা

সংসারে থাকিতে রাজি ন'ন। সংসারের ভাল-মন্দে একেবারে নিঃসম্পর্কিত থাকিয়া তাঁহারা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হইয়া একান্ত নিভৃতে কালাতিপাত করেন। সংসারে তাই নিষ্কাম কর্ম্মের এত অভাব। ত্যাগনিষ্ঠ কর্ম্মের আদর্শ নাই বলিয়া সকলেই স্ব স্ব প্রধান,—তাই এত মারামারি, এত হাহাকার। এই অভাব অপনোদন করিবার জন্য যোগেন্দ্র বাবু ব্রহ্মনিষ্ঠ ত্যাগী পুরুষ অনন্তদেবের আদর্শ পরিকল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী অনন্তদেবকে নিষ্কাম কর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই মানবগীতার চরম বক্তব্য।

এ পৃথিবী কর্ম্মভূমি কর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া তুমি
রহিও না হেথা উদাসীন।
কোটি কণ্ঠে, কোটি স্বরে, তোমারে আহ্বান করে
কত আর্ত্ত, কত দীন, হীন।
পূজা-ধ্যান-পরায়ণ আছে ভক্ত বহুজন,
কর্ম্মী ভক্ত দুর্লভ ধরায়;
কর্ম্ম অনুষ্ঠানে, তাই তোমারে প্রেরিতে চাই
যোগ্য পাত্র বুঝেছি তোমায়।

(মানবগীতা পৃঃ ১৫)

ব্রহ্ম তব হ'ন ধ্যেয়, তিনি বাচ্য, তিনি গেয়,
হ'ন তিনি জীবন-সম্বল।
জনক-সদৃশ হও, গৃহী হ'য়ে ঋষি রও,
পরব্রহ্ম করুন মঙ্গল।
আপনার গৃহে গিয়া, ব্রহ্মে নিত্য আরাধিয়া
কর, এবে জীবন-যাপন;
ত্যজি সংসারীর কর্ম্ম, কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম
আচরিয়া নাহি প্রয়োজন।

এইরূপে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অনন্তদেব সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিয়া নিষ্ঠার সহিত আজীবন নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। নিজ গ্রামের মঙ্গলের জন্য কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগনিষ্ঠ কর্ম্মজীবনের পুণ্য স্পর্শে তাঁহার গ্রামের বহুদিন-সঞ্চিত দৈন্য, দ্বন্দ্ব,

কালিমা, নীচতা বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এই নিষ্ঠাবান ত্যাগী পুরুষের কর্ম্মজীবনের আদর্শ মানবগীতায় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অথচ দুঃসাধ্য কোন কার্য্যের কল্পনা নাই। অনন্তদেব যাহা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণের অসাধ্য নহে। ইহার আভাষ অনন্তদেব একস্থানে দিয়াছেন।

দৈবশক্তি মোর নাই ;
মেধাগুণে, শ্রম-ফলে লব্ধ সমুদয় ;
অসাধ্য-সাধন-পটু এই গুণদ্বয়।

(মানবগীতা পৃঃ ৫৪।৫৫)

গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তদেব যখন তাঁহার গৃহে প্রথম পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল তাঁহার একমাত্র পুত্রের সর্পদষ্ট মৃতদেহ ও তাঁহার মাতা ও পত্নীর মর্ম্মান্তিক শোকোচ্ছ্বাস। ভীষণ পরীক্ষা! বক্ষ শূন্য করিয়া তাঁহার একমাত্র আত্মজ আজ চলিয়া গিয়াছে। সংসারীর পক্ষে এ যে দারুণ অভাব—এ যে প্রচণ্ড আঘাত! কিন্তু অনন্তদেব ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী ; তিনি যে সংসারে সেই জ্ঞান দিতে আসিয়াছেন যাহা লাভ করিলে সকল দুঃখ, সকল আঘাত মানুষের কাছে সহনীয় হইয়া যায়! মৃত্যু? সে তো শুধু রূপ-পরিবর্ত্তন। যাহা কিছু ছিল, আছে বা হ'বে সকলই ব্রহ্মময়। কে মৃত, কে বা অমৃত? অনন্তদেব অবিচলিত রহিলেন, তাঁহার শান্তি-ভঙ্গ হইল না, তিনি পত্নীকে বলিলেন

মর্ত্ত্যলীলা-শেষে
গিয়াছে সে হেথা হ'তে অন্য কোন দেশে।
বিশ্বের জননী যিনি ক্রোড় প্রসারিয়া,
লয়েছেন তুলি তারে। কি ফল কাঁদিয়া?
নহে সে আশ্রয়হীন।

(মানবগীতা পৃঃ ২৬)

প্রিয়ে! দৃঢ় কর মন,
বৃথা এই পরিতাপ, বৃথা এ রোদন।

* * * *

প্রতি নর নারী
আমাদের পুত্র-কন্যা অন্তরে বিচারি,

এস, দোঁহে পাতি, পুনঃ নবীন সংসার,
সহায় ব্রহ্মাণ্ডপতি হবেন দোঁহার।

কি সুন্দর সান্ত্বনা! তাহার পর স্বামী-স্ত্রী একমনে একপ্রাণে পর-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

'স্তুতি নিন্দা অনন্তের উভয় সমান।' স্তুতি নিন্দা তাঁহাদেরই বিচলিত করে, যাহারা তাহাদের মুখাপেক্ষী। অনন্তদেব কর্ম্ম করিতেন আপনার জন্য নহে, প্রশংসার জন্য নহে। পরের হিতের জন্য, পরের সেবার জন্য, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তিনি সেই কর্ম্ম নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে সাধিয়া যাইতেন। 'মা কর্ম্মফলেষু কদাচন' ইহাতেই নিষ্কাম কর্ম্মের সার্থকতা। ইহাই অনন্তদেবের সাধনা ছিল, তাই তিনি স্তুতি-নিন্দার ধার ধারিতেন না। তাঁহার গ্রামে অনেকে ছিল যাহারা অনন্তদেবের দোষ ধরিবার চেষ্টা করিত, তাঁহার কার্য্যের ভিতর নিন্দা করিবার জিনিষ অনুসন্ধান করিত। ইহা হইয়াই থাকে। অনন্তদেব হাসিমুখে সকল নিন্দা, সকল সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া একনিষ্ঠতার সঙ্গে হিতকর্ম্ম সাধন করিতে লাগিলেন। আদর্শ গৃহী সাজিয়া তিনি গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীর ভিতর কেহ কেহ তাঁহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। কেননা অল্পসময়ের মধ্যে মুগ্ধচিত্ত বন্ধুরও অভাব তাঁহার ছিল না।

অনন্ত ব্যাপৃত এবে আপনার কাজে,
নাহি প্রতিবাদী তাঁর হরিপুর মাঝে।

(মানবগীতা পৃঃ ৪৯)

নিষ্কাম কর্ম্মযজ্ঞে তিনি আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিলেন। মুগ্ধ ছাত্রগণকে পাঠ দিতে লাগিলেন, ধনি-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে আর্ত্তের সেবা করিতে লাগিলেন,

নিত্য সদাব্রত তাঁর স্থাপিত ভবনে
বুভুক্ষু কখন(ও) নাহি ফিরে অনশনে।

সংসারের মঙ্গলের জন্য তিনি আপনাকে এবং পরিজনকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া দশের মঙ্গলের কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। তবু তিনি দীন দরিদ্র।

নাহি অর্থ, নাহি চিন্তা, নাহি উপার্জ্জন,
উদ্যানের তরু কটি মাত্র আলম্বন।
অথচ অভাব নাই,
অঙ্গনে না হয় ঠাঁই,

এত দ্রব্য নিত্য নিত্য আসে ভারে ভার,
অন্নদা আপনি যেন পূরেন ভাণ্ডার।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ৫০)

তিনি বেশ জানিতেন তাঁর ভাবনা কি! তাঁহার সকল অভাব পূরণ করিবার জন্য আছেন ভারবাহী জনার্দ্দন। তিনি বলিতেন,

"চিন্তা কর দূর,
কল্যের যা প্রয়োজন জানেন ঠাকুর।"

(মাঃ গীঃ পৃঃ ৫১)

তাঁহার ছাত্রগণকে তিনি প্রাণপণে আপনার আদর্শে গঠিত করিতেন। যে জ্ঞান তাহারা তাঁহার কাছে লাভ করিত তাহাই উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে সকলকে দিবার জন্য তাহাদের প্রণোদিত করিতেন। কেননা জ্ঞানী না হইলে প্রকৃত গৃহী হওয়া যায় না। সঙ্গত সুন্দর কর্ম্মসাধনার প্রধান উপাদান জ্ঞান। দুঃখের বিষয় ভারতে নারী অন্ত্যজ প্রভৃতি শিক্ষালাভে বঞ্চিত। ইহাই ভারতের কাল।

ভারতের এ দুর্দ্দশা অজ্ঞতার ফলে ;
দাসত্ব, দুর্ভিক্ষ, রোগ,
নিগ্রহ, লাঞ্ছনা-ভোগ
ঘটিবে, যাবৎ লোক রবে উদাসীন।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ৫৩)

'জ্ঞানের বিস্তার করিও' শিষ্যের প্রতি ইহাই অনন্তদেবের অনুজ্ঞা।

অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য হ'ক করো বিদ্যাদান
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি জেন ভগবান।

* * * *

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কার
সকলের মূলে জেন জ্ঞানের বিস্তার।

* * * *

অসঙ্কোচে শিখাইও পত্নীরে মাতায়
নিজ কুটুম্বিনীগণে।

মাঃ গীঃ পৃঃ ৫২।৫৩

কিন্তু তাঁহার বীজমন্ত্র ছিল নিষ্কাম কর্ম্মসাধনা। এই মন্ত্রেই তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে দীক্ষিত করিয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিতেন।

কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান ; নিষ্ফল না হয়
সাত্ত্বিক সুকর্ম্ম বিশ্বে, বিধির বিধানে।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ১৩৬)

কর্ম্মময় বিশ্ব ; কর্ম্ম-প্রণোদক তিনি।
নহে ইহলোকে মাত্র, লোকে লোকান্তরে
তাঁহারি বিধানে জীব যায় নিরন্তর
কর্ম্ম-সমাধানহেতু।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ১৩৬)

প্রতি কর্ম্ম, ঘটে যাহে জীবের কল্যাণ,
কিবা কাষ্ঠচ্ছেদ, কিবা বেদমন্ত্র-পাঠ,
অবলম্বা, গ্রহণীয় ; কর্ম্মাধিপ যিনি
ফলত্যাগী সর্ব্বকর্ম্মে পূজা করে তারে।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ১৩৭)

ইহাই অনন্তদেবের শেষ উপদেশ। অবশ্য সৃষ্টি-প্রকরণ, আত্মা পরমাত্মা পরলোক প্রভৃতি অনেক তথ্যই তিনি শিষ্যবৃন্দকে শুনাইতেন, কিন্তু সে শুধু তাহাদের নিষ্কাম কর্ম্মসাধনার উপযোগী করিবার জন্য। এই সকল তত্ত্ব না জানিলে মন স্থির রাখা যায় না। মাঝে মাঝে অবসাদ আসিয়া কর্ম্মীকে ক্ষুণ্ণ মোহযুক্ত করিয়া দেয়। অত্যাচার, অন্যায়, অমঙ্গল, ব্যাধি, মড়ক মানবের মনে যে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন জাগাইয়া তুলে সতত তাঁহা কর্ম্মসাধনার পক্ষে ভীষণ অন্তরায়। জগতে যখন চারিদিকেই অন্যায়, অমঙ্গল, অশুভ ছড়াইয়া রহিয়াছে তখন সামান্য মানুষ কি করিতে পারে, এই ভাবনাই তাহাকে নিষ্ক্রিয় পঙ্গু করিয়া দেয়। এই জড়তা অপসারিত করিবার জন্য পরম জ্ঞানের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই পারলৌকিক তত্ত্বসমূহের অবতারণা করা হইয়াছে।

যোগেন্দ্র বাবু এই সকল তত্ত্বের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাহা উপনিষদ্-সম্মত। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি ছিলেন এক একাকার। কিন্তু রসো বৈ সঃ। তাই সৃষ্টির পূর্ব্বের একান্ত সঙ্গহীন ব্রহ্ম রসবিলাস-ইচ্ছায় আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। ইহাই উপনিষদে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ; যোগেন্দ্র বাবুর কথায়—

কারণ-স্বরূপে ছিলেন প্রভু
হইল বাসনা　　　রচিব জগৎ
মহাশূন্য হেন না রবে কভু।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ৬১)

ইচ্ছাময় তিনি শক্তি সীমাহীন
হৃদয়ে বাসনা-উদয় সনে,
মহাশূন্য মাঝে সঞ্চারিল প্রাণ
মূরতি বিকাশ হইল ক্ষণে।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ৬২)

আপন আনন্দ জীবে করিতে প্রদান
জড় মাঝে বিশ্বপতি সঞ্চারিলা প্রাণ।
করিলেন অমরত্বে অধিকারী তারে
যেন সে পূর্ণতা ক্রমে লভিবারে পারে।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ৬৫)

আনন্দই সৃষ্টির মূল, আনন্দেই সৃষ্টি সঞ্জীবিত। আমাদের দৃষ্টি সংক্ষুব্ধ, সীমাবদ্ধ—তাই আমরা জগতে নিরানন্দের প্রাদুর্ভাব দেখি। কিন্তু সমষ্টিভাবে দেখিলে সুখের তুলনায় দুঃখ অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়।

নহে সুখ স্বল্প, দুঃখ পর্ব্বত-প্রমাণ,
প্রত্যক্ষ করহ বিশ্বে কত তাঁর দান।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ৬৬)

সুখ দুঃখ যদি চাহ করিতে গণন,
লইও সমষ্টি, ব্যষ্টি কোরো না গ্রহণ।

* * * *

প্রতি কার্য্যে আছে, জেন, শুভ বিদ্যমান,
পাইবে প্রত্যক্ষ, কোথা পরোক্ষ প্রমাণ।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ৬৯)

অমঙ্গলের মধ্যে যেমন মঙ্গলের সূচনা জ্ঞানী দেখিতে পান, তেমনি তিনি মৃত্যুর পারে অমৃতত্বের সন্ধান পান। জ্ঞানের আলোকে সকল দ্বন্দ্ব, সকল অবসাদ দূর হইলে মানব সকল রকম অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে স্থির ধীরভাবে স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্মসাধনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। তাই সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মা পরমাত্মা তত্ত্ব প্রভৃতির ধ্যান ও ধারণা কতক পরিমাণে আবশ্যক। তবে সকল জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে মানবকে ইহজগতে কর্ম্মসাধনে নিয়োজিত করা। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

কর কর্ম্ম-অনুষ্ঠান,
মোর প্রীতি হেতু কর্ম্মে পাবে তুমি ত্রাণ।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ১৩৪)

অনন্তদেবের উপদেশ,

শুধু জ্ঞানে, শুধু ধ্যানে লভ্য নন তিনি।
ভক্তি-পূত কর্ম্মে নর লাভ করে তাঁয়,
রাখিও সতত মনে।

এই ভক্তিপূত জ্ঞান-সমাহিত কর্ম্মের আদর্শই অনন্তদেব তাঁহার জীবনে স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। আজীবন তিনি গৃহে থাকিয়া মাতা-পত্নী-পরিবৃত হইয়া—এক কথায় গৃহী হইয়াও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আজীবন তিনি পরহিতব্রতে কাজ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ও তাঁহার পরিজনের ক্লান্তি ছিল না, শ্রান্তি ছিল না, বিতৃষ্ণা ছিল না। পরের ভালমন্দ তাঁহারা এমনই নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন।

অনন্তদেব প্রথমে ছিলেন নিতান্ত গরীব। কিন্তু অবস্থাচক্রের পরিবর্ত্তনে পরে ধনী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বপুরুষ-অর্জ্জিত নদীগর্ভ-নিমজ্জিত তাঁহাদের প্রভূত ভূসম্পত্তি উত্থিত হইয়া তাঁহার করতলগত হয়। কিন্তু সম্পদ তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত করে নাই। বরং তাঁহাকে পরের কল্যাণ-সাধনে সমধিক সাহায্য করিয়াছিল। ধন, মান, সহায় সম্পদ তিনি সবই পাইয়াছিলেন কিন্তু কিছুই তাঁহাকে বিমোহিত করিতে পারে নাই। দারিদ্র্য, অপমান, অবহেলা কর্ম্মজীবনের প্রথম অঙ্কে তাঁহার উপর যেমন কোন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই; শেষজীবনে ধন, গৌরব, সম্মানও তেমনি তাঁহার আদর্শকে অম্লান রাখিয়াছিল। ইহাই প্রকৃত সাধুর, প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। 'সকলই তাঁহার' এই কথা যাঁহার স্মরণে, মনে, ধ্যানে সদা অঙ্কিত থাকে, কোনরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি জানেন তিনি তাঁহার প্রভুর আদিষ্ট কার্য্যই করিতেছেন, তাই তিনি সকল অবস্থাতেই স্থির ধীর থাকিতে পারেন।

ভক্ত যদি বুঝে মনে, নিয়োজিত আমি
প্রভুর আদিষ্ট কার্য্যে, পশ্চাতে আমার
দাঁড়ায়ে বিরাটবেশে সর্ব্বশক্তিমান,
কেন সে ভাবিবে ক্ষুদ্র দীন-হীন আমি।

(মাঃ গীঃ পৃঃ ১৩৫)

তাই অদম্য উৎসাহে সকল বাধা সরায়ে তিনি পরসেবায় কাজ করিয়া গিয়াছেন। গ্রামে মারী উপস্থিত, লোকবলের অভাব, তখনও তিনি আপনার

হাতে গ্রামের কূপ সংস্কার করিয়া গ্রামকে রক্ষা করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার সহায় ছিল তাঁহার প্রিয় শিষ্য দুঃশাসন—এবং এই কার্য্যে দুঃশাসন আপনার জীবন বলি দিয়াছিল। তিনি যে আদর্শ স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন এবং যে আদর্শে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য দুঃশাসনকে গঠিত করিয়াছিলেন—সেই কর্ম্মজীবনের সুন্দর আদর্শ আবার জাগাইবার জন্য যোগেন্দ্র বাবু এই মানবগীতা বিরচিত করিয়াছেন।

লোকহিতে অর্পে যে জীবন
তার হ'তে পুণ্যবান নাহি কেহ ভবে।

লোকহিতকর কর্ম্ম সংসারে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য চাই অনন্তদেবের মত জ্ঞানি-ভক্ত-কর্ম্মী, গৃহি-ঋষি, কর্ম্মি-সন্ন্যাসী। ভারতকে মোহসুপ্তি হইতে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য চাই অনন্তদেবের মত নিষ্কাম কর্ম্মিবৃন্দ—যাঁহাদের ত্যাগ-সমাহিত কর্ম্মের পুণ্য-প্রবাহের মুখে ভারতের সকল দৈন্য, মালিন্য, ক্লৈব্য ধুয়ে মুছে যেতে পারে।

যোগেন্দ্র বাবুর মনস্কামনা সফল হউক। আজ এই নবজাগরণের সূচনায় আমরা তাঁহার মানবগীতাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

গৌরী-স্বাগতম্।

(আগমনী)

লেখক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ।

(১)

তারারাজি-বিরাজি-রত্ন-বিলসন্নীলাম্বরোদ্ভাসিতা
নানাপুষ্পচয়চ্ছলেন দধতী স্বাচারলাজাবলী।
বর্ষাপাতবিধৌতনির্ম্মলতনুঃ কাশাবলীহাস্যকা
গৌর্য্যাঃ সাঽত্র কুলাঙ্গনেব তনুতে সম্বর্দ্ধনাং শ্রীশরৎ॥

(২)

নৃত্যোত্তালতরঙ্গসঙ্গতকরানুত্তোল্য যান্তী মুদা
বিশ্বপ্রেমরসৈক-ভর্তৃমিলনে মুগ্ধা সতী নির্ম্মলা।

তৎপ্রেম্নেব গলদ্দ্রবান্তরবতী স্রোতস্বতী সাম্প্রতং,
গায়ন্তীব 'কুলু' স্বনৈ র্বিতনুতে 'গৌরী-শুভ-স্বাগতম্॥'

(৩)

অধ্যাত্মানিলমেয়মেষু তরুষু প্রাণিত্বমস্তি ধ্রুবং,
ন্যায়জ্ঞৈঃ কথিতং চিরন্তনমিদং সত্যেন মন্যে বচঃ।
নোচেত্তৈঃ কুসুমাঞ্জলির্বিভুপদে শাখাকরৈরর্প্যতে,
সান্দ্রানন্দবিহঙ্গকূজনমিষৈঃ সঙ্গীয় কিং তৎস্তবম্॥

(৪)

মন্দং মন্দং নুদতি পবনস্তালপত্রং প্রশান্ত্যৈ
নন্দন্নন্দন্ বহতি সুহুতং তৎকৃতে হব্যবাহঃ।
স্বান্তং শান্তং ভবতি নিতরাং যাজকানাং মহেঽস্মিন্,
স্বান্তং ধ্বান্তং ত্যজতি কৃতিনাং স্বর্চ্চনে বিশ্বমূর্ত্তেঃ॥

(৫)

কুঞ্জে কুঞ্জে ধ্বনতি বিহগঃ স্বাগতং বিশ্বমাতুঃ,
পুষ্পে পুষ্পে হরতি মধুপো মাতৃকৃত্যৈ মধূনি।
বঙ্গে বঙ্গে প্রতিগৃহমিদং স্বাগতানন্দমুগ্ধং,
রঙ্গে রঙ্গে নটবরগণো নাটয়েৎ স্ব স্ব নাট্যম্॥

(৬)

ভ্রাজং ভ্রাজং জলজনয়নং সংলসদ্ভৃঙ্গতারং,
দর্শং দর্শং তদখিলকৃতিং নৈতি মানং সরস্বান্।
স্মারং স্মারং নিখিলচরিতং বিশ্বমূর্ত্তেরমূর্ত্তেঃ
নামং নামং চরণযুগলং নাস্তমূর্ত্তির্ভবেৎ কিম্॥

(৭)

তন্নো যন্নো সজলজজলং, পঙ্কজং নো নভৃঙ্গং,
নাসৌ যোঽসৌ স্বনতি ন কলং ষট্পদো মাতৃনুত্যৈ।
তন্নো যন্নো হরতি হৃদয়ং গুঞ্জনং মানবানাং,
নাসৌ যোঽসৌ ন লসতি নরঃ শক্তিপূজোৎসবেঽস্মিন্॥

(৮)

উচ্ছন্নুচ্ছন্ বিকিরতি করং ভাস্করস্তন্নিয়োগাৎ,
ফুল্লন্ ফুল্লন্নলিনমমলং ভাসয়েচ্ছীতরশ্মিঃ।

ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ মহিমবিভুতাং সজ্জনো মাতৃমূর্ত্তেঃ,
গায়ন্ গায়ন্ ক্ষণমিব নয়েন্মাতৃপূজাদিনানি ॥

(৯)

প্রকৃতিঃ প্রকৃতিপ্রভবাগমনে,
সজনৈঃ স্বজনৈঃ সহ ভাবগতা।
সগৃহং স্বগৃহং প্রতি রাগযুতা
সহসা সহসা বিদধে বিবিধম্ ॥

(১০)

এতদ্দুঃখং ব্যথয়তিতরাং মর্ম্মপীড়ং সদাঽস্মান্,
শক্তেঃ পুত্রাস্তদপিচ বয়ং শক্তিহীনস্বরূপাঃ।
সংসারাব্ধৌ ত্রিবিধকৃতিভি র্ভূ গুরুগণাত্মকানাং,
শক্তিং দেহি ব্যথিতহৃদয়ে সর্ব্বশক্তিস্বরূপে।

(১১)

বিশ্বাধারে! ভগবতি! বিভো! বিশ্বগে! বিশ্বমূর্ত্তে!
আহ্বানং কিং তব গুণবচো নৈব জানে কথঞ্চিৎ ॥
বিশ্বস্থানং পবনমিব তাং ত্বানয়ে তাপশান্ত্যৈ
ক্ষুদ্রবোঽহং জগদঘহরে! বিশ্বমায়াবিমুগ্ধঃ ॥

(১২)

কিং কর্ত্তব্যং কিমু মম হিতং নৈব জানেঽত্র মূঢ়ঃ,
শক্তির্ভক্তী রতিরথ পদে নাপি কিঞ্চিৎ স্বমস্ব!
গঙ্গা-পূজাং বিদধতি যথা গাঙ্গবারিপ্রদানৈঃ,
তদ্বদ্ যত্তে কিমপি বিহিতং ভক্তিদত্তং গৃহাণ ॥

(১৩)

লীলাস্থানং চিরপরিচিতং ভারতং স্বং তবৈতদ্
ভূয়াত্তস্মিন্ জননি! শুভদে! স্বাগতং স্বাগতং তে!
নিত্যানন্দং বিতর সুখদে! তাপদগ্ধে প্রমুগ্ধে,
শান্তির্নিত্যং বিলসতুতরাং ত্বৎপদে ভক্তিরস্ব!

(১৪)

ভক্তরক্তচিত্তচারি-রাজহংসরূপিকে!
কামদেহদাহকারি-দিব্যবহ্নিহেতুকে!

ধর্ম্মহীন-কর্ম্মলীন-ভুগরুগণদেহকং,
রক্ষ ধাত্রি! দক্ষপুত্রি! দেহি শর্ম্ম শান্তিদে

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

আনন্দময়ী আসিতেছেন, তাই চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে। ধনী, দরিদ্র, নর, নারী, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা, ব্যবসাদার, পাওনাদার সবাই উৎসুক, সবাই উৎফুল্ল। জগজ্জননীর সম্বর্দ্ধনের জন্য কাননকুন্তলা শ্যামলা ধরণী কুঙ্কুমাভরণে সাজিতেছে। প্রভাতে শিশির-ধৌত শুভ্র শেফালিকারাশি, যেন প্রকৃতি মায়ের চরণ-সরোজে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। স্বচ্ছ তটিনী, কুল কুল রবে মায়ের আগমন-সঙ্গীত গাহিয়া সরিৎপতির নিকট মায়ের আগমন সংবাদ দিতে যাইতেছে। ফুল্লনলিনী বিমল সরসী-সলিলে সোহাগভরে দুলিয়া দুলিয়া পরিমল বিলাইতেছে। অলিকুল, ফুলদল-মধু-পানাশায় গুন্ গুন্ স্বরে কুসুমকাননে ধাইতেছে। জ্যোৎস্না-বিধৌত নীরব শারদ-নিশায় কলকণ্ঠ পাপিয়া সুনীলগগন-তলে স্বরসুধা বর্ষণ করিতেছে। স্বচ্ছ নক্ষত্রমালা উজ্জ্বল হীরকমালার ন্যায় গগনে শোভা পাইতেছে। শোভাময়ী শস্যশ্যামলা ধরণী নয়ন-মন তৃপ্ত করিতেছে। আদ্যাশক্তির উদ্বোধনে স্থাবর, জঙ্গম, সর্ব্বভূতে চৈতন্যের সাড়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদেবশক্তিসম্ভবা মহাশক্তি, তিনিই মহামায়া, তিনিই প্রকৃতি। তাঁহারি আদেশে চরাচর বিশ্ব নিয়মিত হয়, তিনিই বিশ্ব-প্রসবিত্রী এবং জগদ্ধাত্রী। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতি, অসুরকুল-নিসূদন ষড়ানন তাঁহার পুত্র, বিশ্বজনবন্দনীয়া বাগ্দেবী ও লক্ষ্মী তাঁহার কন্যা। দেবগণ তাঁহার সহচর, ঋষিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠক। সুতরাং তিনি ত্রিলোক-পূজ্যা। তিনিই জগৎকে মোহিত করেন, চেতন করেন এবং আনন্দ প্রদান করেন। তারই হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে জগৎ আনন্দ লাভ করে। তিনি আনন্দ-সিন্ধু-স্বরূপা।

সুতরাং তাঁর আগমনে সবাই আনন্দ লাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি নিত্যা হইলেও দেবকার্য্য-সাধনার্থ আবির্ভূতা হইয়া থাকেন;

তখন উৎপন্না বলিয়া কথিত হন। তিনি লীলাচ্ছলে হিমালয়-গৃহে গৌরীরূপে এবং দক্ষালয়ে উমারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার অচিন্ত্যবিভব, অচিন্ত্যশক্তি দেবগণেরও অজ্ঞেয়। তিনি, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের হেতু এবং বিশ্ব-মূর্ত্তি-স্বরূপা। তাঁহার স্তবের ভাষা দেবগণ, ঋষিগণ খুঁজিয়া পান না, মনুষ্য কোন্ ছার্! সেই আনন্দময়ীর আনন্দস্রোত এখানে প্রবাহিত হইতেছে। অতীতের কথা, হৃদয়ের ব্যথা যেন আজ কে ভুলাইয়া দিতেছে; শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইতেছে; বিষাদ-কালিমাময় মুখেও হাসি-রেখা দেখা দিতেছে। সবাই উদ্‌গ্রীব, নির্ণিমেষনেত্র, মায়ের আশাপথ পানে চেয়ে আছে। প্রতিক্ষণে মনে হয়, ঐ বুঝি ভুবনমোহিনী মা এল। এস মা আনন্দময়ি! জগজ্জননি! তিনটি দিনের তরে আঁধার মণ্ডপে সিংহাসনে, সিংহ-আসনে ভুবন-জীবন আলো করে এসে দাঁড়াও। আমরা তোমার অধম সন্তান, শক্তিময়ীর সন্তান হয়ে শক্তিহীন, রাজরাজেশ্বরীর পুত্র হয়ে, চিরভিখারী, অন্নপূর্ণার অপত্য হয়ে, অনাহারে দেহ ক্ষীণ, ব্যাধিক্লিষ্ট। মা! তোমার যে পূজা করিব, তাহার কোনই সামগ্রী নাই। তাই, বিল্বদল, আর নয়নের জল সম্বল করে রেখেছি, তোর রাঙা চরণ পূজার জন্য। মা হয়ে যদি তুই সন্তানের দুঃখ না বুঝিবি, নয়নের জল অঞ্চলে না মুছাইবি, তবে, আর তোরে মা বলে ডাক্‌ব না।

প্রাণের ব্যথা কেঁদে আর কত জানাব! তুমি অন্তর্যামিনী, তুমি প্রাণের ব্যথা কি বুঝিতেছ না মা? দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় কতবার তাহাদের অরিকুল নির্ম্মূল করে তাদের দুঃখ দূর করেছ, আমাদের সংসার-চোষণকাঠী দিয়ে ভুলায়ে রেখেছ। এত যে দিবানিশি কাঁদি, মা বলে ডাকি, তাহা কি শুনিতে পাও না? আমরা আশায় বুক বেঁধে আছি, যে, মা এলে সব দুঃখ ঘুচে যাবে। এবার মা এলে আর ছেড়ে দিব না। একটা বুঝা পড়া করে লইব। হয়, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও, না হয়, যাতনার অবসান করিয়া দাও। কুবের তোমার ভাণ্ডারী, লক্ষ্মী তোমার কন্যা, তুমি স্বয়ং অন্নপূর্ণা। তবে তোমার সন্তানকুলের, এত দুর্দ্দশা কেন মা? অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, ধনহীন, আয়ুক্ষীণ—কি দোষে মা। তোর সন্তান অপরাধী? আমরা ভক্তি-হীন ও শক্তি-পূজায় বিমুখ বলেই কি মা এত দুঃখ দিতেছ? যদি তাহাই হয়, তবে আমরা তো জ্ঞানান্ধ, তুমি পথ দেখাইয়া দাও, নতুবা কেমনে জানিব? মা বিনে সন্তানের দুঃখ আর কে দূর করিবে? যদি এসেছ, তবে, শূন্য হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হও। অসুরটিকে দিয়া, পশুরাজটিকে

দিয়া নিপীড়ন করো না মা? স্বয়ং এসে তিনটি দিনের জন্যও অপেক্ষা কর, আর সন্তানের নয়নের জল মুছাইয়া দাও। আশায় উৎফুল্ল হয়ে আজ আমরা তোমার আশাপথ চেয়ে আছি। এবার আমাদের আশা পূর্ণ করিতেই হইবে।

তোমাতে কিছুরই অভাব নাই, তুমি সর্বৈশ্বর্য্যে পূর্ণা, তবে তোমার সন্তানের এত দুঃখ কেন মা? আমরা আর কত সহ্য করিব? সহিষ্ণুতার তো একটা সীমা আছে? আমাদের সীমা অতিক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অত্যাচার একটি দুটি নয়, অসংখ্য—ভৌতিক, সামাজিক, মানুষিক, দৈব, প্রাকৃতিক ইত্যাদি বহুবিধ। নিরন্তর অত্যাচারে আমাদের অস্থি-পঞ্জর বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এ সব কি মা, দেখিতে পাওনা? তুমি মহাকালের গৃহিণী, বিশ্বের চিরসাক্ষিস্বরূপা। আমরা কি ছিলাম, আর কি হয়েছি, এ সব কি দেখিতেছ না মা? তুমি প্রকৃত মায়ের মত হয়ে, আমাদের অভাব অভিযোগ দূর করে দিয়ে, মহামহোৎসবে চিরদিন হৃদয়-সিংহাসনে পূজিত হও, সেই ভাল নয় কি মা? তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমানা, তাই তোমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির অধিষ্ঠানের পূর্ব্বেই মঙ্গল-ঘটে তোমার আহ্বান হইয়াছে। পূত-কলেবর দ্বিজবর সুমধুরস্বরে তোমার মহামহিমাময়চরিত পাঠ করিতেছেন। তুমি শিবসিমন্তিনী, তাই বিল্বমূলে তোমার আমন্ত্রণ হইতেছে। পূজা, হোম, জপ, স্তুতিনতি বিধিবিহিতভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তোমাকে দেবার আমাদের কিছুই নাই, তোমার দেওয়া জিনিস তাই তোমাকে দিতেছি। আমার পাপাশয় তোমার চরণ-বিমুখ মনকে বলিরূপে দিতেছি, গ্রহণ কর। বরষের সাধ নিমিষে ফুরায়। কত কেঁদে, কত আরাধনা করে, বরষের পর মা তোমার দেখা পেয়েছি, হায়! দেখার সাধ না পুরিতেই, সব ফুরায়ে যাবে, এই বড় দুঃখ।

বিশ্বের যাহা কিছু সবই তোমাতে আছে; সৌন্দর্য্য, বিভূতি, শক্তি, মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য্য, জীবনী শক্তি, জ্ঞান, অর্থ, সিদ্ধি, ঋদ্ধি, রস, ভাব, তেজ, বিক্রম সমস্তই তোমাতে আছে। জ্ঞানচক্ষে দেখিতে জানিলে তোমাতে অনেক শিক্ষা আমরা পাইতে পারি। কিন্তু, আমরা অন্ধ, সে দৃষ্টিশক্তি আমাদের নাই। যাহারা তোমার মৃন্ময় মূর্ত্তি মাত্রই দেখে, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না। ত্রিভুবন তোমার লোমকূপে বিরাজ করে। তোমায় না জানিলে, তোমায় না ভজিলে, পুরুষার্থ সুদুর্লভ। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড তোমার উদরে বিরাজ করে। বিশ্বপতিও তোমার প্রভাবে বিমোহিত হইয়াছিলেন। আমরা জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন,

শক্তিহীন, কেমনে তোমায় চিনিব, কেমনে তোমায় পূজিব ? তুমি নিজগুণে যে দেখা দাও, সে তোমার অপার দয়া। ধনীর দ্বারে একমুষ্টি অন্নের জন্য সতৃষ্ণদৃষ্টিতে দাঁড়ায়ে আছে যে ব্যক্তি, সেও তোমার সন্তান, স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়া আছে যে, সেও তোমার সন্তান। এত বৈষম্য কেন মা ? তুমি ইচ্ছাময়ী, শক্তিরূপা, তুমি কি এ বৈষম্য দূর করিতে পার না ? বোধ হয়, তোমার পূজা আমরা করিতে জানি না বলিয়াই বৈষম্য ঘুচে না। তোমার পূজাপদ্ধতি তুমি আমাদিগকে শিখাও, নচেৎ আমরা জানিব কিরূপে ?

তোমার দ্বার হতে কেহই বিমুখ হইয়া ফিরে না। মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সবাই তোমার পূজার অধিকারী। যে মুক্তি চায়, সে মুক্তি পায় ; যে বৈরাগ্য চায়, সে বৈরাগ্য পায় ; আর যে ধনং দেহি, যশো দেহি, ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং বলিয়া প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। সাত্ত্বিক, তোমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি হতে চিন্ময়স্বরূপ অনুভব করিয়া সুখী হয়। রাজসিক মানব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট হয়। তামসিক মানব, ভোজ্য-পেয়লাভে, আমোদ-প্রমোদে সন্তুষ্ট হয়। তোমার নিকট হতে কেহই বিমুখ হইয়া ফিরে না। তোমার অপার করুণাধারা সততই জীবের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। তুমি বর্ষে বর্ষে ভুবনমোহিনীরূপে এসে দেখা দাও, কিন্তু মা! সন্তানের মাত্র তিনটি দিনের জন্য তোমায় পেয়ে আশা মিটে না, তৃপ্তি হয় না। কত কথা তোমায় জানাব, কত প্রাণের ব্যথা তোমায় দেখাব, দীর্ঘ সম্বৎসর ধরিয়া এই আশা বুকে লইয়া বসিয়া আছি। কিন্তু হায়! আশা মিটে না, দুঃখ ঘুচে না। দেখিতে দেখিতে তিনটি দিন চলিয়া যায়। ব্যোমকেশ হারাবার ভয়ে অর্দ্ধ-নারীশ্বর হয়ে আছেন, আর কি আমাদের ধরে রাখ্‌বার শক্তি আছে ? তুমি পাষাণের মেয়ে, সন্তানের প্রতি পাষাণী হয়ে আছ। মা! আমাদিগকে শক্তি দাও, যেন তোমায় ভক্তি-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া হৃদয়-কারাগারে ধরিয়া রাখিতে পারি। তাহা হইলে, যখন ডাকিব তখনই পাইব, আর মা, মা বলে কাঁদিতে হইবে না। বাহ্য পূজা ঘুচায়ে দাও, যেন হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় স্থাপন করিয়া শ্রদ্ধাচন্দনে, ভক্তিকুসুমে, প্রেমসলিলে তোমার কোকনদবিনিন্দিত রাজীব-চরণ যুগল সতত পূজা করিতে পাই। ইচ্ছাময়ি! সন্তানের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর মা! আর চিরদিন দীন সন্তানকে সংসার-চোষণকাঠী দিয়ে ভুলায়ে রেখ না। ইহাতে কোনই রস নাই মা! বরং বিরস। চিরদিনই

কি সন্তানে ভুলায়ে রাখিবি মা! এখন একবার কোলে টেনে লও মা! তোমার নিকট আর ভার-বহনের জন্য প্রার্থনা করিব না। ভার নাবাইবার জন্যই প্রার্থনা করিব। তুমি তুষ্ট হইলে কি না দিতে পার, আর রুষ্ট হইলেই বা কি না করিতে পার? মা তুমি মহাশক্তি, তোমার সন্তান হয়ে আমরা এত শক্তিহীন কেন মা? এত ভীত ত্রস্ত কেন মা?

তোমার চরণ-নখর-দ্বিজরাজ-ময়ুখ-রেখা পাপতাপ-নাশক, তোমার বরা-ভয়কর ধ্বংসোন্মুখ জীবনের আশ্বাসপ্রদ, তোমার বিম্বাধরের হাস্য-কৌমুদী-রেখা সঞ্জীবন রসায়ন। তোমার ত্রিনয়নের প্রসন্ন দৃষ্টি ভবদমন শমন-ভীতিনিবারক, তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, তোমার সমস্তই মঙ্গলপ্রদ। তুমি শিবসীমন্তিনী ও সর্ব্বমঙ্গলা, সুতরাং সর্ব্বজনের পূজনীয়া। তুমি আহার্য্য বস্তুরূপে জীবের প্রাণ বাঁচাইতেছ, আবার জগদ্ধাত্রীরূপে জগৎ পালন করিতেছ। বসন্তে বাসন্তীরূপা সুরথ-রাজার পূজা, শরতে শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিপূজা। তোমার আগমন-উপলক্ষে ধনীর দুয়ারে মধুর স্বরলহরী দিগন্তে প্রসারিত হইয়া শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতেছে। বালকবালিকাগণ বিচিত্র বসন ভূষণে ভূষিত হয়ে সহাস্যবদনে খেলা করি-তেছে। মানবসমাজে আনন্দপ্রবাহ বহিতেছে। মা! তুমি গেলে ভবন আঁধার হবে, উৎসবময় পুরে নিরানন্দ বিষাদচ্ছায়া পতিত হইবে। তাই বলি, যদি এসেছ, তবে কাষ্ঠাসন ছেড়ে এসে হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও। আর যেন তোমার বিরহ কষ্ট পাইতে না হয়। যদিও তুমি সর্ব্বভূতে, চরাচরে অধিষ্ঠিত আছ সত্য, কিন্তু মা! আমরা তোর বিরাট মূর্ত্তির চিন্তা করিতে ও ধারণা করিতে পারি না। তাই মনের মত তোর মূর্ত্তি গড়িয়া নয়নের সম্মুখে স্থাপন করি। যখন তুমি সর্ব্বত্রই বিদ্যমানা, তখন তোমার প্রতিমূর্ত্তিতে তুমি কি অধিষ্ঠিত হইতে পার না? আমরা তাহা ভাবিতে পারি না। আমরা মনে প্রাণে জানি তুমি মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ী হয়ে ভক্তের পূজা গ্রহণ কর। ভক্তের পত্র, পুষ্প, ফলজল তুমি কেন না লইবে? আমাদের ভাগ্য আমরা গড়ি-য়াছি, তজ্জন্য তোমায় দোষ দিব না। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দাও, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। তুমি যে অধম সন্তানদিগকে তিনটি দিনের জন্যও দেখিতে আসিতেছ, সেই বহুভাগ্য। মহশ্মশানে আজ যে অপ্সরার গীতি পরিশ্রুত হইতেছে, নিরানন্দ ভবনে আনন্দস্রোত বহিতেছে, সে তোমারই মহিমা। তুমি ইচ্ছাময়ী; তোমার ইচ্ছাতেই সব হইতেছে ও

হইবে, আমরা তোমার হস্তে ক্রীড়াপুত্তল মাত্র! এ জীবনের বিজয়ার দিনে ঐরূপে মা হৃদয় মাঝে দেখা দিও।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা।*

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

আজ মাত্র তিন বৎসর হইল, সত্যেন্দ্রনাথ এ সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার স্মৃতি আত্মীয়তা-বন্ধুত্বের ভিতর দিয়া ও অন্যান্য নানাভাবে আমাদের মধ্যে জাগিয়া আছে; কিন্তু এমন দিন আসিতে পারে যখন সে স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য কোন জিনিষই বর্ত্তমান থাকিবে না। তবে এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, পৃথিবী হইতে সাহিত্যের আদর যদি কখনও লুপ্ত না হয়, তবে সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিও কখনও লুপ্ত হইবে না। তাঁহার অমূল্য কাব্যাবলীকে আশ্রয় করিয়া সে স্মৃতি অনন্তকাল আমাদের চিত্তপটে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের সকল অংশই যে স্থায়ী হইবে, সেরূপ কথা বলিলে নিতান্তই তোষামোদের পোষকতা করা হয়। কোন লেখকেরই সকল রচনা সাহিত্যে স্থায়ী হয় না। কালিদাস, সেক্ষপীর প্রভৃতি অমর কবিদিগেরও দুই একটী রচনা কালপ্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার সংবাদ প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরও অপরিজ্ঞাত। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে সত্যেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই বিশ্বসাহিত্যের দরবারে অতি উচ্চ এবং স্থায়ী আসন লাভ করিবে। তাঁহার "কবর-ই-নূরজাহান" শীর্ষক কবিতা ইতিহাস-বিখ্যাত সুন্দরী নূরজাঁহা বেগমের স্মৃতি অবলম্বনে রচিত হইলেও উহার কবিত্ব দেশকালের এতই উর্দ্ধে অবস্থিত যে ঘটনাক্রমে কোন দিন যদি ভারত-বর্ষের ইতিহাসখানি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে আমা-দের উত্তর পুরুষগণ উক্ত সুন্দরীর বিষয় কিছুই না জানিতে পারেন, তথাপি ঐ কবিতার সৌন্দর্য্য-জ্যোৎস্না তাঁহাদের চিত্তে আনন্দের জোয়ার আনয়ন করিবে। সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাটী এতই সুন্দর—এতই মনোহর যে, উহার সম্বন্ধে অধিক প্রশংসার কথা বলা যায় না। পাঠক এইমাত্র বলিতে

* যশোহর সাহিত্যসঙ্ঘের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত

পারেন যে, উহা চমৎকার। "কবর-ই-নূরজাহানের" ঠিক সমপদস্থ না হউক, অনুরূপ কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ আরও অনেক লিখিয়াছেন। তাঁহার "তাজ" আগ্রার তাজের মত লোকের মনে যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দ উৎপাদন করিবে; তাঁহার "মহাসরস্বতী" সুদূর ভবিষ্যতেও জগতের কাছে তাঁহার লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা গাহিবে। তাঁহার "মেঘলোকে" পাঠক স্বর্গলোকের আভাস পাইবেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই সকল কবিতা নামযশের আকাঙ্ক্ষা বা ঐরূপ কোন বাহ্য ঘটনার উত্তেজনায় রচিত হয় নাই; কোন সুন্দর কবিতাই সে ভাবে রচিত হইতে পারে না। প্রকৃত কবিত্বের উদ্বোধনে প্রাণ যাহার সাগর-তরঙ্গের মত নাচিয়া উঠে, তাহারই লেখনীমুখে ঐরূপ কবিতা বাহির হইতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার জিনিষ তাঁহার ভাষা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যখন সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করি তখন সে ভাষার কথা আদৌ আমাদের মনে পড়ে না। এমন অনায়াসে এবং অবলীলাকৃত গতিতে ভাষা আপনার কাজ করিয়া যায় যে, সে যে কোন কাজ করিতেছে, তাহা একেবারেই আমরা ভুলিয়া যাই। অতি সুন্দর এবং স্বাভাবিক একখানি চিত্রের দিকে হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের চিত্ত সরাসরি উহার ভাব-রাজ্যের মধ্যে ডুবিয়া যায়। চিত্রকর কি ভাবে কোন্ রেখার পরে কোন্ রেখা টানিয়া, কোন্ রঙের পাশে কোন্ রঙ ফলাইয়া সে ভাবটী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—শিল্পের সে সকল তৌর্য্যত্রিক আমাদের লক্ষ্যই হয় না। এই লক্ষ্য না-হওয়ার ভিতরেই শিল্পের চরম উৎকর্ষ এবং শিল্পীর পরম কৃতিত্ব। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার ভাষা যে আদৌ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, এই জন্যই সে ভাষা আরও বিশেষ করিয়া একটী লক্ষ্যের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

ভাষার কাজ কি?—ভাবকে যথারীতি ফুটাইয়া তোলা। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে ভাব অপেক্ষা ভাব-চিত্রই অধিক। তাঁহার এক একটী কবিতা এক একটী বায়স্কোপের ফিল্ম্ অর্থাৎ চিত্রধারা। ভাষা নিজেকে প্রকাশ না করিয়া অন্তরাল হইতে সেই সকল চিত্রের উপর আপনার অন্তরের বিচিত্র আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া সে গুলিকে পাঠক-সাধারণের চক্ষে উজ্জ্বল এবং সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। মোটের উপর ভাষার যে কাজ, তাহা সত্যেন্দ্রনাথ তাহার নিকট হইতে ষোল আনা আদায় করিয়া লইয়াছেন।

অবশ্য পূর্ব্বে তাঁহার ভাষাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইয়াছিল।

এখন দেখা যাক্ এই গঠনকার্য্যে সত্যেন্দ্রনাথ কি কি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সহজেই বুঝা যায়, ভাষাকে অধিকতর ভাবপ্রকাশক্ষম করিয়া তুলিতে হইলে শব্দ-চয়ন-ব্যাপারে একটু উদারতা অবলম্বন আবশ্যক। গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃতশব্দে বাঙ্গালাভাষাকে সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালাভাষার ওজন এত বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছেন যে অনেকস্থলে উহার স্বচ্ছন্দগতি এবং কর্ম্মপটুতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে যাঁহারা কেবলমাত্র চলিত শব্দপ্রয়োগে ভাষা-গঠনের প্রয়াসী, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া নিজেদের অক্ষমতা বুঝিয়া চলিত শব্দের সহিত মধ্যে মধ্যে পোষাকী সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ শব্দ-নির্ব্বাচন-সম্পর্কে গোঁড়ামী এবং ভণ্ডামী—দুয়ের কোনটীরই প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি প্রকাশ্যভাবে মাতৃপূজায় দশের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে কেহ যেন মনে না করেন যে, বাঙ্গালাভাষায় বিভিন্ন ভাষার যে সকল শব্দ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে সেই সকল শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া আমি এইরূপ বলিতেছি। সেরূপ শব্দ সন্ধান করিলে প্রত্যেকের রচনাতেই কিছু কিছু পাওয়া যায়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে উহাদিগকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার কোনই কারণ নাই। তবে ঐরূপ শব্দ বাদেও এমন অনেক শব্দ সতেন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহার কতকগুলি বাঙ্গালাভাষায় তাঁহার পূর্ব্বে কেহই ব্যবহার করেন নাই; অবশিষ্টগুলি দুই একজনে ব্যবহার করিলেও ঠিক প্রচলিত বলিয়া এখনও তাহাদিগকে মানিয়া লওয়া যায় না। সংস্কৃত এবং চলিত ভাষার ত কথাই নাই; হিন্দী, আরবী, উর্দ্দু, ফারসী, পালি প্রভৃতি বহু প্রচলিত এবং অপ্রচলিত ভাষার ঐরূপ নূতন এবং অর্দ্ধ-নূতন শব্দ তাঁহার কাব্যে মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। ইহার উপরে ইংরাজী Onomatopoeia-জ্ঞাপক দুই একটী নূতন শব্দ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ অল্প গুটিকতক শব্দের উল্লেখ করিলেই চলিতে পারে। যাঁহারা "অভ্রআবীর" এবং "তুলির লিখন" গ্রন্থের "চকোরের গান" "তাজ" "কুঙ্কুম-পঞ্চাশৎ" "কবর-ই-নূরজাহান" "পরিব্রাজক" প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপরে অবশ্যই পতিত হইয়াছে; যথা, 'বোরকা' 'খুসরোজ' 'খামিন' 'আবরুঁয়া' 'বেলেল্লা'

'হোরী' 'খয়রাৎ' 'তুহার' 'মেহেরবাণী' 'উপসম্পদা' ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে 'আবরুঁয়া' 'মেহেরবাণী' 'খুসরোজ' ফারসী ভাষা হইতে, 'তুহার' 'খামিন' 'হোরী' হিন্দী হইতে, 'খয়রাৎ' এবং 'বোরকা' আরবী ভাষা হইতে, 'বেলেল্লা' এবং 'উপসম্পদা' যথাক্রমে উর্দ্দু এবং পালি ভাষা হইতে আমদানী। "দোসর" এবং "সূর্য্যসারথি" কবিতায় 'উদ্‌লা' 'নিঃসীম' 'ঝামট' প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, ইহারা কবির স্বরচিত। এই সকল শব্দের প্রয়োগে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা এক বিচিত্র সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু ইহাদের সাহায্যে কোন কোন বিশেষভাব তাঁহার লেখনীমুখে এমন সহজে এবং সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মরুভূমির মেহেরবাণী ! তুমি মেহের উন্নিসা !
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির দিন-নিশা।

এখানে 'মেহেরবাণী' শব্দটী একাকী যে কাজ করিয়াছে, বাঙ্গালাভাষার কোন শব্দ অপরের সাহায্য-ব্যতীত তাহা করিতে পারিত না।

সত্যেন্দ্রনাথের উদার বুদ্ধি তাঁহাকে বাহির হইতে শব্দ-চয়নে প্রবৃত্ত করিলেও তিনি যে বেহিসাবীর মত চোখের সম্মুখে যাহা পাইয়াছেন তাহাই ঘরে আনিয়া তুলিয়াছেন, তাহা নয়। যে শব্দের ভিতরে সৌন্দর্য্য নাই এবং যাহা দ্বারা তাঁহার কার্য্যের বিশেষ কোন আনুকূল্য হইবে না, তেমন শব্দ তিনি গ্রহণ করেন নাই। নিজের রাজ্যের ভিতরেও তিনি এই বিচার-বুদ্ধিকে সঙ্গে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। মোটের উপরে তিনি হিসাব না করিয়া কোন শব্দই ব্যবহার করেন নাই। শব্দ-নির্ব্বাচনে সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল—

পার্থে তুমি স্পর্দ্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে
ধ্বংসরূপী মহেশের সনে।
তুমি কৌশিকের তপ, দেবি ! তুমি ত্রিবিদ্যারূপিণী ;
ঊষরে উর্ব্বর কর, জন্মমৃত্যু-রহস্য গুর্ব্বিণী !
অগস্ত্যের যাত্রা-পথে তুমি ছিলে বর্ত্তি নির্নিমেষ,
তুমি দুর্গমের স্পৃহা—দুরূহ, দুস্তর, দুষ্প্রবেশ
সিদ্ধির উদ্দেশ।
'অস্তি' নহ 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—
দৈবী অসন্তোষ।

এখানে বিষয়টী অতি গম্ভীর ; তাই সত্যেন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া এখানে

যত গম্ভীরনাদী শব্দের সমাবেশ করিয়াছেন। আবার যেখানে বিষয় অত্যন্ত লঘু, সেখানে তিনি এমন সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে গুরুত্বের লেশমাত্র নাই—

কানে সুনীল অপরাজিতা, পাপড়ি চুলে জাফরানের
পায়ে জড়ায় নুপুর হয়ে শেষ বাসরের রেশ গানের
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগননীলে উত্তরী
নীল পরী গো নীল পরী !

এখানে যতগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সকলগুলিই অত্যন্ত লঘুভার— একেবারে "ছোঁয়-কি-না-ছোঁয়-মাটি' ধরণের। তৎপরে ইহাদের উচ্চারণের ভিতর দিয়া একটা প্রগলভতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরী-নারীকে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ কাহারও না ঘটিলেও উহার সত্তা সম্বন্ধে লোকের মনে যে একটা লঘুত্বের ভাব আছে, উদ্ধৃত কবিতাংশের ভাষা হইতে তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই।

এখানে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, লঘুত্ব, গুরুত্ব, লালিত্য প্রভৃতি গুণগুলি কি তাহা হইলে শব্দের অন্তরেই নিহিত থাকে? ইহার উত্তর এই যে, স্বরূপতঃ কোন কোন শব্দ অন্যান্য শব্দ অপেক্ষা কিছু অধিক গুরুত্ব, লঘুত্ব বা লালিত্যবোধক হইলেও, সাধারণতঃ শব্দের লালিত্য ইত্যাদি গুণ উহার প্রয়োগের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠে। জয়দেবের "গীতগোবিন্দের" ন্যায় কান্ত-কোমল রচনা অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু উহার ভিতরে যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, স্বতন্ত্রভাবে সে গুলিকে পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাদের মধ্যে যে বিশেষ একটা লালিত্য কেহ অনুভব করিতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না। তবে জয়দেব জানিতেন কোন্ শব্দটীর পার্শ্বে কিভাবে কোন্ শব্দটী বসাইলে শব্দগুলি পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করিয়া ভাষার শৃঙ্খলা নষ্ট করিবে না, পরন্তু এ উহার সঙ্গে গলাগলি হইয়া দাঁড়াইয়া ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে। তাই তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে আপাততঃ যে শব্দটীকে শ্রীহীন বলিয়া মনে হইবে, তাহাও কেমন নয়নানন্দ সৌন্দর্য্যে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জয়দেবের ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথেরও শব্দ সন্নিবেশের কৌশলকলা অতি উত্তমরূপে জানা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"সন্ধ্যারাতের অন্ধকার আজ জোনাক পোকায় স্পন্দমান"

এখানে সন্ধ্যা, অন্ধকার, এবং স্পন্দমান এই যে তিনটী শব্দ দেখিতে

পাইতেছেন, ইহারা স্বভাবতঃ কিছু গম্ভীর এবং স্বল্পভাষী। সত্যেন্দ্রনাথ ইহাদের আগে পাছে ক্ষেত্র-বিশেষে একটী বা দুইটী করিয়া লঘুচিত্ত প্রগল্‌ভ চলিত শব্দ লাগাইয়া ইহাদিগকে এমনভাবে পাগল করিয়া তুলিয়াছেন যে, ইহারা নিজেদের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার উপরে আবার ছন্দের নেশা আছে। সে নেশায় সকলকেই অল্পবিস্তর প্রমত্ত করিয়াছে। ফলে সকলে এখানে এক হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর ইহার বিপরীত দৃশ্যও সত্যেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন—দেখাইয়াছেন কতকগুলি মন্দ্রভাষী রুক্ষমূর্ত্তি শব্দ তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী চঞ্চল প্রকৃতির শব্দগুলিকে ভ্রূকুটি এবং ভর্ৎসনা প্রয়োগে শাসন করিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে—

"দম্ভ যবে মূর্ত্তি ধরি স্তম্ভ ও গুম্বজে দিনরাত
অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত"

কোন কোন স্থলে দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথের অলক্ষ্য অধিনায়কত্বে কতকগুলি সাদাসিধা শব্দ যুক্তাক্ষরের অসিচর্ম্মবর্জ্জিত অবস্থায়ও কেমন বীরের মত ছন্দের তালে মার্চ্চ করিয়া চলিয়াছে—

"একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদপ্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

* * *

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে।

ভিন্ন ভাষার নূতন শব্দগুলি সত্যেন্দ্রনাথের সংস্থান-সন্নিবেশের কৌশলে কিরূপে নূতনত্বের সঙ্কোচ হারাইয়া আমাদের আপনার লোক হইয়া উঠিয়াছে তাহার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"কুঙ্কুমপঞ্চাশৎ"———রাকা চাঁদের আলো
পেয়ে ভ্রমর কালো
বেল-ফুলের মালঞ্চে "বেলেল্লা" হ'ল।

কবর-ই-নূরজাহান—

দিনে দিনে উঠ্‌ল ফুটে পরীস্থানের জরীন গুল
মলিন করে রূপ রাণীদের ফুটল তোমার রূপের ফুল।

* *

বাদশাজাদা দেখ্‌ল তোমায় দেখ্‌ল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুসরোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।

অনুপ্রাসের অনুরাগ-সঞ্চারে কত উদ্ধত প্রকৃতির শব্দকে সত্যেন্দ্রনাথ মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যাই হয় না।

"বঙ্কিমচন্দ্র"—

গদ্যে অনবদ্য করি সেতারে সে করেছে আলাপ।

"পরীর মায়া"—

কহে পরীরাণী অশ্বারোহীরে দুঃসাহসী—ইত্যাদি।

অদূর ব্যবধানে দুই একটী ভিন্নার্থজ্ঞাপক অথচ সমোচ্চারণবিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিয়া সতেন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষাকে মধ্যে মধ্যে বেশ রসাল করিয়া তুলিয়াছেন—

'ইজ্জতের জন্য'—

সাগর-পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দীপাঠ।
রঙের দায়ে ভারত প্রজা নিগৃহীত নিগ্রো সাথে।

'প্রিয় প্রদক্ষিণ'—

কত জনমের মূর্চ্ছনা তাতে মূর্চ্ছিত কত স্মৃতি। ইত্যাদি।

একটি কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক মনে করি। শব্দপ্রয়োগের যে সকল কৌশল সত্যেন্দ্রনাথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কোন একটীকে লইয়া তিনি এমন দীর্ঘ মাতামাতি করেন নাই, যাহাতে সেটী একঘেয়ে হইয়া উঠিয়া পাঠকের ধৈর্য্যে আঘাত করে। তিনি প্রয়োজনানুসারে মধ্যে মধ্যে সমাস-নিষ্পন্ন সুদীর্ঘ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বটে কিন্তু উত্তর-রামচরিত-রচয়িতার ন্যায় ঐ প্রকার সুদীর্ঘ শব্দের প্রতি তিনি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। অনুপ্রাসের উপর জয়দেব বা ঈশ্বরগুপ্তের যেরূপ একটা প্রবল প্রলোভনের ভাব ছিল, সত্যেন্দ্রনাথের তাহা ছিল না। ইহার কারণ সত্যেন্দ্রনাথ এই সকল পুরাতন লেখকদিগের মত ভাষাকে একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তারূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিশেষভাবে উহাকে ভাবের বাহন বলিয়াই জানিয়াছিলেন। সুতরাং ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ভাষাকে যতটুকু অলঙ্কৃত করা আবশ্যক, ততটুকুই তিনি করিয়াছেন। অলঙ্কারের বাহুল্য ঘটাইয়া ভাবকে তিনি কোথায়ও আঁড়াল করিয়া ফেলেন নাই। ভাষাশিল্পে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞান অসাধারণ।

বর্ষা-সমাগমে বাঙ্গালাদেশে প্রকৃতি মায়ের অঙ্গে যে নূতন শ্রী ফুটিয়া উঠে, কবি তাঁহার 'ভাদ্র-শ্রী' কবিতায় তাহা কত অল্প কথায় এবং সামান্য অলঙ্কারে কেমন অবিকল ফলাইয়া তুলিয়াছেন—

আকাশ পাড়ার শ্যাম-সায়রে
যায় বলাকা জল সহিতে,
ঝিল্লী বাজায় ঝাঁঝর, উলু
দেয় দাদুরী মন মোহিতে।
* * *
কল্কে ফুলের কুঞ্জবনে
জ্বল্‌ছে আলো খাস গেলাসে।
অভ্রচিকণ টিকলি জলের
ঝলমলিয়ে যায় বাতাসে।

ইহার পরে কবি শরৎরাণীর যে মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহার দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করুন—

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে,
মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎরাণী পান খেয়েছে!
মেশামিশি কান্না হাসি মরম তাহার বুঝবে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন, আর একটি চোখ হাস্‌তে থাকে।

'ভাদ্রশ্রী' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ বর্ষার যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা মূল্যবান বটে, কিন্তু তদপেক্ষা তাঁহার এই শরতের চিত্র অধিক মূল্যবান। এখানে শরৎরাণীর বাহিরের সৌন্দর্য্য ভেদ করিয়া তাঁহার প্রাণের ভাবটীরও কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু 'ভাদ্র-শ্রী' কবিতায় বর্ষার প্রাণের ভাবটীর বিশেষ কোন আভাস আমরা পাই না। সেখানে বর্ষাকালীন প্রকৃতির একটী ফটো লওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু শরতের চিত্র অপেক্ষা মূল্যবান চিত্রও সত্যেন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন—

ঢেউয়ের হাজার কুব্জা হেথায় করছে ঠেলাঠেলি,
কুঁজায় সোজা করবে যে তায় দেখ্‌বে নয়ন মেলি।

এই দুইটী লাইনে যে চিত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, অতি উচ্চ অঙ্গের একজন চিত্রশিল্পী বহু চেষ্টাতেও তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন কিনা, তৎসম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। এমন অনেক ভাব আছে যাহাদের তুলির রেখায় মূর্ত্তি দেওয়া সম্ভব নহে। কোন কোন ক্ষমতাশালী কবি, কবিত্বের ইন্দ্রজাল-প্রয়োগে তাহাদের ছায়া পাঠকের মানস-নয়নে জাগাইয়া দিতে পারেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার 'পুরীর চিঠির' উপরি-উদ্ধৃত অংশে যে

চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে ঐরূপ একটী ভাবই মূর্ত্তি পাইয়াছে। ইহার অনুরূপ চিত্র আরও দেখান যাইতে পারে, কিন্তু বিষয়টী বুঝাইবার পক্ষে একটীই আমি যথেষ্ট মনে করি। যাক্ এ প্রসঙ্গে এই পর্য্যন্ত। অতঃপর সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দঃপ্রয়োগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

এমন অনেক কবি আছেন, যাঁহারা ছন্দকে কেবলমাত্র ব্যাকরণের সূত্র হিসাবেই গ্রহণ করেন; উহাকে না মানিলে কবিতার রাজ্যে আইনভঙ্গের অপরাধ মাথায় চাপে, তাই নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাঁহারা ইহার কাছে মস্তক অবনত করেন। সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা চলে না। ছন্দের সহিত তাঁহার কাব্যের জীবন-মরণ সম্বন্ধ। ছন্দকে বাদ দিলে যে শুধু তাঁহার কাব্যের অঙ্গহানি হয় তাহা নয়, একেবারে প্রাণহানির সম্ভাবনা।

শুক বলে 'কৃষ্ণ আমার মদনমোহন',
সারি বলে 'রাধা আমার বামে যতক্ষণ'।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকের চিত্তে যে ঐন্দ্রজালিক মোহ আনয়ন করে, ইহার ভিতরে ছন্দো-রাধার প্রভাব যে কতখানি, তাহা আভাসে ইঙ্গিতে ইতিপূর্ব্বে কতকটা বুঝাইয়া দিয়াছি, এখানে স্পষ্টভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সত্যেন্দ্রনাথের "কুহু ও কেকা" গ্রন্থের 'পাগ্‌লা ঝোরা' কবিতাটী বোধ হয় আপনারা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। ইহাতে একটী পার্ব্বত্য নদীর নাচিয়া কুঁদিয়া ছুটিয়া চলার যে চিত্রটী কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তেমন স্বাভাবিক চিত্র কাব্যে অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়—

"পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইক মোটে,
পাগ্‌লা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে।
লাফিয়ে পড়ে' ধাপে ধাপে ঝাঁপিয়ে পড়ে' উচ্চ হতে—
চড়চড়িয়ে পাহাড় ফেঁড়ে নৃত্য করে মত্ত স্রোতে—
* * * *
একশ যুগের বনস্পতি বাকল ঝাঁঝি সকল গায়,
মড়মড়িয়ে উপড়ে ফেলে স্রোতের টানে নাচিয়ে তায়,
গুহার তলে গুমরে কেঁদে আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে,
ঐরাবতের বৈরী হয়ে, কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে জুটে,—
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝা ঝড়ের শব্দ করে—
অসাড় প্রাচীন জড়-পাহাড়ের কানে মোহন-মন্ত্র পড়ে।" ইত্যাদি।

এখানে কবি "পাগলা ঝোরার" দোসর রূপে যে ছন্দটী ব্যবহার করিয়াছেন তাহার প্রাণ যেমন লঘুভার, তেমনি তাহার গতি অত্যন্ত বেগসম্পন্ন ও তরঙ্গায়িত। ইহার পরিবর্ত্তে বেদনা-ভারাক্রান্ত মরালমন্থরগতি সংস্কৃত

মন্দাক্রান্তা ছন্দটী যদি পাগ্‌লা ঝোরার দোসর হইয়া দাঁড়াইত তবে তাহার আর পাহাড় ফাঁড়িয়া বাহির হইয়া বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। শিলায় শিলায় উল্লম্ফন, বনস্পতির মূলোৎপাটন, কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে প্রধাবন তাহার বন্ধ হইয়া যাইত। মোট কথা, পাগলা ঝোরার পাগলামীটুকু আমরা আর দেখিতে পাইতাম না। যাঁহারা "মন্দাক্রান্তা ছন্দের" মেঘদূত কাব্যখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার ইঙ্গিতের মর্ম্ম বোধ হয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে একটী কবিতা লিখিয়াছেন; কবিতাটী মেঘদূতের বিষয় অবলম্বনেই রচিত। বিরহী যক্ষ শাঙন মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—

পিঙ্গল বিহ্বল, ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি মন্দ্র মন্থর বচন কও।

যক্ষের হৃদয় বিরহ-বেদনার অঙ্কুশাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, পাগলা-ঝোরার ন্যায় ঐরাবতের বৈরী হইয়া দাঁড়াইবার উল্লাস তাঁহার প্রাণে নাই। তিনি মেঘকে মন্দ্র মন্থর বচন শুনাইবার জন্য কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিতেছেন। যক্ষের হৃদয়ের ব্যথা এবং কণ্ঠের কাতরতা মন্দাক্রান্তা ছন্দে কেমন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে। 'যক্ষের নিবেদনে' যদি সত্যেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দের পরিবর্ত্তে পাগলা ঝোরার ছন্দটী ব্যবহার করিতেন তবে ঐ ব্যথার ভাবটী কখনই এরূপ ফুটিতে পারিত না। সঙ্গীতশাস্ত্রে যাঁহাদের অধিকার আছে, তাঁহারা জানেন, ভিন্ন ভিন্ন ভাবপ্রকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। দীপক রাগিণীতে বেদনার ভাব ফুটাইয়া তোলা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে উত্তেজনার ভাবটী দীপকেই যথার্থ ফুটিবে, বেহাগে কি পূরবীতে কি ইমন কল্যাণে আদৌ ফুটিবে না। ছন্দঃসম্বন্ধেও এই এক কথা। একই ছন্দে দুইটী বিভিন্নভাব কখনও উত্তমরূপে ফুটিতে পারে না।

সত্যেন্দ্রনাথ বুঝিতেন, কোন্ ছন্দের দ্বারা কোন্ ভাবটি সহজে এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে পারে। সেই অনুসারে স্থান-বিশেষে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার "পাল্কীর গান" যে ছন্দে রচিত, তাহা হইতে 'সিন্ধুতাণ্ডবে'র ছন্দ স্বতন্ত্র। "পাল্কীর গান" শুনিতে শুনিতে শ্রোতার মনে হইবে, তিনি যেন বেহারার স্কন্ধে পাল্কীর ভিতরে হেলিয়া বসিয়া আছেন; শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিতে থাকিবেন—

পাল্‌কী চলে
পাল্‌কী চলে,
দুল্‌কী চালে
নৃত্য তালে!
ছয় বেহারা,
জোয়ান তারা,

তপ্ত তামা—
যায় না থামা,
উঠ্‌ছে আলে,
নাম্‌ছে গাড়ায়,
পালকী দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায়

গ্রাম ছাড়িয়ে ঢেউয়ের দোলে
আগ বাড়িয়ে অঙ্গ দোলে—
নামল মাঠে
তামার টাটে ! ইত্যাদি—

উদ্ধৃত কবিতাংশের সহিত "সিন্ধুতাণ্ডব" কবিতার কিয়দংশ মিলাইয়া দেখা যাক্।

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ শ্যামল,
মহেশ্বরের প্রলয় পিণাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিণাক, বাজাও মাদল
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

'পাল্কীর গানে' যে ভাবের সাড়া পাওয়া যায়, এই কয়টী লাইনের ভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং পালকীর গানে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এখানে যদি সত্যেন্দ্রনাথ তাহার পরিবর্ত্তন না করিতেন তবে বাস্তবিক ভুল হইত। অবশ্য পরিবর্ত্তন করিয়া কোন্ ছন্দটী ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম না ; তবে এখন লাইন কয়টী পড়িয়া বুঝিতে পারিতেছি, যেটী ব্যবহার করা সঙ্গত ঠিক সেইটীই সত্যেন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই ; যেহেতু উহার ভিতরে তাণ্ডব-মগ্ন সিন্ধুর উন্মত্ততার যে চিত্রটী ফুটিয়া উঠিয়াছে,তাহাতে অস্বাভাবিকতার লেশ-মাত্র নাই। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে ভাবের সহিত ছন্দের যেরূপ সামঞ্জস্য প্রকাশ পাইয়াছে, অতি অল্প লোকের মধ্যেই সেরূপ দেখা যায়।

এই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে বহুবিধ ছন্দের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ পুরাতন। এইরূপ পুরাতন ছন্দগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পুরাতন বলিয়া সেগুলিকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সত্যেন্দ্র-নাথের প্রতিভার "জীয়নকাঠি" স্পর্শে মরা গাঙেও বান ডাকিয়াছে। প্রচলিত পুরাতন ছন্দগুলিকে বাদ দিলে যেগুলি অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের সংখ্যাও কম নহে। ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) যেগুলি সম্পূর্ণ নূতন, অর্থাৎ কবি যাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। (২) যেগুলি সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় নূতন অর্থাৎ কবি যেগুলিকে ভিন্ন ভাষা হইতে

চয়ন করিয়া প্রথম বাঙ্গালায় ব্যবহার করিয়াছেন। (৩) যেগুলি সত্যেন্দ্রনাথ তদীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন এক এক করিয়া এই তিন শ্রেণীর ছন্দ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলা যাক্। ইতিপূর্ব্বে "পালকীর গান" কবিতায় আপনারা যে ছন্দটীর পরিচয় পাইয়াছেন, উহা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। পাল্কী চলার ভিতরে যে একটী অবিশ্রাম তরঙ্গ-তাড়নের ভাব আছে তাহারই অনুকরণে সত্যেন্দ্রনাথ এই ছন্দটী সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের সৃষ্ট আর একটী নূতন ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার "অভ্র আবীর" গ্রন্থের "পিয়ানোর গানে।" পিয়ানোর সুরের ভিতরে যে একটু বিশেষত্ব আছে, ছন্দের ভিতর দিয়া তাহা কেমন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে!—

গান তার গুন্ গুন্
মঞ্জীর রুণ্ রুণ্
বোল্ তার ফিস্ ফিস্
চুল তার মিশ্ মিশ্—
সেই মোর বুল্‌বুল্
চঞ্চল চুল্ বুল্।

উল্লিখিত দুইটী ছন্দ ব্যতীত "হরমুকুট," "প্রথমগালি", "বৈকালী" প্রভৃতি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের স্বরচিত আরও দুই চারিটী ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবের উদ্বোধনই যদি ছন্দের প্রয়োজনের মূল হয়, তবে সত্যেন্দ্রনাথের এই সকল নূতন ছন্দ কেহ অনাবশ্যক বলিতে পারিবেন না।

ভিন্ন ভাষা হইতে সত্যেন্দ্রনাথ যে সকল ছন্দ আমদানি করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সকলগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। উহাদের মধ্যে যে দুই একটী ছন্দ আমার কর্ণে অন্যান্যগুলি অপেক্ষা মধুর বোধ হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধেই কিছু বলিব। পাশ্চাত্য কবি Scottএর Young Lochinvarএর ছন্দটী কাব্যামোদীদিগের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ সেটীকে কিরূপ কৃতিত্বের সহিত তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা 'কুহু ও কেকা' গ্রন্থের "সিংহল" কবিতাটী পড়িলে বুঝা যায়।—

ওই সিন্দুর টিপ, সিংহল্‌দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস তাম্বূল বন কেশ।
যার উত্তাল-তাল-কুঞ্জের বায় মন্থর নিশ্বাস।
আর উজ্জ্বল যার অম্বর আর উচ্ছল যার হাস।

ইত্যাদি। 'সিংহল' কবিতাটীতে কবি এমন কোন একটী উচ্চভাবের অবতারণা করেন নাই যাহার জন্য উহাকে বিশেষ একটী আদরের বস্তু বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ছন্দের জন্য কবিতাটী বহুলোকের স্মৃতির

হারে মুক্তাফলের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে ভিন্ন ভাষা হইতে সংগৃহীত আর একটী ছন্দ আমার অত্যন্ত মিষ্ট বোধ হইয়াছে। 'মণি-মঞ্জুষা' গ্রন্থে "তাজের প্রথম প্রশস্তি" কবিতায় কবি উহার ব্যবহার করিয়াছেন—

এ নির্ম্মাণ মেহেরবান প্রভুর প্রেম-চিন,
কৃপার নীর হিয়ার তীর ভাসায় দিন দিন।
কুসুমঠাম ধেয়ান ধাম অমল মন্দির
ইহার পর ধাতার বর সদাই রয় থির।

এই দুইটী ছন্দ বাদে পূর্ব্বোল্লিখিত 'সিন্ধুতাণ্ডব' কবিতার সংস্কৃত "পঞ্চ-চামর" ছন্দটীও অতি সুন্দর বলিয়া আমি মনে করি। ইহার পরিচয় আপনারা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে পাইয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কবিগুরুর নিকট হইতে যে সকল ছন্দ ধার লইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না; যেহেতু আধুনিক কবিদিগের মধ্যে অনেকেই আজকাল সে গুলিকে ব্যবহার করিতেছেন এবং অচিরকাল মধ্যে সেগুলি প্রচলিত পুরাতন ছন্দের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু তথাপি সত্যেন্দ্রনাথ যেভাবে ইহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, অন্য অনেকে তাহা পারেন নাই এবং যাঁহাদের ভিতরে উপযুক্ত শিল্পজ্ঞানের অভাব, তাঁহারা তাহা পারিবেনও না।

সত্যেন্দ্রনাথ বহু বিষয়ে তাঁহার গভীর শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। সামান্য মিলপ্রয়োগের ভিতর দিয়া সে জ্ঞানের কতখানি স্ফুরণ হইয়াছে, তাহা একবার লক্ষ্য করুন। কেহ কেহ বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, প্রাচীন-পন্থী কবিদিগের মধ্যে অনেকের মিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। তাঁহারা মনে করেন কবিতা যদি ভাবপূর্ণ হয়, তবে উহার ভিতরে অন্য কোনরূপ ত্রুটি থাকাতে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে না। কিন্তু কবিতার আদর কেবল-মাত্র ভাবের উপরে নয়, ছন্দ, ভাষা, মিল ইত্যাদি আরও কয়েকটী জিনিষের উপর নির্ভর করে। সত্যেন্দ্রনাথ ইহাদের কোনটীকেই উদাসীনতার দৃষ্টিতে দেখেন নাই। মিলের ব্যাপারে পূর্ব্বে কবিরা মনে করিতেন, দুইটী লাইনের শেষ দুইটী অক্ষরের পরস্পরে মিল হইলেই যথেষ্ট হইল। তাই তাঁহারা অসঙ্কোচে "রেখা"র সহিত "বাঁকার" মিল দিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শেষ অক্ষরের সহিত শেষ অক্ষরের মিল দিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। অন্ততঃ শেষের দুই দুইটী অক্ষরে যাহাতে মিল হয়, সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কোন কোন স্থলে দুয়ের অধিক, এমন কি চারিটী চারিটী অক্ষরের মিল দিয়া তিনি স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন—তথা কবিতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

"মুখখানি তার পদ্মকলি
ভাবের হাওয়ায় দোদুল্ দুল্

স্থখের স্বপন বুকের সে ধন
　　দুখের আপন সে বুলবুল।"

সত্যেন্দ্রনাথের মিলের আর একটী বিশেষত্ব উহার স্বাভাবিকতা। যাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ জিনিষটী অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মিলের এই স্বাভাবিকতা তাঁহার কাব্যে সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইবে।

সাধারণভাবে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আপনাদিগকে শুনাইয়াছি; অতঃপর আমি তাঁহার কাব্যের কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ছোট বড় বহু কবির অসংখ্য কবিতার কাব্যানুবাদ বঙ্গভাষাকে উপহার দিয়াছেন। এই সকল অনুবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, পড়িয়া উহাদিগকে কেহ অনুবাদ বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না ইহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—একরকম অনুবাদ আছে, যাহা রূপ হইতে প্রতিরূপ আঁকার মত, তাহাতে কেবল চেহারাটা দেখা যায়, কিন্তু সে চেহারা কথা কহে না অর্থাৎ তাহাকে খানিকটা পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই বাদ পড়ে। এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্যদেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই অনুবাদগুলি প্রবাসী নহে, ইহারা অধিবাসীর সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে—ইহাদিগকে পূর্ব্বনিবাসের পাশ দেখাইয়া চলিতে হইবে না।" রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলিকে কেহ কবিত্বের উচ্ছ্বাস বলিয়া মনে না করিতে পারেন তজ্জন্য সত্যেন্দ্রনাথকৃত রবার্ট ব্রিজেসের একটী গানের কিয়দংশ অনুবাদ প্রমাণস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

যে ফুল ঝরে পরশভরে
　তাতেই আমার মন,
পাঁপড়ি তাঁবুর বাসরে যার
　রঙের আলাপন;
পূর্ব্বি-রাগের অধিক স্মৃতি—
মিলন রাতের মধুর রীতি
একনিমিষে এক নিশাসে
　যুগের অভিনয়,
গান যেন মোর এমনি ধারা
　ফুলের মত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদগুলির আর একটী বিশেষত্ব এই যে, উহাতে মূলের ভাব বিকৃত বা বিনষ্ট হয় নাই। মূলের ছন্দও কবি অনেকস্থলে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মোট কথা, অনুবাদে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অলৌকিক।

অনুবাদ বাদে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে আর একটী বিশেষ জিনিষ, তাঁহার সাময়িক কবিতা। অনেকের ধারণা, যাঁহাদের গীতি কবিতা রচনাই বিশেষ-ভাবে অভ্যাস, তাঁহাদের হাতে সাময়িক কবিতা তেমন উৎকর্ষলাভ করিতে পারে না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিভার প্রভাবে লোকের এ ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের চিরদিন গীতি কবিতা রচনাই অভ্যাস। তথাপি তাঁহার লেখনীমুখে কয়েকটী সাময়িক কবিতা এত সুন্দর ফুটিয়াছে যে, তিনি যদি অন্য কোন কবিতা না লিখিয়া কেবলমাত্র সেই কয়টীই লিখিতেন, তবে তাঁহার কথা লোকে ভুলিতে পারিত না। সত্যেন্দ্রনাথের সাময়িক কবিতাগুলির মধ্যে "ইজ্জতের জন্য" "মৃতু স্বয়ম্বর" "নির্জ্জলা একাদশী" সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভাল কবিতার মত কবিত্বের পরিচয় ইহাদের মধ্যে তত বেশী নাই; সাময়িক কবিতায় সে পরিচয় সকল সময় দেওয়াও সম্ভব নহে। কিন্তু তর্কজয়ের বিবিধ কৌশল প্রয়োগে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা কত উজ্জ্বল ছিল, তাহা তাঁহার সাময়িক কবিতা হইতেই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়—

"নির্জ্জলা একাদশী"—

> ধর্ম্ম নাকি নষ্ট হ'বে? বাঙলাদেশের বাইরে হায়!
> হিন্দু কি আর নেই ভারতে? কাঞ্চীকাশী মথুরায়?
> তারা কি কেউ পালন করে একাদশীর নির্জ্জলা!
> ভ্রষ্ট সবাই? বঙ্গে শুধুই হিন্দুয়ানী নিশ্চলা!

কিন্তু তর্কজয়ের গৌরব অর্জ্জনের জন্যই যে সতেন্দ্রনাথ তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা নহে; তার্কিকের মত তর্কের নেশাও তাঁহার ছিল না। তিনি অন্যায়ের পরম শত্রু ছিলেন। কোথায়ও অন্যায়ের অভিনয় হইতে দেখিলে তাঁহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তখন সে অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবার জন্য প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধে তর্কবলের প্রয়োজন হইলে, তিনি তাহা প্রয়োগ করিতেন। বিনা প্রয়োজনে তর্ক করা তাঁহার স্বভাব ছিল না। নির্জ্জলা একাদশীর নিষ্ঠুরতা তাঁহার মর্ম্মে বড় আঘাত করিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের হিন্দু বালবিধবাদিগের মুখ চাহিয়া তিনি এই নিষ্ঠুর বিধির উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ আজ আর ইহসংসারে নাই! আজ কে আর বলিবে—

> কচি মেয়ের একাদশী—জল চেয়েছে মার কাছে,
> বাপ এসে তা করবে আটক ধর্ম্ম খসে যায় পাছে;
> এও মানুষে ধর্ম্মভাবে, হায়রে দেশের অধর্ম্ম!
> হায় মূঢ়তা এর তুলনায় হত্যাও নয় কুকর্ম্ম।

সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। উপসংহারে আমার বিনীত প্রার্থনা, কবির প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে গিয়া আমার নিজের অক্ষমতার জন্য যদি আলোচ্য প্রবন্ধে সে প্রতিভাকে কোথায়ও আড়াল করিয়া ফেলিয়া থাকি, তবে কবির অমর আত্মা ও সুধীবর্গ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন

১৩৩২ সাল।
১৮৪৭ শকাব্দাঃ

নীলাম্বরের কথা।

বহুরূপ তারা।

লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম, বি, এ, এ।

বকরাশির V. তারা চারিশত আঠার দিনে একবার রূপ পরিবর্ত্তন করে, উহার ক্ষীণতম জ্যোতিঃ হইতে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইতে ২২০ দিন সময় লাগে ব্রিটিশ য়্যাষ্ট্রনমিকেল য়্যাসোসিয়েসনের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯২৩ খৃঃ অঃ ৩ ডিসেম্বর এই তারাটী স্থূলতম জ্যোতিঃ ৮'১ স্থূলত্বে উপনীত হইয়াছিল। আমরা ঐ সময়ে ঐ তারাটীকে ইহা অপেক্ষা আরও একটু বেশী উজ্জ্বল দেখিয়াছিলাম; আমাদের পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ১৯২৩ খৃঃ অঃ ২২ নভেম্বর তারাটী ৭'৮ ও ২৮ নভেম্বর ৭'৬ স্থূলত্বে উপনীত হইয়াছিল পরে ১৩ ডিসেম্বর তারাটী ৮'৪ স্থূলত্বে পরিণত হয়। হারভার্ড মান-মন্দিরে আমরা যে সকল পর্য্যবেক্ষণ পাঠাইয়াছিলাম তাহাড় গড় হিসাব করিয়া লিয়ন ক্যাম্বেল সাহেব স্থির করিয়াছেন যে ২৬ নভেম্বর তারাটী স্থূলতম জ্যোতিঃ ৮'০ স্থূলত্বে উপনীত হইয়াছিল। এই তারাটী ঘোর রক্তবর্ণ যখন স্থূলতম

জ্যোতিতে উপনীত হয় তখন দেখিলে মনে হয় যেন নীলাম্বরে একবিন্দু রক্ত পড়িয়াছে। এইপ্রকার রক্তবর্ণ তারা নীলাম্বরে আরও অনেক আছে, উহাদের স্বভাব বড়ই বিচিত্র, উহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে বিশেষ তৎপরতার আবশ্যক নতুবা তারাটী উহার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার অধিক উজ্জ্বল বোধ হয়। উহাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে উহাদের উজ্জ্বল লাল আলোক অক্ষিগোলকের পশ্চাদাবরক ঝিল্লিকে উদ্দীপিত করে এবং তাহার ফলে তারাটীকে অধিকতর উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি একই সময়ে তারাটীকে তিন বা চারিবার দেখিলে তিন বা চারি প্রকার স্থূলত্বের বলিয়া ভ্রম হয়। ক্যাম্বেল সাহেব লিখিয়াছেন :—

Red stars require special care in order that the results of different observers may be more consistent. It is a well recognized fact that the longer one gazes at a red star, the more the retina of the eye is excited, and the brighter the star appears as the result. This is not true of the blue stars so that oftentimes it is possible to estimate the red stars too bright. This was the case in the observations of stars like S. cephei. To overcome this difficulty, it is recommended that when a red variable is under observation, (and a large number of the long period variables are red stars) the comparisons between the variable and the comparison stars be made by short, quick glances rather than by long, protracted views.

Red stars when faint do not appear to show their color so strongly as when bright, and for this reason it is best not to attempt to estimate their brightness with too great optical aid. This same rule may be applied to all variable star observations, but more particularly to the red ones on occount of their strong color.

Dr. Edward Gray লিখিয়াছেন :—

The novice having mastered the initial difficulties, soon encounters a new one of quite a different nature, namely :—to estimate the value of a red star, especialy when it is found in the neighborhood of a white star. This is a practical question because all stars of very long period are orange-red to red in hue, and some are very strongly red. For example, R sculptoris, R cygni, R V cygni, V cygni, R S cygni, R Leporis (even called the crimson star), T cephei and so on, through a long list.

In years past much has been written on this subject, with two opposite methods of evaluation advanced :—one by a quick hasty observation, the other a more prolonged estimate of ten to twenty

seconds. It is only necessary here to observe that the wave-lengths of orange and red are much longer than those of blue, violet and the rays beyond violet ; consequently it takes a longer time for the former to make an equal visual impression on the human retina or the photographic plate.

It is well known that the ordinary photographic Plate is color-blind , it represents only the blue and violet rays with approximate correctness. It is a matter of common comment how black in tone yellow, orange and red flowers or other objects come out in a photograph. To remedy this orthochromatic plates were introduced, Now it happens that of the hundreds of thousands of photographs of stars and star-fields almost all were taken on ordinary color blind plates which do not represent red and orange stars properly: Red stars require orthochromatic plates and a color-filter. A double lantern-slide (no 481 yerkes) shows U cygni on a plain plate and a color corrected one. This is a very red star and there must be fully two magnitudes difference in the two pictures ! The conclusion is obvious. To the eye a five to ten seconds observation wonld seem requisite.

যে সকল তারা পর্য্যবেক্ষক V Cygniকে ৮'০ স্থূলত্বের অধিক উজ্জ্বল দেখিয়াছেন তাহার তালিকা ঃ—

সন ও তারিখ		স্থূলত্ব	পর্য্যবেক্ষক	মন্তব্য—
১৯২৩। অক্টোবর	২৯	৭'৯	কার	কারের স্থূলতম পর্য্যবেক্ষণ ১৯ডিঃ ১৯২৩
নভেম্বর	২	৭'০	পেলটেয়ার	পেলটেয়ারের ঐ ঐ ২ নভেম্বর ঐ
ঐ	১৩	৭'৫	বোটন	বোটনের ঐ ঐ ১৩ ঐ ঐ
ঐ	২২	৭'৮	চন্দ্র	চন্দ্রের ঐ ঐ ২৮ ঐ ঐ.
ঐ	২৮	৭'৬	ঐ	
ডিসেম্বর	৯	৭'৮	কার	
ঐ	১৯	৭'৬	ঐ	
ঐ	২৯	৭'৮	ঐ	
১৯২৪। জানুয়ারী	১৮	৭'৮	ঐ	
ফেব্রুয়ারী	১৫	৭'৭	পেলটেয়ার	

যাঁহারা উহাকে ৮' স্থূলত্বের কম উজ্জ্বল দেখিয়াছেন তাহার তালিকা

সন ও তারিখ		স্থূলত্ব	পর্য্যবেক্ষক	মন্তব্য
১৯২৩। অক্টোবর	২৭	৮'৪	ওয়াটার ফিল্ড	স্থূলতম জ্যোতিঃ
নভেম্বর	২	৯'০	পিকারিং	ঐ
ঐ	৭	৯'০	ক্রিষ্টি	ঐ

সন ও তারিখ		স্থূলত্ব	পর্য্যবেক্ষক	মন্তব্য—
নভেম্বর	২৭	৮'৯	গডফ্রে	ঐ
ঐ	ঐ	৯'০	লিভেনওয়ার্থ	ঐ
ডিসেম্বর	৮	৮'৫	ইয়ালডেন	ঐ
ঐ	১১	৮'৬	ওয়াটার ফিল্ড,	জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়াছে

যাঁহারা তারাটীকে ৮'০ স্থূলত্বে দেখিয়াছেন তাহার তালিকা ঃ—

সন ও তারিখ	স্থূলত্ব	পর্য্যবেক্ষক	মন্তব্য
১৯২৩। অক্টোবর ২৫	৮'০	বোটন।	ইঁহারা কিন্তু তারাটী এতদপেক্ষা
ডিসেম্বর ১	৮'০	পেলটেয়ার।	অধিক উজ্জ্বলও দেখিয়াছেন,
ঐ ২০	৮'০	বোটন।	উপরে দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা তারাটীকে ৭'৮ হইতে ৮'২ স্থূলত্বে দেখিয়াছেন তাহার তালিকা ঃ—

সন ও তারিখ	স্থূলত্ব	পর্য্যবেক্ষক	মন্তব্য
১৯২৩। অক্টোবর ২৯	৭'৯	কার	৮'১ বা ৮'২ স্থূলত্বে কেহই
নভেম্বর ২২	৭'৮	চন্দ্র	তারাটীকে দেখেন নাই।
ডিসেম্বর ১	৮'০	পেলটেয়ার	
ঐ ৯	৮'৭	কার	
ঐ ২০	৮'০	বোটন	
ঐ ২৯	৭'৮	কার	
১৯২৪। জানুয়ারী ১৮	৭'৮	ঐ	

এই সকল পর্য্যবেক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে ১৯২৩ খৃঃ অঃ নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে একদল পর্য্যবেক্ষক তারাটীকে ৮'০ হইতে অধিক উজ্জ্বল আর একদল পর্য্যবেক্ষক ৮'০ স্থূলত্বে এবং তদপেক্ষা কম উজ্জ্বল দেখিয়াছেন, কিন্তু পেলটেয়ার ব্যতীত কেহই উহাকে ২৬ নভেম্বর হইতে ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ৮'০ স্থূলত্বে দেখেন নাই। পেলটেয়ার ১ ডিসেম্বর ৮'০ স্থূলত্বে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ২ নভেম্বর তিনি উহাকে ৭'০ স্থূলত্বেও দেখিয়াছেন।

বস্তুতঃ ২ নভেম্বর হইতে ২৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫৭ দিন তারাটী বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষকের মতে ৭'০ হইতে ৯'০ স্থূলত্বে বিদ্যমান ছিল; দিন সংখ্যা ও স্থূলত্বের গড় হিসাবে আমাদের মতে ৩০ নভেম্বর তারাটী স্থূলতম জ্যোতিঃ ৮'১ স্থূলত্বে উপনীত হইয়াছিল।

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা।

(জন্মাষ্টমী-উৎসব উপলক্ষে পঠিত)

লেখক—শ্রীদীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ছত্রিশ কোটী হিন্দু নর-নারীর হৃদয়ের ধন, আদরের দেবতা, বিপদের বন্ধু, খেলার সাথী, আবার স্নেহরসমণ্ডিত ত্রাণকর্ত্তা পিতামাতা; আবার কোথাও বা সরল হাস্যমুখরিত শিশু গোপালরূপে বঙ্গজননীর ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত; আবার কোথাও বা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের জন্য রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতাররূপে দণ্ডায়মান। এই কালো মূর্ত্তিটী যে বাঙ্গালার কতখানি প্রাণ জুড়িয়া অধিষ্ঠিত, তা যিনি বাঙ্গালার সমাজ, সাহিত্য, কথকতা, সঙ্গীত, যাত্রা, নাটক এমন কি দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

বাঙ্গালার ভিখারী ভিক্ষা লয় "জয় রাধে গোবিন্দ" বলিয়া, বাঙ্গালী অন্তিমকালে আত্মীয়জনকে মধুর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করায়, বাঙ্গালীর সঙ্গীতের বিষয় রাধাকৃষ্ণের পবিত্র লীলামৃত-কাহিনী, বাঙ্গালীর বীণার ঝঙ্কার দীপকরাগে পূর্ণ হয় রাধাকৃষ্ণের পবিত্র নামে, বাঙ্গালীর কাব্যরস জীবন্ত হইয়া উঠে ভগবানের অনন্তলীলাকে লক্ষ্য করিয়া; বাঙ্গালীর যাত্রার আসর জমিয়া উঠে বালগোপালের সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া; বাঙ্গালী আহারের পূর্ব্বে জনার্দ্দনকে নিবেদন না করিয়া কোন খাদ্যবস্তু ভোজন করিতে পারে না। তাই বাঙ্গালীর কণ্ঠে কৃষ্ণনাম এত মধুর; হাটে, মাঠে, ঘাটে, সুখে দুঃখে বিপদে কৃষ্ণনাম; তাই বাঙ্গালী অখণ্ড মণ্ডলাকার এই চরাচর ব্যাপিয়া শুধু কৃষ্ণময় দেখে। এহেন হৃদয়সর্ব্বস্ব দেবতাকে শিক্ষিত বাঙ্গালী সাধারণ মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান—করুন, অবতার বলিয়া মানিতে চান—মানুন, ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই জানি এবং দেবাদিদেব বলিয়াই পূজা করিব।

আজ কৃষ্ণা অষ্টমীর ঘোর অন্ধকারময় রজনী তাঁর জন্মতিথি; ভারতের লৌহ-কারাগারে, দুর্য্যোগের নিশীথে তাঁর জন্ম। বিশ্ব যখন কংসের দানবী শক্তির ভারে টলমল, দুর্ব্বল ভক্ত সাধুজনের প্রতি পশুশক্তির অত্যাচারে ধরণী

প্লাবিত, সেই সময় 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' তাঁহার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ। সেই শক্তিময় মহাপুরুষ অসাধ্য সাধন করিয়া কি ভাবে ভক্তজনের সহিত আনন্দময় লীলাখেলা খেলিয়াছিলেন, জগৎকে কি অমূল্য শিক্ষা ও সাধনা দান করিয়াছিলেন, তাহাই আলোচ্য বিষয়। নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরক্ষর গোপনরনারীগণের সঙ্গে রসময়ের লীলাখেলার কি উদ্দেশ্য, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রজকুলে ব্রজের রাখালরূপে ভক্তগণের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলিবার মধ্যেই বা কি মহৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা। এই জন্মকথা আলোচনা করিলেই আমরা তাঁহার অনন্তলীলার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি জগৎবাসীকে শোক-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া প্রেমের বিমল শান্তি দ্বারা শান্ত করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে এক প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি নরলোকে প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যের আগারে বিলাসী ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ না করিয়া নিরক্ষর দরিদ্র গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিবার কি প্রয়োজন ছিল? শিক্ষিতের নিকট, ধনীর নিকট কেন তিনি ধরা দিলেন না? ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছে, "তোমরা শিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিমানী, তোমরা কি বিনা যুক্তিতর্কে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমধর্ম্মকে মানিয়া লইতে পারিবে? তাঁহার সরল সহজ মূর্ত্তিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? জ্ঞানগর্ব্বান্ধ ভট্টাচার্য্যগণ নয়নে বসন বাঁধিয়া যোগাসন রুদ্ধ করিয়া কঠোর তপস্যার আঁধারে বসিয়া প্রেমময়কে খুঁজিয়া বেড়াইবে। আর ব্যথার ব্যথী কাঙাল ভক্ত ব্রজবালকগণ বলিতেছে "আমরা কাঙাল, অশিক্ষিত, অজ্ঞানী, মূঢ়, আমরা পাপী, ধর্ম্মগুরুর নিকট যাবার সাধ্য নাই। তাই তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের মিলন হইতে পারে না। আমাদের কানু অতি আপনার ধন। একবেলা কানুর অভাব হইলে আমরা বৃন্দাবন শ্মশান দেখি। আমরা তপস্যা জানি না, পূজা জানি না, মন্ত্র জানি না; জানি শুধু সরল হাসি, সহজ প্রেমের বন্ধন, যার কাছে ব্রজেশ্বর সদাই বাঁধা, যার জন্য কানু প্রতিজ্ঞা করিয়া বল্লেন, 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'। তাই ত বলি,—

"ভাগ্যে তোমার নয় ক দেউল মস্ত ইমারৎ,
যেথায় লোকের হুড়াহুড়ি ব্যস্ত সহরৎ।"

তাই ত আমরা নির্ভয়ে বলি,—

"চাষের চাঁলে, ঘরের দুধে, গাছের ফল ফুলে,
যেদিন যাহা জুটে তাহা দেই গো পাদমূলে।
ভিন্ন করে আয়োজনের নাইক দাবী দাওয়া,
এক থালাতেই তোমার আমার আগে পিছে খাওয়া।"

প্রাণে প্রাণে যাহা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই খাটিবে না।" কানু গরীবের ঘরে কুড়াইয়া পাওয়া ধন। তাঁহাকে পাইতে হইলে তপস্যা করিতে হয়, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। তাঁহার সঙ্গে যখন এতদূর নিকট সম্পর্ক তখন ব্রজবালকগণ বৃথা যুক্তি-তর্কের জালে জড়াইতে যায় কেন?

তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছে, ভগবান্ সরল সহজ প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিশাইয়া আজ জগৎকে এই শিক্ষা দিতেছেন, "ভগবৎ-প্রেম সহজাত, আত্মার অন্তস্তল হইতেই জন্মে, বহির্জ্জগৎ হইতে শিক্ষালাভ করিতে হয় না।" পাশ্চাত্য দর্শনও বলিয়া থাকে, "Idea of infinite inductively acquired নহে, উহা deductively evolved."

শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রসঙ্গে আরও বলিতেছে "কৃষ্ণ সিংহাসনের ধন নহে, কালীয়াসনের ধন; রণজয়ী নহে মনোজয়ী; অসিধারী নহে, বাঁশীধারী; রথের সারথী নহে, তরীর কাণ্ডারী; গীতার শ্রীকৃষ্ণ নহে, গীতের শ্রীকৃষ্ণ; শুধু ভূভারহরণের জন্য নয়, গোপ-গোপীর ন্যায় অবোধ মূর্খ নীচ ও হীন ব্যক্তিগণের মনোহরণের জন্য নিত্যই বিরাজ করিতেছেন।"

সরল ও সহজ আনন্দ, খোলা প্রাণের চরম স্ফূর্ত্তি; সখ্য, দাস্য, করুণ, বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি ছয় রস যেখানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া জীবন্তরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ভগবান্ বাসুদেব সেখানেই তাঁহার লীলার ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এই একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তি দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে এই কথাটি হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মত আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল তখন

যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরব-লাভের সাহিত্য। কালকেতু, ধনপতি, চাঁদসদাগর প্রভৃতি সাধারণ লোকেই তাহার নায়ক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নহে, মানী জ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা, ইহাই সাহিত্য নানাভাবে প্রচার করিতেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবটী ধরা দিয়াছে। ভগবান্ শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালীর অতি সামান্য সেবাও যে তাঁহার কাছে অগ্রাহ্য হয় না, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে আমরা পাই।"

ভাগবত সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। কারণ এই গ্রন্থেও ঠিক এই আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই আর একটী প্রধান জিনিস 'প্রেমের কথা।' একমাত্র প্রেমাস্পদ প্রেমদাতা শ্রীভগবান্ তাঁহার এই বিশ্বলীলায় নিজের অচিন্ত্য ও অননুমেয় প্রেম ও আনন্দের খেলা মিশাইয়া নিখিল বিশ্বের ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুটীকে পর্য্যন্ত সফল মধুময় ও সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল; তাঁহার এই ব্যাকুলতায় অধরে যেন আর সুধারাশি ধরিতেছে না; সর্ব্বদা উথলিয়া উথলিয়া বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভগবান্ আনন্দময়, বিশ্বের আনন্দেই তাঁর স্থিতি। বেদও এই কথাই বলে "আনন্দই ভগবান্, প্রেমই ভগবান্।" এই নিরাবিল পূত আনন্দের মধ্য দিয়া ভগবান্ পাইতে শুধু বেদ ভাগবতই উপদেশ দিতেছেন না, বাঙ্গালার আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করিতেছেন। বাঙ্গালার কবি রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়—
লভিনু মুক্তির স্বাদ।"

ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অমর হইবার জন্য যাহারা জগতের সকল-প্রকার আনন্দ ও লীলাখেলা হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া শুষ্ক মরুভূমির মত যোগাসনকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাই আশ্রয় করিয়া অন্ধকারে পাঁক ঘাটিয়া মরুন,—কবি তাহা চায় না। নরনারীর নৈসর্গিক প্রেম, বিরহ, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিদ্যা, অবিদ্যা, সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, এ সকলই যখন সেই বিশ্বরূপের লীলাসিন্ধুর তরঙ্গনৃত্য; প্রকৃতির প্রতি বর্ণে, গন্ধে, গানে যখন

চিরসুন্দরের সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত, তখন ইহাদের আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে আপ-নাকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দিতে পারিলেই ত চরম মুক্তিলাভ। বিশ্বপ্রকৃতির নব নব নৈসর্গিক বিকাশ সেই অনন্তলীলারই অঙ্গ। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিত্যকাল ধরিয়া রাসে, দোলে, ঝুলনে, বিরহে, মিলনে, মানে, মানভঞ্জনে, সখ্যবাৎসল্যের নব নব আনন্দে ঐ একই লীলা চলিতেছে। সংসারে ভোগ্যবস্তুর অভাব নাই, বিলাসবাসনারও অন্ত নাই, কিন্তু সকল আনন্দের মধ্যভাগে সেই আনন্দ-ময়ের আনন্দই মুখ্যরূপে বিরাজ করিবে; সকল পিপাসার মধ্যে সেই প্রেমময়ের প্রেম-পিপাসার প্রতিই লক্ষ্য থাকিবে বেশী করিয়া। ভক্ত তুলসীদাসও এই কথাই বলিয়াছেন, প্রেমময়কে পাইবার জন্য পাগল হইয়া ঘরের বাহির হই-বার ত কোনই প্রয়োজন নাই। যেমন গাভী মুখে তৃণ ভক্ষণ করিলেও তাহার স্নেহময় দৃষ্টি থাকে একমাত্র নবজাত বৎসের প্রতি, সেইরূপ সংসারের সকল কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও লক্ষ্য থাকিবে সেই অনন্ত ভূমানন্দের প্রতি।

আবার এই ভূমানন্দ ও সুখের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছে শ্রীমদ্ভাগবত আর একরূপে। আত্ম-বিসর্জ্জনেই সুখ, আত্ম-রক্ষায় নহে। সুখবাঞ্ছা না থাকাই পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। আগে অশ্রু, পরে হাসি, আগে কান্না ব্যাকুলতা, বিরহ-জ্বালা; তার পর চিদানন্দ, মিলন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত শ্রীরাধা, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচিত শ্রীরাধা কখনও অভিমানিনী, গরবিণী, রাজরাণী, আবার কখনও বা বিরহ-জ্বালায় জর্জ্জরিতা, কৃষ্ণ-দরশন-আশায় চঞ্চলা ব্যাকুলা, মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিতা, যেন "পতত্তি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।" এই বিরহ-ব্যথাকে ভক্ত গোপনারী কিরূপ মনে করি-তেছেন? বসন্তের আনন্দের মধ্যে কোকিলের কুহু-স্বরে যে ব্যথা, জননীর স্নেহরস-ব্যাকুলিত চির-আদরণীয় শাসন ও প্রহারে যে ব্যথা, প্রিয়তমের করুণার দান এই ব্যথাও কতকটা সেই প্রকারের। ভগবানের দেওয়া এই ব্যথাকে নির্ব্বিবাদে হজম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, প্রেমময়কে পাইবার জন্য কুলশীল, লাজলজ্জা, ভয় সব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য আকুলপ্রাণে কাঁদিতে পারিয়া-ছিলেন বলিয়াই তিনি ভগবানের প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

আগে ব্যাকুলতা, চঞ্চলতা, হাসি কান্না, অশ্রু, মান, অভিমানের সাধনা পূর্ণ হইবার পর ভগবানের সহিত চির-মিলন। তখন দুটী জীবন আপন আপন সুখ-দুঃখ এক সঙ্গে মিলাইয়া এক অভূতপূর্ব্ব চিদানন্দ-সাগরে আত্মাকে ডুবাইয়া দেয়। তখন আমার আত্মার মধ্যে আমার বলিতে কিছুই থাকে না,

সবই সেই বিশ্বস্রষ্টার বলিয়া বোধ হয়, তখন অখণ্ড বিশ্বে শুধু 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ' বলিয়া বোধ হয়। এই পূর্ণ মিলনকে ভাগবত 'রাসলীলা' বলিয়া থাকে। এই রাসলীলায় ভগবান্ প্রেমের বলে ভক্তের হৃদয়-রাসমন্দিরে গিয়া অধিষ্ঠিত হন, তখনই ভক্ত চিদানন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া থাকে "সোহহং" অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর, ঈশ্বরের সত্তা ভক্ত নিজ নিজ প্রাণে অনুভব করে।

ভক্ত যে ভাবে ভগবান্‌কে ডাকে বা ভাবে, ভগবান্ সেইভাবেই তাকে দেখা দেন, তাই বৃন্দাবনে তিনি ছয়ভাবে পূজিত হইয়া ছয়ভাবের লীলা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপ-নরনারীগণ কেউ বা দাস্যভাবে, কেউ বা বাৎসল্যভাবে, কেউ বা সখ্যভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছিল, তাই ভগবান্ কখনও বা রাখাল বালকগণের সখারূপে, কখনও বা ব্রজরাজ নন্দের আদুরে গোপালরূপে, কখনও বা গোপনারীগণের স্বামিরূপে, কখনও বা পাপিষ্ঠের দণ্ডদাতারূপে লীলা করিয়াছেন। যে যেভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিয়াছে সে সেইভাবেই তাঁহাকে দেখিয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীরাধার দর্শনই চরম ও শ্রেষ্ঠ দর্শন। কোন ভক্তই আর এমন করিয়া দেখিতে পারেন নাই। এ দেখার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ভক্ত কবি 'বিদ্যাপতি'—

"জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এ দেখার আর শেষ নাই, লাখো যুগ ধরিয়া দেখিলেও নয়নের তৃপ্তি নাই, তাই এ রূপ নিত্যই নূতন। এ বিশ্বরূপ একবার যার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সেই মজিয়াছে ;—পরক্ষণেই সে ভাবিয়াছে,—হায়! কি দেখিলাম! এ দেখার যে আর তৃপ্তি নাই। যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। দেখিবার তৃপ্তি যেদিন পূর্ণ হইবে, সেদিন যে বিশ্ব অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে ; পাপের পুতিগন্ধময় বাতাসে ভগবানের সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া যাইবে। ইহার কারণ, ভগবানের রূপে কাম বা লালসার তীব্র গন্ধ নাই, এ রূপ একবার দেখিলে বাহিরের সকল কামনা বা লালসা এক নিমেষে ফুরাইয়া যায়। তখন ভগবান্ ভক্তকে ডাকিয়া বলেন "রূপ দেখিবে? কে আছ রূপপিয়াসী! আমার দিকে ফিরিয়া চাও, আমি সকল বিশ্বে রূপের কণা ছড়াইয়া দিয়াছি, তোমরা অনিমেষে পান কর, আর ঐ চাহিয়া দেখ—

"বর্হাপীড়ং নটবর-বপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।
বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং॥

রন্ধ্রান্ বেণোরধর-সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদ-রমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥”

এতক্ষণ শুধু ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের লীলাখেলাই বর্ণনা করিলাম, এইবার দেখিতে হইবে অভক্তদের সঙ্গে ভগবান্ কি খেলা খেলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অভক্তদের মধ্যে একমাত্র কংসকেই প্রধান দেখা যায়। এই কংস ঠিক কলি-যুগের একটী দানবীয় পশুশক্তি বা 'আমিত্বের' উপাসক। তিনি রাজশক্তি হাতে পাইয়াই অহঙ্কার ও গর্ব্বে মাতিয়া ক্ষুদ্র 'আমিত্ব'কে লইয়াই ব্যস্ত হইলেন, ক্ষণস্থায়ী দেহরক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, নিরাবিল আনন্দ ও প্রেমকে বর্জ্জন করিয়া শুধু ভোগসাগরেই মগ্ন হইয়া রহিলেন; ত্যাগের জন্য না বাঁচিয়া শুধু ভোগের জন্যই বাঁচিতে চাহিলেন, আর বাঁচিবার জন্য শুধু মরণকে ভয় করিতে লাগিলেন। তাই তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। তিনি যদি মৃত্যুকে জয় করিয়া প্রেমকে মরণের সঙ্গে মিলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে পারিতেন “মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম-সমান,” তাহা হইলে মরণই শেষে তাঁহার নিকট প্রেম ও আনন্দের উজ্জ্বল নটবররূপে দেখা দিত।

(ক্রমশঃ)

উচ্ছ্বাস।

(আকাশের প্রতি)

লেখক—সম্পাদক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

হে আকাশ সর্ব্বব্যাপী
তুমি এ বিশ্ব মাঝারে,
আছ তুমি স্থূলে সূক্ষ্মে,
আছ আলোক আঁধারে ॥
বল দেখি আছে নাকি,
এ বিশ্বে এমন দেশ,—

যেথা আছে শুধু শান্তি ;
নাহি অশান্তির লেশ ॥
নাহিক অসত্য যেথা,
সত্য সদা শোভমান,
যদি থাকে, হে আকাশ,
বলে দেও সেই স্থান ॥
সেই স্থানে গিয়া আমি
শুনি নিত্য তব গান,
শান্তির ছায়ায় বসি
জুড়াইব মম প্রাণ ॥
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত ॥

(৮)

হে আকাশ, শুন মম অন্তরের কথা
হৃদয়ের সুখ দুঃখ মরমের ব্যথা।
বিশ্বের সমস্যা যত করিতে পূরণ
ভেবে ভেবে মরিলাম সারাটি জীবন ;
সব কথা বলি যদি বলিবে "পাগল
উন্মাদের প্রায় সদা বকিছে কেবল ॥"
বল বল তাহে মোর কোন ক্ষতি নাই।
আমার প্রশ্নের যদি সদুত্তর পাই ॥
তুমিই কেবল বিশ্বে যদি ইচ্ছা কর
সমস্যা সমস্ত পূরণ করিতে পার।
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত ॥

(৯)

হে আকাশ, এস তুমি আমি দুইজনে,
ত্যজি লোকালয়, অতি নিভৃত নির্জ্জনে,
পরস্পর কহি কথা, যাহা আসে মনে,
খুলে দিয়া মন, মিত্র যথা মিত্র সনে ॥
পৃথিবীর পৃষ্ঠ ছাড়ি চল উর্দ্ধে যাই,
যত উঠি তত নূতন দেখিতে পাই ॥
গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র তারকা যত,—
তোমার আশ্রয়ে তারা ঘূরে অবিরত ॥
অসীম তাদের সংখ্যা, একা তুমি ভিন্ন
কে পারে গণিতে বল করি তন্ন তন্ন ॥
মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হয় ভাবি বিশ্বলীলা
বল হে আকাশ এ সব কাহার খেলা ?
পরমাণু হতে বিশাল মণ্ডল যত
সকলি ঘুরিছে সদা লাটিমের মত ॥
কেহ নাহি আছে স্থির ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে,
ঘুরে ঘুরে কোথা যায় কে বলিতে পারে ?
ঘুরিতেছে গ্রহগণ রবি কেন্দ্র করি,
কাকে কেন্দ্র করি বল ঘুরে তিমিরারি ?
সেই কেন্দ্র বল পুনঃ কাকে কেন্দ্র করি।
তোমার মাঝারে চলে যায় ঘুরি ফিরি ॥
অসীম অসীম শুধু সকলি অস্থির
কেহ ত সসীম নহে, কেহ নহে স্থির।
যদি কিছু জান তুমি, বল হে গোপনে,
একাই শুনিব, বলিব না অন্য জনে।
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

গীতার সমদর্শন।

লেখক—সম্পাদক।

সমদর্শন বলিতে কি বুঝায়। গীতায় আছে,—"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি, শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।" অর্থাৎ বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গো হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সমদর্শী। তার পরের শ্লোকেই আছে,—

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতো মনঃ
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।"

যাহাদের মন সাম্যে অবস্থান করে, তাহারা এই জীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন। বিকাররহিত যে সাম্য বা সমতা, তাহাই ব্রহ্ম। যাহাদের এইরূপ সাম্যে অবস্থান, তাহাদের ব্রহ্মেই অবস্থান হয়।

জগতের যে মূল তত্ত্ব, তাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলা যায়। যে তত্ত্ব অসীম এবং যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। দধি প্রভৃতি যাবৎ পদার্থ দুগ্ধ হইতে উদ্ভূত। তাহাদের সকলেই দুগ্ধ অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। দুগ্ধ যখন দুগ্ধ ততক্ষণ উহা নির্দ্দোষ বা বিকারশূন্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবগত আছেন, যে দধি, নবনীত, তক্র প্রভৃতি দ্রব্য মূলতঃ দুগ্ধই বটে, তাহাদের ব্যবহারিক ভেদ সত্ত্বেও তাহারা সকলেই এক দুগ্ধ মাত্র। এই বিশ্বের তাবৎ পদার্থই তত্ত্বতঃ ব্রহ্মমূলক। ব্যবহারিক জগতে তাহাদের বহুবিধ ভেদ সত্ত্বেও তাহারা মূলতঃ এক। জ্ঞানীরা এ কথা জানেন। গীতায় সেই কথাই বলা হইতেছে যে পারমার্থিক জগতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই—সেখানে মাত্র absolute homogeneity—নির্দ্দোষ সাম্য—কোন ভেদ নাই। সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত কোন ভেদ নাই। দেশ-কাল-জনিত কোন ভেদ নাই। সেখানে নির্দ্দোষ সাম্য একমেবাদ্বিতীয়ম্।

"পণ্ডিতেরা সমদর্শী, ইহার অর্থ এই নয় যে, ব্যবহারিক জগতে তুমি ব্রাহ্মণ ও কুকুরে সমব্যবহার করিবে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই ব্যবহারিক জগতে এরূপ আচরণ করা সম্ভবপর নহে, কেহ করেনও না।

পাশ্চাত্য জগতে যে সাম্যবাদের ধ্বনি শুনা যায়, এবং যে ধ্বনির প্রতি-ধ্বনি ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে শুনা যাইতেছে, সে সাম্যবাদ ও গীতার সাম্যবাদ

স্বতন্ত্র জিনিষ। Equality, liberty, fraternity, "সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃভাব" এই যে ধ্বনি—ইহা প্রথমে ফরাসী দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় উত্থিত হয়। অভিজাতদিগের দ্বারা মানব-সমাজে যে অযৌক্তিক ভেদ, যে ভেদের ফলে সমাজে গুণের আদর না হইয়া কেবল বংশেরই আদর হয়, যে ভেদের ফলে পরিশ্রমের আদর না হইয়া আলস্যেরই আদর হয়, যে ভেদের ফলে বিদ্যার আদর না হইয়া অবিদ্যার আদর হয়, সেই ভেদের বিরুদ্ধে ফরাশী-দেশীয় রাষ্ট্রবিপ্লববাদীরা অযৌক্তিক ভেদ নষ্ট করিতে গিয়া ন্যায্য ভেদ নষ্ট করিয়া ফেলিয়া যে equalityর ধ্বনি উঠাইয়াছিলেন, সে equality গীতার সাম্যবাদ নহে।

গীতার সাম্যবাদ অন্য প্রকারের। গীতার সাম্যবাদে—ব্যবহারিক জগৎ ও পারমার্থিক জগতের বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে। পারমার্থিক জগতে, মানুষে মানুষে কেন, মানুষে ও পশ্বাদিতেও কোন ভেদ নাই, সকলই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়। ব্যবহারিক জগতে মানুষে মানুষে যে ভেদ সে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অল্পতা বা আধিক্যবশতঃ হয়। মানুষে মানুষে ভেদ যে গুণ-বৈষম্যে হয়, ইতর জগতেও তদ্রূপ হয়। প্রকৃতির এই তিন গুণ হেতুই, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়—সকল দেশে ও সকল সমাজেই হয়—নাম যাহাই দেও না কেন। যাহারা সত্বগুণবিশিষ্ট তাহারা সমাজের ব্রাহ্মণ, যাহারা রজোগুণবিশিষ্ট, তাহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, আর যাহারা তমোগুণবিশিষ্ট তাহারা শূদ্র। প্রত্যেকেই দুই গুণ আছে, যাহার যে গুণ প্রবল, তাহার বিকাশ তদনুসারে হয়। গুণের ন্যূনাধিক্য করা মানুষের হস্তে। গুণের অধিকারী না হইয়া গুণোপযোগী স্থানের প্রয়াসী হইলেই সমাজে বৈষম্য উপস্থিত হয়। বৈষম্যের প্রাবল্যেই রাষ্ট্রবিপ্লব হয়—এবং বিপ্লববাদীরা স্বয়ং মূলতত্ব ভুলিয়া—একরূপ বৈষম্য ধ্বংস করিতে গিয়া—অন্যবিধ বৈষম্য আনয়ন করেন। পাশ্চাত্য রুশিয়া ও ফ্রান্স দেশে এইরূপই হইয়াছে।

বস্তুতঃ যাহার যাহা ন্যায্য পাওয়া উচিত, তাহাকে তাহা দেওয়ার নামই সাম্য ভেদ। সকল জিনিষকেই একরূপে ব্যবহার করা যে সাম্যবাদ, তাহা ব্যবহারিক জগতের নহে। ব্যবহারিক জগতে দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া যে ন্যায্য ব্যবহার তাহাই সাম্যবাদ।

বিজয়া ।

লেখক—সম্পাদক ।

সত্যের হউক জয়,
অসত্যের পরাজয় ।
জ্ঞানের হউক জয়,
অজ্ঞানের পরাজয় ॥
বিদ্যার হউক জয়,
অবিদ্যার পরাজয় ।
লক্ষ্মীর হউক জয়,
অলক্ষ্মীর পরাজয় ॥
শিবের হউক জয়,
অশিবের পরাজয় ।
ধর্ম্মের হউক জয়,
অধর্ম্মের পরাজয় ॥
পুণ্যের হউক জয়,
অপুণ্যের পরাজয় ।
শান্তির হউক জয়,
অশান্তির পরাজয় ॥
সংযমের হ'ক জয়,
অসংযমের পরাজয় ।
মিত্রতার হ'ক জয়,
শত্রুতার পরাজয় ॥
দেবত্বের হ'ক জয়,
পশুত্বের পরাজয় ।
দাতার হউক জয়,
কৃপণের পরাজয় ॥
সাম্যের হউক জয়,
অসাম্যের পরাজয় ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় যার ।
যথার্থ বিজয়া তার ॥

গীতা-নাটক।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ষোড়শ দৃশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! আপনি এইমাত্র বল্লেন যে জগতের সমুদায় পদার্থই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে উৎপন্ন হয়। সে বিষয়ে আমার আরও একটু জানবার লালসা হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে ভারত! মহদ্ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতিই উৎপত্তি-স্থান; আমি তাহাতে চৈতন্যরূপ বীজ নিক্ষেপ করি; সেই গর্ভাধান হ'তে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়! যাবদীয় মূর্ত্তি সকল সর্ব্বযোনি হ'তে উৎপন্ন হচ্ছে; তাদের মাতা মহদ্ব্রহ্ম, এবং আমি পরমেশ্বর বীজপ্রদাতা পিতা। মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে দেহপুরস্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে সুখ-দুঃখ-মোহাদি দ্বারা ভাবী দেহে আবদ্ধ করে। এই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্বহেতু সত্ত্বগুণ চৈতন্যোদ্দীপক ও জ্ঞানের প্রকাশক এবং দুঃখশূন্য; উহা দেহীকে সুখ ও জ্ঞানের সহিত আবদ্ধ করে। অর্জ্জুন! রজোগুণ রাগাত্মক; উহা অনুরাগ, তৃষ্ণা ও আসক্তি বৃদ্ধি করে। তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত এবং সর্ব্বদেহীর মোহকারী। উহা আলস্য, প্রমাদ ও নিদ্রাদির দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। পার্থ! রজোগুণ বৃদ্ধি হ'লে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভস্পৃহা ও অশান্তির সৃষ্টি হোয়ে থাকে। সাত্ত্বিক লোক ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন, এবং জগতের যে কিছু শান্তি আছে তাহা লাভ কোরে অন্তে আমাকে প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। রাজসিক লোক মধ্যগতি এবং তামসিক লোক অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন। ভগবন্! ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধোগতি কি, বিবৃত করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। কৌন্তেয়! সত্ত্বগুণে জ্ঞানোদয় হ'য়ে আত্মগতি বা ঊর্দ্ধগতি হয় অর্থাৎ পুনরায় জঠর-যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হয় না। যদি কাহারও দৈববিপাকে পুনরায় নরকুলে জন্মগ্রহণ কর্ত্তে হয়, তবে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ কোরে অধিকতর জ্ঞানী হন এবং চিরশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করেন। রজোগুণে লোভাদি-আসক্ত হ'য়ে জীব মধ্যলোকে অর্থাৎ ইতরশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে। আর তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে জীব নিম্নে অতল হ'তে সপ্ত পাতালাদি সপ্তলোকে ইতরপ্রাণীতে বা কীটাদি পতঙ্গযোনিতে বা হিংস্র জন্তুকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ করে।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! মানুষ কোন্ সকল চিহ্ন ও কিরূপ আচার অবলম্বন কল্লে এই তিনটী গুণ অতিক্রম কর্ত্তে সমর্থ হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন হোয়ে সুখ দুঃখাদির গুণকার্য্য দ্বারা বিচলিত হন না; যিনি সম-দুঃখসুখ, আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান; যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমান দেখেন; যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য; যিনি মান অপমান, শত্রু ও মিত্র সমান বোধ করেন এবং যিনি সর্ব্ব-সংকল্পত্যাগী; তিনিই গুণাতীত অর্থাৎ সমস্ত গুণকে অতিক্রম কোরে মোক্ষলাভে সমর্থ হন। অর্জ্জুন! সংসাররূপ অব্যয় অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উর্দ্ধে এবং শাখা সকল অধোদিকে বিস্তৃত। সমস্ত বেদের কর্ম্মকাণ্ড উহার পত্র। যিনি এই অশ্বত্থবৃক্ষকে বিদিত আছেন, তিনিই বেদবেত্তা। দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা এই বদ্ধমূল অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন কোরে তার মূলীভূত কারণ অনুসন্ধান ক'রবে, যাহা প্রাপ্ত হ'লে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। আমি সেই আদিপুরুষের শরণাগত হই, এই ব'লে তার অনুসন্ধান কর্ত্তে হবে! অর্জ্জুন! প্রত্যেক ভূতে অবিনাশী জীবাত্মা এ সংসারে জীবভাবে অবস্থিত আমারই অংশ। তিনি প্রলয়কালে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বারংবার সংসারভোগে আকর্ষণ করেন। আমি জগতে অধিষ্ঠিত থেকে নিজ তেজঃপ্রভাবে যাবতীয় ভূত সকল ধারণ ক'রেছি এবং সোমরসপূর্ণ ওষধিগণকে পোষণ কর্চ্ছি। আমি জঠরাগ্নিরূপে সমুদায় প্রাণিগণের দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক প্রাণাপান বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত হ'য়ে চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করে থাকি। তবে আমি থাকি না কিসে? আমি ভিন্ন কোন্ কার্য্য সম্পন্ন হ'য়ে থাকে? জীবের জ্ঞান জন্মিলে আমার সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড সহজেই বুঝ্‌তে পারে।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! জীবের উপকারের জন্যেই ত আপনি সর্ব্বথা সর্ব্বত্র যত্নশীল, তবে কেন জীবগণ তা সম্যক্ অবধারণ কর্ত্তে সমর্থ হয় না? এবং তোমাকে যে ভজনা করে তারই বা বিপদ আপদ ঘটে কেন?

অর্জ্জুনের গীত।

কারে সুখী রেখেছ হে সুখময়?
সুকোমল নামটী তোমার সুকঠিন হৃদয়।
যে তোমার উপাসক, তাহার নাই কোন সুখ,
সদাই অসুখী শুক নারদাদি সমুদয়।

তুমি যদি ভক্তের গতি, তবে কেন ভক্তের দুর্গতি ?
সাক্ষী তার পশুপতি যিনি দেব মৃত্যুঞ্জয়।
দেখ দেখি হে গোবিন্দ, নন্দ কেন কেন্দে অন্ধ ?
বসুদেবের যে বিবন্ধ তাহা আর জানাব কায় ?
শুন ওহে মায়াময়, নামটি ধর দয়াময়,
অন্তর তব বিষময় কত দিব পরিচয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন, যেমন অন্ধকার ঘরে কোথায় কি আছে আলোক ব্যতীত দেখা যায় না, তেমন মায়াচ্ছন্ন এই পৃথিবীতে সাধারণ লোক জীবাত্মার দেহত্যাগ, স্থানান্তরে গমন, ভিন্নদেহধারণ ও উপভোগ এই ত্রিবিধ ক্রিয়া আত্মজ্ঞানরূপ সূর্য্যালোক অভাবে কিছুই দেখ্‌তে পায় না; তজ্জন্য মনে অসুখী হয় না বা স্বপ্নেও চিন্তা করে না। পরন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত মহাত্মাগণ সব জানেন; সব দেখ্‌তে পান। পার্থ! আমাকে উপেক্ষা কো'রে যাহারা দম্ভ, দর্পভরে আমার আরাধনা না করে তাহারা অজ্ঞানী, কাজেই আমি তাদের দূরে থাকি। যারা দৈব সম্পদ্ লক্ষ্য করে জন্মগ্রহণ করে, আমি তাদের নানা গুণে বিভূষিত করি। আর যারা আসুর সম্পদ লক্ষ্য করে, তারা দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষে বন্ধনের হেতু হয়। মোক্ষলাভ করা তাদের পক্ষে অতিশয় দুষ্কর এবং কাহার কাহার পক্ষে অসম্ভব হয়। তুমি দৈবসম্পাদ লক্ষ্য কোরে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, অতএব শোক ক'রো না। শোকে কোনপ্রকারে অভিভূত হওয়া জ্ঞানীর পক্ষে অশুভকর।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! দৈব ও আসুর সম্পদ কি? আপনি দয়া ক'রে আমাকে সম্যক্ উপলব্ধি কোরে দিন।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! দৈব সম্পদ্‌শালী ব্যক্তিরা অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অদ্বেষ, অলোভ, বিনয়, স্থৈর্য্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হন। আর আসুর সম্পদ্‌শালী লোক সকলের ধর্ম্মে অপ্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। তাদের শৌচ নাই, আচার নাই ও সত্য নাই। তারা জগৎকে স্বভাবজ, ঈশ্বরশূন্য, স্ত্রীপুরুষসম্ভূত, কামজনিত বলে; সেই অল্পবুদ্ধি লোক সকল উগ্রকর্ম্মা হ'য়ে জগতের ক্ষয়কারী হয়। তারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ হয় এবং অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। আমি এই সমস্ত দ্বেষপরবশ ক্রূরস্বভাব নরাধমদিগকে নিরন্তর সংসারে আসুরযোনি মধ্যে নিক্ষেপ করি।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! লোকের ঐ সমস্ত আসুর-ভাবাপন্ন হওয়ার কারণ ও মূলীভূত হেতু কি?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! কাম, ক্রোধ ও মোহ এই তিনই জীবের অধোগতির দ্বারস্বরূপ; অতএব এই তিনকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। কার্য্যকারণের নিরূপণ ক'র্ত্তে হ'লে শাস্ত্রই তাহার প্রমাণস্বরূপ। অতএব শাস্ত্র অনুসারে স্বীয় অধিকার অনুরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জেনে কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত হও। কুকর্ম্মে ধনাঢ্য হওয়া অপেক্ষা বরং সৎকর্ম্মে দরিদ্র হওয়া ভাল, কেননা চিররুগ্ন স্থূলদেহ অপেক্ষা ক্ষীণ সুস্থ শরীরও মঙ্গলপ্রদ।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! যারা শাস্ত্রবিধি তুচ্ছ কোরে পরন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হোয়ে পূজাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে তাদের সেই নিষ্ঠা কিদৃশী অর্থাৎ তাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক কি রাজসিক অথবা তামসিক?

শ্রীকৃষ্ণ। ভারত! প্রাণী মাত্রেরই শ্রদ্ধা স্বীয় স্বীয় চিত্তবৃত্তির অনুরূপ হোয়ে থাকে। অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত দেহী শ্রদ্ধাময়। যে যাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত, তার পক্ষে আমি তাদৃশভাবে থাকি। যারা শরীরস্থ পঞ্চভূতকে এবং দেহস্থ আত্মাস্বরূপ আমাকে বৃথা উপবাসে কৃশ করে তারা ক্রূরকর্ম্মা আসুর। যে সকল হীনচেতা ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হোয়ে শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত ক'রে অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তারা আমাকেই ক্লেশিত করে। তাদিগকে ক্রূরস্বভাব বলে জানবে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! শাস্ত্রে লোকের আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানের কিরূপ ব্যবস্থা আছে?

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ! সকলের আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দান তিন প্রকার, তা বলি শোন। আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক, রসাল, অধিকক্ষণ স্থায়ী ও হৃদয়গ্রাহী আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত হো'য়ে নিতান্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক। হে কৌন্তেয়! দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ আদির পূজা, শৌচ, আর্জ্জব, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এইগুলি শারীর তপঃ জানবে। মনের প্রসন্নতা জন্য মিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ, সত্য, প্রিয়, হিতবাক্যপ্রয়োগ এবং বেদাভ্যাসাদি বাঙ্ময় তপস্যা। যে দান মাত্র কর্ত্তব্যানুরোধে, দেশকালপাত্র বিবেচনায় ও প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে করা হয়, তাই সাত্ত্বিক। হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যজ্ঞ, ও তপস্যা বা যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তা সবই অসৎ। অবস্থা

গোপন কোরে যারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করে তাহারা নির্দ্দিষ্ট ফল প্রাপ্ত হয় না।

ওহে বীর চূড়ামণি, তাই শাস্ত্র মানি
শাস্ত্রের বিধি নিষেধ ভালরূপে জানি।

ধর আজ্ঞা পার্থ! স্বধর্ম্ম ক'রোনা ব্যর্থ, যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া ক্ষত্রধর্ম্ম উক্ত; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধি শাস্ত্রবদ্ধ।

সপ্তদশ দৃশ্য।

পাণ্ডবগৃহ—দ্রৌপদী ও সখীগণ।

দ্রৌপদী। সখীগণ! আজ আমার অন্তরে যুগপৎ বিষাদ ও উল্লাসের উদয় হচ্ছে কেন? ক্ষণিক উল্লাসিতা হচ্ছি, পরক্ষণেই মনে বিষাদের সঞ্চার হচ্ছে। যুদ্ধস্থলের সংবাদ কি তোমরা কেউ বল্‌তে পার?

১ম সখী। দ্রুপদরাজতনয়া! তোমার এখন হর্ষ ও বিষাদের সময়ইত বটে! এটা বড় একটা আশ্চর্য্যজনক নয়। তবে ভাই তুমি ত সজ্জন ও সাধুসঙ্গ করেছ। তুমি রাজতনয়া এবং পাণ্ডবগৃহিণী ও ভবকর্ণধারের গৌরবিণী, তোমার আর বিষাদ কি ভাই? যুদ্ধস্থলে শ্রীহরি স্বয়ং তোমার তৃতীয় পাণ্ডবের সারথি। এতেও যদি মনে দ্বিধা ও সংশয় হয়, তবে তোমার মনে শান্তির জন্যে আর কি দরকার হয় জানি না।

২য় সখী। তাই ত ভাই, আমরা স্ত্রীজাতি। আমাদের মনে সদাই নানারূপ চিন্তার উদয় হয়। বিশেষতঃ এমন ঘোরতর যুদ্ধে কার অদৃষ্টে কি আছে তা কি কেউ সহসা বল্‌তে পারে?

৩য় সখী। রাজনন্দিনি! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক সমস্ত চিন্তা পরিহার কর। স্বয়ং বাসুদেব যখন পাণ্ডবের অনুকূল, তখন কার সাধ্য পাণ্ডুকুলের অমঙ্গল সাধন করে? চিন্তা করো না সখি! সেই ভবভয়হারি শ্রীহরিকে সতত মনঃ প্রাণে চিন্তা কর ও ডাক।

গীত (একতালা—ভৈরবী)

গেলনা গেলনা দুঃখের কপাল।
গেলনা, গেলনা, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না, আর কতকাল।
আমরা মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ, কিন্তু হায় কি কপাল হয় নানা দুঃখ
ভাগ্যের মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা বাড়ায় জঞ্জাল॥

গীত।

১ম সখী। এস প্রাণ মন দু'জনে, অতি গোপনে অতি সাবধানে,
ডাকি প্রাণ মন ভরে সেই রাধিকা-হৃদি-রঞ্জনে।
২য় সখী। ওরে উভয়েতে যুক্তি ক'রে, বাঁকা শ্যাম গিরিধরে ডাক্‌ব আদরে
ক'রব বিধিমতে পদ-পূজা ভক্তি-কুসুম-দানে।
৩য় সখী। দুইজনে ঐক্য হ'লে, কার্য্য-সাধন অবহেলে হইবে বলে,
পঞ্চভূতে কি করিবে রাখ্‌ব তাদের শাসনে॥

দ্রৌপদী। সখীগণ! সবই ত জানি। সবই ত বুঝি। দুঃখের চিন্তা না করাই দুঃখনাশের প্রকৃত ঔষধ। কিন্তু কি করি, সেই চিন্তাহারী হরি যে তার অবসান কর্ত্তে দিচ্ছেন না; যাহোক ভাই, আর আমরা দুঃখ কষ্টকে মনে স্থানও দেব না।

অষ্টাদশ দৃশ্য।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ।

অর্জ্জুন। হৃষীকেশ! সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিভিন্নতা জানিতে একান্ত ইচ্ছা হয়েছে। আপনি কৃপা কোরে ব্যাখ্যা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ "সন্ন্যাস" এবং যাবতীয় কর্ম্মের ফলত্যাগকেই বিচক্ষণেরা ত্যাগ ব'লে থাকেন। ত্যাগ তিন প্রকার। যজ্ঞ, দান, তপোরূপ কর্ম্ম আমার মতে কোনক্রমে ত্যাগ ক'রবে না, কেননা

ইহারা ফলাভিসন্ধিশূন্য মানবগণকে পবিত্র করে। যাহা কিছু সত্য সংসারে আছে, যাহা কিছু সৎকর্ম্ম সংসারে সম্ভবপর, সেগুলি চিরকাল অপরিবর্ত্তিত-ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। নিত্যকর্ম্ম পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে। শারীরিক ক্লেশহেতু ও নিতান্ত দুঃখজনক ব'লে ভয়প্রযুক্ত যে ব্যক্তি নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে ত্যাগ-ফল-লাভে সমর্থ হয় না। আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ কোরে কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। দেহধারী কখনই সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ কর্ত্তে সমর্থ হয় না। যিনি কর্ম্মফলত্যাগী তাঁকেই ত্যাগী বলা যেতে পারে। অর্জ্জুন! যা হ'তে সকলের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হচ্ছে, যিনি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন, মনুষ্যের স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁকে অর্চ্চনা করাই কর্ত্তব্য। সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বভাব-বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্লে দুঃখভোগ কর্ত্তে হয় না। যেমন ধূম-রাশি দ্বারা অগ্নিসমাচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু তাতে অগ্নির স্বভাব হীন হয় না, তদ্রূপ সমস্ত কার্য্যই কিছু না কিছু দোষে সমাচ্ছন্ন থাকে। অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হ'লেও কদাচ তাহা পরিত্যাগ ক'রবে না।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! ব্রহ্মপদের যথার্থ অধিকারী কে?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ কোরে নির্জ্জন বা নদীকূলে বা একান্তে পর্ব্বতগুহায় অথবা জনমানবশূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে অবস্থান কোরে শাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং নিদ্রালস্যকর অতিভোজন বর্জ্জন এবং যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদের যথার্থ অধিকারী। অর্জ্জুন! ভোগের অবসান না হ'লে চিত্ত-শুদ্ধি হয় না; চিত্ত-শুদ্ধি না হ'লে পরাভক্তির উদয় হয় না এবং পরাভক্তি ব্যতীত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয় না। পার্থ! ভগবৎ শরণাগতের ভগবৎকৃপায় সকল অভাব ও দুঃখ মোচন হয় এবং দুঃখমোচন হ'লে তিনি নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। এই মানবজন্ম অতি দুর্লভ; এই দুর্লভ মানবজন্মে যত্ন ও চেষ্টা কর্লে সবই হয়; হেলায় অধঃপতন হয়।

যেরূপ বা যাগা আমি,　　ভক্ত তা প্রকৃত জানি
প্রবেশে আমাতে অন্তে অন্তিমে তাহার;
সদা সব কর্ম্মে থাকি,　　আমি কৃষ্ণে দৃষ্টি রাখি
অন্তে নিত্যপদ পান প্রসাদে আমার।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! এই সংসার ঘোর মায়াযুক্ত কর্ম্মজাল দ্বারা আবৃত। ইহা হ'তে উত্তীর্ণ হওয়া ত আজীবন কর্ম্ম কর্লেও সম্ভবপর বোধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ। তা ত বটেই। সংসার হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে ও পুরুষকার দেখাতে গিয়া যিনি বলপূর্ব্বক শত্রু এবং ইন্দ্রিয়দিগকে দমন কর্ত্তে চেষ্টা করেন; কখনই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয় না। কারণ ভগবৎ ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। কিন্তু যিনি চেষ্টাবিহীন হ'য়ে ভগবৎ প্রসাদলাভে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি সকল বিপদে অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'তে পারেন; এমনি ভগবৎ মহিমা। অতএব হে অর্জ্জুন! স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানের বশীভূত হ'য়ে অহঙ্কারে যদি (ভগবদ্বাণী) আমার বাক্য অবহেলা কর তবে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হোয়ে মহাবিপদে আসুরিকভাবে বিনষ্ট হবে। আরও যদি "আমি ধর্ম্মাত্মা" "যুদ্ধরূপ হিংসা-বৃত্তি আমার অন্যায়" এই অজ্ঞানে কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং অহঙ্কারের বশীভূত হ'য়ে বল "আমি যুদ্ধ করব না", তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি ইহজন্মে বা জন্মান্তরে তোমাকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করবে, তখন গুরুজন বধ অন্যায় এবং দেশ, জাতি, কুল, মান প্রভৃতি নাশক এ জ্ঞানও থাক্‌বে না এবং অনিচ্ছাস্বত্ত্বে উক্ত যুদ্ধকার্য্যে তোমাকে বাধ্য করবে। কারণ কর্ম্মপাশ ছেদন কর্‌বার একমাত্র সহজ উপায়—একাগ্রতা, বৈরাগ্য ও ভক্তির উদয়ে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্মে অন্তরশুদ্ধি দ্বারা প্রেমভক্তির উদয়ে ব্রহ্মপদ লাভ।

গীত।

আমাতেই মন প্রাণে, সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণে
আমি "কৃষ্ণ জীবগতি" এই মনে গণি।
বুদ্ধি যোগাশ্রম জ্ঞানে, সতত আমার ধ্যানে
আমাতেই রাখ চিত্ত বীর-চূড়ামণি;
রাখিলে আমাতে মতি, হবে অন্ত দুঃখ অতি
তরিবে এ ভবদুর্গে প্রসাদে আমার।
দম্ভ দর্পে হয়ে ঐক্য, নাহি ধর মম বাক্য
নিশ্চয় হবে নিধন কুন্তীর কুমার।
"আমার স্বজন স্মরি"
অহঙ্কার হৃদে ধরি
"করিব না যুদ্ধ আমি" ভাবিছ যা মনে।
মিথ্যা তাহা। তেজ করি
প্রকৃতি তোমাকে ধরি
করাবে প্রবৃত্ত পার্থ কুরুক্ষেত্র রণে।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! আর আমি তোমাকে কি উপদেশ প্রদান করব? তুমি যদি অহঙ্কার-পরতন্ত্র হোয়ে আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর, তবে নিঃসন্দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তোমার অধ্যবসায় আছে বলেই আমি তোমাকে হিতোপদেশ দিলাম। সূত্রধর যেমন দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিকা সকলকে ভ্রমণ করায় তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থান কোরে তাদিগকে ভ্রমণ করাচ্ছেন। এক্ষণে তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হও। তাঁর অনুকম্পায় পরমশান্তি ও পরমপদ পাইবে। আমি এই পরম গুহ্য জ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন কল্লেম; এক্ষণে ইহা সম্যক্ পর্য্যালোচনা কর। হে পার্থ! তুমি একাগ্রমনে গীতাশাস্ত্র শুনিলে কি? ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত মোহজাল নষ্ট হ'ল কি? বল। শত্রুদমন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ও প্রকৃত ধর্ম্ম; স্বীয় ধর্ম্মপালনে যদি এখনও তুমি কাতর হও, তাও বল। আর কালহরণ করা উচিত নয়।

অর্জ্জুন। হে অচ্যুত! আমি তোমার কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ কল্লাম। আমার সর্ব্বসন্দেহরূপ মোহ নাশ পেয়েছে। এক্ষণে নির্ম্মল স্মৃতিলাভে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রব।

শ্রীকৃষ্ণ। হে মহাবাহো! শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত পবিত্র ও সংগ্রামাভিমুখ হোয়ে দুর্গার স্তব কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের অনুমতি গ্রহণ কর।

এই আত্মজ্ঞান ভবে　　　অর্জ্জুন কহিনু এবে
　　গোপনীয় হইতেও গুহ্যতম অতি,
সযতনে হৃদে রাখ　　　অন্তরে বুঝিয়া দেখ
　　পরে বাঞ্ছা হয় যা, তা কর যত্নে অতি।
সুখে দুঃখে এই ভাবে　　　আমারি সর্ব্বতোভাবে
　　ভারত! শরণ লবে আমি মাত্র সার,
আমার কৃপায় তবে　　　নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে
　　অসাধ্য পরমা শান্তি ঘটিবে তোমার।
(আমি) আত্মা কৃষ্ণে প্রাণ　　　কর পার্থ সমর্পণ,
　　হও আমারই ভক্ত সব উপেক্ষিয়া।
আমার অর্চ্চন সার　　　আমাকেই নমস্কার,
　　স্থির কর চিত্ত তব একাগ্র করিয়া।

অন্তিমে নিশ্চয় তবে আমাকেই প্রাপ্ত হবে
সত্যই প্রতিজ্ঞা করি বলিতেছি আমি
কেন যে প্রতিজ্ঞা করি জানহ গাণ্ডিবধারী
এ ভবে আত্মীয় সখা অতি প্রিয় তুমি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি মাত্র "কৃষ্ণ" পদে ধরি
একাগ্র অন্তরে লহ আমার শরণ,
সর্ব্ব পাপ হতে ত্রাণ দিব আমি মুক্তি দান
করিও না শোক পার্থ, মানহ বচন॥

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! তোমারি অনুজ্ঞায় আজ এখনি আমি মা দুর্গার স্তব সমাপন ক'রে যুদ্ধারম্ভ ক'র্ব্ব।

দুর্গাস্তব।

সতী সাধ্বী ভবপ্রীতা ভবানী ভবমোচনী।
আর্য্যা দুর্গা জয়া আদ্যা ত্রিনেত্র শূলধারিণী।
পিনাকধারিণি চিত্রা চণ্ডঘণ্টা মহাতপা
মনোবুদ্ধি-স্বরূপিণী চিত্তরূপা মহেশ্বরী,
সর্ব্বমন্ত্রময়ী সত্যা সত্যানন্দস্বরূপিণী।
অনন্তা ভাবিনী ভব্যা ভব-ভব্যস্বরূপিণী
শাকম্ভরী দেবমাতা ত্রিনয়নপ্রিয়া সদা
সর্ব্ববিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী
সর্ব্বাসুরবিনাশা চ সর্ব্বদানবঘাতিনী।
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী সত্যা সর্ব্বসংহারকারিণী,
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী
কৌমারী চৈব কন্যা চ কিশোরী যুবতী সতী।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

নমস্তে জগদাদ্যন্ত্য-স্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞান-রূপে
নমস্তে সদানন্দনন্দ-স্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ
ত্বমেকা গতি র্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনল সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে
ত্বমেকা গতি র্দ্দেবী নিস্তার হেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। বীরবর! আমি তোমার স্তবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে বর দিতে এসেছি। ধনঞ্জয়! তুমি অল্পকাল মধ্যেই অরাতিগণকে পরাজিত করবে। তুমি নর, নারায়ণ তোমার সহায়; অন্য লোকের কথা দূরে থাক, স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রও তোমাকে পরাভূত কর্ত্তে সমর্থ হবেন না। তুমি ধর্ম্ম-যুদ্ধ কোরে নারায়ণের অভিলাষ পূর্ণ কর।

অর্জ্জুন। গীত। বলি হারি হরি! তোমার করুণায়
শুধু হরি! হরি! ব'লে তোমায় পাওয়া যায়।
নাহি প্রয়োজন, পূজার উপকরণ, রজত-কাঞ্চন, কুসুম-চন্দন,
কেবল মুখের কথায় হরি ব'লে হরি পাওয়া যায়।
তোমার এই বিধান, হে করুণা-নিদান, খুলে মনঃ-প্রাণ
করলে তোমার গুণ-গান, জীবে তোমার সঙ্গ পায়।
(শুধু হরিবোল হরিবোল ব'লে
জীবে তোমার সঙ্গ পায়)
(শুধু হরি হরি হরি ব'লে
তোমার সঙ্গ পায়)
তব কৃপায় হরি, মোহ পরিহরি
আত্মজ্ঞানে আজি হই আত্মবান,
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সন্দেহ-ভঞ্জন ক্ষত্রো-
কুলোচিত পালিব বচন।

বাসুদেব! এই আমি পুনরায় গাণ্ডীব ধারণ কল্লেম। আপনার অনুগ্রহে

এখন আমি উপযুক্ত জ্ঞানযুক্ত হয়েছি। আপনার আজ্ঞা-পালনেই নিযুক্ত হ'লেম। সৈন্যগণ স্ব স্ব স্থানে নিযুক্ত হ'য়ে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান হউক।

শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু (শঙ্খ-ধ্বনি ও বিবিধ বাদ্য বাদিত)

(ভ্রাতৃগণ সহ যুধিষ্ঠিরের কৌরব সেনা মধ্যে গমন।)

যুধিষ্ঠির। (স্বগত) এই বুঝি তৃতীয় পাণ্ডবের মোহ ভঙ্গ হ'ল। তবে এক্ষণে যে কর্ত্তব্য আছে তা করাই কর্ত্তব্য। (কবচ ও আয়ুধ ত্যাগ কোরে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে শত্রু-সৈন্যাভিমুখে গমন)

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ! আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ কোরে রিপু-সৈন্যাভিমুখে পাদচারে গমন কচ্ছেন?

ভীমসেন। রাজন্! শত্রু-সৈন্যগণ সুসজ্জিত হ'য়েছে; এ সময়ে আপনি অস্ত্র শস্ত্র ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ কোরে কোথায় চলেছেন?

নকুল। আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোয়ে এরূপ ব্যবহার করাতে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হচ্ছে; বলুন, কোথায় যাচ্ছেন?

সহদেব। মহারাজ! এক্ষণেই এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সময় সমুপস্থিত হ'য়েছে; এ সময় আপনার যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য; আপনি তা না ক'রে শত্রু-গণের অভিমুখে কোথায় যাচ্ছেন?

শ্রীকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) পাণ্ডবগণ! আমি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হ'য়েছি; উনি ভীষ্ম, দ্রোণ, ও শল্য প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সম্মানিত কোরে শত্রুগণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন। পূর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরায় শ্রবণ কোরেছি যে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ, গুরু ও বান্ধবগণের সম্মান কোরে শাস্ত্রানুসারে বলবান শত্রুগণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, অবশ্যই তাঁর জয়লাভ হয়।

১ম কৌরবসেনা। দেখ ভাই, এই ক্ষত্রিয়কুল-কলঙ্ক কাপুরুষ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ভীতি-বশতঃ সহোদরগণসহ শরণার্থী হোয়ে ভীষ্মের সমীপে গমন কর্চ্ছে। আহা! মহাবীর ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব সহায় থাক্‌তেও নির্লজ্জ যুধিষ্ঠির কিরূপ ভীত হোয়ে গমন কচ্ছে, দেখ! নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে ঐ কাপুরুষ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই; নতুবা সংগ্রাম-সময় সমুপস্থিত হওয়াতে কি নিমিত্ত উহার মনে ভয়ের সঞ্চার হ'ল?

২য় কৌরবসেনা। তাইত ভাই; এই বুঝি পাণ্ডবদের দম্ভ-দর্প! এই বুঝি তাদের সৈন্য সমাবেশ! এই বুঝি কৃষ্ণঠাকুরের ধর্ম্মোপদেশ! যা হোক

দেখা যাক্ ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। শোনা যাক্ রাজা যুধিষ্ঠির বা কি বলেন এবং ভীষ্মই বা কি প্রত্যুত্তর করেন। সমরশ্লাঘী ভীমসেন ধনঞ্জয় ও বাসুদেবই বা কি বলেন।

ভীষ্ম-সমীপে যুধিষ্ঠির ও ভ্রাতৃগণ।

যুধিষ্ঠির। (ভীষ্মের চরণদ্বয়ে হস্ত দিয়া) পিতামহ! হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ কর্ত্তে এসেছি। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রব। অনুগ্রহ কোরে অনুমতি প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীষ্ম। হে রাজন্! বুঝ্‌তে পেরেছি। যদি তুমি অনুজ্ঞা-গ্রহণার্থ আমার নিকট আগমন না কর্ত্তে, তা'হলে আমি তোমাকে শাপ দিতাম। কিন্তু এক্ষণে আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হ'য়েছি। আশীর্ব্বাদ করি যুদ্ধ কোরে জয়লাভ কর। তোমার অন্যান্য যে সমুদায় অভিলাষ আছে তাও সিদ্ধ হোক। তোমার কখন পরাজয় হবে না। এক্ষণে তোমার স্বীয় অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর। রাজন্! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ আমাকে অর্থ দ্বারা বদ্ধ ক'রেছে। অতএব আমি নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে বল্‌ছি যে কাজেই আমাকে তা'দের পক্ষ অবলম্বন কর্ত্তে হবে; তোমার পক্ষাবলম্বন কোরে যুদ্ধ কর্ত্তে পারব না। অতএব এতদ্ব্যতীত আমার নিকট কি প্রার্থনা কর, বল।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! আপনি আমার হিতার্থী হ'য়ে আমাকে মন্ত্রণা প্রদান করুন এবং কৌরবগণের পক্ষ হ'য়ে যুদ্ধ করুন; আমি এই বর প্রার্থনা করি।

ভীষ্ম। রাজন্! তোমার বিপক্ষগণের পক্ষ হ'য়ে আমাকে অবশ্যই যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। যা হোক, এ বিষয়ে তোমার যা অভিলাষ থাকে, ব্যক্ত কর। আমি তোমার অভিলাষ পুর্ণ কর্ত্তে পরাঙ্মুখ হব না।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! আমি আপনাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা কচ্ছি আপনি অপরাজেয়; অতএব আপনাকে কিরূপে পরাজয় কর্ত্তে পারব? তার যে সদুপায় থাকে আমাকে দয়া ক'রে তাই বলুন। আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যদি হন তবে তার সৎপরামর্শ প্রদান করুন।

ভীষ্ম। ধর্ম্মরাজ! আমাকে সমরে পরাস্ত কর্ত্তে পারে এমন কেহ নাই। তবে আমার নিধন-বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ কর্ত্তে তুমি আর একদিন আগমন করিও।

যুধিষ্ঠির। যে আজ্ঞে পিতামহ! তবে আমি এখন গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করি।

ভীষ্ম। অতি উত্তম।

যুধিষ্ঠির। (গুরু দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক) হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ কর্ত্তে এসেছি। ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছি, অতএব আপনি অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন।

দ্রোণ। রাজন্! তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হ'য়ে যদি আমার অনুমতি-গ্রহণ জন্যে না আস্‌তে, তা'হলে আমি তোমাকে শাপ দিতাম। যা'হোক এক্ষণে তুমি আমার পূজা করাতে আমি তা গ্রহণ কোরে পরম পরিতুষ্ট হ'লেম। তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ কর; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জয়লাভ হ'ক্। হে রাজন্! কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্মদেব যা বলেছেন, আমারও সেই কথা। দুর্য্যোধন অর্থের দ্বারা আমাদিগকে বদ্ধ করেছে, সুতরাং আমারও কাপুরুষের ন্যায় কৌরব-পক্ষে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। তুমি আমার কাছে কি প্রার্থনা কর, বল। যখন মহাত্মা মধুসূদন তোমার মন্ত্রী, তখন তোমার জয়লাভে সংশয় কি? ধর্ম্মরাজ! যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়। অতএব আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তুমি সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাস্ত করবে।

যুধিষ্ঠির। দ্বিজোত্তম! আমি আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করি, তা শ্রবণ করুন। আপনি অপরাজেয়; আমি আপনাকে কিসে পরাজয় কর্ত্তে সমর্থ হব?

দ্রোণ। রাজন্! আমি সমরক্ষেত্রে ক্রুদ্ধচিত্তে শর বর্ষণ কর্ত্তে আরম্ভ কর্ল্লে কেউ আমাকে বধ কর্ত্তে সমর্থ হবে না। কিন্তু আমি সমরে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন অচেতনের ন্যায় অবস্থান করব, সেই সময় আমাকে নিহত কর্ত্তে পার্ব্বে। সত্যবাদী ব্যক্তির মুখে মহৎ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ কর্ল্লেই আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করব।

যুধিষ্ঠির। আচার্য্য! প্রণাম করি। আমি এখন মাতুল মদ্ররাজ শল্যকে প্রণাম করব এবং তাঁর অনুজ্ঞা গ্রহণ কর্ব্বো।

দ্রোণ। বেশ! ভালই ত; সেটাও কর্ত্তব্য বই কি।

যুধিষ্ঠির। (শল্যের নিকট উপস্থিত হ'য়ে প্রণামপূর্ব্বক) মাতুল! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হচ্ছি। আজ্ঞা করুন যেন শত্রুগণকে পরাস্ত কর্ত্তে পারি।

শল্য। মহারাজ! আমার অনুমতি গ্রহণ না কোরে সমরে প্রবৃত্ত হ'লে আমি তোমার পরাভব হোক ব'লে অভিসম্পাত কর্ত্তেম। যা হোক, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়েছি। ভাগিনেয়! আমি ত দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন কোরেই যুদ্ধার্থে এখানে এসেছি, সুতরাং তাঁর পক্ষ হ'য়ে যথাশক্তি যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। তোমার কি হিতসাধন কর্ত্তে হবে, বল।

যুধিষ্ঠির। মাতুল! আমার প্রার্থনা যে, আপনি সংগ্রামসময়ে সূতপুত্র কর্ণের তেজোহ্রাস করবেন।

শল্য। কুন্তীনন্দন! আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করব। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গমনপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, আমি বলছি, তোমার জয়লাভ হবে।

যুধিষ্ঠির। যে আজ্ঞে, মাতুল! (উচ্চৈঃস্বরে) যিনি আমার হিতসাধন কর্ত্তে বাসনা করেন, তিনি আগমন করুন, আমি তাঁকে বরণ করব এবং সাদরে অভিবাদন কোরে তাঁহাকে যুদ্ধার্থ অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রদান করব।

যুযুৎসু। (সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে) মহারাজ! আমি প্রীতিপূর্ব্বক আপনার পক্ষ হোয়ে কৌরবগণের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

যুধিষ্ঠির। ভ্রাতঃ! চল, আমরা সকলে একত্র হোয়ে তোমার ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যুদ্ধ করি। আমি তোমাকে যুদ্ধার্থে বরণ কর্ল্লেম; তুমি আমার নিমিত্ত যুদ্ধ কর। অমর্ষ-পরায়ণ দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন অচিরে নিহত হবে। স্পষ্টই বোধ হচ্ছে তুমি একাকী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ও পিণ্ড রক্ষা করবে।

"আর কি করিব!"

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"লোক-প্রকাশে পুজিলে তোমারে
লোকে ভণ্ড বলে চটে।
মানসে পূজিলে চোখে না দেখিলে
নাস্তিক এ নাম জগতে রটে।
দেখে শুনে মনে করিয়াছি সার,
সবে তুষ্ট করা ভবে সাধ্য কার,
পারে যে করুক চেষ্টা অনিবার,
অসম্ভব তাহা আমার নিকটে।
আপনার মনে ভাল যা' বুঝিব
করে যাব, কারো পানে না চাহিব,
বলুক লোকে যা বলে'—না শুনিব,
তাহে ভাল মন্দ ঘটুক যা ঘটে।"

তবু ধন চিন না যে মন।

লেখক—শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

(১)

ভাব সদা মন, সেই বিভু-ধন,
এমন রত্ন পাবে না কভু।
ভাব সে বিভবে, ডাক উচ্চরবে,
স্মর অনাদি অনন্ত প্রভু॥

(২)

আশা অভিলাষ ত্যজিয়া বিলাস,
পার যদি দেখ, দেখ মন।
একচিত্ত হয়ে, সেই নাম গেয়ে
ভুঞ্জে একে সবারি মিলন॥

(৩)

বাসনাই সদা অভাব-জন্মদা,
তাতে ঘোর দু'খ সমাগম।
বাসনা না পূরে, বেড়ে যায় দূরে,
এমনি আশা গো বিষম॥

(৪)

আশা-বাসা ত্যজ সদা বিভু ভজ,
(সেই) অমূল্যপদে শরণ লও।
দেখ না মজিয়ে সেই পদাশ্রয়ে,
কত সুখী অবিরত হও॥

(৫)

মন রে আমার! কর রে বিচার,—
নিত্য অনিত্য কেবা সে হয়।
পিপাসিত যেই জানিয়া কি সেই
মরীচিকা পানে কভু ধায়?

(৬)

তোমারি তাহাই, হয়েছে সদাই,
জাননা বুঝনা কিবা ধন।
ধন ধন করে খালি মর ঘুরে
তবু ধন চিন না যে মন॥

ভক্তি-কথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একমাত্র নামই উপায় এবং উপেয় স্বরূপ। শ্রেয়োলাভের যত কিছু উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে নামই শ্রেষ্ঠ উপায়। যতদিন জীবের আত্মরতি না জন্মিবে ততদিন নামকে উপায় মনে করিয়া আত্ম-রতিরূপ উপেয় সাধন করিতে হইবে। উপায় দ্বিবিধ, গৌণ উপায় ও মুখ্য উপায়। দান-ব্রতাদি শুভ কর্ম্ম গৌণ উপায়। কারণ, সেই সব কার্য্য করিতে করিতে বহুকাল পরে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে তবে শ্রদ্ধা জন্মে। নাম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই শ্রেয় সিদ্ধির হেতু। সরল প্রাণে কৃষ্ণ-নাম গান করিলে, অতীন্দ্রিয় সুখ আসিয়া চিত্তকে নাচায়। সেই নামানন্দ সুখের সহিত ব্রহ্মানন্দও সমান নহে। কৃষ্ণনামানন্দই অনন্ত ও মহৎ। অন্য সব শুভকর্ম্ম জড়াশ্রিত, নাম স্বতঃসিদ্ধ চিন্ময়। সাধুসঙ্গে নাম লইতে লইতে জড় বুদ্ধি দূর হয়, অনর্থ নিঃশেষ হইয়া তখন শুদ্ধ নাম প্রকাশ পায়। দৃঢ় শ্রদ্ধাসহকারে যিনি নাম লন, শীঘ্রই তাহার জিহ্বায় শুদ্ধ নামের উদয় হয়। ঐ নাম আত্মা হতে বহির্গত হইয়া মনে, প্রাণে, দেহে ব্যাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় মানব এই জীবনেই জীবন্মুক্ত হয়। তখন স্বতই অন্তর হইতে নাম স্ফুরিত হইতে থাকে। তাদৃশ ব্যক্তি নামী হতে অপৃথক্। শ্রেষ্ঠ ভক্তেরা এইরূপ অবস্থা সতত কামনা করেন। যে পর্য্যন্ত অনুরাগ না জন্মে, তাবৎকাল যত্নপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিবে। বিষয়াসক্ত মন নাম স্মরণকালে বিষয়ে ধাবিত হয়, এজন্য বিশেষ সতর্ক হইয়া নাম করিবে। অনন্যচিত্ত হইয়া নির্জ্জনে নাম করিতে করিতে ক্রমে নামে অনুরাগ জন্মে। নাম-গ্রহণে আলস্য, ঔদাসীন্য, প্রমাদ, যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। বৃথা কাল গত না করাই সাধু চরিত্রের লক্ষণ। এমতভাবে নাম জপ করিতে হইবে, যাহাতে জপ-সংখ্যা-বৃদ্ধি-স্পৃহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। কামিনী-কাঞ্চন, প্রতিষ্ঠাশা, জয়-পরাজয় ইত্যাদি বাসনায় যদি হৃদয় আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নাম গ্রহণে অনবধানতা জন্মে।

ক্রমে ক্রমে সেই সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া সৌভাগ্যবান বৈষ্ণবের আচরণ শিক্ষায় যত্ন করিবে। হরিক্ষেত্রে, হরিবাসরে ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবসহ

উৎসবে মত্ত হইবে। তাহাতে বিষয়-সুখ-বাসনা দূর হইয়া শ্রেষ্ঠ রস হৃদয়ে উদিত হইবে। জীবনরক্ষার উপযুক্ত পানাহার করিবে, ভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু তাহা পরিত্যাগ করিবে। আর এই ভাব মনে করিবে যে, কৃষ্ণই আমার রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই আমার প্রতিপালক। তিনি যাহা করাইতেছেন, তাহাই করিতেছি। পুত্র, দারা, দেহ, গেহ প্রভৃতিতে আমার বোধ ত্যাগ করিবে। আমি সুখে থাকি আর দুঃখে থাকি, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি সতত কৃষ্ণদাস, আমার সুখ-দুঃখ-ভোগ কৃষ্ণেচ্ছায় হইবে, এই ভাব মনে রাখিতে হইবে। "আমি" "আমার" ভাব ত্যাগ করিয়া নামের শরণাগত হইবে! নাম সর্ব্বোত্তম, নামই গুরু, বিশুদ্ধ-চিন্ময়-স্বরূপ। অন্যান্য শুভকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া শরণাগত হইয়া সাবধানে যে নাম স্মরণ করে, জগতে সেইজনই ভাগ্যবান। এমত ব্যক্তির কৃষ্ণেচ্ছায় শীঘ্রই সাধনদশা শেষ হয়। পরে ভাবাবস্থা, তাহা হইতে প্রেম-লাভ হয়। প্রেমদশাই চরম পুরুষার্থ, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। জ্ঞানে মুক্তি, কর্ম্মে ভোগ, আর নির্ম্মল সাধনে সুদুর্লভা কৃষ্ণভক্তি জন্মে। সাধনের নৈপুণ্যে প্রেমফল লাভ হয়। সাধারণ আলঙ্কারিকদিগের নির্ণীত যে রস, তাহা প্রকৃত রস নহে; বিকৃতি মাত্র। প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত যে শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্ব, তাহাই রস। আত্মারামগণ প্রকৃতির সীমা পার হইয়াও শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বের বিচিত্রতা দেখিতে পান না। সুতরাং তাঁহারা নীরস। শুদ্ধসত্ত্বে চিদ্বিশেষ আছে তাহাই নিত্যরস। সেই শুদ্ধসত্ত্বে যে অখণ্ড পরমব্রহ্ম বস্তু, তাহা স্বভাবতঃ শক্তি ও শক্তিমদ্‌রূপে প্রতিভাত হয়। শক্তিমানের তত্ত্ব দুর্লক্ষ্য। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই। শক্তিমান সর্ব্বদাই স্বেচ্ছাময় পুরুষ। শক্তি তদ্‌ভাব-প্রকাশিনী। চিৎ, জীব ও মায়া এই তিনভাবে প্রকাশ।

নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ভেদে জীব দুইপ্রকার। নিত্যবদ্ধ জীবগণের মধ্যে কতকগুলি অন্তর্মুখ, অর্থাৎ কৃষ্ণাভিমুখ, আর অধিকাংশই বহির্মুখ, অর্থাৎ বিষয়াসক্ত। অন্তর্মুখ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবান, তাঁহারা সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। যাঁহারা অতি ভাগ্যবান হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কর্ম্ম বা জ্ঞানমার্গে বহু দেবতারাধন বা নির্ব্বিশেষ অবস্থার আশা করেন। সেই শুদ্ধতত্ত্বগত অখণ্ডরস, কৃষ্ণাদিনামরূপে পুষ্পকলিকার ন্যায় বিশ্বে কৃষ্ণ-কৃপায় প্রচারিত হইয়াছে। সেই নামরূপ কলিকা স্বল্প ফুটিতে ফুটিতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময় রূপ বিকাশিত হয়। পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের সমস্ত গুণ প্রকাশ পায়। নাম-কুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে

কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্যলীলা অতীত হইয়াও জগতে উদিত হয়। কৃপাক্রমে জীবের সত্তাগত ক্ষুদ্র সম্বিৎ ও হ্লাদশক্তিতে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী সম্বিতের সমবেত সার আসিয়া ভক্তিরূপিণী বৃত্তি হইয়া থাকে। সেই সর্ব্বেশ্বরী শক্তি আবির্ভূতা হইয়া কৃষ্ণনামে রসের সামগ্রী সকল প্রকাশ করেন। রসে স্থায়িভাব নামে একটি সিদ্ধভাব আছে, তাহার নাম রতি। আর চারিটি ভাব-সংযোগে রতিই রসত্ব লাভ করে। সেই চারিটি ভাব যথা, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী। আলম্বন, বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দ্বিপ্রকার। যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি আশ্রয়; কৃষ্ণ বিষয়। কৃষ্ণের রূপগুণাদি, উদ্দীপন ভাব। আলম্বন ও উদ্দীপনাত্মক বিভাবের কার্য্যের সঙ্গে যে সকল ফলোদয় হয়, তাহাই অনুভাব। পরে সেই সকল ভাব গাঢ়তা লাভ করিয়া সাত্ত্বিক বিকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারী কার্য্য করিতে থাকে। উক্ত রসই ব্রজরস। উহাই সর্ব্বসার এবং জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ।

অন্তর্মুখ জীবগণের মধ্যে ভক্ত্যুন্মুখ মানবই শ্রেষ্ঠ। পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিবলে মানবের ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হয়। শ্রদ্ধা উদিত হইলে শুদ্ধ সাধুগুরু লাভ হয়। গুরু-কৃপায় যুগলনামরূপ মহামন্ত্র প্রাপ্তি ঘটে। শ্রদ্ধা হইলেও প্রথম বিষয়-বাসনা প্রতিবন্ধক থাকে। তাহা অতিক্রম করিয়া নামবল লাভ করিবার জন্য একটি সাধনক্রম শ্রীগুরুদেব দিয়া থাকেন। সংখ্যা করিয়া তুলসী মালায় নাম স্মরণ বা কীর্ত্তন, সেই উপাসনা-ক্রমই সকল লাভের মূল। সুতরাং প্রথমে একাগ্র হইয়া নির্জ্জনে নাম স্মরণ করিবে। ক্রমে নাম-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। নামের নৈরন্তর্য্যে বিষয়-বাসনা-প্রতিবন্ধক তিরোহিত হইবে। ভক্তিসাধনে দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। একটি অর্চ্চনা-প্রবৃত্তি, অপর স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি। উভয়ই সমীচীন হইলেও স্মরণ, কীর্ত্তন প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রধান। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে, স্মরণ, শ্রবণ, কীর্ত্তন এই তিনেরই অনুশীলন উহাতে হয়। যাহার নামে ঐকান্তিকী রতি হয়, সে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে থাকে। নামের সঙ্গে সঙ্গে সেবা, নম্রতা, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন উপনীত হয়। বিষয়ী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই তিনজনই বহির্মুখ। কারণ তিন জনই স্বার্থসাধনে সচেষ্ট। এ দেহের ইন্দ্রিয়-তর্পণই বিষয়ীর চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়-সুখই কর্ম্মীর উদ্দেশ্য। নিজের সমস্ত কষ্ট দূর করাই জ্ঞানীর উদ্দেশ্য। এই তিন পদ অতিক্রম করিয়া জীব অন্তর্মুখ হয়। অন্তর্মুখ, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্মুখ, অন্য দেবাদির সেবা

ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন। কিন্তু, স্ব-স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ এবং ভক্তস্বরূপ অনভিজ্ঞ। কিন্তু মূঢ় হইলেও তাহাতে স্বনিষ্ঠ প্রবৃত্তি থাকায় শুদ্ধ বৈষ্ণব না হইলেও বৈষ্ণব-প্রায়। মধ্যম অন্তর্মুখ, শুদ্ধ বৈষ্ণব ও পরিনিষ্ঠিত উত্তম অন্তর্মুখের ত কথা নাই। তিনি নিরপেক্ষ নাম-নামীতে অভেদ বুদ্ধি ব্যতীত অন্তর্মুখ হইতেই পারেন না। অন্তর্মুখ মাত্রেরই ভগবানে অনন্য শ্রদ্ধা আছে, সুতরাং নামের অধিকারী। অন্তর্ম্মুখ ভক্ত প্রথমে অপরাধ বর্জ্জন করিয়া নাম স্মরণ ও কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্যসাধন করিবেন। স্পষ্ট স্পষ্ট নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন। নাম স্পষ্ট স্থির ও সুখকর হইলে শ্যাম-সুন্দরের রূপ ধ্যান করিবেন। হস্তে মালা-সংখ্যা মনে বা মুখে কৃষ্ণনামানু-সন্ধান করিতে করিতে নামার্থ যে রূপ তাহারা চিন্নয়নে দর্শন করিতে থাকি-বেন; অথবা শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া দর্শন ও নাম স্মরণাদি করিবেন। নামের সহিত রূপ একত্ব প্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণগুণ সকল স্মরণে আনিতে অভ্যাস করিবেন। ইহা অভ্যস্ত হইলে, প্রথমে মন্ত্রধ্যানময়ী লীলার স্মরণ করিয়া তাহার নামরূপগুণের সহিত ঐক্য করিয়া লইবেন। এই সময়েই নাম-রসের উদয় হয়। মন্ত্রধ্যানময়ী ভাবনা দৃঢ় হইলে, স্বারসিকী অষ্টকাললীলা ধ্যান করিতে করিতে সম্পূর্ণ রসোদয় হইবে। এই সাধনের আরম্ভকালে সাধক প্রায় কনিষ্ঠভাব প্রাপ্ত। অনতিকালবিলম্বেই সাধক উত্তম সাধুসঙ্গে মধ্যম ভক্ত হইয়া অবশেষে উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামা-ভ্যাস হয়। নামাভ্যাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধনামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবা-ধিকার হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচটী রস হইলেও শৃঙ্গার রসই চরম রস। এই রসের অধিকারিগণই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পরমানু-গৃহীত। এই রসে কৃষ্ণের অনেক যূথেশ্বরী থাকিলেও শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী সকলের প্রার্থনীয়া। তিনি স্বয়ং স্বরূপ শক্তি এবং অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্গনা তাঁহার কায়ব্যূহ। শ্রীমতীর যূথমধ্যে গণিত হওয়াই রসিক মাত্রের প্রয়োজন। গোপীর আনুগত্য বিনা ব্রজে কৃষ্ণ-সেবা-লাভ হয় না। সুতরাং শ্রীমতীর দলে ললিতাদির গণে প্রবিষ্ট হওয়ারই প্রয়োজন।

এই প্রণালীতে রসসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, সাধন, ভজন ও সিদ্ধি পরস্পর নিকট হইয়া পড়ে। অত্যল্পদিনের মধ্যেই স্বরূপ সিদ্ধির উদয় হয়। যূথেশ্বরীর কৃপায় কৃষ্ণেচ্ছা সহজে হয়। তাহা হইলেই কৃষ্ণ-বহির্মুখতানিবন্ধন যে লিঙ্গ-দেহ তাহা অনায়াসেই নষ্ট হয় এবং জীব বিশুদ্ধ বস্তুস্বরূপে ব্রজে বাস করেন।

এই পর্য্যন্ত জীব-গতি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। ইহার পর যে ভাগবত অবস্থা তাহা আর ব্যক্ত করা যায় না। তাহা ভগবৎ কৃপাবলে অনুভূত হয় মাত্র। শৃঙ্গার রসকেই উজ্জ্বল রস বলা যায়। চিজ্জগতে এই তত্ত্বই পরম উজ্জ্বল। পার্থিব ব্রজরস অবলম্বনে ইহা লব্ধ হয়। রায় রামানন্দ বলিয়াছেন, "অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার। সিদ্ধ দেহে চিন্তি কর তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ। গোপী-অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেই নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে।" উজ্জ্বলরস সাধিতে যাঁহার প্রবৃত্তি, তিনি ব্রজের গোপী-আনুগত্য অবশ্যই স্বীকার করিবেন। জীব পুরুষভাবে শৃঙ্গার রসের অধিকারী হন্ না। ব্রজগোপী-স্বরূপ লাভ করিলে কৃষ্ণভজন হয়। একাদশ প্রকার ভাব গ্রহণ করিলে, তবে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয়। সম্বন্ধ, বয়স, নাম, রূপ, যূথপ্রবেশ, আজ্ঞা, বাসস্থান, সেবা, পরাকাষ্ঠা, পাল্যদাসীভাব। সাধক জগতে যে আকারে থাকুক না কেন, হৃদয়ে এই একাদশটী ভাব গ্রহণ-পূর্ব্বক ভজন করিবেন। এই একাদশভাব সাধনকালে সাধকের পাঁচটী দশা ক্রমশঃ উদয় হয়। শ্রবণদশা, বরণদশা, স্মরণদশা, আপন দশা ও সম্পত্তি দশা। "সেই গোপী-ভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদ-ধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়। ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাব-যোগ্য পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে।" এই বাক্য দ্বারা রায় রামানন্দ এই শিক্ষা দেন যে, উজ্জ্বল রস সাধিত হইলে সাধকের গোপীদেহ-প্রাপ্তি আবশ্যক।

কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া যখন এই ভাবে রতি হয়, তখন সদ্গুরুর নিকট সেই ভাব শিক্ষা করিতে হয়। শ্রীগুরুর মুখে তত্ত্ব-শ্রবণই শ্রবণদশা। সাধক ব্যাকুল হইয়া সেই তত্ত্বগত ভাব অঙ্গীকার করেন, তাহাই বরণদশা। রসস্মরণ দ্বারা সেই ভাব অভ্যাস করাকে স্মরণদশা কহে। আত্মাতে সেই সুন্দরভাব আনয়ন করাকে আপনভাব বা প্রাপ্তিদশা কহে। এই পার্থিব অনিত্য সত্তা হইতে পৃথক হইয়া সেই বাঞ্ছিত স্বরূপে নিশ্চল হওয়াকে সম্পত্তি-দশা কহে। গুরুদেব শিষ্যের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি অবগত হইয়া যখন বুঝিবেন শিষ্য শৃঙ্গাররসের অধিকারী, তখন তাহাকে শ্রীরাধার যূথে, ললিতাগণ মধ্যে সাধকের সিদ্ধ মঞ্জরীস্বরূপ অবগত করাইবেন। সাধকগত একাদশভাব ও সাধ্যগত অষ্টকালীয় লীলা দেখাইয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিবেন। সাধকের সিদ্ধ দেহগত নাম, রূপ, গুণ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবেন। সাধিকা

যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া যে পতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয় তাহা বলিয়া দিবেন। বেদ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীযূথেশ্বরীর পাল্যদাসীভাব ও তাঁহার অষ্টকালীয় নিত্য সেবা দেখাইয়া দিবেন। সাধিকা সেইভাব বরণ করিয়া স্মরণদশায় প্রবেশ করিবেন। ইহাই সাধকের ব্রজে গোপী জন্ম। যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" এই ভাগবত আজ্ঞাই এস্থলে পালনীয়। স্বাভাবিক রুচি স্থির না হইলে উপদেশ শুদ্ধ হয় না। প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কাররূপ দ্বিবিধ সুকৃতিজনিত প্রবৃত্তিকেই রুচি বলা যায়। জীবাত্মার এই রুচি নৈসর্গিক। যাঁহাদের শৃঙ্গাররসে রুচি নাই, দাস্য বা সখ্যে আছে, তাঁহারা সেই সেই ভাবে উপদিষ্ট হইবেন, নতুবা অনর্থ ঘটিবে। মহাত্মা রামানন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই, এই জন্যই তাঁহাকে প্রথম সখ্যরসে প্রবেশ করান হইয়াছিল। পরে শ্রীজীবের কৃপায় তাঁহার স্বরুচিসম্মত ভজন লাভ হয়; ইহা লোক-প্রসিদ্ধ আছে।

স্মরণদশাকে আপনদশায় প্রাপ্তিযোগ্য করিয়া সাধনা না করিলে, কোন ক্রমেই সিদ্ধি হয় না। এই অনির্ব্বচনীয় ভজনতত্ত্বে কোন প্রকার কর্ম্মাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর বা যোগাড়ম্বর নাই। বাহ্যে কেবল নিবৃত্তি ভাবের সহিত নামানু-শীলন, কিন্তু অন্তরে মহারসের মহাড়ম্বর থাকে। যে সকল সাধক বাহ্যাড়ম্বরে ব্যস্ত বা অন্তর স্থির করিতে যত্ন করেন না, তাঁহাদের স্মরণ আপনযোগ্য হয় না। সুতরাং বহু জন্ম সাধনেও সিদ্ধি হয় না। এই ভজনই সহজ ভজন, কিন্তু ইহাতে কোন উপাধি উপস্থিত হইলে সাধনান্তর হইয়া পড়ে, সহজ সাধন হয় না। শ্রীগুরুর নিকট সরল অন্তরে এই ভজনের বিশুদ্ধতা ও উপাধি বুঝিয়া লইবেন। জীবের চিৎস্বরূপগত একটি চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ সিদ্ধসত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়া আছেন। শুদ্ধ গুরুকৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ পরিচয় লাভই পরম সহজ বস্তু। বদ্ধ জীবের ভক্তিসাধনেই সেই ক্রম আছে। তন্মধ্যে একটী বৈধক্রম, একটি রাগানুগ সাধ্যক্রম। বৈধক্রম ও রাগানুগক্রম এই উভয় প্রথম পৃথক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ভাব উপনীত হইলে আর পার্থক্য থাকে না। শাস্ত্রবিধিশাসনে বৈধক্রমের উদয় হয়। ব্রজজনের ক্রিয়ায় লোভ হইতে রাগানুগক্রমের উদয়, সুতরাং প্রথম ক্রমটি সাধারণ, দ্বিতীয়টী বিরল। গাঢ়াসক্তি থাকিলে সবই সহজসাধ্য হয়। স্মরণ অবস্থায় প্রথমে কেবল স্মরণ, অর্থাৎ নিজের একাদশভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক অষ্টকাল সেবা ভাবনা।

তখন নিরবচ্ছিন্ন সিদ্ধভাব জন্মে না। কখন কখন স্মরণ হয়; কখনও বিক্ষেপ। স্মরণ করিতে করিতে স্মরণের স্থিরতা-সাধন, ধারণা ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ ধারণা করিতে করিতে ধ্যান হয়। অনুস্মৃতি সর্ব্বকালে ধ্যান। অনন্য-ভাবে কৃষ্ণলীলা-ধ্যান, এই সমাধিরূপ স্মরণ হইতে হইতেই আপন দশা উপস্থিত হয়। স্মরণে এই পঞ্চদশা অতিক্রম করিতে অনিপুণ ব্যক্তির পক্ষে বহু যুগ যাইতে পারে, কিন্তু নিপুণ ব্যক্তির অল্পদিনেই চরিতার্থতা জন্মে। ভাবো-পস্থিতি দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হয়, কিন্তু সিদ্ধদেহে অভিমান প্রবল হয়। তখন স্ব-স্বরূপেক্ষণে ক্ষণে ব্রজবাস হয়। স্ব-স্বরূপগত রাধাকৃষ্ণ-সেবায় অতি সুখোদয় হয়। এমন কি অনেকক্ষণ ব্রজধাম দর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমানে অবস্থিতি এবং চিদ্বিলাসগত লীলার স্ফূর্ত্তি হয়। এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার অবশ্য হইবে। এবং তদিচ্ছাক্রমে হঠাৎ স্থূলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া যাইবে। পাঞ্চভৌতিক দেহ পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ বিলয় পায়। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃতভাবে উদয় হইয়া চিদ্ধামে যুগল-সেবা করিতে থাকে। এই অবস্থায় সাধন সিদ্ধভাবে নিত্য সিদ্ধদিগের সালোক্য লাভ হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যশ্রদ্ধোদিত ভক্তির সহিত নামভজনই সুলভ ধন। নাম-ভজনে সহজে স্বল্পকালে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিলাভ ঘটে। কেবল কুসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধু সঙ্গে ভজন করিবে। প্রেম একটী পরমশুদ্ধ চিদ্ধর্ম্মফলক বিশেষ। সাধু চিত্তই তদ্‌গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ।

অসাধুচিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীব-হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। অতএব যিনি নাম-সাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গ, নির্জ্জন-বাস, নিজের সুদৃঢ়ভাব। জীব সকল নিজের সুকৃতিবলেই ভক্তি লাভ করেন। নামে রুচিই ভক্তিলাভের উপায়। ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য মহাপ্রভু, নামকে যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম। এই ভীষণ কলিযুগে এত সহজ ও নিশ্চিত শ্রেয়ঃসাধন নাম-ভজন ব্যতীত আর কিছুই উপযুক্ত নহে। বদ্ধ, পতিত, পাপরত, স্বল্পায়ু কলির জীবের পক্ষে নাম-ভজনতুল্য সহজ ও শ্রেষ্ঠ মোক্ষোপায় হইতে পারে না। যিনি স্বতই জীবের প্রতি কৃপালু, সেই ভগবানই স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এই সহজ পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। চাই বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, দৃঢ়প্রত্যয়, নাম-নামীর অভেদ জ্ঞান।

নামকীর্ত্তনই কলিযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে নরাধম নাম শ্রবণে বিমুখ, তাহার কর্ণচ্ছিদ্র বৃথা গহ্বরতুল্য। যিনি শ্রীবিগ্রহ-সম্মুখে প্রণাম না করেন, তাঁহার মস্তক কিরীট-ভূষিত হইলেও প্রস্তরাদির ন্যায় ভারভূত। হরিনামশ্রবণে যাহার হৃদয় দ্রব না হয়, সে ব্যক্তি কঠিন পাষাণতুল্য। নামই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, ইহা বিশ্বাস করিয়া নামাশ্রয়ই শ্রেয়োলাভের উপায়।

যাহারা সংসার-নিবৃত্তির হেতু ভগবানকে উপেক্ষা করিয়া অন্য তুচ্ছ ফলের জন্য তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাহারা তাঁহার মায়ায় প্রতারিত হয়। জড় জগতের অতীত ভগবানের সেবা দ্বারা তাঁহার চরণে তীব্র রতিরসের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তনরূপ বৈকুণ্ঠে যাবার পথ ভাগ্যহীন ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য। ভগবানের ভক্তগণ কখনও নষ্ট হয় না। কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করে না। যেহেতু তাহারা ভগবানকে, আত্মা, সুহৃদ্, সুত, সখা, গুরু ও ইষ্টধন বলিয়া রসমার্গে ভজনা করেন। তিনি সেই সেই ভাবে তাহা-দিগকে দেখা দিয়া থাকেন। জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বারা উদ্দীপিত ভক্তি ভগবানকে বশীভূত করে। সংসার-প্রবিষ্ট ব্যক্তির যাহাতে ভগবানে ভক্তি জন্মে তাহাই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা বেদ আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যাহাতে কৃষ্ণে অপ্রাকৃত রতি জন্মে তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা শ্রবণ দ্বারা কৃষ্ণকথামৃত পান করেন। এবং ক্রমশঃ তাঁরা চরণ-কমলের দিকে অগ্রসর হন। তীব্র ভক্তিযোগে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করাই নিঃশ্রেয়স-সাধনের মুখ্য পথ। স্বীয় পাদমূলভজনকারী প্রিয় ব্যক্তি, অনন্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অনবধানাচরিত বিকর্ম্ম ধ্বংস করিয়া ফেলেন। এজন্য ভক্তের কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যাঁহারা অচ্যুত-পাদপদ্ম সেবা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ প্রেম-রূপ পরা শান্তি লাভ করেন। অচ্যুত-পাদপদ্ম-সেবাই নিত্য ধর্ম্ম। তাহাতে কিছুতেই ভয়ের কারণ থাকে না। স্বর্গ, অপবর্গ প্রভৃতি যে সকল সম্পদ পৃথিবীতে বা [illegible] আছে, সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের চরণার্চ্চনের ফল।

(ক্রমশঃ)

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড
৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩৩২ সাল।
১৮৪৭ শকাব্দাঃ

উচ্ছ্বাস।

(আকাশের প্রতি)

লেখক—সম্পাদক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১০)

হে আকাশ, বল দেখি কাহার বিধানে,
সক্ষম সবল দুর্ব্বলের নির্য্যাতনে?
মৃগেন্দ্র ভোজন করে যত মৃগকুল,
মৎস্য মৎস্য-ভয়ে সদাই ব্যাকুল।
দয়া মায়া একেবারে করি বিসর্জ্জন,
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মনুর নন্দন,
করিছে জীবের সদা বিনাশ-সাধন,
হিংসাতেই সদা তার হরষিত মন।

হে আকাশ, এই প্রাণি-বধের বিধান,
অহোরহ বিচলিত করে মম প্রাণ ;
বিশ্বপতি-বিশ্বপ্রেমে হয়ে সন্দিহান,
দুঃখে ক্ষোভে সদা আমি থাকি ম্রিয়মাণ

নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(১১)

হে আকাশ, ধরাধামে যত অবিচার
অনাচার দেয় ব্যথা মনেতে আমার ;
কভু ভাবি মনে মনে থাকিলে শকতি,
গড়িতাম নূতন করিয়া বসুমতী॥
সূর্য্য মম দহিত না কভু জীবগণে,
নিত্য পূর্ণ চন্দ্র মম শোভিত গগনে,
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কভু না হইত,
প্রাণিগণ অন্নাভাবে কভু না মরিত ;
পৃথ্বী করিত না কভু অগ্নি উদ্গীরণ,
কাঁপিত না ভূমি কভু হইয়া ভীষণ,
বহিত না বায়ু কভু হইয়া প্রবল,
তুষারে মণ্ডিত কভু হ'তনা অচল,
জীবগণে পরস্পরে হিংসা না করিত,
অকালে কালের গ্রাসে কেহ না পড়িত,
থাকিত না মরুভূমি,—সর্ব্বত্র উর্ব্বরা,
ধন-ধান্যে পূর্ণ সদা হ'ত বসুন্ধরা,
সত্যের হইত সদা সর্ব্বত্র বিজয়,
মিথ্যার সর্ব্বত্র সদাকাল পরাজয়।
না থাকিত প্রবঞ্চনা চৌর্য্য ব্যভিচার,
সকলে ধার্ম্মিক হ'ত, অতি সদাচার।

এইরূপ করিতাম নূতন সৃজন,
সখে, জান তুমি, নাহি জানে অন্যজন।
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

বঙ্গসাহিত্যের উপর বৈষ্ণব ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভাব।

লেখক—শ্রীবিনোদলাল ভদ্র এম, এ, বি, এল।

জগতে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ও উন্মেষ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মান্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট। বিশেষ কোন কথিত ভাষার উৎপত্তি-কাল নির্ণয় করা এক রকম অসম্ভব বলিয়াই সকলে স্বীকার করেন। কিন্তু কথিত ভাষা যখন লিখিত ভাষায় পরিণত হয়, তখন তাহার কাল নির্দ্দেশ করা অনেক সময় সম্ভবপর বটে। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে তিনি যে ভাবে ও যে ভাষায় জনসাধারণকে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা যেন সেই ভাবেই লিখিত ও প্রচারিত হয়। এই কারণেই পালিভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের উপদেশ ও লীলা লোক-সমাজে প্রচার-উপলক্ষে বাঙ্গালা ভাষার বিকাশ আরম্ভ হইল। চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবের পুর্ব্বেও কয়েকটি কারণে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধিত হইতেছিল।

প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। তখন বাঙ্গালায় বুদ্ধদেবের নাম ছিল ধর্ম্ম ঠাকুর। বাঙ্গালায় নানাস্থানে যে ধর্ম্ম-পূজার প্রচলন আছে তাহা বুদ্ধ-উপাসনারই শেষ চিহ্ন। একাদশ শতাব্দীতে রাজা ধর্ম্মপালের শাসন-সময়ে রমাই পণ্ডিত নামে কোন এক ব্যক্তি একখানি পদ্ধতি রচনা করেন। তাহাতে আছে 'সিংহলে শ্রীধর্ম্মদেব বহুত সম্মান' অর্থাৎ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রভাব। অতঃপর বৃন্দাবন দাস তাঁহার প্রণীত চৈতন্য ভাগবতে একস্থানে লিখিয়াছেন যে সাধারণ লোকে যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপালের গীত

শুনিবার জন্য উৎসুক। ইহারা সকলেই বৌদ্ধ নৃপতি ছিলেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারদের মুখে তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তন শুনিতে পাওয়া যায় না; তথাপি তাঁহাদের সুশাসন ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধারণ লোকের মনে তাঁহাদের প্রভাব অনেকদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। "ধান ভানিতে মহীপালের গীত" বলিয়া যে প্রবাদ এখনও প্রচলিত আছে তাহাতেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। দিনাজপুর অঞ্চলে এখনও সময়ে সময়ে একমাস ব্যাপিয়া মহীপালের গান হইয়া থাকে। গ্রিয়ারসন সাহেব ১৮৭৬ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মাণিকচাঁদ ও গোপীপালের গান প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের প্রথমাংশ বুদ্ধদেবের দ্বারা আলোকিত। ঐ সময়ের একখানা কাব্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি—ইহার নাম ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য। এই গ্রন্থে লাউসেনের কীর্ত্তি বর্ণিত আছে। পঞ্জিকাতে কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে লাউসেনের নামোল্লেখ আছে। গ্রন্থখানি যদিও কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি উহা পাঠ করিলে বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ আকার ধারণ করে। ঐ গ্রন্থে তাৎকালিক সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে ভক্তির আবেগ ও ভাবোন্মাদ অপেক্ষা সত্যানুরাগ, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি চরিত্রবলের দৃষ্টান্তই অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট। ইহার কারণ এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে ভক্তির স্থান ছিল না। বঙ্গসাহিত্যের পরবর্ত্তী ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব ভক্তি ও ভাবের রাজ্যে। এই ভক্তির স্রোত যে কেবল বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেই প্রবল তাহা নহে—কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয় বীর রামচন্দ্রকে ভক্তজন-মনোলোভী কোমল ও মধুরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গলের সমাজে সত্যানুরাগ ও চরিত্রবানের কিরূপ আদর ছিল তাহা হরিহর বাইতির চরিত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। মন্ত্রী মহম্মদ যখন তাহাকে লাউসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলেন, তখন সে প্রথমে অস্বীকার করিল। কিন্তু মন্ত্রী যখন তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া ভয়-প্রদর্শন করিতে লাগিল; তখন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে বলিয়া স্বীকার করিল। হরিহর যখন সাক্ষ্য দিতে যাইতেছে তখন সে যেন শুনিতে পাইল—"হরিহর, আমাদের নরকে ডুবালি আমাদের যে এখনও উদ্ধার হয় নাই—আমরা যে তোর মুখ চেয়ে আছি।" হরিহর মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারিল না। সে মন্ত্রীকে বলিল—'আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না, আমাকে শূলে দাও।' হরিহর ঐ গ্রন্থের একটি সাধারণ চরিত্র

মাত্র—ইহাতেই বুঝা যায় যে তখন সমাজে সত্যনিষ্ঠা ও চরিত্রবলের আদর্শ কত উচ্চ ছিল।

পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অন্তর্হিত হইয়া দেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা দেখিলেন যে সমাজে হিন্দু-ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বৌদ্ধপ্রচারকদিগের ন্যায় সাধারণ চলিত ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালার কুটীরবাসী জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। এই জন্য তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় শনির পাঁচালী, শিবের গান প্রভৃতি রচনা করিয়া কুটীরগুলিকে আত্মসাৎ করিলেন। যদিও এইভাবে সাধারণ লোকের নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালা ভাষাকে গ্রহণ করিলেন, তথাপি ইহার এখনও রাজদ্বারে সম্মান হইল না। যখন সংস্কৃতভাষা তাহার ত্রোটকচ্ছন্দ, অনুপ্রাস প্রভৃতিতে ভূষিত হইয়া রাজসভায় সুধীগণের চিত্ত বিনোদন করিতেছিলেন, তখন দীনা বঙ্গভাষা বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে মেঠো সুরে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিলেন।

১২০৩ সালে যখন বখ্‌তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিলেন, তখন বাঙ্গালাভাষার পক্ষে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। মুসলমান রাজারা এই দেশেই স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করিলেন। হিন্দুর ধর্ম্ম, নীতি, আচার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে নিহিত থাকায় তাঁহারা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে কিছুদিন বাস করিয়া তাঁহারা চলিত ভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেই হিন্দুর ধর্ম্মকাহিনী প্রভৃতি চাহিলেন এবং তাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থগুলির অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করিলেন।

হুসেন সাহ মালাধর বসু দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদ করাইয়া তাঁহাকে গুণরাজ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। নসরুৎসা সম্বন্ধেও কথিত আছে যে তিনি 'রচিলেন পাঁচালী।' পরাগল খাঁ বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই সময়ে জনৈক কবি লিখিয়াছেন পরাগল খাঁই কৃষ্ণ। তিনি মগদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত চট্টগ্রামে গিয়া তথায় কবীন্দ্র পরমেশ্বরের দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুবাদ করান। তাঁহার পুত্র ছুটী খাঁ মহাভারতের অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করান। মুসলমান রাজারা এইভাবে পথ-প্রদর্শন করিলে হিন্দু রাজারাও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিলেন। তখন তাঁহাদের নিয়োগে কৃত্তিবাস রামায়ণ ও কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ

করেন। সুতরাং দেখা যায় যে বর্ত্তমানযুগে যখন বঙ্গসাহিত্যের নবাভ্যুত্থানের মূলে খ্রীষ্টান পাদরীদের সহায়তা বর্ত্তমান তেমনি মধ্যযুগেও বঙ্গসাহিত্যের অভ্যুত্থান মুসলমান বাদসাহগণের সাহায্যে ঘটিয়া ছিল। তবে মুসলমানদিগের সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের আর একটুকু সম্পর্ক আছে- সে সম্পর্ক ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্পর্ক। মূলে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থান মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবের সহিত জড়িত।

নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যখন দেশের মধ্যে ক্ষীণ হইয়া আসিল, তখন শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত শৈবধর্ম্ম তাহার আসন গ্রহণ করিল। শৈবধর্ম্মের মূলমন্ত্র 'শিবোঽহম্' অর্থাৎ আমাতে ও শিবে প্রভেদ নাই। সুতরাং শৈবধর্ম্মে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের স্থান নাই। কিন্তু সাধারণ লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ব্যক্তিগত পরমেশ্বর ভিন্ন চরিতার্থ হয় না। তাহারা এমন একজন দেবতা চায় যাহাকে ভক্তি করা যায়, পূজা করা যায়, যাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করা যায় ও বিপদে আপদে যাঁহার শরণাগত হওয়া যায়। মুসলমানেরা আসিয়া জনসাধারণের সমক্ষে এই ব্যক্তিগত পরমেশ্বরের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঈশ্বর জীব হইতে পৃথক। তিনি পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার বিতরণ করেন। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকেরাও শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিতর দিয়া জনসাধারণের নিকট সেই ব্যক্তিগত পরমেশ্বর আনিয়া দিলেন। এই উভয় সম্প্রদায়ই শৈবধর্ম্মের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিল এবং মুসলমান ধর্ম্মের আক্রমণ হইতেও সমাজকে রক্ষা করিল। শিব নিশ্চেষ্ট দেবতা, তাঁহার ভক্ত চাঁদ সদাগর কত যন্ত্রণা কত লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, কিন্তু শিব তাঁহার জন্য কিছুই করিলেন না। কিন্তু শাক্তের চণ্ডী ও বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগত-প্রাণ। চণ্ডীকাব্যে দেখিতে পাই যেখানে তাঁহার ভক্ত কষ্টে পড়িয়াছেন সেইখানেই চণ্ডী নিজে আসিয়া ভক্তকে কোলে লইয়াছেন। বৈষ্ণব ও শাক্তে এখন যতটা বিরোধ দৃষ্ট হয়—পূর্ব্বে তাহা ছিল না। উভয়ের মধ্যেই ব্যক্তিগত ঈশ্বর প্রত্যক্ষ এবং উভয়েই বেদান্তবাদী শৈবধর্ম্মের প্রতিকূলে। তবে শাক্তধর্ম্ম কর্ম্ম-প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্ম ভাব-প্রধান। এই প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে মুসলমান ধর্ম্মের দেখাদেখি বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্মের নূতন সৃষ্টি হইল। বেদে উভয় ধর্ম্মেরই উল্লেখ আছে এবং ব্যক্তিগত পরমেশ্বরের কথাও বরাবরই হিন্দুধর্ম্মে ছিল। তবে কালের গতি অনুসারে হিন্দুধর্ম্মের এক একটা দিক বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে অদ্বৈতবাদই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; পরে যখন মুসলমানধর্ম্মের আক্রমণে হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম

হইল, তখন ব্রহ্মবাদী বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্ম প্রধান স্থান অধিকার করিয়া সমাজকে বিপ্লব হইতে রক্ষা করিল। এই যে শৈব ও শাক্তধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম-কলহের সূত্রপাত হইল, ইহাতে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন আপন দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কাব্য গীত প্রভৃতি রচনা করিতে লাগিলেন। শিবের গীত, মনসার গীত প্রভৃতি উহার উদাহরণ।

শাক্তধর্ম্মের পর, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব। বৈষ্ণবধর্ম্ম ভাষায় ও সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই পরিস্ফুট হইবে। আজানুলম্বিত বাহু, গজরাজগতি, মরাল গমন প্রভৃতি কথাগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিত। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক ছিল, বাঙ্গালা সাহিত্যে সেগুলি অস্বাভাবিক এবং আবর্জ্জনা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল পুথিগত উপমা ও বিশেষণের ভারে নবীনা বঙ্গভাষা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাবের বন্যায় ভাষার এই সব আবর্জ্জনা ভাসিয়া গেল। কারণ বৈষ্ণব কবি তাঁহার অন্তরের সহজ আবেগে সহজ কথায় ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। সুতরাং তাঁহারা ভাষার মধ্যেও সহজ এবং স্বাভাবিক উপমা ও বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। সহজ কথায় যে কত গভীর ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহা বাঙ্গলা এই প্রথম দেখিল। জয়দেব যখন গীতগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন তখনও সংস্কৃতের নজির এবং নিয়মের রাজত্ব। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের মুখে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' এই কথা বলাতেও কত না ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের শ্রীরাধা শ্যাম-অঙ্গে পা দিতে মোটেই কুণ্ঠিতা নহেন। প্রেম যেখানে প্রকৃত ও গভীর, সেখানে লৌকিক নিয়মের স্থান নাই। কিন্তু বৈষ্ণবকবি-বর্ণিত 'রাধাকৃষ্ণের প্রেম' বুঝিতে অনেকেই ভুল করেন। এই জন্য আমার মনে হয়, প্রথমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া পরে বৈষ্ণবপদাবলী পাঠ করা উচিত। শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ যে যে ভাবের ও প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের জীবনে তাহাই প্রত্যক্ষ ঘটিয়াছিল। চৈতন্যদেবের 'হরিনাম সার' মূলক উপদেশ পরে কত ভাবে, কত গ্রন্থকারের হাতে বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ঐ ভাবে ঐ উপদেশ এদেশে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্য দিয়া মাতৃ-ভাষাকে যে কতদূর গরীয়সী করিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীচৈতন্যের তিরো-ভাবের পর অনেকেই তাঁহার জীবনী বঙ্গভাষায় লিখিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং

তাঁহার জীবনীই বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম জীবনচরিত। ঐ জীবনচরিত দেখিয়া লোকে অপরের জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করে। এইরূপে বঙ্গভাষার একটি বিশেষ অভাব এই সময়ে পূরণ হয়। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম-বিষয়ক বিশেষ কোন আন্দোলন এদেশে হয় নাই এবং ঐ সময়ে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসূচক তদ্রূপ কোন গ্রন্থও দেখা যায় না।

ক্রমশঃ অষ্টাদশ শতাব্দী আসিয়া পড়িল। ঐ সময় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বড়ই বিবাদ চলিতেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আত্মগরিমা লইয়া বিভোর হইয়া পড়িল। এ প্রসঙ্গে শক্তিসাধক রামপ্রসাদের কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শ্যামাসঙ্গীত গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সঙ্গীতগুলি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন বলা যাইতে পারে। এইভাবে হিন্দুগণ যখন নিজ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক ইহাদের কে বড় এই প্রশ্ন যখন হিন্দুসমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিল, তখন খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ ধীরে ধীরে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করিয়া এদেশে অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় আবশ্যকবোধে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামপুর হইতে তাঁহারা 'সমাচার দর্পণ' নামক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। উহাই আমাদের প্রথম সংবাদপত্র। মিসনারীগণ বঙ্গভাষায় দেশ মধ্যে সর্ব্বত্র খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দলে দলে লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রকারান্তরে এই প্রচারকগণের প্রকাশিত পুস্তক পত্রিকা ইত্যাদি দ্বারা বঙ্গভাষা একটা নূতন আকার ধারণ করিল। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তকের একটু আমদানী হইল। নূতন কোন ধর্ম্মই ভারতে দীর্ঘকাল স্থায়িভাবে কার্য্যকর হয় নাই। খৃষ্টধর্ম্ম যখন একটু প্রসার লাভ করিল, তখন চিরস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইল। তিনি হিন্দুর ছুঁৎমার্গধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম এই দুয়ের মাঝামাঝি এক ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন। দেশে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামে নূতন ধর্ম্মমত আসিয়া পড়িল। বেদ, উপনিষদের বঙ্গানুবাদ হইল। বঙ্গভাষায় প্রথম গদ্য-লেখক রাজা রামমোহন রায় 'সংবাদ-কৌমুদী' নামক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। বাঙ্গালাভাষায় বড় বড় বক্তৃতায় দেশে নূতন সাড়া পড়িল। ব্রাহ্মধর্ম্মমত-প্রচার জন্য বঙ্গভাষায় অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইল—রাজা রামমোহন রায়ের ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের নবপ্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান সমাজ' হইতে পৃথক

হইয়া পড়িল—পরে 'কুচবিহার বিবাহের পর হইতে আবার নববিধান সমাজ ভাঙ্গিয়া একদল লোক 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত করিলেন; ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই দলের নেতা হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম যত ভাগেই বিভক্ত হউক না কেন—পরোক্ষে বঙ্গভাষা ভক্ত-সম্প্রদায়গণের প্রকাশিত ধর্ম্মমতপূর্ণ গ্রন্থ দ্বারা এবং প্রকাশ্যে ধর্ম্মমন্দিরে ও সভাসমিতিতে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা বেশ পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অক্ষয়কুমার দত্ত প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী', নববিধান সমাজের মহাত্মা ধর্ম্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের 'ধর্ম্মতত্ত্ব', সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রীর 'তত্ত্বকৌমুদী' ইত্যাদি সংবাদপত্রে বঙ্গভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইল। সংবাদপত্রে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার প্রসার বাড়িতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দী চলিয়া গেল—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিষম গোলযোগ বাধিল। সর্ব্বত্রই যেন জড়বাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইল। কামিনী-কাঞ্চনে জীবের অসাধারণ আসক্তি জন্মিল। পুরাতন ফেলে নূতনের প্রতি চোক পড়িল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সময় বহুকালব্যাপী সুপ্ত শক্তির পূর্ণবিকাশ, সার্ব্বজনীনতা, সরল স্বাভাবিকতার জীবন্ত মূর্ত্তি, ভারতের অতীত গৌরব জগতের ভবিষ্যৎ একত্র করিয়া লোকসমাজে দাঁড় করাইবার জন্য ভারতের আধ্যাত্মিক তেজের পূর্ণ অবতাররূপে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইহধামে অবতীর্ণ হইলেন। নিজে ত্যাগী হয়ে অদ্বৈত জ্ঞানের কবজ পরিয়া ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগৎকে ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দুসম্প্রদায় ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান, মুসলমান সকলেই ভক্তিভরে ঠাকুরের কথামৃত পান করিবার জন্য আকুলপ্রাণে তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কোন্ ধর্ম্ম বড় এই প্রশ্ন লইয়া যে এত বিবাদ বিসংবাদে ব্যস্ত ছিল তাহা যেন ঠাকুরের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় নিমেষ মধ্যে তিরোহিত হইল। সকল ধর্ম্মের, সকল শাস্ত্রের সার কথা প্রকৃতিকে জয় করা, আত্মদর্শী হওয়া, ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করা, মৃন্ময় মূর্ত্তিকে চিন্ময় পরমব্রহ্মের চিন্তা করা, ছুঁৎমার্গ পরিহার করা, কামিনী-কাঞ্চনকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করা প্রভৃতি চিরন্তন তত্ত্ব অতি সরল সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়া পরমহংসদেব যে উপদেশ বিতরণ করিতে লাগিলেন

তদ্দ্বারা মানব সমাজের অশেষ হিতসাধন হইল। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বার্ত্তা] ঘরে ঘরে ঘোষিত হইল—ঠাকুরের কথামৃত অচিরাৎ গ্রন্থাকারে দেশ মধ্যে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতে লাগিল—কি কোরাণ, কি বাইবেল, কি বেদ বেদান্ত, সকল ধর্ম্মগ্রন্থের মূলতত্ত্ব সরল ও সহজ ভাষায় মানব সমাজে প্রকাশিত হইল। একদিকে ধর্ম্মবিবাদ মিটিয়া গেল, অন্যদিকে ঠাকুরের উপদেশামৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্গভাষা অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া পড়িলেন। পরমহংস-দেবের প্রিয়তম ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় অসংখ্য বক্তৃতা দ্বারা জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিযোগমূলক উপদেশ বিতরণ করিয়া আমাদিগকে এক-দিকে যেমন ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন—অপরদিকে আবার মাতৃভাষাকে বিশেষ-ভাবে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ, জ্ঞান-যোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অমূল্যরত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কালে 'রামকৃষ্ণ মিশন' গঠিত হইল—ধীরে ধীরে কত ব্রহ্মচারী কত ভাবে মাতৃভাষায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন—বঙ্গভাষা উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিল। অন্যদিকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতুলনীয় কবিত্ব শক্তি দ্বারা গীতাঞ্জলী-প্রমুখ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষাকে সভ্য জগতের নিকট অশেষ সম্মানে সম্মানিত করাইয়া মাতৃভাষার যথেষ্ট কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা Theosophical Societyর 'ব্রহ্মবিদ্যা পত্রিকার উল্লেখ করিতে পারি। *

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা।

লেখক—শ্রীদীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভোগের আদর্শ আমাদের প্রাচ্যের আদর্শ নহে, উহা প্রতীচ্যের আদর্শ প্রাচ্যেরআদর্শ ভোগের মধ্যেই ত্যাগ এবং উভয়ের মিলন বা সামঞ্জস্যই মুক্তির চরম সোপান। তাই আজ বাঙ্গালায় 'চিত্তরঞ্জন' মরিয়াও অমর; প্রাচীনযুগের 'শিবিরাজ' 'প্রহ্লাদ' ও 'দধীচি'র আদর্শ এত জাগ্রত, এত মূর্ত্তিমান। নিষ্কাম প্রেমের উপাসনাই জগতে চিরন্তন। ভোগের উপাসনা, আমিত্বের প্রভাব যে

* ফরিদপুর ঈশান ইনষ্টিটিউসনে ছাত্র-সম্মিলনীতে পঠিত।

ক্ষণস্থায়ী ইহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য একদিকে কংস, অন্যদিকে ব্রজবালকগণ ; একটী অন্তর্ম্মুখী, অন্যটী বহির্ম্মুখী। একটী দেখাইল মরণের মধ্যে হাসির বিদ্যুৎরেখা, অন্যটী দেখাইল মরণের মধ্যে ভীতির বিভীষিকা ; একটী মরিয়াও অমর হইল, আর একটী মরিয়া লুপ্ত হইল।

এতক্ষণ ভাগবতের প্রেমধর্ম্ম ও উহার সাধনপ্রণালী যাহা আলোচনা করিলাম, উহা শুধু ভক্তগণের জন্য। ঐ প্রণালীর সাধনা মূর্খ গোয়াল-গোয়ালিনীরাই জানিত ও বুঝিত ; সাধারণ স্তরের মানুষ কিম্বা গভীরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছে এই প্রণালীর সাধনা আদর পাইবে না, কারণ তাঁহারা ইহার তত্ত্ব আজিও নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ছেলে খেলাধূলায় যে আনন্দ পায়, পিতা কখনও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না ; এইজন্যই পিতাপুত্রে এত ব্যবধান। যা'হোক্, ভাগবতে সাধনার আর একটী স্তর বর্ণিত হইয়াছে, যে স্তরের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে অগ্রসর হইতেই হইবে। শিশু যখন হাঁটিতে শেখে, তখন আছাড় খাইয়াও আবার উঠিতে চায়, নূতন একটা কিছু দেখিলেই তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হয় ; যতই কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই অন্তর নব নব বিকাশের পথে ধাবিত হইতে থাকিবে। সাধারণ মানুষও ঠিক এইভাবে ঠেকিয়া শিখিয়া পড়িতে পড়িতে অগ্রসর হয়। ভাগবতরত্ন শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় এই সাধনার একটী সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন—"আমরা সাধারণ মানুষ, গিয়াছি বায়স্কোপের ছবি দেখিতে। বায়স্কোপের ছবিগুলি জীবন্ত মানুষের মত হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। এখন আমরা মনে করিতেছি, একটু অগ্রসর হইলেই ঐ ছবিগুলি ধরা যাইবে। কিন্তু যতই উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছি, ততই ছবি আমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। আমরা মনে করিতেছি ছবি ধরিতে পারিয়াছি,—কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতেছি, তাহা ভুল—মিথ্যা। এইরূপে নব নব বিফলতা ও নব নব আশার উন্মাদনায় একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলাম, হঠাৎ পিছনের দিকে ফিরিয়া দেখি, দূর হইতে একটা আলোকের ছটা আসিতেছে। তখন আমাদের চিন্তার স্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইল, তখন কৌতূহল হইল, ঐ আলোকের ছটা কোথা হইতে আসিতেছে তাহাই দেখিতে হইবে। ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একটী সিঁড়ি আছে, ভাবিলাম এই সিঁড়ি ধরিয়া অগ্রসর হইলেই বোধ হয় গন্তব্য স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইবে। আমাদের মধ্যে যাহারা কষ্টসহিষ্ণু ন'ন, কংসের মত দেহটাকেই

সর্ব্বস্ব মনে করেন, তাঁরা চম্পট্ দিলেন; কিন্তু যাঁরা লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁরা ভীত না হইয়া অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ সোপানপথ বাহিয়া আমরা উপরে উঠিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম, একটী বালক, তাহার সমস্ত দেহ আনন্দপূর্ণ, খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে আর কল ঘুরাইতেছে। আমরা এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলাম "তুমি এমনি করিয়া আপন আনন্দে বিভোর হইয়া খেলা করিতেছ আর আমরা নীচে বসিয়া ছবি দেখিয়া বঞ্চিত হইতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে আমরা যাইয়া সেই বালকের পা চাপিয়া ধরিলাম। বালক আমাদের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "বাঃ! তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ, আমায় ধরিয়া ফেলিয়াছ দেখিতেছি, বেশ করিয়াছ আমিও তাই চাই; আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না; সেই অসীম আনন্দের আবেগে আমি নিত্যকাল এইরূপ খেলিতেছি, এ খেলা আমার অন্তরের আনন্দ মূর্ত্তিসম্পন্ন করিয়া অনুভব করা মাত্র। তোমরা এমনি করিয়া আমার নিকট আসিবে ইহাই আমার আনন্দ। তোমরা আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। এখন হইতে তোমরা আমার স্বজন হইলে, আর তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এখন হইতে তোমরা আমার নিকটেই থাক।"

উল্লিখিত উদাহরণ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি—"মানুষ প্রথমে বহির্ম্মুখী, বাহিরের জগতের দিকে বেশী করিয়া আকৃষ্ট হয়, কিছুদিন এইভাবে বহির্জ্জগৎকে উপভোগ করিবার পর মন যখন অশান্ত হইয়া উঠে, তখন মানুষের আত্মা শান্তির অন্বেষণে অন্তর্জ্জগতের দিকে ধাবিত হয়। অন্তর্জ্জগতের দিকে প্রবেশলাভ করিলে আনন্দময়ের সঙ্গে চিরন্তন মিলন সাধিত হয়।

সর্ব্বশেষে ভগবৎ-সাধনা সম্বন্ধে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইহা গোপীগণের সাধনা সম্বন্ধে। আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত সাহিত্যিকগণ অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন। যা'ক্—তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য কিছুতেই নষ্ট হইবে না। স্বর্গীয় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় সকলের সন্দেহই ভঞ্জন করিয়াছেন ইহার সম্বন্ধে একটী সুন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া। গোপীগণ প্রেমসাধনার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল এবং ভগবানে সকলি সমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু একটা জিনিস অর্পণ করিতে পারে নাই,—ইহা 'লজ্জা'। তাই ভগবান্ একদিন তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্নানমগ্না গোপনারীগণের বস্ত্র লুকাইয়া রাখিলেন। বস্ত্রাভাবে যে মুহূর্ত্তে তাহাদের অন্তরে লজ্জার

আবির্ভাব হইল, সেই মুহূর্ত্তে ভগবান্ তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কারণ লজ্জা আসিলেই কামের উদয় হয়, কামের উদয় হইলেই ভগবানের নাগাল পাওয়া অসম্ভব। ছোট বালিকা বিবস্ত্রা অবস্থায় যখন পিতার কোলে গিয়া বসে, তখন তাহার অন্তরে লজ্জার লেশ মাত্র থাকে না। তারপর ধীরে ধীরে যখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্ক হয়, তখনই কাম ও লজ্জা আসিয়া অন্তরকে অধিকার করিয়া বসে, তাই আর বালিকা বিবস্ত্র অবস্থায় বাহিরে যাইতে পারে না। গোপীগণেরও কতকটা সেইভাব হইয়াছিল। গোপীগণও কৃষ্ণকে প্রথমে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিল, তাঁহাতে সবই অর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু লজ্জা অর্পণ করিতে পারে নাই বলিয়া সে ভালবাসা কাম-গন্ধে কলুষিত হইয়া উঠিল, তাই তাহারা ভগবানের অতি নিকটে গিয়াও তাঁহার মধ্যে মিশিতে পারিল না। আর শ্রীরাধা লোক, লজ্জা, ভয় এ তিনই ভগবানে অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে গিয়া মিশিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই ভাগবতে প্রেমের আসল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের সব দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও অশান্তি মিটিয়া গিয়াছে। তাই বোধ হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, আজন্ম ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও স্বদেশপ্রেমিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবধর্ম্মের এত পক্ষপাতী ছিলেন; ভাগবতের অমৃতময় কাহিনী তন্ময় হইয়া শুনিতেন আর বাঙ্গালার বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া শ্রদ্ধেয় রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন শুনিয়া ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইতেন। শেষ জীবনেও রামঠাকুরের পদকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—"আহা! আমাদের বাঙ্‌লায় এমন সুন্দর ভগবৎ-প্রেমের কাহিনী কীর্ত্তিত হয়, তাই ছাড়িয়া কিনা আমরা বিলাতী থিয়েটার দেখিবার জন্য ব্যস্ত হই। মায়ের কোলে স্থান থাকিতে আমরা বিলাতে যাই শান্তি খুঁজিতে—; আমাদের মত মূর্খ কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা কাঞ্চন ছাড়িয়া কাচ কুড়াইতেছি।" স্বদেশপ্রেমিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও একদিন বড় আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছিলেন— "হায়! ছিলাম বামুনের ছেলে, হলেম খৃষ্টান; খৃষ্টের ধর্ম্ম ছেড়ে হলেম ব্রাহ্ম; কিন্তু কোন ধর্ম্ম বা শাস্ত্র ঘেঁটেই শান্তি খুঁজে পেলেম না। শেষে শান্তি পেলেম হিন্দুর গীতা আর ভাগবতে। বস্তুবিক ভাগবত-ধর্ম্মের মত এমন শান্তিময় ধর্ম্ম আর নাই।

তারপর হিন্দুমহাসভা এবার আমাদের অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণের

জন্মাষ্টমী উৎসবকে একটী জাগ্রত জাতীয় উৎসবে পরিণত করতে হবে। এতে হয়ত কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বলতে পারেন, কেন ? এ কেন'র উত্তরে আমার একটী কথা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে বোধ হয়। আমার জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধু একদিন বলেছিলেন "প্রায় দেশেই একটা না একটা জাতীয় উৎসব চলিত হয়ে গেছে। যেমন মহারাষ্ট্রে 'শিবাজি-উৎসব'। ঐ 'শিবাজী-উৎসব' মহারাষ্ট্রে বৎসরের মধ্যে একটী দিনের জন্য নবীন প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে দেয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, দুর্দ্দিনে নব আশার কল্পতরু শিবাজিকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দান করে মার্‌হাট্টারা বীর-পূজার পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করে। কিন্তু জাতীয় জীবনকে উদ্বোধিত করিবার পবিত্র মন্ত্র আমরা আজ পর্য্যন্তও খুঁজিয়া পাইলাম না। স্বদেশী যুগে স্বদেশ-প্রেমিক নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় বাঙ্গালায় যদিও শিবাজি-উৎসব জন্মলাভ করেছিল, মিন্তু রাজশক্তির প্রবল তাড়নায় তাহার মুকুল অকালে ঝরে পড়েছিল। তাই আমরা আবার এমন একটী উৎসব চাই, যাতে করে আমাদের জাতীয় জীবন আবার উদ্বোধিত হয়; বহুকালের জরাজীর্ণ অন্তরটা হর্ষে ও বীর্য্যে নৃত্য করে উঠে।

এই জাতীয় জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে, এই দুর্দ্দিনে ঘন মেঘাড়ম্বরে জাতীয়-জীবনের কাণ্ডারী শ্রীমধুসূদনকে প্রাণ খুলিয়া ডাকা ভিন্ন আমাদের আর কি গতি আছে ? ভগবান্ যে দুর্দ্দিনেরই সখা, বিপদের বন্ধু, তিনি যে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে কংসের কারাগারে জগতের দুঃখ মোচন কর্‌বার জন্যই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই বাঙ্গালার কবি ত্রাস্ত হয়ে বিপদের দিনে ডেকে বল্‌ছেন—

"কারাগারে লৌহ দ্বারে ঝঞ্ঝা আসি ঠেলা মারে
ঝন্ ঝন্ করি যায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া।
মাঝে মাঝে কংসচর ভয়ঙ্কর দণ্ডধর—
হুঙ্কারি মথুরাপথে বেড়ায় ঘূরিয়া।
এমনো দুর্দ্দিনে স্বামী যদি নাহি এস নামি
গোলোক ছাড়িয়া এই ত্রস্ত ধরাতলে,
এ দুঃখে সবার সহ ভাগ যদি নাহি লহ,
ডুবিবে তোমার সৃষ্টি প্রলয়ের জলে।"

আজ বাঙ্গালার আকাশে সন্ধ্যা, অন্ধকারময় রজনীতে পাপ-তাপময় হাহাকার ও আর্ত্তনাদ; আজ বাঙ্গালার বড়ই দুর্দ্দিন আজ বাঙ্গালীর পথপ্রদর্শক

অগ্রদূত সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন নাই; বাঙ্গালার অদৃষ্টাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, সুখ-সৌভাগ্য অস্তমিত। অতএব ভূভার হরিতে আজ তোমাকেই অবতীর্ণ হতে হবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেমন নিঃসহায় পাণ্ডবগণের রথের সারথী হয়ে তাদের পথ দেখিয়েছিলে, আজ আবার ছিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মদ্রোহী দুর্ব্বল জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের লক্ষ্যপথে চালিত কর। ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামী, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারে ধরণী আজ জর্জ্জরিতা, দুষ্কৃতদের বিনাশন ও সাধুদের পরিত্রাণের জন্য যে তোমায় যুগে যুগে অবতীর্ণ হতেই হবে।

তাই,—

“জন্ম তব কারাগারে আবির্ভাব অন্ধকারে
আলোকিত সৌধ-শিরে লভ'না জনম,
যেখানে বন্ধন-ভয় উপদ্রব লভে জয়
সেইখানে জাগো তুমি হে প্রিয় পরম!”

যেখানে ঐশ্বর্য্যের আলোকে জগৎ দেদীপ্যমান, সেখানে ত আমরা তোমায় চাই না; সেখানে আমরা তোমায় চিন্‌ব না। ঘন মেঘের দুর্দ্দিনেই বসুদেব তোমায় চিনেছিলেন, দৈবকী চিনেছিলেন— তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন; তাই ত আজ ঘন মেঘের অন্তরালে তোমার জন্মোৎসব। অবনত ভারত বহুবর্ষ ধরে তোমায় অন্তরের সহিত চাহিয়া আসিতেছে; ভক্ত কবি জয়দেব, চণ্ডীদাসের সুললিত ছন্দে; গায়কের গভীর রাগিণীতে; অন্ধ ভিক্ষুকের খঞ্জনীর একতারার সুরে; ঋষিগণের বীণার ঝঙ্কারে; আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে জীবনের নব নব মুহূর্ত্তে একমাত্র তোমারই পবিত্র নাম ওঙ্কার ধ্বনি-মত বিশ্ব ব্যাপিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। তুমি যে বাঙ্গালীর বড় আদরের ধন,— আশার স্বপন; বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিত্যকাল ধরিয়া রাসে, দোলে, ঝুলনে, বিরহে, মিলনে, মানে, মানভঞ্জনে, সখ্য-বাৎসল্যের নব নব আনন্দে আমাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে নিত্য লীলা-খেলা করিতেছ। তোমার প্রেম যে বিশ্বব্যাপী, অফুরন্ত, নিত্য ও শাশ্বত, তাই আজ জাতীয় জীবনকে জাগ্রত ও উদ্বোধিত কর্‌বার জন্য, নিরানন্দময় জীবনে শান্তি ও আনন্দের পূত মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত কর্‌বার জন্য ‘মঙ্গল-ভৈরব-শঙ্খ-নিনাদে’ সব ‘ভেদ ও বিবাদ’কে চূর্ণ কর। নব আশে আজ হিন্দুস্থান তোমারই আশাপথ চাহিয়া আছে; সকল দ্বন্দ্ব ও ভেদ, সুখ ও দুঃখ, ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য করে বাঙ্গালার অন্ধকার

ঘুচিয়ে দাও! আজ তোমার শুভ জন্মদিনে ইহাই আমাদের অন্তরের একমাত্র কামনা। *

নীলাম্বরের কথা।

বহুরূপ তারা।

লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম, বি, এ, এ।

হ্রদ-সর্পরাশির R. তারাটী এবারে পঞ্চম শ্রেণীর তারায় অধিক উজ্জ্বলতা লাভ করে নাই, কিন্তু তাহা হলেও উহাকে খালিচক্ষে দেখিবার কোন অসুবিধা হয় নাই। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯২৪ খৃঃ অঃ ৩ আগষ্ট আমরা উহাকে পশ্চিম আকাশে সূর্য্যাস্তের পর শেষ বার দেখিয়াছিলাম, তখন উহার স্থূলত্ব ৭'৮২ ছিল। তৎপরে ১৯২৪ খৃঃ অঃ ২৯ নভেম্বর উহাকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্ব গগনে প্রথম দেখিতে পাই, তখন উহার স্থূলত্ব ৯'১৪ ছিল। হিসাবমত ১ অক্টোবর উহার ক্ষীণতম জ্যোতিতে থাকিবার কথা, কিন্তু ঐ সময়ে তারাটী সূর্য্যসান্নিধ্যে থাকায় পর্য্যবেক্ষণ সম্ভব ছিল না। যাহা হউক ২৯ নভেম্বরের পূর্ব্বেই যে উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯২৫ খৃঃ অঃ ২৭ এপ্রিল উহার স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইবার কথা, কিন্তু আমরা ৩ মে পর্য্যন্ত উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়াছি, ঐ দিন উহা ৪'৫০ স্থূলত্বে উপনীত হইয়া ১৬ মে পর্য্যন্ত ঐ স্থূলত্বে বিদ্যমান ছিল, তৎপরে উহার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইতে থাকে। আমাদের পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সন ও তারিখ			স্থূলত্ব	মন্তব্য।
১৯২৪।	আগষ্ট	৩	৭'৮২	সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে দৃষ্ট।
	নভেম্বর	২৯	৯'১৪	সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে দৃষ্ট। ক্ষীণতম জ্যোতির পর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি।
	ডিসেম্বর	২৩	৮'৯৫	
১৯২৫।	জানুয়ারী	৩	৮'৭৭	আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না।
	জানুয়ারী	২৭	৮'১৩	দূরবীণে দৃষ্ট।

* রঙ্গপুর হিন্দু-সভা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত জন্মাষ্টমী-উৎসবে পঠিত।

সন ও তারিখ		স্থূলত্ব	মন্তব্য।		
ফেব্রুয়ারী	১৬	৭'৯২	ঐ	ঐ	
”	২২	৭'৪৩	ঐ	ঐ	
”	২৬	৭'৪৩	ঐ	ঐ	
মার্চ্চ	৬	৭'৬৪	দ্বিচক্ষু দূরবীণে দৃষ্ট।		
”	১৬	৭'৫৪	ঐ	ঐ	
”	১৯	৭'৫৪	ঐ	আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না।	
”	২১	৭'৩৩	ঐ	ঐ	ঐ
”	২২	৭'৩৩	ঐ	ঐ	ঐ
”	২৫	৭'১৩	ঐ	—	—
”	২৬	৭'০৩	ঐ	—	—
”	২৮	৬'৯৩	ঐ	আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না।	
”	২৯	৬'৯৩	ঐ	ঐ	ঐ
”	৩০	৬'৫৩	আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। চন্দ্রালোকে তারাটী সমাচ্ছন্ন ছিল। দূরবীণে দৃষ্ট।		
এপ্রিল	৩	৬'২৩	ঐ		ঐ
”	১১	৫'৮৫	দ্বিচক্ষু দূরবীণে দৃষ্ট।		
”	১৪	৫'৬৬	খালিচক্ষে দৃষ্ট।		
”	১৯	৫'৪৬	ঐ	ঐ	
”	২৪	৫'২৮	ঐ	ঐ	
”	২৫	৫'১৮	ঐ	ঐ	
”	২৬	৪'৯৮	ঐ	আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না।	
মে	১	৪'৭৯	ঐ	চন্দ্রালোকে দৃষ্ট।	
”	৩	৪'৫০	ঐ	ঐ	স্থূলতম জ্যোতিঃ।
”	১০	৪'৫০	ঐ	ঐ	ঐ
”	১১	৪'৫০	ঐ	—	ঐ
”	১২	৪'৫০	খালিচক্ষে দৃষ্ট।		স্থূলতম জ্যোতিঃ।
”	১৩	৪'৫০		ঐ	ঐ
”	১৪	৪'৫০		ঐ	ঐ
”	১৫	৪'৫০		ঐ	ঐ
”	১৬	৪'৫০	ঐ	আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না।	ঐ

”	১৮	৪'৬০	ঐ	ঐ জ্যোতিঃ হ্রাস আরম্ভ।
”	২০	৪'৭৪	ঐ	ঐ
”	২৪	৪'৭৪	ঐ	ঐ
”	২৭	৪'৯৮	ঐ	ঐ
”	২৮	৪'৯৮	ঐ	চন্দ্রালোকে দৃষ্ট।
”	৩১	৪'৯৮	ঐ	ঐ
জুন	১	৪'৭৯	ঐ	ঐ ক্ষণিক জ্যোতিঃ বৃদ্ধি।
”	১২	৫'২৮	ঐ	আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না।
”	১৫	৫'৩৭	ঐ	ঐ
”	২০	৫'৬৬	ঐ	ঐ
”	২১	৫'৬৬	ঐ	ঐ
”	২২	৫'৬৬	ঐ	ঐ
”	২৪	৫'৭৬	ঐ	ঐ
”	২৫	৫'৭৬	ঐ	ঐ
জুলাই	২	৫'৯৫	দ্বিচক্ষু দূরবীণে দৃষ্ট।	চন্দ্রালোকে সমাচ্ছন্ন। আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না।
	১৭	৬'০৪	ঐ	সন্ধ্যালোকে দৃষ্ট।

কন্যারাশির S. তারাটীকে আমরা গত বৎসর ৩ আগষ্ট (১৯২৪) পর্য্যন্ত পশ্চিম আকাশে সূর্য্যাস্তের পর দেখিয়াছিলাম। তখন উহার স্থূলত্ব ১০'৪০ ছিল। তৎপরে সূর্য্যসান্নিধ্য লাভ করায় আর পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। তৎপরে ২৯ নভেম্বর শেষরাত্রে উহাকে পূর্ব্বগগনে দেখিয়াছিলাম। তখন উহা অদৃশ্য ও ১১'০৫ স্থূলত্বের তারা হইতেও ক্ষীণ জ্যোতি ছিল। ১৯২৫ খৃঃ অঃ ৩ জানুয়ারী পর্য্যন্ত তারাটী ১১'০৫ স্থূলত্বের তারা হইতে ক্ষীণ ছিল, ৩০শে জানুয়ারী আমরা উহাকে প্রথম দেখিতে পাই। ঐ সময়ে তারাটী ১১'০৫ স্থূলত্বের তারার সমান ছিল। এই সময় হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ মে তারাটী পূর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করে। হিসাবমত ২১ এপ্রিল উহার পূর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করিবার কথা কিন্তু আমরা ৩ মে পর্য্যন্ত উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছি।

সন ও তারিখ			স্থূলত্ব	সন ও তারিখ			স্থূলত্ব
১৯২৫।	জানুয়ারী	৩	১১'০৫ হইতেও ক্ষীণ ও অদৃশ্য	১৯২৫।	এপ্রিল	১৪	৭'৪১
”	”	৩০	১১'০৫ দৃশ্য	”	”	১৭	৭'১০
”	ফেব্রুয়ারী	১৫	১০'২১	”	”	২৬	৬'৬৮
”	”	২১	৯'৮৮	”	মে	৩	৬'৫৮ স্থূলতম জ্যোতিঃ
				”	”	১১	৬'৬৮

সন ও তারিখ			স্থূলত্ব	সন ও তারিখ			স্থূলত্ব
"	"	২৬	৯'৭৮	"	"	১৫	৬'৭৮
"	মার্চ্চ	৬	৯'৪০	"	"	২০	৬'৮৮
"	"	১৪	৯'১৯	"	"	২৭	৭'০০
"	"	২১	৮'৮২	"	জুন	১৫	৭'৬০
"	"	২৪	৮'৫২	"	"	২৪	৭'৯৪
"	"	২৯	৮'৩২	"	জুলাই	২	৮'৪২
"	এপ্রিল	৩	৭'৮২	"	"	১৬	৯'০১
"	"	৬	৭'৭৪	"	"	২০	৯'১১
"	"	১১	৭'৫১	"	আগষ্ট	১	৯'৩০

শেফালিরাশির S. তারাটী চারিশত পঁচাশি দিন অন্তর অর্থাৎ প্রায় এক-বৎসর চারি মাস অন্তর একবার করিয়া স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হয়। গত বৎসর ১৯২৪। ৩ ফেব্রুয়ারী এই তারাটী স্থূলতম জ্যোতি ৮'০ স্থূলত্বে উপনীত হইয়াছিল। হিসাবমত এবারে ২৫ মে উহার স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইবার কথা। আমরা উহাকে ২২ জানুয়ারী ৯'৫, ২ জুন ৮'৬ ও ১৬ জুলাই ৮'৯ স্থূলত্বে দেখিয়াছি। আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় এবারে আমরা ঐ তারাটীকে বেশী পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই।

শেফালিরাশির T. তারাটী তিনশত সাতাশি দিন অন্তর একবার করিয়া স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হয়। গত বৎসর ১৯২৪ খৃঃ অঃ ২৯ জুন স্থূলতম জ্যোতি ৬'৩ স্থূলত্বে উপনীত হইয়া খালিচক্ষে দৃশ্যমান হইয়াছিল। হিসাবমত এবারে ২৫ জুলাই আবার স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইবার কথা ছিল। আমরা ১৩ জুলাই পর্য্যন্ত উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছি পরে আর উহার জ্যোতি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই। আমাদের পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ—

সন ও তারিখ			স্থূলত্ব		সন ও তারিখ			স্থূলত্ব	
১৯২৪।	জুন	২৯	৬'৩০	স্থূলতম জ্যোতি	১৯২৫।	এপ্রিল	৫	৭'৮১	
"	জুলাই	২৫	৬'৬৮		"	"	৬	৭'৬০	
"	সেপ্টেম্বর	১	৭'৯৮		"	"	১২	৭'০১	
"	"	৯	৮'১২		"	"	১৫	৬'৯০	
"	"	২৮	৮'৩১		"	মে	১৪	৬'৫৯	
"	অক্টোবর	২২	৮'৯৮		"	"	৩০	৬'৩৬	
"	নভেম্বর	২৯	৯'৯২		"	জুন	২	৬'৩৬	
"	ডিসেম্বর	১৫	১০'৩০		"	"	২৩	৬'১৫	দ্বিচক্ষু দূরবীক্ষে দৃশ্য

১৯২৫	জানুয়ারী	১৩	১০'৬০	ক্ষীণতম জ্যোতিঃ	,	,	২৫	৬'১৫	, ,
,	ফেব্রুয়ারী	২৫	৯,৩০		,	জুলাই	৭	৫'৭৩	, ,
,	মার্চ্চ	৭	৮'৭৮		,	,	১৩	৫'৬২	খালিচক্ষে দৃশ্য স্থুলতম জ্যোতিঃ
,	,	১৯	৮'১৮		,	,	১৬	৫'৬২	
,	,	২২	৮'১৫		,	,	২১	৫'৬২	
,	,	৩১	৭'৮৯		,	,	২৩	৫'৬২	
					,	আগষ্ট	১	৬'০৪	
					,	,	৭	৬'১৩	
					,	,	৯	৬'২২	
					,	,	১৩	৬,৪২	

ভক্তি-কথা।

লেখক—শ্রীআশুনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অচ্যুত-চরণে শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিবে, হে ভগবন! আমি তোমার চরণ-বিমুখ হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছি, এখন শরণাগত জনে রক্ষা কর। যাঁহারা ভগবদ্বিগ্রহের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করেন এবং প্রসাদ ভোজন করেন, তাঁহারা মায়া জয় করেন। ভগবৎ কথা শ্রবণ, অনুধ্যান, প্রিয়বস্তু তাঁহাকে অর্পণ, দাসবৎ পরিচর্য্যা, গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা নিশ্চিত শ্রেয় লাভ হয়। অষ্টাঙ্গের দ্বারা বন্দনা, ভক্তপূজা, ভগবৎ গুণকীর্ত্তন, ভগবানে আত্মসমর্পণ, সর্ব্বকাম ত্যাগ, এইগুলি দাস্যের অঙ্গ। আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণ মৎপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ করেন; তাহা হইলে আর বাকী রহিল কি? মহারাজ অম্বরীষ, মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্য তদ্‌গুণ-কীর্ত্তনে, কর্ণ তদ্‌গুণ-শ্রবণে, হস্ত হরিমন্দির-মার্জ্জনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহদর্শনে চক্ষুকে, ভক্তাঙ্গ-স্পর্শনে শরীরকে, কৃষ্ণপাদ-কমল-সৌরভে নাসাকে, কৃষ্ণার্পিত তুলসীযুক্ত প্রসাদান্ন-গ্রহণে রসনাকে, পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্র-ভ্রমণে, মস্তক পাদাভি-বন্দনে, কৃষ্ণদাস্যে কামকে, কামানুগ ক্রোধ ইত্যাদিকে কৃষ্ণাশ্রিত রতি যাহাতে হয়, সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনুকূলতা দ্বারা কৃষ্ণে যেমন তন্ময়তা

জন্মে, বৈরানুবন্ধ হইতে তদপেক্ষা গাঢ় ও তদপেক্ষা সত্বর তন্ময়তা জন্মে। চৈদ্য, কংসাদি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তথৈব ভজাম্যহং ॥

যে, যেভাবে আমায় ভজে, আমিও সেইভাবে, তাহাকে ভজি। এই ভগবদুক্তি অত্যন্ত সত্য জানিবে। তবে দ্বেষ, ভয় এই দুটি রাগের প্রতিকূল, আর কাম, স্নেহ এই দুটি অনুকূল। প্রতিকূলভাবে ভজনা করা শিষ্টজনের অকর্ত্তব্য। ভক্তগণ গোপী-অনুগত রাগানুগা ভক্তিই আশ্রয় করিয়া প্রেম-পিপাসু হইয়া থাকেন। নামে রুচিই জীবের পরম ধর্ম্ম। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। এই ভীষণ কলিযুগের মানবের নামে রুচি ব্যতীত নিস্তারের অন্য উপায় নাই। সুতরাং বর্ণমাত্রবোধে অবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জোর করিয়া মনকে নামে আসক্ত করিতে হইবে। ক্রমে নাম-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, তাহা হইতেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং বিষয়াসক্তি অপগত হইবে। বিধৌত-পাপ ও চিত্তশুদ্ধ হইলে তখন আপনা হইতেই ক্রমশঃ নামে রুচি জন্মিবে। নামে রুচি জন্মিলে সর্ব্বানর্থ তিরোহিত হইয়া ক্রমে অনুরাগের সঞ্চার হইবে। উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন করিবে, তাহাতে মন বিষয় হইতে বিমুক্ত হইবে এবং নামে তন্ময়তা জন্মিবে। এই ভজনপথ যেমত সহজ, বাধাবিঘ্ন দূর করিতে না পারিলে সেই রূপ কঠিন। নামে দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিলে, প্রতিপদেই পতন সম্ভব। নিয়ত শক্তিশালী নামের প্রতি সন্দেহ না করিয়া সাধন করিয়া দেখুন, নামের কোন শক্তি আছে কিনা?

এতাবানেব লোকেঽস্মিন পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ ভাঃ ৬।৩।২২

শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ, স্মরণ প্রভৃতি দ্বারা যে ভক্তিযোগ তাহাই জীবের পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি প্রভাবে চণ্ডালও সদ্য পবিত্র হয়, যম-ভয় দূর হয়। নাম-মহিমা যাহারা অর্থবাদ বা প্রশংসামূলক বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, তাহাদের আর কোনও সৎকর্ম্ম-বলে নিস্তারের উপায় নাই। চার্ব্বাক প্রকৃতি পাষণ্ডগণ, শিশ্নোদর-পরায়ণ হইয়া শত শত আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত অস্থিরচিত্তে পর্য্যটন করিতে থাকে। নিত্য সুখ স্বরূপ ভগবানকে বিস্মৃত বা উপেক্ষা প্রদর্শন-পূর্ব্বক আত্যন্তমধ্য-দুঃখসঙ্কুল বিষয়রসে নিমগ্ন হইয়া থাকে। দুস্তর বিষয়-বাসনা হৃদয় হইতে নিঃশেষে দূর করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করা

নিতান্ত প্রয়োজন। কীর্ত্তনকালে সবলে করতালি শব্দ করিবে, তাহা হইলে দেহ-বৃক্ষ হইতে পাপ-পক্ষিগণ পলায়ন করিবে। নামাভাস হইতে ক্রমে শুদ্ধ নামে রুচি জন্মিবে। সুতরাং নাম-গ্রহণে কখনও বিমুখ হইবে না। নামের অচিন্ত্য শক্তি ক্রমশঃই প্রকাশ পাইবে। তখন অবিশ্বাস আপনা হতেই দূর হইবে। কলি-কলুষ-দূষিত-চিত্ত মানবের নাম মহাযজ্ঞই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। কারণ, নাম, রূপ, গুণ, এ সকলের কোন ভেদ নাই। বিশুদ্ধ নামে রুচি হইলে ভগবানে রুচি হইল বুঝিতে হইবে। যুক্তি, তর্ক, বিচার যেখানে বিমুখ হয়, সেখানে নামের শক্তি স্ববলে বিরাজ করে। আম, গণনা অপেক্ষা খাওয়া ভাল। নিষ্ফল বিচার-রসিক হওয়া চেয়ে নামরসের রসিক হওয়া মঙ্গলকর।

দুর্ব্বুদ্ধি কলির লোকেরাই ভগবন্নাম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। গুণজ্ঞ, সারগ্রাহী ঋষিগণ, কলিকে এই বলিয়া প্রশংসা করেন যে, একমাত্র অন্য সাধন-নিরপেক্ষ নাম কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। হরিনাম-গ্রহণ-কালে যদি নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ প্রকাশিত না হয় এবং হৃদয় দ্রব না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হৃদয় প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়াছে। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ জননী-দর্শন আশায় যেমন ব্যাকুল হয়, ক্ষুধার্ত্ত বৎসগণ যেমন মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়, বিদেশগত প্রাণপতির দর্শনাশায় সাধ্বী স্ত্রীর মন যেমন ব্যাকুল হয়, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির প্রাণ জলপানের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, ভগবানের জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা জন্মিলে বুঝিতে হইবে ভববন্ধন মোচন হবার আর বিলম্ব নাই। যাঁহারা নামাশ্রয় করেন, তাঁহাদের অন্য প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক নাই। ভগবন্নাম-প্রভাবে ঘোর মহাপাতকী অজা-মিল পাপমুক্ত হইয়া উদ্ধার পাইয়াছিল। পাপ ত্রিবিধ, অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ, আকস্মিক। আকস্মিক পাপ এই জন্মকৃত। প্রায়শ্চিত্তে বিশেষ বিশেষ পাপ মাত্রেরই ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারব্ধ পাপের কিছুতেই ক্ষয় হয় না; অপ্রারব্ধের ত কথাই নাই। অনুতাপাদি জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তে অপ্রারব্ধ পাপ-ক্ষয়। আক-স্মিক পাপ হইতে জ্ঞানী লোক সাবধান হন। নতুবা প্রারব্ধ পাপের সহিত তাহা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু নামের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি, নাম-প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার পাপ-ক্ষয় হইয়া যায়। কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় জীবন থাকে। তখন আর কর্ম্ম জন্য কোনও ফলভোগ করিতে হয় না।

সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম একই বস্তু, তাহাতে কৃষ্ণের সমস্ত শক্তি আছে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। পার্থিব ভোগ, সম্পদ, আয়ু, যশ সমস্তই

হরিভক্তির নিকট তুচ্ছ। যদি আত্মেশ্বর হরিকে না জানা যায়, তাহা হইলে সমস্ত গুণই বৃথা। সমুদ্র পার হইবার জন্য যদি কেহ কুকুরের লেজ আশ্রয় করে, সে যেমন ফল পায়, হরিকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার আরাধনাকারী ব্যক্তিও তদ্রূপ ফল পায়। উচ্চবংশ, শাস্ত্রপাঠ, তেজ, তপস্যা কিছুই হরি-সাধনের যোগ্য নহে। জীর্ণ ব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য। যিনি মন, প্রাণ, চেষ্টা সমস্তই ভগবানে অর্পণ করেন, তিনি নীচ জাতি হইলেও দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি আপন বংশের সহিত জগৎ পবিত্র করেন। কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তি নিজেকেও পবিত্র করিতে সমর্থ নহে। অতএব ভগবচ্চরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করাই নিশ্চিত শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। ভগবানের কৃপা সততই সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষিত হইতেছে সত্য, তথাপি তাহা অনুভব করিবার জন্য তাঁহার শরণাগত হওয়া, তন্নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ করা একান্ত আবশ্যক। ভগবন্নাম-গ্রহণে পাপক্ষয় ও চিত্ত শুদ্ধ হইলে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস জন্মে। তাহা হইতে সাধন-ভজনে প্রবৃত্তি হয়। অতএব বেশ বুঝা যায় যে, নামই সাধ্য এবং নামই সাধন। নামই উপায়, নামই উপেয়। সুতরাং একান্তচিত্তে নামাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। নাম-সাধনবলেই পশ্চাৎ প্রেমভক্তির উদয় হয়। মুক্তি অপেক্ষাও ভক্তের নিকট উহাই পরম পুরুষার্থ এবং একান্ত বাঞ্ছিত। প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইলে আর কিছুই বাকী রহিল না। সুতরাং এক নামই সর্ব্বার্থদাতা এবং সর্ব্বশ্রেয়ঃসাধন। অপার মহিমাময় নামে যদি শ্রদ্ধা না জন্মে, তাহা হইলে জীবের আর সুলভ নিঃশ্রেয়সের উপায় নাই। এইজন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্য জগতের হিতার্থে দেশে দেশে যাচিয়া নাম বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

পরমেশ্বর হরিতে যাঁহার ভক্তি দৃঢ় হইয়াছে, তাঁহার নিকট ভুক্তি, মুক্তি খদ্যোততুল্য। যাঁহাকে পাইলে আর কিছু লাভ বলিয়া মনে হয় না, প্রাণ তাঁহার জন্য কেন কাতর হয় না? হে করুণাসিন্ধো! হে প্রাণবল্লভ! হে অরবিন্দলোচন! আনন্দ-সিন্ধুতুল্য তোমার চরণারবিন্দ হংসগণ আশ্রয় করেন। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার চরণাশ্রয়কে যে সুখ বলিয়া মানে না, সে তোমার মায়ায় নিশ্চিত বঞ্চিত। হে দয়িতেশ্বর! হে নিখিলভুবনবন্ধো! কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি তোমায় ছাড়িতে পারে? হে হৃষীকেশ! তুমি দয়া করিয়া আমার ইন্দ্রিয়দিগকে তোমার রাতুল চরণে বাঁধিয়া দাও। আমি শক্তিহীন, ভক্তিহীন, সাধনভজনবিহীন, জ্ঞানহীন, দীনাতিদীন। তুমি দীনবন্ধু, অবশ্য তুমি দুর্দ্দিনে

এ সুদীনের প্রতি দয়া করিবে; এই আশায় তোমার কৃপা-আশায় কাল-সিন্ধুতীরে বসিয়া আছি। আশা আছে তুমি অনন্ত-দয়া-সিন্ধু, বিন্দুপানাশায় তোমার কূলে এসেছি। দেখো যেন সিন্ধুকূলে পিপাসায় প্রাণ না যায় আমার দেহ যেন তোমার সেবা করিতে করিতে অবসিত হয়। এ বাগ্‌যন্ত্র তোমার গুণ গান করিতে করিতে যেন নীরব হয়। এ নয়নদ্বয় তোমার ভুবনমোহন মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে যেন মুদিত হয়। মন, প্রাণ, সে দিনে যেন তোমার চরণ ছাড়া না হয়। জন্মে জন্মে যেন তোমায় হৃদয়-সিংহাসনে পূজা করিতে পাই; ইহাই চাই, আর কিছু চাহি না। যদি এ প্রার্থনা পূরাও, নাথ! তবে জানিব তুমি প্রকৃতই পতিতপাবন, প্রকৃতই দীনজন-বন্ধু, প্রকৃতই অগতির গতি, নিরুপায়ের উপায়।

প্রায়েন ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রয়াণং হি সতামহং। ১১।১১।৪৭

হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ হতে উৎপন্ন যে ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগ ব্যতীত সাধুদিগের একমাত্র আশ্রয় যে আমি, আমাকে পাইবার অন্য উপায় নাই। ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন, ভক্তি ব্যতীত আমাকে পাবার অন্য উপায় নাই। ভক্তিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবদ্বশীকারিণী। সুতরাং ভগবানকে পাইতে হইলে ভক্তির শরণাগতি ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অন্য কোন উপায়ে ভগবানের জ্ঞান জন্মিলেও ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের চরণে শরণাগত হইয়াছে, সে দেবতার নিকট, পিতৃ-লোকের নিকট, ঋষিদিগের নিকট বা প্রাণীদিগের নিকট ঋণী নহে। মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াই ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ হয়;—দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃ-ঋণ। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া ঋষিগণের ঋণ, দারপরিগ্রহ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ইহা না করিলে ঋণ শোধ হয় না। সুতরাং গৃহীর উক্ত ত্রিবিধ ঋণ শোধ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। কিন্তু যিনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে মুকুন্দের চরণারবিন্দে শরণ লইয়াছেন, তিনি আর কোন ঋণেই ঋণী নহেন। তিনি উক্ত ত্রিবিধ ঋণ শোধ না করিলেও অঋণী হইবেন।

দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং।
ন কিঙ্করো নায়মৃণীচ রাজন্॥
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং।
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং॥ ১১।৫।৩৭

কামাদি দুর্জ্জয় রিপুগণ বশীভূত না করিতে পারিলে বনে গিয়া গৈরিক বসন ধারণ ও মালা, ঝোলা, চিম্‌টা ধারণে কি ফল আছে? অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির গৃহে ও বনে কোনও প্রভেদ নাই; এবং তাদৃশ ব্যক্তির মন কখনও ভগবদারাধনার অনুকূল হইতে পারে না।

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ।
যতঃ স আস্তে সহ ষট্‌ সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য,
গৃহাশ্রমঃ কিং ন করোত্যবদ্যং?

যাহারা আত্মার উদ্ধারের চেষ্টা না করে, তাহারাই আত্মঘাতী। আত্মঘাতী অসাধু, অশান্ত, মূঢ় এবং স্ত্রীজাতির ক্রীড়ামৃগতুল্য, অর্থাৎ নারীরা যেভাবে খেলায় সেইভাবে খেলে, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের সহিত কখনও সঙ্গ করিবে না। তাহাতে সাধনার অশেষ বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে। অবিচ্ছিন্ন ধারায় গঙ্গার বারিরাশি-প্রবাহ যেমন সমুদ্রে পতিত হইতেছে, সেইরূপ চিত্তগতি অন্যবিষয়া না হইয়া সতত ভগবচ্চরণাসঙ্গী হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। জ্ঞান, জাতি, পদগৌরব, আভিজাত্য কিছুই মুকুন্দের প্রীতির কারণ নহে, তাঁর প্রতি অচলা ভক্তিই তাঁর প্রীতির কারণ। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন; ভাবই গ্রহণ করেন, বাহ্য কোন বস্তুতেই তাঁহাকে বশ করিতে পারে না। তবে, তিনি ভক্তের দত্ত পত্র, পুষ্প, ফল জলও সাদরে গ্রহণ করেন।

ভক্তে বিষ দিলেও তিনি খান, অভক্তে সুধা দিলেও সুধান্ না। ভক্তিই কেবল তাঁহাকে বাঁধিতে পারে, আর কিছুই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। ভক্তি তাঁহার বশীকারিণী শক্তি এবং আকর্ষণী। সুতরাং ভগবানকে পাইতে হইলে ভক্তি একান্ত আবশ্যক। তাঁহার অবিচ্ছিন্ন অপার করুণাধারায় বঞ্চিত থাকা জীবের চরম দুর্ভাগ্য। যুক্তি-তর্ক-বলে যে জিনিস না মিলে, সহজ বিশ্বাসে তাহা সহজে মিলে। উৎকট প্রযত্ন-বলে এই জীবনেই ঈশ্বরানুভব হইতে পারে। এখনও অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যদি বস্তু-লাভ হয়, তবে তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি কিছুই নাই। আমরা একখানি ছিন্ন বস্ত্র বা অচল একটি পয়সা হারাইলে, তজ্জন্য প্রাণ-পাত করি, দিবানিশি পুত্র, কলত্র, বিষয়-বিভবের শুভাশুভ চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাই, তাহার শতাংশের একাংশও যদি ভগবচ্চরণে তন্ময়তা স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে জীবন জন্ম সফল হইয়া যায়। বিষয়ীর

বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতির প্রতি টান, ধেনুর বৎসের প্রতি টান, এই তিন টান যখন ভগবানের প্রতি পড়িবে, তখন আর তিনি দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। অন্তরের ধন তখন বাহিরে এসে দেখা দিবেন। যত শোক, তাপ, যত যাতনা মৃত্যুভয়, এ সব তখন দূরে যাবে, হৃদয় শান্তি-সাগরে ভাসিবে। তখন প্রবাসের খেলা ফুরায়ে যাবে, নিজ দেশে প্রিয় সুহৃদের নিকট অবস্থান করিবে। সরিৎপতি যেমন যাবতীয় জলের নিধি, সেইরূপ ভগবান অনন্ত সুখসিন্ধু, অপার প্রেমনিধি। এক ভগবান ভিন্ন অন্য বস্তুতে ভালবাসা সম্ভবপর নহে। আমরা যাহা কিছু ভালবাসি, তাহা ভগবানের প্রতিবিম্ব বলিয়াই ভালবাসি। আমরা না বুঝিয়াও তাঁহাকেই ভালবাসি। তিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার সত্তা কোথায় নাই? তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপ ধ্যান করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার মূর্ত্তির রচনা করিয়া পূজা করি।

ভবদবদাহনে যখন প্রাণ-পাখী খাঁচা ছেড়ে পলাইতে চায়, তখন শান্তি-বারিধারা-আশে আমরা কাহার দিকে লক্ষ্য করি? সেই ধন্বন্তরি ভিন্ন শমন-তক্ষক-বিষে আর কে বাঁচাইতে পারে? মনুষ্য-জীবনে আমরা যতটা ভালবাসা, প্রেম কল্পনা করিতে পারি তাহার পূর্ণতা সেই ভগবানে। যাঁহার জগৎজীবন নাম জীবনে, পবনে বিরাজিত, অনন্ত জ্যোতি দিনকরকিরণে ব্যাপ্ত, যাঁহার অচিন্ত্য বিভূতি বিশাল ভুবনে বিস্তৃত, সেই পরম কারুণিক ভগবানই আমাদের একমাত্র সুহৃদ এবং প্রেমাস্পদ। তাঁহার চরণ-সরোজে যে মনোমধুপ মধুপান করে, সে জিতমৃত্যু ও অমৃতত্ব-প্রাপ্ত। তিনি সততই আমাদিগকে দেখেন, আমরাই তাঁহাকে দেখি না। তিনি সদাই আমাদিগকে ভালবাসেন, আমরাই তাঁহার প্রতি বিমুখ। পৃথিবীর প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু পরীক্ষা করিয়া দেখ, সর্ব্বত্র তাঁহার দয়ার পরিচয় পাইবে। সেই নির্ম্মাণদক্ষ বিশ্বপতির সৃষ্ট জীবদেহ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সবাইকেই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সৌরজগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়। জল-নিধির উদ্দাম নৃত্য দেখিলে বিশ্বপতির অদ্ভুত লীলা মনে হয়। যিনি শিব, অর্থাৎ মঙ্গলময়, যাঁর অভাবে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ শবতুল্য হয়, হায়! আমরা তাঁহারই প্রতি বিমুখ। আমরা অতি হতভাগ্য, তাই তাঁহার করুণায় বঞ্চিত হয়ে নিরবধি যাতনা-সাগরে ভাসিতেছি। তিনি স্বয়ং দুস্তরসাগর পার করিয়া দেবার জন্য হাত ধরিয়া লইতে চাহেন, কিন্তু আমরাই অগ্রসর হই না, অবিশ্বাসে আত্মহারা হই। অবিশ্বাসেই বঞ্চিত হইলাম, অবিশ্বাস আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন

করিল, তবুও জ্ঞানোদয় হইল না। স্বপ্নতুল্য দেহ, গেহ, পুত্র দারাদিতে গাঢ় প্রত্যয় জন্মিতেছে, আর নিত্য সত্য সনাতন ভগবানের অস্তিত্বে ঘোর অবিশ্বাস। তিনি গুরুরূপে, শাস্ত্ররূপে, কখনও বা স্বয়ং আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, আমরা তাহা শুনিয়াও বিশ্বাস করি না, দেখিয়াও চিনিতে পারি না। কি দগ্ধ ভাগ্য! কিছুতেই চেতনার উদয় হইল না, কিছুতেই মন কুপথ ছেড়ে সুপথে চলিল না। নিজ দোষে নিজের সর্ব্বনাশ ঘটিল, বৃথা বিলাপে এখন কি ফল হইবে? আমরা না বুঝিয়া ভগবানকে নিষ্ঠুর বলি। তিনি নিষ্ঠুর নন, তিনি করুণা-সাগর। আমরাই তাঁহার করুণা চাহি না, কিন্তু তিনি দয়া করিতে সততই প্রস্তুত। যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমরা সংসার-পারাবারে কখনও ডুবিতেছি, কখনও উঠিতেছি, কখনও ভাসিতেছি, কখনও হাবুডুবু খাইয়া দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইতেছি, তাঁহার চরণে শরণাগত না হইলে কিছুতে মায়া আমাদিগকে ছাড়িবে না। যে ভূতে আমাদিগকে ধরিয়াছে, তাহাকে যে সে বৈদ্য ছাড়াইতে পারিবে না। সেই বৈদ্যরাজ, ভবব্যাধি-শমন কালবরণ নীলরতন ভিন্ন আর কেহই সে ভূত তাড়াইতে পারিবে না। ভয়, শোক, তাপ, দুঃখ, এসব হতে মুক্ত হতে হইলে, ভগবানের চরণে শরণাগতি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ভবভয়ভঞ্জন রাধারমণের শরণ না লইলে কিছুতেই জীব শান্তি পাইবে না। মানব সুখ-শান্তির জন্য অগণ্য উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না। কৃত্রিম উপায়ে, বাহ্য বস্তুতে ক্ষণিক সুখ দিতে পারে, কিন্তু আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। তজ্জন্য রাধাগোবিন্দের চরণাশ্রয় একান্ত আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

গীতা-ধর্ম্ম।

লেখক—শ্রীমন্মথকুমার রায় বি, এল, বি, সি, এস্।

(৩)

গুরুবাক্য রাখি মনে, বিবেক মানিয়া—
হইনু করমে রত ; কিছু জমি নিয়া—
কৃষিকার্য্য আরম্ভিনু, পরিশ্রম করি ;—

পরের অধীনে হীন দাস্যবৃত্তি ছাড়ি।
স্বাধীন আয়াসে শ্রম করি সারাদিন
আপন জমিতে বসি,—নহি চিন্তা-ক্ষীণ।
যেমন ফসল পাই, ধান্য পাট আদি—
মালিকের কর আগে দিয়া যথাবিধি
জীবিকা অর্জ্জন করি,—যথা-প্রয়োজন,
বিলাস-সম্ভোগ লিপ্সা করিয়া বর্জ্জন।

জনক জননী ভ্রাতা ভগ্নী দারা সুত,
সকলের ভার লয়ে ভারবাহী মত—
করি কর্ম্ম নির্ব্বিকার;—কর্ত্তব্য যেমন
প্রত্যেকের প্রতি যথা—করিয়া সাধন
যাপিতে জীবন শুদ্ধ চেষ্টা করি সদা,
সহ্য করি জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝা বাধা।

যাহা সত্য যাহা ন্যায্য করিয়া গ্রহণ,
সংসারে কর্ত্তব্য-বোঝা করিতে বহন—
সুদৃঢ়-অন্তরে করি ঈশ্বর স্মরণ—
যিনি সব সুখ-শান্তি-শক্তির কারণ।

স্বকর্ম্ম করিয়া যাই—না ভাবিয়া ফল,
আসুক সুখের হর্ষ, কিম্বা অশ্রুজল;
লাভ ক্ষতি তুল্য জ্ঞান করিয়া অন্তরে—
মোহ-মায়া-আকর্ষণে বাঁধা নাহি পড়ে
পদ্মপত্রে জল মত বিশুদ্ধ জীবন
যাপিতে চাইছি সদা করি প্রাণপণ।

এইমত যায় দিন—একদা কি ভ্রমে
বড়ই গর্ব্বিত হনু নিজ বুদ্ধি-ক্রমে।
দুর্ব্বল মানব সদা রিপুর অধীন—
সহজে ভুলিয়া যায় জীবনের ঋণ।
সুখ-সম্পদের আলো সবে ভরে ঘর
করে না ঈশ্বরে আর ভরসা নির্ভর।

অহঙ্কারে ভাবে মনে—আমি সর্ব্বমুল
নিজশ্রমে সাঁতারিয়া পাইয়াছি কূল।
দুঃখের আবর্ত্তে নর বিভু-কৃপা চায়—
সুখের তরঙ্গে মোহে পুনঃ ভুলে যায়।

তাই ভ্রমে নিপতিত সুখের মোহেতে,
পাশরিয়া "শোক রোগ আছে এ জগতে"—
পত্নী-পুত্র-মায়াজালে হইয়া নিবদ্ধ—
আনন্দে ডুবিয়া গেনু ; হইনু অবাধ্য
বিবেকের নীতি-মর্ম্মে , বুদ্ধির আবেশে
জড়ায়ে পড়িনু ক্রমে চিন্তা-ভয়-পাশে।
ভাবিতে লাগিনু মোহে—"আমার সংসার,
আমার বিভব-বিত্ত, পুত্র পরিবার ;
আমার এ সুখৈশ্বর্য্য রবে চিরদিন
হবে না জীবনগতি কখনো মলিন।"
জীবন যে গড়া ভবে সুখ দুঃখ দিয়া—
সম্পদ লভিয়া কিছু, গেনু পাশরিয়া—
গুরুর সে উপদেশ—"সুখে দুঃখে সম
রহিবে অটল স্থির, যেন মন মম
সুখের আনন্দে হর্ষে না হয় মগন,
দুঃখের আঘাতে কিম্বা না ভাঙে কখন।"
এইরূপে যায় দিন—হঠাৎ বিপাকে
পড়িনু ভাগ্যের দোষে ; নানা দুঃখ-শোকে
জর্জ্জরিত হনু আমি—বৃষ্টির অভাবে
শস্য সব গেল মরে খর-রৌদ্র-তাপে
দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিল দেশ জুড়ি
সঙ্গে সঙ্গে এলো হায় রোগ মহামারি।
অশন-বসন-দায় হলো উপস্থিত,
কেমনে সংসার চলে—উপায় বিহিত
না পাই খুঁজিয়া কিছু, পত্নী-পুত্র-দুঃখ
দেখিয়া বিদীর্ণ-প্রায় হলো মম বুক ;

কি করি কি করি ভাবি বসি অহর্নিশ—
সতত দংশন করে চিন্তা-আশীবিষ।

এমন সময়ে হায় কলেরা রাক্ষসী
কাড়িয়া লইল মোর প্রাণের প্রেয়সী ;
হইনু পাগল আমি শোকের আবেগে,
কত গালি বিধাতায় দিনু অতি রাগে,
সংসার আঁধার হলো—ভাঙিল উদ্যান,
তথাপি হলোনা শেষ সব অকল্যাণ।
পত্নীর পশ্চাতে পুত্র পড়িল যে রোগে,
হায় হায় কি বিপদ আসি একযোগে
ধরিল আমারে বেড়ি—দুঃসহ সঙ্কট—
অন্তরে জাগিল ক্ষোভ ভীষণ বিকট।

উপায় না হেরি তবে—গুরুর বচন
অবশেষে অকস্মাৎ হইল স্মরণ।
আহ্বান করিনু তাঁরে মনঃ-প্রাণ দিয়া—
এস এস গুরুদেব কৃপা প্রকাশিয়া—
জীবন দুর্ব্বিহ মম—পুত্র বুঝি যায়
এস এস কর ত্রাণ—এ বিষম দায়।

আকুল রোদন বুঝি পৌঁছিল সে প্রাণে
সে দিন সন্ধ্যায় যবে দিবা-অবসানে—
জ্যোতির বিকাশ আমি করিনু দর্শন ;
সম্মুখে দেখিনু দেব—প্রসন্ন বদন,
হস্ত তুলি আশীর্ব্বাদ করিয়া আমায়
কহিলেন সারবাণী—দৈববাণী-প্রায়॥

(ক্রমশঃ)

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"প্রাচ্য প্রতীচ্যে কোনও প্রকৃত প্রভেদ আছে কিনা" এই প্রশ্ন শুনিলেই লোকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। যাঁহারা কোনও বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই অভিমত প্রকাশ-তৎপর, তাঁহারা এই প্রশ্ন শ্রবণমাত্রই বলিয়া উঠিবেন "প্রভেদ আছে। যথেষ্টই আছে।" তাঁহারা কেবল বাহ্য প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলিয়া থাকেন। এরূপ বলাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তির গবেষণাপ্রসূত উত্তর একটু অন্য ভাবের। কারণ তাঁহাদের মত এই যে আপাততঃ দৃষ্টিতে বাহ্য আকার-প্রকারে, আচার -ব্যবহারে ও পরিণামে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হইলেও বস্তুতঃ উভয়ের গতি একই দিকে এবং লক্ষ্যও একরূপ। কার্য্যতঃ এক হইলেও কেন উভয়ের মধ্যে এরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃতই একটু চিন্তার বিষয়। আমরাও মানব, তাহারাও মানব। একই পরমেশ্বরের সৃষ্ট। তবে কেন এরূপ হয়? ইহার উত্তর অতীব সরল ও সহজ। একটু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই উহা সহজে বোধগম্য হইবে। এখন দেখা যাউক, এই বৈষম্যের মূল কারণ কোথায়।

প্রত্যেক বস্তুই দেশকাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন হয়। যেরূপ ব্যক্তিগত বিশেষত্বের জন্য সকল ব্যক্তিরই উপাস্যদেবতা (মুখে বলিলেও কার্য্যতঃ) এক হয় না বা হইতে পারে না; সেইরূপ সকল ব্যক্তিরই প্রকৃতি, আচার ও কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ, কথাতেই বলে যে; "আপ্‌রুচি খানা, পররুচি পিন্‌না" অর্থাৎ আপন রুচি-অনুসারে খানা (আহার) ও (আমার ইচ্ছা না থাকিলেও অপরের তীব্র সমালোচনার ভয়েই হোক বা অন্য কারণে) পরের রুচি-অনুসারে বসন-ভূষণাদি-পরিধান (পিন্‌না) বা সাজসজ্জা হইয়া থাকে। কথাটা খুবই সত্য। কেননা, রামের যাহা ভাল লাগে শ্যামের তাহা ভাল নাও লাগিতে পারে। আমার চক্ষে যাহা ভাল, আপনার চক্ষে তাহা ভাল নাও হইতে পারে। দেশকালপাত্র-ভেদে রুচি ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়, সেইজন্য পোষাক পরিচ্ছদাদিও বিভিন্ন না হইয়া পারে না। বাহ্য প্রকৃতির পার্থক্য-নিবন্ধন, মানব-প্রকৃতিও পৃথক হয়। দেখুন গ্রীষ্ম-প্রধানদেশে তাপের আধিক্যহেতু সকল বিষয়েই শিথিলভাব দৃষ্ট হয়। সকলেরই

ভাব বহির্ম্মুখ, সেইজন্য সাধারণতঃ মৃত্তিকা শিথিল, বিশ্লিষ্ট ও ধূলিপ্রবণ। জল্ তরল, মানব ধীর ও অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমী ও আলস্য-পরায়ণ, কাজে কাজেই অদৃষ্টবাদী। ইহাদের আহার স্নিগ্ধদ্রব্য; কিন্তু শীতপ্রধানদেশে সমস্তই ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সব ভাবই অন্তর্মুখ, তাই মৃত্তিকা কঠিন, ঘনসন্নিবিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত সংযত (সংহত); জল প্রায়শঃ ঘন (এমন কি সময় সময় কঠিন তুষারেও পরিণত।) মানব স্বার্থপর চঞ্চলপ্রকৃতি, কর্ম্মঠ সুতরাং পুরুষকারবাদী (কারণ দারুণ শীতে অদৃষ্টবাদিতার আলস্য সহ্য হয় না—শীতে মানুষের জীবন যেন অসহ্য হইয়া উঠে।) আহার উষ্ণ ও উগ্রবীর্য্য দ্রব্যাদি, (যাহা দারুণ শীতের মধ্যেও রক্তকে তরল অবস্থায় রাখিতে পারে।) সেইরূপ উপাসনাক্ষেত্রেও উভয়দেশে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শীতপ্রধান দেশে লোকের প্রকৃতি সাধারণতঃ অসহিষ্ণু ও চঞ্চল। তাহারা কোনও বিষয়ে অধিকক্ষণ মন স্থির রাখিতে পারে না। সেইজন্য তাহারা পরের বিষয় বেশী ভাবিতে চায় না বা পারে না। কাজে কাজেই তাহারা স্বার্থপর ও স্ব-স্ব প্রধান। তাই এমত সেমত করিয়া ক্রমাগত মতের পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অবশেষে একেশ্বরবাদই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে ও নিরাকারের (পরমেশ্বরের) উপাসনায় রত হয়। কিন্তু যার মন বশে নয়, দেবতায় তাহার বিশ্বাস স্থায়ী হইতে পারে না। তাই সাধকশ্রেষ্ঠ ৺রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার।" সাধনায় ফল হইল না, ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশই প্রবল হইতে লাগিল, মন বশে থাকিল না, বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া দেবতাও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মানব বিশ্বাস হারাইল। অধঃপতিত হইতে হইতে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম ভুলিয়া ও অমান্য করিয়া জড়বাদের আপাতমধুর গভীর গর্ত্তে নিপতিত হইল। আর উঠিবার শক্তি রহিল না। তাহারা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, নীতি বিস্মৃত হইয়া ঘোর স্বার্থপর ও পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। হিংসা, দ্বেষ, বিরোধ, যুদ্ধবিগ্রহাদি অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিল। নিজেরা অসুখী হইয়া উষ্ণ হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে জগতের শান্তিময় বায়ু উষ্ণ ও বিষাক্ত করিয়া তুলিল।

এদিকে উষ্ণপ্রধান দেশেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জলবায়ুর গুণে মানব শৈথিল্য ও ঈশ্বরে অতিরিক্ত আস্থাবশতঃ ক্রমে ক্রমে অদৃষ্টবাদী ও অলস হইয়া স্বীয় জীবন দুঃখময় করিয়া তুলিল। অদৃষ্টবাদিতার জন্য সহজ আত্ম-নির্ভরশক্তি বা স্বাবলম্বন হারাইল। কাজেই একান্নভুক্ত ও পরভাগ্যোপ

হইয়া পড়িল। পরের উপর নির্ভর করা ব্যতিরেকে তাহার আর অন্য কোনও উপায় রহিল না। মানব রিপুপরতন্ত্র ও আলস্যের দাস হইল। নিজেদের কৃত পাপজ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইয়া গেল। জড়-বাদীদের কথায় মুগ্ধ হইয়া বিলাসস্রোতে ভাসমান হইল। প্রতীচ্যের আনীত তীব্র আলোকে অন্ধ হইয়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইল। দুঃখ ও শাস্তির সীমা রহিল না।

কিন্তু পরিণাম একরূপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ের শিক্ষাদীক্ষার ফলে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। সেইজন্য উন্নতির সময় প্রতীচ্য পুরুষকারে অত্যধিক বিশ্বাসের ফলে তীব্র উত্তেজনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া উন্নতির পথে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হয় এবং ত্বরায় তমোভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়া ধ্বংসের পিচ্ছিল পথ অধিকতর সহজ (সুগম) করিয়া লয়। আর প্রাচ্য, অদৃষ্টবাদ ও ঈশ্বরে অত্যধিক বিশ্বাসহেতু অটলহৃদয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সোপান অবলম্বনে উন্নতির পথে অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে অগ্রসর হয়। এবং প্রথমে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন থাকিলেও বাসনাময় সংসারের সহবাসে ও তীব্র তাড়নায় ক্রমশঃ রাজসিকতার মধ্য দিয়া তামসিকতায় ঢলিয়া পড়ে। তবে প্রভেদ এই যে প্রকৃত চেষ্টার পর কার্য্যে বিফল-মনোরথ হইলে প্রতীচ্য হতাশ হইয়া যথেচ্ছাচারী, উন্মাদ-প্রায় ও এমন কি সময় সময় আত্মঘাতী হইয়া উঠে, আর প্রাচ্য বিফল-মনোরথ হইলেও আশার ক্ষীণ আলোকে ভবিষ্যৎ উন্নতির মন্দির আলোকিত রাখিতে চেষ্টা করে এবং আর্য্যঋষিগণের পুণ্য-প্রভাবে ও সুশিক্ষার ফলে অকৃতকার্য্যতার মধ্যেও মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্তের আভাস দেখিয়া মনকে প্রবোধ-দানে সক্ষম হয়। সেইরূপ পতনের সময়ও চিরাভ্যস্ত দারুণ উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতীচ্য অবসাদগ্রস্ত হইয়া হতাশভাবে পতিত হয়; আর প্রাচ্য চিরাগত সংস্কার ও অতি নির্ভরতার পরিণাম-স্বরূপ আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য অধোগামী হয়। কিন্তু তথাপি সে হতাশ না হইয়া মনে করে "চিরদিন কভু সমান না যায়" "এ সব দিন নেহি রহেগা।"

উপসংহারে বক্তব্য এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই চরিত্রগত স্বাভাবিক প্রভেদ বিস্মৃত হওয়ায় আমাদের দেশে আজকাল সংস্কার-বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু হিন্দু না হইয়া, হয় হিন্দুত্বের অসার অংশ সবলে ধারণ করিয়া আপনাকে প্রকৃত হিন্দু মনে করিতেছেন, নয় হিন্দুর ধর্ম্ম অসার ভাবিয়া অহিন্দু হইতেছেন। এ দুটির কোনটিই ভাল নয়। মনে রাখিতে হইবে যে

সংস্কারাদি কার্য্যে যাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় চরিত্র রক্ষা করিয়া আমাদের জাতির উন্নতির উপযোগী তাহাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা, বিবাহ, ধর্ম্ম-পালন ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে আজকাল যথেষ্ট ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে, কারণ পল্লবগ্রাহিতাই আধুনিক যুগের বিশেষত্ব। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণই যেন বিষম গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যাহা করিবে আমাদেরও তাই করিতে হইবে। কেন? তাহার উত্তর নাই। তাহারা দারুণ গ্রীষ্মে ৫টা জামা পরে, আমাকেও পরিতে হইবে। তাহারা ঈশ্বর মানে না, আমিও তাই। তাহারা ভাল মাখম, ভাল দুধ ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য খায়, আমি কিন্তু খাই পুঁইশাক আর ঘুষো চিংড়ী। তাহারা ৫০০।৭০০ টাকা মাইনে পায়; আমি পাই ৭৫।১০০ টাকা। তবু তাদের মত হওয়া চাই বেশতো, তাদের ভালটা লও, মন্দটা বাদ দেও না কেন? সে বেলায় নয়। তাই দেশের আজ এই দুরবস্থা।

চিত্তরঞ্জন-স্মৃতি।

লেখক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ,

অধ্যাপক, পাটনা কলেজ।

(১)

দেশবন্ধু সম্বন্ধে অনেক মহারথী অনেক কথা লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। তাঁহার কথা অবশ্য ফুরাইবার নয় এবং যখন প্রথিতনামা লেখকগণ অনেক কথা বলিয়াছেন, তখন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র স্কুলমাষ্টারের তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখা সমীচীন হইবে কিনা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অপিচ, অন্যতম স্কুলমাষ্টার—মাষ্টারগণের শীর্ষস্থানীয় একজন যখন তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে "মরার উপর খাঁড়ার ঘা' দিয়াছেন," তখন কি লিখিতে কি লিখিব সেই ভয়ে এতদিন চুপ করিয়াছিলাম। কিন্তু দেশবন্ধুর সম্বন্ধে আমি একটা কথা জানি, যাহা বাঁকিপুরের ৩।৪ জন ব্যতীত অন্য কেহই জানেন না—আর সেই কথাটায় সেই মহাপ্রাণের প্রাণের প্রকৃত চিত্র পাওয়া সহজ, তজ্জন্য কিছু না লিখিয়াও থাকিতে পারিতেছি না।

১৩২২ সালে বাঁকিপুরে তাঁহার সহিত আমার প্রথম দেখা হয়। তৎপূর্ব্বে কলিকাতা সাহিত্যসম্মিলনে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম এবং বোধ হয় যেন শুনিয়াছিলাম যে কলিকাতা সাহিত্যসম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, সে দূর হইতেই দেখা—নিকটে যাইতে সাহসে কুলায় নাই। ইহার পূর্ব্বে আর কোন দিন তাঁহাকে দেখি নাই, তবে 'বরিশাল-হিতৈষী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন মহাশয়ের মোকর্দ্দমা কলিকাতা হাইকোর্টে আসিলে চিত্তরঞ্জন পারিশ্রমিক না লইয়াই কার্য্য করিয়াছিলেন ইহা জানিতাম এবং পরে 'নারায়ণ'রূপে শ্রীযুক্ত অরবিন্দকে রক্ষা করিয়াছিলেন এ সংবাদও অবশ্যই অবগত ছিলাম।

ঠিক যে কোন্ মাসে তাঁহাকে প্রথম দেখি তাহা মনে নাই। তিনি কি একটা মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিতে বাঁকিপুরে আসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ (অধুনা মান্যবর বিচারক) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছিলেন। একদিন বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া দেখি পূর্ণেন্দু বাবুর (বিহার ও উড়িষ্যার প্রবাসী বাঙ্গালীর নেতা ৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্) একখানি "চিরকুট্"—বৈকালে পাঁচটার পরে চিত্তরঞ্জনের সহিত দেখা করিতে যাইবেন, সঙ্গে যাইতে হইবে। তখন বাঁকিপুরে সাহিত্যসম্মিলনের কথাবার্ত্তা চলিতেছে; সভাপতি লইয়া জল্পনা কল্পনা হইতেছে। চিত্তরঞ্জনের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে—কিছু চাঁদাও আদায় করিতে হইবে। সঙ্গে আরও যাইবেন, অন্যতম প্রবীণ উকীল অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ। যথাসময়ে পূর্ণেন্দু বাবু আসিয়া মথুর বাবুকে ও আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মোটরে চলিলেন।

চিত্তরঞ্জন সেইদিন প্রাতেই পাঞ্জাব মেলে কলিকাতা হইতে বাঁকিপুরে আসিয়াছেন এবং আমাদের পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আদালত হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। পূর্ণেন্দু বাবু আমাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। মথুর বাবু যে চিত্তরঞ্জনের বাল্যবন্ধু ছিলেন তাহা আমরা জানিতাম না—মথুর বাবুও কোন দিন আমাদের সে কথা বলেন নাই। মথুর বাবুকে দেখিয়াই চিত্তরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, "মথুর, কেমন আছিস্?" আমরা ত অবাক্! স্বয়ং মথুর বাবুও কিছুক্ষণ চুপ। ফিরিবার সময় মথুর বাবু আমাদিগকে বলিলেন যে চিত্ত ও তিনি বাল্যবন্ধু। খুব মেশামেশী ছিল—কিন্তু চিত্ত তখন খুবই বড়, পাছে না চিনিতে পারেন, এই ভয়ে আর তিনি পূর্ব্বে সে কথা বলেন নাই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন খুব বড়—তাঁর অন্তঃকরণও

খুব বড়। সুতরাং মথুর বাবুকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই—বহুদিনের পরে দেখা হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াই সেই ছোটবেলার ভাবেই ডাকিয়া "তু তুকারী" বলিয়া কথা বলিতে লাগিলেন।

কলিকাতা হইতে চিত্তরঞ্জন ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য রসগোল্লা আনিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীটী আমাশয়ে ভুগিতেছিলেন। সেইজন্যই হৌক অথবা হাঁড়ী আকারে বড় ছিল বলিয়াই হৌক, অথবা বাল্যবন্ধুর সহিত বহুদিন পরে মধুর মিলন হইবার জন্যই হউক, আমাদিগের জন্য রসগোল্লা আসিল। চিত্তরঞ্জন তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিজেই পরিবেশন করিতে লাগিলেন। চাকরের হাত দিয়া রসগোল্লা দিতে বোধ হয় তাঁহার ভাল লাগে নাই—অথবা নিজে পরিবেশন করিলে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় সেই তৃপ্তি-ভোগের জন্যই দাঁড়াইয়া আমাদের রসগোল্লা দিতে লাগিলেন। পূর্ণেন্দু বাবু একটী লইয়াই হাত গুটাইলেন, মথুর বাবুও প্রায় তাই। সুতরাং এই দুই সিংহ এত শীঘ্র রণে পরাজয় স্বীকার করাতে সিংহের অংশ আমার ঘাড়েই পড়িল। আমি না না করিলেও তিনি ছাড়িলেন না। "কলিকাতার রসগোল্লা," "ছেলেমানুষের রসগোল্লায় আপত্তি আশ্চর্য্যের কথা" প্রভৃতিতে অনেকগুলি রসগোল্লা দ্বারা উদর তৃপ্ত হইল—আর অধিকতর তৃপ্তিবোধ হইল তাঁহার মিষ্ট কথায়। রসগোল্লার সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। "নারায়ণের" জন্য গোটা দুই প্রবন্ধের জন্য অনুগ্রহ করিয়া অনুরোধ করিলেন। অবশ্য এ আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলাম এবং ইহারই ফলে যতদিন "নারায়ণ" চলিয়াছিল, ততদিনই বিনামূল্যে "নারায়ণ" পাইয়াছিলাম। দশম বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন সম্বন্ধেও ২।৪টী কথাবার্ত্তা হইল। সেদিন কিন্তু আর বেশী কোন কথা হইল না—কারণ ভ্রাতুষ্পুত্রীটীকে দেখিবার জন্য চিকিৎসক আসিলেন। আমরা দেখিলাম চিত্তরঞ্জন উহার অসুখের জন্য বেশ একটু চিন্তিত।

কয়েকদিন পরে চিত্তরঞ্জন মথুর বাবু ও আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বাঁকিপুরে থাকিবার সময়, চিত্তরঞ্জনের ব্যবহারার্থ প্রথিতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত হাসান ইমাম্ তাঁহার "মোটর"গাড়ী খানি দিতেন—চিত্তরঞ্জন আমাদিগের জন্য সেই গাড়ীখানি পাঠাইয়াছিলেন—আহারান্তে আমরা সেই গাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। কারণ, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন যে মথুর বাবুর গাড়ী নাই—আর আমার ত' অবশ্য কথাই নাই। আহারের সময় "নারায়ণ" সম্বন্ধে ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। মথুর বাবু, চিত্তরঞ্জনের অনু-

রোধে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর "সারদামঙ্গল" হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে জানিতাম না দাদার (মথুর বাবুর) এত গুণ। পঠদ্দশায় মথুর বাবু অনেক সময় তাঁহাদের "ক্লাবে" আবৃত্তি করিতেন—সে কথা চিত্তরঞ্জন ভুলেন নাই। মথুর বাবু গদ্গদস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, আর চিত্তরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ঃ—দেখিলাম তাঁহারও ইহা মুখস্থ।

"এস মা করুণারাণী, ও বিধুবদনখানি, হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিগো আবার ;
শুনে সে উদার কথা, জুড়াক্ মনের ব্যথা, এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, এস না এ যোগিজন-তপোবন-স্থলে।"

(২)

বাঁকিপুরে সাহিত্যসম্মিলনের দশম অধিবেশন হইল। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণকে লিখিয়া কলিকাতার পার্শ্বেল এক্স্‌প্রেসের সহিত কতকগুলি প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যমশ্রেণীর গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হয়। মূল সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যশাখার সভাপতি চিত্তরঞ্জন, বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় এবং দর্শনের সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সব এই গাড়ীতে। ইতিহাসের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পূর্ব্বদিনে পৌঁছিয়াছিলেন। সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যের বিক্রমাদিত্য স্যার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ। প্লাটফর্ম্মের একপার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্ব পর্য্যন্ত ন স্থানং তিল-ধারণং। ইহাঁকে দেখা, উহাঁর গাড়ীর বন্দোবস্ত করা, বাসা নির্দ্দেশ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পূর্ণেন্দু বাবু হইতে ছোট স্বেচ্ছাসেবক পর্য্যন্ত সকলে ত্রস্ত। ওদিকে পার হইবার পুলের উপরেও লোকারণ্য। বঙ্গের বাহিরে প্রথম সাহিত্যসম্মিলন। (অবশ্য ইতিপূর্ব্বে ভাগলপুরে সম্মিলন হইলেও তখন বিহার বঙ্গ হইতে পৃথক হয় নাই।) বঙ্গের বাহিরে এই মহাযজ্ঞে মহারথিগণ আসিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের কথা দূরে থাকুক, বিহারী ভদ্রলোকগণও কি করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যাহা হৌক সকলকে গাড়ীতে উঠাইয়া জিনিষপত্র পৌঁছাইয়া দিয়া কার্য্যালয়ে আসিবার পরক্ষণেই সংবাদ পাইলাম যে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আনীত কলিকাতার তামাক হারাইয়া গিয়াছে, পাওয়া যাইতেছে না। প্রথমটা এ সংবাদে হাসিয়া উঠিলাম। পাটনা—নবাব বাদশাহদের স্থান, এখানে তামাকের ভাবনা। শুনিবামাত্র শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ মহাশয় সহরে সংবাদ পাঠাইলেন। মোটরে করিয়া স্বেচ্ছাসেবক চলিয়া গেল—সহরের অন্যতম

নবাবের ব্যবহৃত তামাক আসিয়া পৌঁছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বাসায় প্রেরিত হইল। কিন্তু সে তামাকেও তাঁহার তৃষা মিটিল না। শুনিলাম, কলিকাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাক ফরমাস দিয়া তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইত। কথাটা খুব ছোট—কিন্তু, যাঁহারা আষাঢ়ের 'বসুমতী'তে রাখালের (শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের) লেখা প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারাই এ বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন। কারণ চিত্তরঞ্জন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তামাকু-সেবনও ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সম্মিলনের সময় চিত্তরঞ্জনকে স্বতন্ত্র একটি বাসা দেওয়া হইয়াছিল। কারণ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় যে বাসাটীতে থাকিতেন, তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল। তাঁহার সঙ্গে শ্রীমান্ চিররঞ্জন, শ্রীযুক্তেশ্বরী বাসন্তী দেবী ও তাঁহার ভগ্নীপতি ছিলেন। এদিকে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী এ বন্দোবস্তে খুব রাগিয়া গেলেন। অবশেষে তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইল—চিত্তরঞ্জন থাকিবেন সম্মিলন-প্রদত্ত বাসায়—খাইবেন ভ্রাতৃজায়ার ওখানে। সম্মিলন-স্থল হইতে তাঁহার বাসা প্রায় পাঁচ মাইল। সম্মিলন প্রথমদিন একাদশ ঘটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরদিবসদ্বয় প্রাতে আটটার সময় আরম্ভ হইত। স্যার আশুতোষকে প্রথমদিন সভা-ভঙ্গের পরেই বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল—সুতরাং অবশিষ্ট দুইদিন চিত্তরঞ্জনকেই সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। প্রাতে তাঁহার জন্য মোটর লইয়া যাইতাম এবং সভা-ভঙ্গের পরে তিনি আহারাদির জন্য চলিয়া যাইতেন। দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে সভাভঙ্গের পরে পাঁচকড়ি বাবু, সমাজপতি মহাশয়, হেমেন দা' (শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়) ও আমাদের কয়েকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বেলা অধিক হইয়া গেল। তখন দেখা গেল সেখানে একখানি মোটরও নাই। গাড়ী করিয়া সেই সময় পাঁচমাইল পথ যাওয়া সহজ কথা নহে। আমরাত' কিছুতেই তাঁহাকে "ছক্কড়ে" যাইতে দিব না—তিনি বলিলেন একখানা এক্কা আনুন না। দ্বিজেন্দ্রলালের "বিঘোরে বিহারে চড়িনু এক্কা" দেখা যাউক কেমন হয়। পাঁচকড়ি বাবু বলিলেন ধূপ ধাপ বিষম ধাক্কার অপেক্ষাও যদি আর কিছু হয় তাও বোধ হয় সহিতে পারিবে। খুব হাসি চলিতে লাগিল—ইতিমধ্যে একখানা মোটর আসিয়া পড়িল।

সম্মিলন ত হইয়া গেল। হিসাব শোধ করিবার সময় দেখা গেল—হাজার টাকার দেনা। উপায়? কোন উপায় মনে হইল না। অভ্যর্থনা-সমিতির

সভাপতি পূর্ণেন্দু বাবুর বরাবরই আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। তাঁহার খরচও সম্মিলন উপলক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ কি করিয়া দেনা শোধ করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। পূর্ব্ব হইতেই আমরা তাঁহাকে একটু চাপিয়া চুপিয়া চলিতে বলিয়াছিলাম—তিনি শোনেন নাই। এমন সময়ে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল।

হঠাৎ একদিন শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ মহাশয় আমাকে আসিয়া বলিলেন, "সমাদ্দার মহাশয়! "নারায়ণ" রক্ষা করিয়াছেন।" আমিত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন যে কলিকাতা হইতে অজ্ঞাতনামা একটী লোক একহাজার টাকার একখানি নোট সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পাঠাইয়াছেন। নোটের সঙ্গে সামান্য একটু চোথা কাগজে লেখা "কোন বন্ধুর দান।" মথুর বাবুও প্রথমে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে বলিলেন যে চিত্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে দেনা টেনা হয়নি ত এবং তিনি কথাপ্রসঙ্গে হাজার টাকার দেনার কথা বলিয়াছিলেন। বোঝা গেল এ কার দান—এ অযাচিত, অপ্রত্যাশিত দান কাহার। কয়েকদিন পরে যখন তাঁহার সহিত দেখা হইল, টাকার কথা উত্থাপন করিতেই তিনি বলিলেন যে টাকাটা কে পাঠাইয়াছেন তাহা যখন জানা নাই তখন আর ওসম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল। একটু পরে বলিলেন যে, যে দিয়াছে যখন সে অজ্ঞাত থাকিতে চায়, তখন চুপ করিয়া থাকাই কর্ত্তব্য। চিত্তরঞ্জনের ইহাই মহত্ত্ব। বাইবেলে আছে তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিবে, তাহা যেন তোমার বাম হস্ত না জানে। তাই চিত্তরঞ্জন কিছুতেই একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে দেন নাই। আজ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধে "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিয়াছেন। তিনি এ হাজার টাকার দানের কথা খুবই জানেন। তিনি বাঁকিপুরে দশম বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন। আজ তিনি তাঁহার বন্ধুর সম্পাদিত কাগজে স্বর্গগত ব্যক্তির চরিত্রালোচনা করিয়া দেশবাসীকে যে মর্ম্মাহত করিয়াছেন, সেই নিন্দিত ব্যক্তির দান না পাইলে তিনি সে সময়ে কি করিতেন? মোকর্দ্দমা হইলে তিনি কি বাদ যাইতেন? চিত্তরঞ্জন স্বর্গে, তাই আজ এ ঘটনাটা—এই মহাদানের কথা—অহৈতুক দানের কথা লিখিতেছি এবং তিনি যে আমাদিগকে—সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষকে কি দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন তাই মনে পড়িয়া আবেগে হৃদয় আপ্লুত হইতেছে। নিমকহারাম আমরা,

তাই আমাদের সকল কথা মনে থাকে না। সেকস্‌পিয়র আণ্টনির মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন—

"The evil that men do lives after them,
The good is oft interred with their bones."

এ কথাটাই আমাদের মনে থাকে। তাই স্যার আশুতোষের তিরোধানের পরে, দেশবন্ধুর স্বর্গারোহণান্তে, আমরা তাঁহাদের নিন্দা করিয়া তৃপ্তি পাই।

(৩)

ইহার পরে একদিন কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে দেখা হয়। সে আদর যত্ন বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর নহে। সেদিনও তিনি মোকর্দ্দমা উপলক্ষে বাঁকি-পুরে আসিতেছিলেন। বলিলেন, অনেকদিন বাঁকিপুরের বন্ধুদের সহিত দেখা হয় না। সকলের সহিত দেখা করিতে চাই। ২।৩ দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া আমারই বাসায় ছোট খাটো সান্ধ্যসম্মিলনের ব্যবস্থা হইল। বাঁকিপুরে যে সকল সাহিত্যিক ছিলেন, একজন ব্যতীত সকলেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া, তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্যসুখ ভোগ করিলেন। চিত্তরঞ্জনের সহিত (ভাগলপুরের) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল মহাশয় এবং অন্য একজন কে আসিয়াছিলেন। সুকণ্ঠ উপেন্দ্র বাবু চিত্তরঞ্জন-রচিত গানটী গাহিলেন :—

"মিটায়োনা এই পিয়াসা এইত আমার মিষ্টি লাগে,
ওগো বিরহী, চির-বিরহী এ তৃষ্ণা যেন নিত্য জাগে।
মিলন আমি চাহি না যে হে
এই পিয়াসা যেন থাকে,
চোখের জলে এত মধু!
প্রাণ-বঁধু, হে প্রাণ-বঁধু!
মুছায়োনা চোখের বারি নাই বা এলে আঁখির আগে।
নাই বা হ'ল মিলন যদি এই বিরহ নিত্য জাগে।"

(নারায়ণ, ২য় বর্ষ)

আর ২।৩ খানি গানের পর চিত্তরঞ্জন, ঢাকা সাহিত্যসম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পূর্ব্বে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং যাহা এখনও কোন সংবাদপত্রে ছাপা হইয়াছিল না (অতঃপর ইহা "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল) তাহা পাঠ করিলেন। গান, গল্প, সবই চলিতে লাগিল। রাত্রি বারোটারও পরে তিনি ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ প্রস্থান করিলেন।

২। ৩ দিন পরেই পূর্ণেন্দু বাবু তাঁহার বাটীতে চিত্তরঞ্জনের স্বাগতার্থ জন্য একটী সান্ধ্যসম্মিলনের ব্যবস্থা করিলেন। সে সময় পূর্ণেন্দু বাবুর বাটীতে কাশি হইতে একজন ভাল কীর্ত্তনিয়া আসিয়াছিলেন। কীর্ত্তনে চিত্তরঞ্জন গলিয়া গেলেন। তিনি উহা যে কত ভাল বাসিতেন, প্রতি কীর্ত্তনে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে লাগিল—কারণ তিনি গলদশ্রু হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

(৪)

বহুদিন আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। দেশবন্ধু অসুস্থ হইয়া পাটনায় আসিয়াছেন। দেখা করিবার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু শুনিলাম তিনি কাহারও সহিত দেখা করেন না। চিকিৎসকে নিষেধ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শুনিলাম একটী ভদ্রলোক তাঁহার কোন আত্মীয়ের চাকুরীর জন্য দেশবন্ধুর নিকটে গিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটী আমার বিশেষ পরিচিত, কথাপ্রসঙ্গে দেশবন্ধুর নিকট এই কথা বলাতেই তিনি বলিয়াছিলেন যোগীন বাবু যদি আমাকে বলেন তবে চাকুরী পাইবেন। এই সংবাদ পাইয়া এবং তিনি দেখা করিতেছেন জানিয়া দেখা করিতে গেলাম, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ দেখা পাইলাম না। সেদিন কলিকাতা এবং বোধ হয় অন্যস্থান হইতেও কি একটা পরামর্শের জন্য অনেকে আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য দেখা হইল না।

কয়েকদিন পরে সুহৃৎ-পরিষদে "মণীন্দ্রহলের" দ্বার-উন্মোচনের ভার তাঁহার উপরে পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের বিক্রমাদিত্য স্যার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় যেবার বাঁকিপুরে আইসেন, সেই বার আমাদের অনুরোধে তিনি স্থানীয় "সুহৃৎপরিষৎ ও হেমচন্দ্র লাইব্রারীর" দ্বিতলের ব্যয়-নির্ব্বাহের অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অর্থে দ্বিতল নির্ম্মিত হয়। দেশবন্ধুকে এই মণীন্দ্রহলের দ্বার উন্মোচনের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সহজেই স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় সুহৃৎপরিষদের সভাপতি, নিমন্ত্রণপত্রও তাঁহার নাম ছিল; কিন্তু সভার সময় তাঁহাকে দেখা গেল না—হঠাৎ অসুস্থ হইয়া তিনি দার্জ্জিলিং চলিয়া যান। তাঁহার অনুপস্থিতিতে কয়েকটী কার্য্যভার, দ্বারদেশে সভাপতিকে অভ্যর্থনা, মাল্যদান, সভাপতিবরণ অক্ষমের উপরেই পড়িল। মোটর হইতে নামিয়াই আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"এই যে; আপনাকে যে দেখিতেই পাই না।" আমি উত্তর করিলাম "আপনার শরীর অসুস্থ—তারপর।" "তারপর" বলিতেই তিনি খুব হাসিয়া উঠিলেন—আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম। ইহার একটু অর্থ ছিল। সাহিত্যসম্মিলনের সময় আমার একটী বন্ধু তাঁহার নিকটে আমার অনেক রকম নিন্দা মন্দ করিয়াছিলেন। বন্ধুটী আমার নিকটে উপকৃতও ছিলেন, কিন্তু সম্মিলনে সম্পাদকত্ব না পাওয়াতে এবং উহা আমার স্কন্ধে পড়াতেই তিনি খুবই দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই চিত্তরঞ্জনের নিকট

দুঃখপ্রকাশ ... অসম্বদ্ধ কথা বলিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং আমাকেও তাঁহারই সম্মুখে ঐ সকল কথা বলেন। চিত্তরঞ্জনের সহিত যখনই দেখা হইয়াছে তখনই আমায় এই বন্ধুটির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। বন্ধুটী আমার মত লোক হইতে চিত্তরঞ্জনের সাবধানে দূরে থাকা উচিত প্রভৃতি উপদেশও দিয়াছিলেন—তাই 'তারপর' বলাতে দেশবন্ধু আমি সেই পুরাতন কথাটী উল্লেখ করিতেছি বুঝিতে পারিয়া খুব হাসিয়া উঠিলেন।

সভারম্ভের তখন কয়েক মিনিট দেরী ছিল। নূতন প্রকাশিত সংসম্পাদিত "দেশভক্তি" পাইয়া পড়িয়া বেশ লাগিয়াছে বলিলেন। এ বইখানি তাঁহাকেই উৎসর্গ করা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন "এখন ত আমার আর কিছু নাই—কি দিব?" আমি বলিলাম "সংসারে দেনা পাওনা একদিনে শোধ যায় না। আর কেবল কি পাউণ্ড, শিলিং লইয়াই পৃথিবী।" তিনি বলিলেন যে দেখুন চিকিৎসকেরা সমুদ্রের উপর থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন কিন্তু অর্থাভাব। আমি বলিলাম "বন্দে মাতরম্ মোকর্দ্দমার পর দার্জ্জিলিং যাইয়া খুব ভাল ছিলেন—সেখানে যাইয়া চুপ করিয়া কিছুদিন থাকুন না?" বলিলেন, তাহাই স্থির করিয়াছি।

সভারম্ভ হইল—তিনি দুর্ব্বল। আমরা বলিলাম আপনাকে কিছু বলিতে হইবে না। তিনি বলিলেন "বলিব না"; কিন্তু "স্বভাব যায় না মলে।" তাই কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তৎপরে মণীন্দ্রহলের দ্বার উন্মোচন করিলেন। জলযোগের ব্যবস্থা ছিল—অবশ্য তাহা অসুস্থ শরীরে গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু বন্ধুবর রায়সাহেব মনোরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের জন্য রাজগৃহের কুণ্ড হইতে আনীত জল শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ মহাশয় আনাইয়া রাখিয়াছিলেন—তাহাই অনেকখানি পান করিলেন। প্রস্থানের সময় একবার দেখা করিবার আদেশ করিয়া গেলেন।

পরদিনই দেখা করিলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহাকে কিছুকাল বিশ্রামের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলাম। ২।১ দিন মধ্যে ফরিদপুরে যাইবেন। না গেলে কি হয় না প্রশ্নোত্তরে বলিলেন দেশের এই সঙ্কট-সময়। আমি বলিলাম শরীর? হাসিয়া উঠিলেন। অর্থ বুঝিলাম—আর কিছু বলিলাম না। প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

বাঁকিপুর "রয়াল বেঙ্গল টাইগার"কে স্থান দিয়াছে। চিত্তরঞ্জন যখন প্রথম মোকর্দ্দমা পরিচালনার্থ বহুদিন পূর্ব্বে বাঁকিপুর আইসেন, তখন কয়েকজন লোক বলাবলি করিয়াছিল ইহার "সেয়ার" (C. R—শৃগাল) নাম কে রাখিয়াছে?—এত' বাঘ। স্যার আশুতোষ পাটনায় যে গৃহে মহাপ্রয়াণ করেন, সে বাসা হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জনের বাসা নিকটেই। বাঙ্গালার এক ব্যাঘ্র এখানেই দেহত্যাগ করেন। অন্যজনও কুক্ষণে পাটনা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার শেষ যাত্রা। বিহারে বাঙ্গালীদের প্রতি যে আক্রোশ দৃষ্ট হইতেছে, সেই অগ্নি-নির্ব্বাপণের জন্যই কি বাঙ্গালার এই দুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ পাটনায় নির্ব্বাণ লাভ করিলেন? যিনি অকালে তাঁহাদিগকে নিজ কোলে টানিয়া লইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড
৮ম সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ।

১৩৩২ সাল।
১৮৪৭ শকাব্দাঃ

উচ্ছ্বাস।

(আকাশের প্রতি)

লেখক—সম্পাদক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১২)

হে আকাশ!
চাহিনা মিলন—
আমি চাহিনা মিলন,
আমি চাহিনা মিলন।
বিরহেই কাটে
যেন সারাটি জীবন,
যেন সারাটি জীবন।

বিরহেই পাই—

যেন রস মিলনের,

যেন রস মিলনের ॥

মিলনের রস—

নাহি হয় আস্বাদন,

নাহি হয় আস্বাদন।

সে যে দুয়ে একজন,

সে যে দুয়ে একজন ॥

ব্রহ্ম রসময়—

জীব তাহা করে পান,

ব্রহ্ম তাহা করে দান ॥

ব্রহ্মানন্দ হয় দানে,

জীবানন্দ হয় পানে ॥

জীব ব্রহ্ম হলে—

কে কাহারে করে পান?

কে কাহারে করে দান?

নাহি তথা ব্রহ্মানন্দ,—

নাহি তথা জীবানন্দ।

নীরবে শুনিতে তব

প্রভাতী সঙ্গীত,

সারানিশি জেগে আছি

হইয়া স্তম্ভিত।

(১৩)

হে আকাশ,

অহরহ উঠে প্রশ্ন ভাবুকের মনে

সাধু ভক্ত জ্ঞানী ত্যাগী পুছে কতজনে

নব্য ও প্রাচীন শাস্ত্র করে অধ্যয়ন

কিছুতেই নাহি হয় সমস্যা-পূরণ—

আচ্ছা বল দেখি কিসের কারণ

বিশ্বপতি এই বিশ্ব করেন সৃজন?

এ বিশাল বিশ্ব কভু নহে অকারণ
অনায়াসে মেনে লয় ভাবুকের মন ;
কারণের চিন্ময়ত্বে নাহিক সংশয়
তবুও সদাই মনে হয় যে উদয়
কার ক্ষতি হত বিশ্ব না হইত যদি ?
পাগলের মত আমি ভাবি নিরবধি
অনাদি অনন্ত যদি এই বিশ্ব হয়
কোথা থাকে সৃষ্টি তবে, কোথায় প্রলয় ?
স্বভাবে কি আছে চিৎ ওতঃপ্রোতভাবে ?
সৃষ্টি স্থিতি লয় কিহে তাহার প্রভাবে ?
চিত্তের স্বতন্ত্র সত্তা যদি নাহি থাকে,
বল দেখি তবে সৃষ্টি করে কে কাহাকে ?
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

পুরী-দশনে।

লেখক—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

এক্ষণকার ব্রাহ্মণগণ, গোস্বামিগণ, গুরুগণ ও বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ পূয-রক্ত-পূরিত মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। মৎস্য যে একটা জীব তাহা তাঁহাদের ধারণাই নাই; তাঁহারা মৎস্যকে শাকসবজীর মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন, মৎস্যবধে তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে না! একটি ইংরাজ মহিলারও ক্ষুদ্র-জীব-বধে প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তিনিও লিখিয়াছেন—

"Turn, turn thy hasty foot aside,
Nor crush that helpless worm ;

The frame thy wayward looks deride
Required a God to frame.

* * * *

Let them enjoy their little day,
Their humble bliss receive ;
Oh ! do not take away
The life thou canst not give".

এই কবিতাটিকে তিনি "Humanity" নাম দিয়াছেন। জীবে দয়া থাকিলে মনুষ্য, নচেৎ পশু বা পশুর শ্রেণীর। পশ্চিমে মৎস্যভোজীকে "চামার" কহিয়া থাকে, কারণ তথায় চামারগণই মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। মৎস্য-ভক্ষণ যে কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই দোষাবহ, তাহা নহে ; বাইবেলেও বলিয়াছেন—

"It is good neither to eat flesh ———"

Romans XIV—21

অন্যত্র—

"I delight not in the blood of bullocks, or of lambs or of he-goats".

Isaiah I—11

অন্যত্র—

"Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy".

Mathew V—7

তদ্ভিন্ন গ্রীশ দেশের বিখ্যাত কবিও কহিয়াছেন—

"Take not away the life you cannot give
For all things have equal right to live".

Pythagoras

এতদ্ভিন্ন কোরাণেও নিষেধ যথা—

"লাঁইএ নালাল্লাহা লহমোহা অলাদে মাওহা অলাকেঁই য়েনা লোহৎ তাক্ওয়া মিন্কুম্।"

কোরাণ শরীফকে সুরা হজ্জকী ৩৬ আঁয়ৎ।

কখনও উহার মাংস ও রক্ত আল্লার নিকট পহুঁছিবে না ; কিন্তু তোমার কর্ম্ম তাঁহার নিকট পহুঁছিবে।

অন্যত্র—

"কলীলোম্ মিনাশ্যাম্ কহু খয়েরোম্ মিন্ কসরতুন্ ইবাদৎ"

রসুল হজরৎ মহম্মদ হদীসে।

অল্প দয়াও বহু আরাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ।

সুতরাং জীব-বধে মহাত্মা ক্রাইষ্ট্ ও হজরৎ মহম্মদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল; কিন্তু উপরিউক্ত ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, গুরু ও বৈষ্ণবগণের প্রাণ কাঁদে না। এই মনুষ্যপদবাচ্য মনুষ্যগণের জীবের প্রাণবধে পাষাণহৃদয় কাঁদে না। এরূপ গোস্বামী, ভাগবত-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণও দেখিয়াছি যে পূয রক্ত না হইলে অন্ন গলাধঃকরণ হয় না! মহাপ্রভুর উপদেশ—

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।
এই তিন ধর্ম্ম ভিন্ন নাহি সনাতন॥

বৈষ্ণব প্রভু মুখে "হা গৌরাঙ্গ" বলিতেছেন, কিন্তু পূয-রক্ত ভক্ষণ করিয়া জীবে দয়ার ধর্ম্ম প্রকাশ করেন! গুরুগণ, গোস্বামিগণ শিষ্য-বাটী গমন করিয়া শ্মশানে থাকিয়া শৃগালগণ যেরূপ নির্ভয়ে প্রশান্তচিত্তে মৃতদেহ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা মৃত-মৎস্য-পূয-রক্ত ভক্ষণ করেন! ইহাকেই বলে গুরু। অনেক ব্রাহ্মণ গুরুও দেখা যায় যে তিনি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ এই তিন স্বরে উচ্চারিত প্রণবও উচ্চারণ করিতে পারেন না; অনেকে গায়ত্রীর অর্থও জানেন না। তোতাপক্ষীর বোল মুখস্থ বলেন, ইহাঁরা ব্রাহ্মণ বা গুরু। এ গুরুর আড়ম্বর লোপ হওয়া ভাল, কারণ তিনি তৃণভোজী; আর ইনি যে পূয-রক্ত না হইলে দিনযাপন বা অন্ন ভক্ষণ করিতে পারেন না। এক্ষণকার গুরুর পুত্র হইলেই গুরু। তিনি আড়ম্বর-লোপী হইলেও গুরু! কিন্তু শাস্ত্রের আদেশ তাহা নহে। গুরু পরীক্ষা করিয়া গুরু করা কর্ত্তব্য; গরুর পুত্র গুরু নহে। যিনি মনের সংশয় ছেদ করিতে পারিবেন তিনিই গুরু।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ৭ পরিচ্ছদে মধ্যলীলায়াং।

ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না; তাঁহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ থাকা চাই; শূদ্র যদিও ব্রাহ্মণের ক্রিয়া করেন তাহা হইলে তিনিও ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রোচিত কর্ম্ম করেন তিনিও শূদ্র—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎতেনৈব বিনির্দিশেৎ॥

শ্রীভাগবতে ৭।১১।৩৫

পূর্ব্বে ক্রিয়া-অনুসারে জাতি হইত; তজ্জন্য ব্রাহ্মণ দশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—

দেবোমুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রোনিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

অত্রি-সংহিতায়াং

এই দশ শ্রেণীর মধ্যে যিনি যেরূপ ক্রিয়া করিতেন তিনি সেই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; সুতরাং যিনি মৎস্য ভক্ষণ করিতেন তিনি চণ্ডালশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতেন। তাহা হইলে মৎস্যভোজী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ; চণ্ডাল ব্রাহ্মণ কি গুরু হইতে পারেন? কিন্তু এখন ব্রাহ্মণ-সমাজের এরূপ অধঃপতন হইয়াছে যে ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ। গলে একগাছি সূত্র থাকিলেই হইল; তিনি মন্ত্র দিতেছেন, বিষ্ণু স্পর্শ করিয়া পূজা করিতেছেন। কলি-কালের ব্রাহ্মণের লক্ষণ কেবল সূত্র; তিনি অন্তঃসারশূন্য হইলেও ক্ষতি নাই! বস্তায় একটা মার্কমারা থাকিলেই হইল—তাহার মধ্যে চাউল থাকুক অথবা ধূলি থাকুক।

"———বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি।

শ্রীভাগবতে ১২।২।৩

মৎস্যভোজী বিষ্ণু-স্পর্শ করিবেন না—

মৎস্যাশী ন স্পৃশেদ্ বিষ্ণুং মাংসাশী ন যজেচ্ছিবম্।

তাহা হইলে আজকাল বিষ্ণুও নাই, শিবও নাই—শাঁসটা চলিয়া গিয়াছে, কেবল খোলসটাই আছে। এই সকল কারণেই ত আজকাল সংসারে হাহাকার! পূর্ব্বে দ্রব্যাদি কত সুলভ ছিল, আজকাল কিরূপ মহার্ঘ। দিল্লীশ্বর আকবরের সময় ত্যাগ করিলেও তখন দ্রব্যের মূল্য এইরূপ ছিল—

গম	২ দামে একমণ		
যব	৮ ...	...	
মটর	৬ ...	...	
কড়াই	৭ ...	...	
মিছরি	১২৮ ...	...	
ময়দা	২২ ...	...	
আটা	১০ ...	...	
ঘৃত	১০৫ ...	...	
দুগ্ধ	২৫ ...	...	
চিনি	৬ ...	...	
চাউল	১০০ ...	...	

৪০ দামে এক টাকা

২৮শবর্ষের হিন্দু-পত্রিকার ৯ম সংখ্যায় এ সমুদায় আলোচনা করা গিয়াছে; সুতরাং অন্যান্য দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা গেল না।

তত প্রাচীন সময়ের কথা ত্যাগ করিলেও আমাদের সময়ের কথা বলি যে টাকায় কলমদানী চাউল ৩০সের, ঘৃত টাকায় নয় পুয়া; ইক্ষু গুড় যখন /১৫ সের হইল তখন সকলে বলিল "গুড় আক্রা হয়ে গেছে।" এখন সেই গুড় নয় পুয়া। ক্রমে ক্রমে দ্রব্য কম হইয়া যাইতেছে। অতঃপর লীলাময়ের কি ইচ্ছা তাহা তিনিই জানেন! ছয় মাস ফাঁসি—মিনিটে মিনিটে প্রাণ যাইবে না ত? তবে "ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ" এই আশা। যাহা হউক এই সমুদায় পাপের পরিণাম নহে কি? শরীরের মধ্যে মস্তক শ্রেষ্ঠ, সেই মস্তকে যদি ব্যাধি আক্রমণ করিল তাহা হইলে ত সর্ব্বশরীরকে আক্রমণ করিবে! সেইরূপ সৃষ্টির প্রধান ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ যদি দূষিত হইলেন তাহা হইলে সংসারের পতন অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ২৪।২৫ বৎসর বেদ পাঠ করিতেন, পরে আজীবন যাগ যজ্ঞ করিতেন; যজ্ঞে ধূম, ধূমে বৃষ্টি, বৃষ্টিতে শস্য হইয়া প্রজাগণ সুখে থাকিত। ব্রাহ্মণ শ্ববৃত্তি কখনও করিবেন না—

———ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন।

শ্রীভাগবতে ৭।১১।১৮

অন্যত্র—

সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মনুঃ ৪।৬

অন্যত্র—

সেবাং লাঘবকারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে শ্ববৃত্তিং বিদুঃ॥

মুদ্রারাক্ষসে ৩ অঙ্কে।

কিন্তু গোস্বামি-পাদগণ কহেন যে কুকুরের বৃত্তি অপেক্ষা দাস্যবৃত্তি আরও হীন, কারণ কুকুরের যে স্বাধীনতা আছে ভৃত্যের তাহাও নাই; বর্ষাতে কুকুর কোথাও শুইয়া থাকে কিন্তু ভৃত্যকে দৌড়াইতেই হইবে। এ বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা যথা—শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুপাদ একদিন বর্ষাকালে নবাবের আদেশে রাত্রিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। ঘটনাক্রমে এক গৃহীর অঙ্গন দিয়া গমন করিতেছিলেন। গৃহী তাঁহার পত্নীর সহিত শয়ন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের পদ-শব্দ শ্রবণ করিয়া গৃহী, পত্নীকে কহিয়াছিলেন যে "কুকুর আসিয়াছে"; তাহাতে তাঁহার পত্নী কহিয়াছিলেন যে "না, এত বৃষ্টিতে কুকুর কখনই আসিবে না, কাহারও বাড়ীর চাকর।" প্রভুপাদ মনে করিলেন যে আমিও ত চাকর; উজির হইলেও চাকরের শ্রেণীতে বটে—আর এ চাকরী

করিব না।" এই মনে করিয়া প্রাতে মহাপ্রভুর উদ্দেশে দক্ষিণদিকে চলিলেন। নবাবের দক্ষিণ ও বামহস্ত দুই ভাই শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভুদ্বয় ছিলেন। নবাব যখন জানিলেন যে শ্রীরূপ প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তখনই চতুর্দ্দিকে (পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়া) অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিন দিকের অশ্বারোহী প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কেবল দক্ষিণদিকের অশ্বারোহী তাঁহার গমন নিবেদন করিল। নবাব তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে দ্রুত গমন করিয়া দেখিলেন যে শ্রীরূপ প্রভু কম্বলের উপরে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া আছেন। নবাব গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। শ্রীরূপ তাঁহাকে দর্শন করিয়া হাস্য করিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া নবাব কহিলেন যে "তুমি কি বায়ুগ্রস্ত হইয়াছ ? আমি নবাব—তোমার মনিব—তোমাকে লইতে আসিয়াছি ; কোথায় উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবে, না হাস্য করিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলে !" শ্রীরূপ-প্রভুপাদ তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে "আমি বায়ুগ্রস্ত হই নাই, যাঁহার দর্শনে যাইতেছি—এখনও দর্শন লাভ হয় নাই ; সে সময়ে দেখিতেছি যে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা আমার পদতলে দণ্ডায়মান, যখন দর্শন হইবে তখন না জানি কি হইবে, সুতরাং আর প্রত্যাবর্ত্তন করিব না।" নবাব অনেক অনুনয় করিলেও শ্রীরূপপাদ প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া কহিয়াছিলেন যে আর দাসত্ব করিব না, কারণ তাহা শ্ববৃত্তি অপেক্ষা অধম—

সেবা শ্ববৃত্তি যৈরুক্তা ন সম্যক্ তৈরুদাহৃতম্।
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক্ব শ্বা বিক্রীতাসুঃ ক্ব সেবকঃ ॥

ব্রাহ্মণগণের সমাজের দাঢ্য না থাকা বশতঃ অধুনাতন সময়ে হাইকোর্টের ব্রাহ্মণ জজের যে মান্য, একজন কাশী কিম্বা নবদ্বীপবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সে মান্য নাই।

কিন্তু পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণই সংসার রক্ষা করিতেন, তাঁহাদের স্থানও উচ্চে ছিল—

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ ॥

মনু-সংহিতায়াং ১ অধ্যায়ে।

দেবতারা যে ব্রাহ্মণের মুখে হবনীয় দ্রব্যাদি ভোজন করেন, পিতৃলোকেরা যাঁহাদের মুখে শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, ঈদৃশ ব্রাহ্মণ হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ?

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠা প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥

মনু-সংহিতায়াং ১ অধ্যায়ে।

সমুদায় জীবের মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহাদিগের সুখ-দুঃখ-বোধ আছে; তাদৃশ প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী পশু শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিজীবী জীবগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

ঐ　　ঐ

ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি যাগাধিকারী বিদ্বানেরা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানের মধ্যে শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহাদিগের কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি আছে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; এবং শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীরাই শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥　　ঐ　　ঐ

ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবা মাত্রই পৃথিবীর সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু সমুদায় মনুষ্যের ধর্ম্ম সকল রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বংদদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ॥

ঐ　　ঐ

এই সংসারে যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহা সমুদায়ই ব্রাহ্মণের নিজ ধনের তুল্য; তজ্জন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমুদায় সম্পত্তির প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন।

ব্রাহ্মণেরা যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরের বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ করিয়া অন্যকে দান করেন, সে সমুদায়ই তাঁহাদের আপনার; যেহেতু ব্রাহ্মণের দয়াতেই ইতর যাবতীয় লোক ভোজন-পরিধানাদি করিতেছে।

কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বেদাধ্যয়নের পর আজীবন তিনি যাগ

যজ্ঞ করিতেন, তাহাতে শস্য উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যগণ সুখে থাকিত। ব্রাহ্মণের নিজের স্বার্থ কিছুই নাই, কেবল সংসার-রক্ষার ভার তাঁহার উপর (এ বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীভাগবতের ১১।১৭।৪২ শ্লোক দেখুন।) তজ্জন্যই ভগবান কহিয়াছেন যে তিনি ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া আহার করিয়া অধিক সন্তোষ লাভ করেন (শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৮; পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে।) কিন্তু সে দিন এখন নাই, সে ব্রাহ্মণও আর নাই। যে ব্রাহ্মণগণ একদিন সংসার রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই সংসারের পতনের কারণ হইয়াছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে কেহ কখনও ক্রিশ্চিয়ান হন নাই; রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে কেহ কখনও বিলাত যান নাই ইত্যাদি। এ সমুদায় কার্য্য সেই লীলাময়ের লীলা। ব্রাহ্মণগণের অভ্যুদয় যে কতদিনে হইবে তাহা লীলাময়ই জানেন।

যাহা হউক মায়াপুরে নবদ্বীপ দেখিলে প্রাণ শীতল হয়; এখানে ভেট ত দূরে থাক্, প্রচুর পরিমাণে দুইবেলা প্রসাদও প্রদান করিয়া থাকেন, যতদিন থাকুন না কেন। মহাপ্রভু তাঁহার কার্য্য পরমহংস মহারাজ দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। ইতিমধ্যেই ১৭টি মঠে দেবতা স্থাপন করিয়াছেন, ভোগ আরতি প্রভৃতি নিয়মিত চলিতেছে। তিনিই নবদ্বীপ-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভগবান গৌরচন্দ্র করুন, তাঁহার পার্শ্বদকে দীর্ঘজীবী করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত কার্য্য করাইয়া লউন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার অধিকার একটা চণ্ডালেরও আছে।

গান।

(১)

আর কতদিন রাখ্‌বে সখা এম্নি করে' পায়ে ঠেলে,
আমারে কান্দা'লে যেমন,—কান্তে হ'বে আমি ম'লে।
তখন,—ডাক্‌বে না কেউ এমন্ করে',
নদীর তীরে, বনের ধারে,
অশ্রু-অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে ধর্‌বে না কেউ চরণতলে।
আবার,—স্বপন-মাধুরী-মাখা,
তোমার ও মুরতি সখা,

নয়ন্ মুদে ভাব্‌বে না কেউ, ভাস্‌বে না কেউ আঁখির জলে।
আর কতদিন রাখ্‌বে সখা, এম্নি করে' পায়ে ঠেলে॥
তখন—পাবে বলে' তোমার দেখা,
সাঁজ সকালে একা একা
ঘূর্‌বে না কেউ বনে বনে, উদাস-মনে অবহেলে।
দিলেও তুমি তখন দেখা,
দেখ্‌বে না কেউ তোমায় সখা,
দেখ্‌লে যা'রে সারাজীবন পুড়্‌তে হয় রে দুঃখানলে।
আর্ কতদিন রাখ্‌বে সখা, এম্নি করে' পায়ে ঠেলে॥

ভূষণ।

গান।

(২)

ঐ বুঝি সে ডাকে, আমায় ঐ বুঝি সে ডাকে।
দিবানিশি পথে পথে খুঁজে বেড়াই যাকে॥
ঐ বুঝি সে ডাকে,—
পাতার আড়ে ফুলের চোখে
যে আমায় লুকিয়ে ছাখে,
(আবার) শ্যামা দোয়েল পিকের তানে ক্ষেপিয়ে ছায় আমাকে,
ঐ বুঝি সে ডাকে,—
যখন—ঘাটে মাঠে বনে বনে,
[illegible] বেড়াই আপন মনে,
তখন—কে যেন এসে বাতাসে কাণ পেতে থাকে।
ঐ বুঝি সে ডাকে,—
একলা বসে' নদীর তীরে,
ভাসি যখন নয়ন-নীরে,
ও যে—ছায়ায় ভেসে তখন এসে বুকে বুকে রাখে,
আমায় বুকে বুকে রাখে,
ঐ বুঝি সে ডাকে, আমায় ঐ বুঝি সে ডাকে॥

ভূষণ।

গান। (বাউলের সুর)

(৩)

আমি—আর কতদিন বহিব খেয়া ক'ওরে দয়াল হরি।
আমার পাপের বোঝা বইতে নারে এ জীর্ণ খেয়ার তরি॥
তোমার চরণ ছুঁলে, শুনেছি পাষাণ গলে,
আমার এই মিনতি, হে শ্রীপতি, দাও হে পাষাণ করি।
আর কতদিন বহিব খেয়া ক'ওরে দয়াল হরি॥
এতকাল নিথর জলে, বেয়েছি হেসে খেলে,
এখন—কালবৈশেখীর ঝড় উঠেছে সুমুখে বিপদ্ ভারী।
আর কতদিন————
কোলাহল গ্যাছে থেমে আস্‌ছে ঐ আঁধার নেমে,
ভূষণ আকুল তীরে একলা ব'সে তরাসে যায় মরি॥
কোথায় জলদবরণ অনাথ শরণ অকূলের কাণ্ডারী॥
আর কতদিন বহিব খেওয়া ক'ওরে দয়াল হরি॥

ভূষণ।

গান। (রামপ্রসাদের সুর—"মা আমায় ঘুরাবি কত।")

(৪)

এবার বুঝি ডুব্‌লো ভরা। এবার বুঝি ডুব্‌লো ভরা॥
তোরা ধরাকে জ্ঞান করিস্ সরা।
এবার বুঝি ডুব্‌লো ভরা॥
ওরে,—ছোট বড় জাতিতে নয়, (ও তা') গুণ-গরিমায় যায়রে ধরা।
এবার,—খেল্‌তে এসে বুদ্ধিদোষে হাতের পাঁচ খোয়ালি তোরা॥
এবার বুঝি ডুব্‌লো ভরা॥
একদিন যা'দের ত্যাগের মন্ত্রে ছিল বিশ্ব পাগল-পারা।
হেলায়,—রাজরাজেশ্বরের মাথায় চরণ তুলে দিত যা'রা।
তা'দের,—সব্ গ্যাছে, আর কিছু নাইরে, (আছে) শুধু জাতির বড়াই করা।
তোরা আপন পাপে আপ্‌নি মলি' (হলি) আপন বিষে আপ্‌নি জরা
এবার বুঝি ডুব্‌লো ভরা।

ঐ শোন্,—বিশ্ব-জোড়া বান ডেকেছে,—তোরাই শুধু দিস্‌নে সাড়া।
এমন আনন্দ-বাজারে এসে,—হ'য়ে রইলি বাসি মড়া॥
এবার বুঝি ডুব্‌লো ভরা॥
ভূষণ বলে—চোখ্ রাঙ্গিয়ে এখনো ছাড়্ জব্দ করা।
একবার দাঁড়া দেখি ঝাড়া দিয়ে, (দেখ্‌বি) শক্তি তোদের জগৎ জোড়া
এবার বুঝি ডুব্‌লো ভরা॥

ভূষণ

গান।

(৫)

সেথা কি গাহিব গান ?
যেথা অসাড়্ হ'য়ে পড়ে' আছে তিরিশ কোটি প্রাণ।
সেথা কি গাহিব গান ?
ভালমন্দ না বিচারি', (যেথা) মানুষ আপ্‌নি মরে, পরকে মারি,
সেথা দুনিয়াদারি কি ঝঁক্‌মারি,—শুন্‌বে কে এ তান্।
সেথা কি গাহিব গান॥
যেথায়—শারদচাঁদিনী রা'তে, বসি' তমাল বীথিকাতে,
তান্ ধরিলে বাঁশীতে যমুনা বহিত উজান্॥
আবার—ঘুমের ঘোরে পাগল হ'তো ব্রজাঙ্গনার প্রাণ।
সেথা কি গাহিব গান॥
নানক কবীর গুরুগোবিন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গ চিরানন্দ
একদিন—ভাসিয়েছিল ভারত যা'রা—এনে প্রেমের বান ;
সেথা কি গাহিব গান॥
ধরার দুখে বিগলিয়া, সোণার সিংহাসন ত্যজিয়া,
যেথা—রাজপুত্র বনে গিয়া—দেখা'লো প্রেম কি গরীয়ান্।
আবার প্রেমে ভুলি কোলাকুলি কর্‌লো হিন্দু মোসলমান।
সেথা কি গাহিব গান॥
পাপীকে তরা'তে যেথা, মায়ের বুকে দিয়ে ব্যথা,
দ্বারে দ্বারে ঘুরে গোরা—উড়ালো প্রেমেরি নিশান্।

আবার,—ভাসিল—ভাসা'লো প্রেমে নদীয়ার বয়ান্।
সেথা কি গাহিব গান ॥
ও যার—প্রতি ধূলি প্রতি অণু কত মহাজনের পদরেণু,
সেথা ভূষণ কি বাজা'বে বেণু ধরিবে কি তান্?
ওরে,—আপনি বাজিত বাঁশী পেলে একটী পরাণ।
সেথা কি গাহিব গান ॥
ভূষণ ত বাঁচে না আর, এ যে ভীষণ অন্ধকার,
আজ কোন্ পাপে কি অভিশাপে ভারত এ মহাশ্মশান !!
হেথা কি গাহিব গান্ ॥

ভূষণ।

গান।

(৬)

এমন সোণার দেশে এসে কেন ছোট এদের মন?
এরা দেবীর ছেলে হ'য়ে কেন দানবের মতন? (কি শাপে দানবের মতন?)
এমন সোণার দেশে,—
যা'দের মাথার উপর এমন আকাশ এমন চন্দ্র তারা,
আবার,—এমন মলয় বাতাস যা'দের সকল দুঃখ-হারা,
তারা কোন্ পাপে কি অভিশাপে অনুদার এমন?
পোড়ে অভিমানের দাবাগ্নিতে—পতঙ্গ যেমন।
এমন সোণার দেশে—
হায়রে,—শ্যামা দোয়েল কোকিলের তান্—অলির গুঞ্জরণ,
করে যা'দের প্রাণে অবিশ্রান্ত সুধা বরিষণ,
আবার,—তটিনীর কুল কুল স্বরে, যা'দের কাণে মধু ক্ষরে',
বাউলের সঙ্গীতে করে চিত্ত-বিমোহন।
হায়রে,—কিসের দুখে তা'দের আজি এ অধঃপতন !!
ওরে,—ঘাটে মাঠে তটে বাটে কর্‌বে নিরীক্ষণ,
আবার, আশে পাশে দেখ্‌রে চেয়ে ফিরা'য়ে নয়ন;
সবাই ব্যস্ত আগে যেতে, জগৎ যেন উঠ্‌ছে মেতে,

উৎসাহ আর উদ্যমেতে মত্ত ত্রিভুবন।
ছি, ছি,—তোদের মত কেউ করে'নি মরণকে বরণ;
ভূষণ বলে সবার মাঝে আছেন নারায়ণ,
একবার উদার-প্রাণে সকল জনে দেরে আলিঙ্গন।
ভাই বলে' দেরে আলিঙ্গন,
এমন সোণার দেশে এসে কেন ছোট এদের মন।

ভূষণ

বাঙ্গালার তুরদৃষ্ট।

লেখক—শ্রীআন্তনাথ কাব্যতীর্থ।

বাঙ্গালার তুরদৃষ্ট না হইলে বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল রত্ন স্যর্ আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জনকে অসময়ে হারাইব কেন? যাহা যায় তাহার অভাব আর ঘুচে না। বিদ্যাসাগর গিয়াছেন, তাঁহার অভাব আর ঘুচিল না। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম গিয়াছেন, তাঁহার শূন্য সিংহাসন আর কেহই অধিকার করিল না। অতীতের কথা, অন্তরের ব্যথা বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন না হইতে হইতেই আজ নিদারুণ শোক-বজ্র বাঙ্গালার শিরে নিপতিত হইল। একটি শিক্ষা-বিভাগের কর্ণধার, আর একটি জন্মভূমির স্বাধীনতার সেবক। আজ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভারত ও ইউরোপ চিত্তরঞ্জনের জন্য তুঃখপ্রকাশ করিতেছে কেন? পরার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগই ইহার মুখ্য কারণ। অবসর মত করিব, এইরূপ ভাব মনে থাকিলে, বা নাম যশের প্রলোভনে নেতা সাজিলে, কেহই তাহার বাধ্য হয় না, কেহই তাহার কথা শুনে না। অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ না দেখাইতে পারিলে জগতে কেহই বরণীয় হয় না। বুদ্ধ রাজ্য, ধন, সুখ, পত্নী, পুত্র, স্বজন বান্ধব সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিশ্বের কল্যাণ-ব্রতে দীক্ষিত হইলেন; জগৎ, তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জননী, জন্মভূমি, প্রিয়তমা পত্নী, বন্ধু-বান্ধব, অর্থ, যশঃ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, জগৎ ঈশ্বরাবতার-জ্ঞানে আজও তাঁহার পূজা করিতেছে। এইরূপ অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ না দেখাইতে পারিলে, বিশ্বের বরমাল্য কেহই পায় না। স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ ইদানীং স্বদেশের হিতার্থে যেমত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাও অদ্ভুত।

তাঁহার শ্মশানযাত্রার দিনে কলিকাতায় যে শোকচ্ছবি দৃষ্ট হইয়াছে এবং সকল স্থান হইতে অবিশ্রান্ত যেমত সহানুভূতি প্রকাশ হইতেছে; ইহার একমাত্র কারণই স্বার্থত্যাগ। জগতের সমস্ত ঘটনাই লোক-শিক্ষার জন্য। পরবর্ত্তিকালে যদি কেহ উক্ত মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন, তবেই বুঝিব দেশের দেহে জীবন-সঞ্চার হইয়াছে। নচেৎ সাময়িক দুঃখপ্রকাশে বা দুই এক বিন্দু অশ্রুপাতে মহাত্মার কোনই উপকার সাধিত হইবে না। যদি দেশবাসী তাঁহার আরব্ধ ব্রত সমাপ্ত করিতে পারেন, একজন নয়, শত শত ব্যক্তি অদম্য উৎসাহে তাঁহার আরব্ধ যজ্ঞের সমাধা করিতে পারেন, তবেই জানিব, আজ এ শোক-প্রকাশ সফল হইয়াছে।

একখানি ছিন্ন বস্ত্র একটি অর্দ্ধ পয়সার মমতা লোকে ত্যাগ করিতে পারে না, সেস্থলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ নিশ্চয়ই অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ভারতে অনেক রাজা, জমিদার, ধনী আছেন যাঁহাদের গৃহে কোটি কোটি টাকা সঞ্চিত আছে। কিন্তু, তাঁহারা ভারতের হিতার্থে তিলমাত্র স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন কি ? অনেকের এরূপও ধারণা আছে যে, নিজ ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াইতে যায় কে ? অর্থ ব্যয় করিয়া কারাবরণ করিয়া রাজ-রোষ উৎপাদনে আবশ্যকতা কি ? তাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষিতা পাগ্‌লামি মনে করেন। সুশোভিত মস্‌নদে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া ধূমপান ও আত্মপ্রশংসা—ইহাই তাঁহাদের মতে মনুষ্যত্ব। তাঁহারা এখন দেখুন এবং বুঝুন জগৎ কাহার জন্য কাঁদে। ভক্তরাজ তুলসীদাস বলিয়াছেন, হে মনুষ্য! তুমি যখন সূতিকা-গৃহে জন্মিয়াছিলে, তখন কেবল তুমিই কাঁদিয়াছিলে। আর তোমার পার্থিব বান্ধবগণ হাসিয়াছিল ও আনন্দিত হইয়াছিল। তুমি জগতে এমন কার্য্য দেখাইয়া যাও, যাহার জন্য তোমার শেষ যাত্রার দিনে যেন তুমি হাসিতে হাসিতে যাইতে পার এবং জগৎ তোমার জন্য কাঁদে। এই শ্লোকটির দৃষ্টান্তস্থল আজ চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি নির্ব্বিকার-চিত্তে হাসিতে হাসিতে গিয়াছেন, জগৎ তাঁহার বিরহে অশ্রুপাত করিতেছে। এদেশে অনেকেই অনেক সময় বিবিধ ঘটনায় নেতা সাজিয়া রঙ্গভূমে দেখা দিয়াছেন, কিন্তু এমনটির আর তুলনা নাই। তিনি কেবল বাক্যবীর ছিলেন না, প্রকৃত কর্ম্মবীর। চিত্তরঞ্জনের চিত্তও বীরের ন্যায় অদম্য ছিল। কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে বাধা দেখিয়া তিনি কখনও ভীত হন নাই। বাঙ্গালাদেশের বৈদ্যবংশই অধিকাংশ শিক্ষিত, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যজীবন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন।

অনেকস্থলে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ করিয়াছে। মৃতের দোষ আলোচনীয় নহে। তাঁহাকে রুচিভেদে, অনেকে অনেক রূপ দেখিতে পারে। কিন্তু, তিনি যে স্বদেশের হিতার্থে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা সবাইকেই স্বীকার করিতে হইবে।

অমানুষিক পরোপকারী স্বার্থত্যাগী মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জন দাশের উচ্চ মনোভাব জানিতে পারিয়া দাশের অনেক কার্য্যে সম্মতি দিয়াছেন। দাশ, কার্য্যক্ষেত্রে মহাত্মার দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ ছিলেন। এখন মহাত্মাকে অনেকটা সহায়শূন্যভাবে কার্য্য করিতে হইবে। দাশ দেশবন্ধু নাম পাইয়াছিলেন, প্রকৃতই তিনি দেশবন্ধু হইয়াছিলেন। আমরা যদি দুদিনের মত হাহাকার করিয়া তাঁহার উপকার পরিশোধ হইল মনে করি, তবে বলিতে হইবে আমরা ঘোর অকৃতজ্ঞ। তাঁহার আরব্ধ যজ্ঞের পরিসমাপ্তি করিতে পারিলেই তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার পরিতৃপ্তি হইতে পারে। তিনি ত্রিদিব হইতে দেখিতে চান যে, তাঁহার কর্ত্তব্যপথে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতেছি। অলৌকিক-চরিত্র মনস্বী ব্যক্তিরা এ জগতে পথ দেখাইতে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের নির্দ্দিস্ট পথে গমন করাই উচিত। ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যজীবনে সবাই সব কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন না। সে দোষ তাঁহাদের নহে, তাহা কৃতান্তের দোষ। তিনি ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কালে মহীরূহরূপে শস্যশালী হইলে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইবে। কামকিঙ্কর মানব যাহা তপস্যা করিয়া উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে, সেই ধন, মান, যশঃ সমস্তই তিনি কর্ত্তব্যের নিকট বলি দিয়াছেন। গলাবাজি করা, আর হিতৈষিতা কার্য্যে প্রদর্শন করা, স্বর্গ নরক প্রভেদ। যে স্বার্থের জন্য মানব, এমন কুকার্য্য জগতে প্রচার নাই যাহা না করিতে পারে, সেই স্বার্থ, পরার্থপরতার জন্য বলি দিতে যে জন সমর্থ, সে সাধারণ মানব নহে। রাজদরবারে সম্মানলাভার্থ অনেক শিক্ষিত ধনী ব্যক্তি রঙ্গভূমে অভিনয় করিতে কিছুই বাকী রাখেন নাই। কিন্তু স্বর্গীয় দাশ তাহা তুচ্ছ বোধে দূর হইতে পরিহার করিয়াছেন, তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ পরোপকারের জন্যই সঞ্চিত হইত। তিনি দান করিয়া গর্ব্বিত হওয়া দূরে থাক, বরং গ্রহিতার নিকট লজ্জিত থাকিতেন। যেমন পঞ্চভূত মাত্র পরোপকারের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বিত্ত, বিভব সমস্তই পরহিতার্থে বা স্বদেশ-হিতার্থে নিযুক্ত ছিল।

বাঙ্গালাদেশ প্রকৃতপক্ষে একজন স্বদেশবান্ধব কর্ম্মবীর চিরদিনের মত হারাইল,

তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজপুরুষেরা মনে করিতেন যে, যে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবা ঘৃণিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাস সেই সব উদ্ধত যুবকদিগের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় সে সন্দেহ-কালিমা নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া বিধৌত করিয়া গিয়াছেন। তাদৃশ নৃশংস ব্যাপার তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকলের নিকট ন্যায়ের মর্য্যাদাই প্রার্থনা করিতেন। তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহ-ব্যাপারে অনেকে তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছে। সে কলঙ্ক তিনি জীবিতকালেই ক্ষালন করিয়া গিয়াছেন। সবদিক পর্য্যালোচনা না করিয়া পর-চরিত্রে দোষারোপ করা খুব অন্যায়। রাম, শ্যাম, যদু, নবীন অনেকেই তো ছিলেন, কেহই তো তারকেশ্বরের গোলযোগ-নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। যেমন চিত্তরঞ্জন দাশ একটা মীমাংসা করিয়া গোলযোগ-নিবৃত্তি করিলেন, অম্নি চারিদিক হ'তে নানা কথা রটিতে লাগিল। তিনি এখন দোষ-নির্ম্মুক্ত হইয়া পবিত্র স্থানে গিয়াছেন, দেখা যাক্ আর তাদৃশ কয়টি শক্তিশালী সমাজ-হিতৈষীর উদয় হয়। তিনি যে কেবল রাজনীতি-চর্চ্চা লইয়া থাকিতেন, তাহা নহে। দেশের ব্যাধি ও মৃত্যু সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পল্লীসংস্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তজ্জন্য কিছু অর্থও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেখা যাক্, এখন কোন্ মহারথী তাঁর সংকল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করেন। শাস্ত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, ত্যাগী ও সংযমী ভিন্ন রিপুপরতন্ত্র মানব দ্বারা কখনও জগতের উপকার হইতে পারে না। স্বর্গীয় দাশ মহাশয় ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এমন কি প্রিয়তম পুত্র, প্রিয়তমা পত্নীর ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহাও ভাবেন নাই। যাঁর জন্য প্রায় সমগ্র পৃথিবীবাসী দুঃখপ্রকাশ করিতেছে, সে লোক সাধার মানব নহে।

সেই দেবচরিত্র অসাধারণ মনুষ্যের অভাব আর পূর্ণ হইবে এমত আশা নাই। এই জগৎ শিক্ষার স্থল। তাঁহার অমানুষিক চরিত্র আদর্শ করিয়া যদি দুই একজনও গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন, তবেই জানিব যে, তাঁহার অভাব আমরা মনে প্রাণে বুঝিয়াছি। নতুবা দু'দিন হৈ চৈ, গলাবাজি করিয়া কি ফল হইবে? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি সমাজ-হিতৈষী মহাত্মাদিগের অভাব পূর্ণ হইয়াছে কি? রত্নগর্ভা ধরণীর উদরে বিবিধ রত্ন দেখা দিয়া থাকে, আবার ধরণীগর্ভেই বিলীন হয়। মায় জীব-জগতে মানব, স্বার্থের জন্য দানবতুল্য হয়। যাঁহারা অকপটভাবে সেই

স্বার্থ বলি দিতে পারেন, তাঁহারা অমানুষিক-চরিত্র নহেন কি? যিনি দেশের ও দশের হিতার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, দেশ ও দশজন অবশ্যই তাঁহার পূজা করিবেই। চিরদিন জগতে এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা ছিন্ন বস্ত্র, জুতার মায়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা একবার ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া লউন। দেশের ও দশের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তিনি মৃত্যুকেও ভয় করেন না। কারাবরণ, কায়িক দণ্ডভোগ, তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ কথা। মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করিয়া দেখিবেন, ভারতবাসীর হিতার্থে তিনি আফ্রিকায় সৌভাগ্যবলে মৃত্যুমুখ হতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এইরূপ পরহিতার্থে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁরা মৃত্যুকেও ভয় করেন না। যাঁহারা নিজের ষোল আনা বজায় রাখিয়া স্বদেশী সাজিতে চাহেন, তাঁহাদের সে ভণ্ডামি প্রভুত লোকের বিরক্তিকরই হইয়া থাকে। নিজের স্বার্থ ক্ষতি করিয়া পরের হিতসাধন করা খুব সহজ কথা নহে। তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলে না। কিন্তু যাহা আমরা পরের হিত মনে করি, তাহাই নিজের হিত। পরকে সুখী করিতে না পারিলে, নিজে সুখী হওয়া যায় না।

নিজের আত্মা ভিন্ন সবই পর, কিন্তু আমি যাহাদিগকে লইয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করি, তাহাদিগকে সুখী না করিতে পারিলে, বিনিময়ে তাহাদের নিকট হতে সুখী হইতে পারি না। সুতরাং পরের হিত করিতে গেলেই নিজের সুখ আসিয়া উপনীত হয়। বলপ্রকাশে বা ধন-বিনিময়ে প্রীতিলাভ করা দুর্ঘট। সুতরাং পরার্থপরতাই স্বার্থপরতা। কারণ, তাহার সহিত বাঞ্ছিত প্রীতি জড়িত আছে। পাশবিক বলে কখনও প্রীতি আদায় হয় না। দানবেরা কখনও সুখী হইতে পারে না। যাঁরা স্বার্থপরতা যতটা সীমা প্রসারিত করেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে সুখী হন। এই নিয়ম যিনি অবগত নহেন, তিনি সুখের মধুরাস্বাদ প্রাপ্ত হন না। অর্থক্ষয়, রাজভয়, কষ্টভোগ প্রভৃতি কারণে, যাঁরা পরার্থসাধনে বা জন্মভূমির হিতসাধনে বিমুখ, তাঁহাদের নগণ্য প্রাণের কোনই সাফল্য দৃষ্ট হয় না। "চাচা, আপন বাঁচা" এই রীতিই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। পরের বাড়ী কেহ মরিলে ফেলিবার লোক মিলে না। কেহ কাহারও বাড়ীর দিকে একবার দৃষ্টিপাতও করে না। এইরূপ রীতির বাজারে যিনি জন্মভূমির হিতার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন, তিনি কি অসাধারণ মানব নহেন? বীর ব্যতীত সংসার-সমরাঙ্গনে কেহই জয়ী হইতে পারে না। চিত্তরঞ্জন কর্ম্মবীর ছিলেন, সুতরাং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন তাহার প্রতিকূল কোন বাধাই তিনি গ্রাহ্য

করিতেন না। যশের জন্য, ধনের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য, লোক-সংগ্রহের জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী হন নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধেই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের তীব্র আকর্ষণ যাঁহার হৃদয়ে উপনীত হয়, তিনি কখনও নিশ্চেষ্টভাবে থাকিতে পারেন না। এদেশে এমন কত রাজা, জমিদার, নবাব, তালুকদার, মহাজন আছেন, যাঁহারা বিপুল অর্থ-স্তূপের উপর শয়ান আছেন। মনে করিলে তাঁহারা জন্মভূমির অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। কিন্তু কর্ত্তব্যের তীব্র আকর্ষণ, অথবা জন্মভূমির প্রীতি তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। সুসন্তানজ্ঞানে জন্মভূমি যাঁহার কণ্ঠে অপার্থিব বরমাল্য প্রদান করেন, তিনি নরকুলে দেবতা-স্বরূপ।

বস্তুতই দাশ মহাশয়ের তিরোভাবে দেশের সমূহ ক্ষতি বোধ হইতেছে। সেই জন্যই আজ মানবমণ্ডলী তাঁহার জন্য বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিতেছে। তাঁহার জীবনচরিত লেখা বা অন্যান্য বিষয় পর্য্যালোচনা করা অনাবশ্যক। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের স্মরণীয় ঘটনাবলীই আমাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি প্রকৃত মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। স্বার্থত্যাগ, পরোপকার-ব্রত, গুরু হ'তে শিক্ষা-প্রাপ্ত। তিনি যদি দেশের লোকের চিত্তে হিতৈষণা-বীজ রোপণ করিয়া যাইতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিব তাঁহার প্রাণ বিসর্জ্জন সফল হইয়াছে; তাহা হইলেই বুঝিব তাঁহার আরব্ধ ব্রত সমাপ্ত হইবে। সমস্ত কার্য্যই যদি আড়ম্বরমাত্রে পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে বুঝা যায় দেশের দেহে প্রাণ-সঞ্চার হইতেছে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য; দেশ একটা ভাব ধরিয়া রাখিতে পারে না। বৈদ্যুতিক তারের একপ্রান্তে আঘাত করিলে, সেই আঘাত যেমন সমগ্র বৈদ্যুতিক আধারে অনুভূত হয়; সেইরূপ একটি প্রাণের স্পন্দন যখন সমগ্র ভারতীয় জাতির প্রাণে অনুভূত হইবে, তখনই জানা যাইবে যে, জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি প্রথমেই দুইটি দেশমাতৃকার উজ্জ্বল-রত্নের নাম উল্লেখ করিয়াছি। দুইটিই কর্ম্মবীর ও পুরুষ-সিংহ। স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অভাব আর কখনও যে পরিপূরণ হইবে এমত আশা খুবই অল্প। তাঁহার মহনীয় চরিত্র দুই চারি কথায় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বজ্র হতেও কঠোর এবং কুসুম হতেও কোমল অলৌকিক চরিত্র সাধারণের দুরধিগম্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ কর্ণধার স্যর্ আশুতোষের বাসনা আর কেহ যে পূরণ করিতে পারিবেন এমত বুঝি না। তিনি অর্থে, সামর্থ্যে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, তেজস্বিতায়, কার্য্যতৎপরতায়, কর্ত্তব্যপরায়ণতায় সর্ব্বাংশে

অতুলনীয় ছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁহার প্রিয়তম বিশ্ববিদ্যালয়টিকে স্বর্গ হইতেও পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। দেশের কি দুরদৃষ্ট, অসময়ে দুইটি স্বদেশ-হিতৈষী উজ্জ্বলরত্ন কাল-জলধিতলে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইলেন।

জন্মভূমির সুসন্তানদিগের জন্য অবশ্যই সবাই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্কল্পিত ব্রতের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের অমর কীর্ত্তি-দেহ-প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পথ। তাঁহাদের স্মৃতি, তাঁহাদের অনুসৃত পথ যদি বিস্মৃত হই, তাহা হইলে সাময়িক শোক-প্রকাশ বৃথা। বীর পুরুষদিগের আরব্ধ কার্য্যের সমাপন করাই তাঁহাদের আদেশ-পালন-স্বরূপ। দেশে শিক্ষিত লোক, ধনী, যশস্বী অনেকেই আছেন এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারেন। কিন্তু আজ সমগ্র দেশ, যে দুটি কর্ম্মবীরের অভাব মনে প্রাণে অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের শূন্য সিংহাসন পুনরায় অলঙ্কৃত হয় ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। "চাচা, আপন বাঁচা" নীতি অবস্থার দোষে দেশে এতই বেশী ঢুকিয়াছে যে, কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না। সুতরাং নিজের খেয়ে পরের চরকায় তেল দেওয়া এখনকার দিনে অসম্ভব। সেই অসম্ভব যাঁহাদের চরিত্রে সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের আহ্বানে অবশ্যই জনসমাজ নিশ্চিতই উদ্বুদ্ধ হইবে। সাধারণ কথায় লোকে বলে—"তুমি যদি আমার হও, তবে আমিও তোমার হই।" বস্তুতই কথা সত্য। যিনি পরার্থে সর্ব্বত্যাগী হন, পরও তাঁহার অনুরক্ত ও বাধ্য হয়। সমগ্র পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ মানব বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী হইল কেন? মহান্ স্বার্থত্যাগ ও পরহিতৈষণাই তাহার একমাত্র কারণ। রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যদি কোনও হিতসাধন করা যায়, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণ যেমন উপকৃত হইবে, সেই সঙ্গে আমিও উপকৃত হইব। সুতরাং পরার্থপরতায় স্বার্থের ক্ষতি হয় না। যখন পূর্ব্বগগনে তরুণারুণ-কিরণচ্ছটা দেখা যাইতেছে, তখন অচিরেই চণ্ডকিরণ রবি উদিত হইবেন; বিলম্ব নাই। দেশের ভাব দেখিয়া মনে হয়, দেশবাসী গুণের আদর করিতে শিখিয়াছে। মৃতদেহে যেন ক্রমশঃ প্রাণ-সঞ্চার হইতেছে, সকল দিক থেকে এখন একতারই একমাত্র প্রয়োজন বোধ হইতেছে। এ বিষয়ে জাতি, বর্ণ বিচার করিলে স্বার্থসিদ্ধি কোন কালেই ঘটিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

ভক্তি-কথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীবের জীবন অপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু কিছুই নাই। যখন মৃত্যু নিকটে এসে সেই প্রিয়তম জীবন হরণ করে, তখন পৃথিবীতে এমন সুহৃদ কে আছে, যে সেই ভীষণ বিপদ হ'তে রক্ষা করিতে পারে? জীবন, ধন, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, বৈভব, বসন, ভূষণ, প্রিয়জন সবই ত্যাগ করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে বলপূর্ব্বক মৃত্যু জীবন হরণ করে। তখন প্রিয়তমা পত্নী, পুত্রগণ, প্রিয় নিকেতন, ছাড়িয়া যাইতে মন শোকে নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। মনে হয় হায়! এই চিরপরিচিত সুহৃদ্‌বর্গ, দেহ, গেহ ত্যাগ করে কোন্ অন্ধতম সুদূর প্রদেশে যাইতে হইবে। হায়! একদিন আমার কটাক্ষে মহাপ্রলয় সাধিত হইত, আমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ধরণী বিকম্পিত হইত, অগণ্য সৈন্য সামন্ত আমার ভ্রূভঙ্গে পরিচালিত হইত, হায়! এখন আমি একবারে শক্তিহীন! কোন শক্তিই আজ আমায় রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এই অবর্ণনীয় মৃত্যু-যাতনা, কঠোর জঠর-যাতনা গোবিন্দের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। এমন কোন উপায় নাই, এমন কোন দেবতা নাই যে, এই দারুণ যাতনা হতে অব্যাহতি দিতে পারে। মৃত্যুর কথা ভাবিতে হইলেও প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, আত্মা অবিনাশী, দেহের ধ্বংস অনিবার্য্য। তাহাতেই বা সান্ত্বনা কি? আমি এই মূর্ত্তিতে, এই স্মৃতি লইয়া এই প্রিয়জনের নিকট আর তো ফিরিয়া আসিব না; এ স্মৃতিও তখন থাকিবে না, সুতরাং তাহাতে সান্ত্বনা কি? মৃত্যুর পর যদি জন্ম না হয়, তবে বাশ্ সব শেষ। আর কোন কথা নাই। কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তবেই তো গোল রইল। যাতায়াত যদি চলিতেই থাকিল তবে যাতনা শেষ হইল কৈ?

তবে উপায় কি? ভগবান বলিতেছেন, যাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছে, তেষামহং সমদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ। মৃত্যু-সঙ্কুল-সংসার-সাগর হতে আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি। যদি জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবানের শরণাগতি ভিন্ন নিস্তারের

আর পথ নাই। সুতরাং ভগবান সর্ব্বতোভাবে আরাধ্য ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শক্তিসাধ্য বিপদই আমরা দূর করিতে পারি না, যাহা শক্তির অতীত তাহা কিরূপে নিবারণ করা যাইবে? যেখানে মনুষ্যশক্তি কুণ্ঠিত হয়, সেখানে ভগবচ্ছক্তিই প্রধান। তাঁহার করুণা পাইতে হইলে ভক্তি-বলে তাঁহাকে বাধ্য করিয়া তাঁহার নিকট হতে করুণা ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। তাহা কি মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব? অবশ্য সম্ভব। সমস্ত আত্মার ঈশ্বর ভগবান হরি। তিনিই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, অন্তরে ভক্তিভাব উদিত হইলে সর্ব্ব আত্মার ঈশ্বর ভগবান্ হরি, তাহা জানিতে পারেন। তখন তিনি কলুষিত আত্মা বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া নিজ দেহে মিলাইয়া লন। তখন সেই আত্মার মায়ার ও কর্ম্মের যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং আর জন্ম মৃত্যু ঘটে না, প্রবাহ নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট মুক্তি। কিন্তু ভক্তেরা নিত্য সঙ্গী থাকিয়া নিত্য-লীলারস-সুখ অনুভব করিতে বাসনা করেন।

ইহার পরও যদি কেহ বলেন, ভগবদারাধনার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না, তাহা হইলে আর বাক্য-ব্যয় বৃথা। সব ছাড়িতে হয়, কিন্তু ভগবানকে ছাড়া যায় না। তিনিই আত্মা এবং সুহৃদ। আমাদের আত্মা ভগবানের অংশ হইয়াও কর্ম্মাধীন হইল কেন? উহা ভগবানের ইচ্ছাধীন নহে, জীবেরই কর্ম্মজনিত ফল। এক সময় সৃষ্টি, এক সময় লয়, এমত নহে। সৃষ্টিধারা অনাদি ও অনন্ত। ইহা না বলিলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে। কিন্তু তাহা হইলেও জীবের উৎকট সাধনা-বলে সৃষ্টির নিবৃত্তি হইতে পারে। জ্ঞান বা ভক্তি সমস্ত কর্ম্মফল ভস্মীভূত করে, সুতরাং কারণাভাবে কার্য্যের অভাব বিধায় আর জন্ম মৃত্যু ঘটে না। এই দেহকে ভোগায়তন কহে, কর্ম্মফল ভোগ জন্য দেহ ধারণ করিতে হয়। কর্ম্ম-ধ্বংস হইলে আর তাহার ফল জন্মে না; সুতরাং আর ফল-ভোগার্থ দেহ গঠিত হয় না। তখন জীব-পদবাচ্য আত্মা আত্মার ঈশ্বর ভগবান হরির অঙ্গে বিলীন হয়। উহাই মুক্তি বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্মফল ধ্বংস না হওয়া অবধি জন্ম, মৃত্যু, কর্ম্মফল জন্য হইবেই। নাস্তিকেরা বলেন, জন্ম, মৃত্যু, স্বভাবের নিয়ম, তজ্জন্য কর্ম্মফল কল্পনা করা অন্যায়। তাহা হইলে অকারণ কার্য্যোৎপত্তি দোষ ঘটে। আকস্মিক বা অকারণ কোন কার্য্য ঘটে না। আর একমাত্র স্বভাব সকল কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। তাহা হইলে নিয়ম বিপর্য্যয় হয়। সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে হইলেও ভক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে।

অতএব ভগবদারাধনাই নিশ্চিত শ্রেয়োলাভের উপায়, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে মায়া আমাদিগকে ভগবদ্বিমুখ করিয়া সংসার-নরক-কুণ্ডে নিপতিত করিয়াছে, ভগবানের রাতুল চরণে শরণাগতি ব্যতীত সে মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার অন্য উপায় নাই। ধ্যানে, জ্ঞানে, শয়নে, স্বপনে, মনে বিষয়ই সদা জাগরূক। ভগবানকে ভাবিতে গেলেও মনের দ্বারে বিষয় এসে সে ভাবনা দূর করিয়া দেয়। মৃত্যুকালে সম্মুখে প্রিয়তম পুত্র, পত্নী প্রভৃতি স্বজনগণের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া শোকে কাতর মন আর ভগবানকে ভাবিতে পারে না। কোণে, বনে যে যেখানেই যাও, মন সঙ্গেই থাকিবে। সেই মনের ভিতর বিষয় প্রবেশ করিয়া আছে, সেই মন লইয়া সাধন ভজন হইবে কিরূপে? এ দেহ ছাড়িয়া গেলেও মন সংস্কার লইয়া পরদেহে যাইবে। সুতরাং বিষয়-বিষ-মূর্চ্ছিত মন লইয়া সাধন ভজন হওয়া দুঃসাধ্য। তবে যদি করুণাসিন্ধু ভগবান দয়া করিয়া মন হতে বিষয় দূরীভূত করিয়া দেন, তবেই তাঁহার দিকে মন ফিরিতে পারে। কিন্তু ভগবানের করুণা পাবার জন্য একান্তচিত্তে সতত তাঁহাকে ডাকা আবশ্যক। তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে নিরন্তর ডাকিতে থাকিলে, সেই অন্তর্য্যামী ভগবান হরি কখনই নির্দ্দয় হইয়া থাকিবেন না। তাঁহাকে পাইতে বিত্ত-বিভবের কিছুই আবশ্যক করে না, তিনি অকিঞ্চন জনের সহজ-লভ্য।

মন দিয়া আত্মার ঈশ্বর ভগবানকে ভজনা করিবে, তাহাতে অর্থের কোনই প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে যতনে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া প্রেম-সলিলে যুগল চরণ-পদ্ম বিধৌত করিয়া শ্রদ্ধা-চন্দন মাখাইয়া ভক্তি-কুসুম দিয়া তাঁহার চরণ পূজা কর। অনর্থ অর্থের আবশ্যকতা কি? তিনি তোমার ভক্তি-দত্ত, পুষ্প, ফল, জল, সাদরে গ্রহণ করিবেন। তিনি কাহারও প্রতি বিমুখ নহেন, তবে, ভক্ত তাঁহাকে চায়, সুতরাং পায়। অভক্তে চাহে না, পায় না। শত্রু, মিত্র, পুত্র, জননী যেভাবে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা কর, সেই ভাবেই তাঁহাকে পাইবে। ভাবের সহিত মন এক করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাও, অবশ্য এসে তিনি দেখা দিবেন। তাঁহার অভাব কোন স্থানেই নাই, তিনিই বিশ্বরূপ, উৎকট বাসনা জাগিলে সর্ব্বত্রই তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। মঠে, ঘটে, মস্‌জিদে তাঁহার আরাধনা মনের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় মাত্র। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে সর্ব্বত্রই তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অভিব্যক্তি, তাঁহার অভাব কোথায় আছে? যে দিকে নয়ন ফিরাইবে, সেইদিকেই

তাঁহার লীলার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। নাস্তিকেরাই ভাবে এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড স্বভাব হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক অণু, পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়াশীলতা দেখিলে তাঁহার সত্তা বুঝিতে পারিবে।

কি জন্য আমরা ভগবানকে চাই? অনির্ব্বচনীয় সুখ-শান্তিলাভের জন্য, সর্ব্বতাপ-নিবৃত্তির জন্য। সংসারে কি সুখ নাই? আছে সত্য, তাহা পরিণামে পরিতাপী। সংসারে যে বস্তু যে পরিমাণে সুখ দিতে পারে, তাহার সহস্রগুণ দুঃখ প্রতিদান করে। তাপশূন্য কেবল আনন্দ পাওয়া কি সম্ভব? শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, আত্মসাক্ষাৎকার জন্য যে আনন্দ, তাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বরূপ এবং তাহা ভাষা দ্বারা অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। সুতরাং দুঃখশূন্য সুখ জীবের পক্ষে অসম্ভব নহে। তবে, সাধারণতঃ জীব সে সুখ-প্রার্থী হইলেও পাবার জন্য চেষ্টা করে না। অধিকন্তু দুঃখ-পারাবারে সাঁতার দিতে থাকে। ভগবান ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। তাঁহাকে যে মূর্ত্তিতে দেখিতে কামনা করিবে, সেই মূর্ত্তিতে তিনি দেখা দিবেন। তিনি ইচ্ছাময়, সর্ব্বশক্তিমান ও পূর্ণ। তাঁহাতে কোনও ত্রুটি কল্পনা করা চলে না। ভক্তানুগ্রহার্থ তিনি সবই করিতে পারেন। অন্তরের মাঝে তাঁহাকে স্থাপন করিতে পারিলে, অন্তরেই তিনি দেখা দিয়া চরিতার্থ করিতে পারেন। অনন্ত যুগ ধরিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়া কোনই ফল নাই। চাই ক্রিয়াযোগ-সাধনা, যে ক্রিয়া-বলে প্রাণধনকে প্রাণের ভিতর দেখা পাওয়া যায়।

আমরা বিনশ্বর স্বজন-বান্ধব-বিরহে দিবানিশি কত অশ্রুপাত করি, তাহার রূপ-গুণ স্মরণ করিয়া কত বিলাপ করি। কিন্তু যিনি জীবের জীবন, যিনি আত্মার ঈশ্বর, যিনি সুহৃদ্, যিনি প্রাণধন, তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া কৈ একদিনও তো বিলাপ বা অশ্রুপাত করি নাই। যাঁহার বিরহে সতত কাঁদা উচিত, তাঁর জন্য কোন দিনই কাঁদি নাই; আর যার জন্য কাঁদা উচিত নয়, তার জন্যই সদাই কাঁদি। আমাদের এ দুর্ভাগ্য, এ দুর্দ্দিন কতদিনে ঘুচিবে তাহা কে বলিবে? মণি-মন্ত্রৌষধি-বলে তক্ষক-বিষের শান্তি হতে পারে, কিন্তু শমন-তক্ষক-বিষের ঔষধ কে বলিয়া দিবে? কালভয়-বারণ কালবরণ রাধারমণ বিনে আর সে তক্ষক-বিষ-নিবারণের অন্য ঔষধ নাই। তাঁহার নামামৃত পান করিলে মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হয়, শমন দূরে পলায়ন করে। এমন কি চিরদিনের মত শমন-ভয় দূর হয়। ভগবৎকৃপা বা ভাগবতকৃপা ব্যতীত সহজে জীবের শ্রেয়োলাভের অন্য পন্থা নাই, ইহা সুনিশ্চিত। যত কিছু প্রয়োজন আছে, তন্মধ্যে ভগবচ্চরণ-শরণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন।

তুমি বিষয়ী, সর্ব্বদা লাভ, ক্ষতি, সঞ্চয়, ব্যয়ের চিন্তায় অধীরচিত্তে দিন-যামিনী গত করিতেছ। কিন্তু সেই বিষয়-বৈভব তোমার দেহের, জীবনের সঙ্গী। দেহান্তে তাহাতে পুত্র, জ্ঞাতি, দস্যু, তস্কর, অগ্নি, রাজা প্রভৃতির অধিকার। অথচ সেই বিষয়ের প্রতিই তোমার ঐকান্তিক মমতা। তাহার কারণ, তোমার জীবনান্তে, তোমার পরিত্যক্ত বিষয়-বৈভব-লাভে, তোমার পুত্র-কলত্র সুখী হইবে। এই চিন্তাতেই তুমি জীবন-পাত করিয়াও বিষয়-চিন্তা কর। কিন্তু তুমি ঠিক্ বলিতে পার কি, তোমার পুত্র-কলত্রের ভাগ্যে সেই বিষয়-ভোগ ঘটিবে কিনা? এবং যদি ঘটে, তাহাতে তোমার আত্মার তৃপ্তি কি? যাহা বর্ত্তমানে আছে, তাহার সম্বন্ধেই তুমি যাহা কিছু বলিতে পার, কিন্তু ভবিষ্যৎ বিষয়ে তুমি অন্ধ, সুতরাং সে পক্ষে কখনও স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই করিতে পার না। তবে অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য অমূল্য জীবনরত্ন কেন হেলায় কাল-সিন্ধুতলে নিক্ষেপ করিতেছ? ইষ্টানিষ্ট-বিধাতা তোমার অদৃষ্ট, সেই ভাগ্যের প্রসন্নতার জন্য সতত ভগবানের কৃপালাভের জন্য সমুৎসুক হও; ভাল করিয়া, সুখময় করিয়া নিজের ভাগ্য গঠন কর।

শোক, দুঃখ, জরা, ব্যাধির যাতনা হ'তে যদি মুক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে সংসারের মমতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভগবানের প্রতি সেই মমতা স্থাপন কর। তখন তুমি দুঃখশূন্য যাতনা-বিরহিত হইবে, সদানন্দময় হইবে, তৃপ্ত হইবে, বাসনার শেষ হইবে। যত কিছু দুঃখ তুমি প্রকৃতি হতে পাইতেছ, প্রকৃতির-সংসর্গ ত্যাগ কর, তাহা হইলে তুমি দুঃখের অতীত হইবে। বাসনা হতেই তোমার দেহ রচিত হইয়াছে, বাসনা-ক্ষয় হইলেই দেহ-ধ্বংস হইবে। তখন দুঃখ দূর হইবে। নিজ সংকল্প-বলে কোষকার কীট যেমন নিজের বন্ধ হেতু গৃহ নির্ম্মাণ করে ও তাহাতে বদ্ধ হয়, তুমিও সেইরূপ স্বীয় সংকল্প-প্রভাবে দেহ-গেহে আবদ্ধ হইয়াছ। দেহে আত্মবোধ হওয়ায় সতত মৃত্যুভয়ে ভীত হইতেছ। যদি তুমি বুঝিতে পার, দেহ-নাশে তোমার মৃত্যু হয় না, তাহা হইলে আর মৃত্যু-ভয়ে কখনও ভীত হইবে না। মৃত্যু ব্যাপারটা কি, কাহার মৃত্যু হয়, পঞ্চত্ব-ব্যাপার কি, এসব বিষয় মনে প্রাণে জানিতে পারিলে কখনও মৃত্যু-ভয়ে তুমি ভীত হইবে না। তুমি অভীর সন্তান হয়ে কেন মৃত্যু-ভয়ে বৃথা ভীত হইতেছ? সিংহ হইয়া শৃগালবৎ কেন ত্রস্ত হইতেছ? ভয়, সঙ্কোচ বৃথা কল্পনা, মন হতে একদম দূর করিয়া দাও। যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরাৎপর পরমেশ্বর, যিনি অভয়দাতা, তাঁর চরণে শরণ লও, ভয়ও ভয় পাইয়া

দূরে পলাইবে। ভগবানকে ভুলিয়াই তুমি কষ্ট পাইতেছ, ভগবদ্বিমুখ হইয়াই তুমি মায়ার কবলে পতিত হইয়াছ; এবং তজ্জন্যই অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছ। ভগবানের চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট মায়া কখনও যাইতে পারে না। ভগবানের নামের এমনই মহিমা যে, তাঁর নাম করিলেও মায়া বিগত হয়। নামরূপ প্রতিহারী কোনও পাপ-তাপ, কুপ্রবৃত্তি হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দেয় না।

এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অক্ষম সাধন-শক্তিহীন কলির মানবের নিস্তারের জন্য সহজ সাধন হরিনাম মহামন্ত্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। ঐ নামে বিশ্বাসী তরিবে, অবিশ্বাসী মরিবে এবং পুনঃ পুনঃ সংসারে ঘূরিবে, নরকে মজিবে। সাধনশক্তিবিহীন সংসারাসক্ত মানবের দৃঢ়প্রত্যয়সহ নামাশ্রয় ব্যতীত এ যুগে নিস্তারের অন্য পথ আর নাই। নামাভাস হতে বিশুদ্ধ নামে রুচি জন্মিলে, নামের সহিত রূপ, লীলা প্রত্যক্ষ হইবে। নামী স্বয়ং হৃদয়ে প্রকাশিত হইবেন। এ বিষয়ে যুক্তি তর্ক চলিবে না এবং তাহাতে বস্তুও মিলিবে না। আমের হিসাব করা চেয়ে খাওয়াই ভাল। তাহাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও তৃপ্তি উভয়ই ঘটে। সেইরূপ নাম সাধনা করিয়া দেখাই ভাল; বুঝ, নামের মহিমা আছে কিনা? নামের শক্তি যদি সাধন-বলে প্রকাশ পায়, তবে শুষ্ক তর্কে কাল গত করিবার আবশ্যকতা কি? কত মানব, দানব, নাম-মাহাত্ম্যে তরিয়া গিয়াছে, এখনও কত যাত্রী সে পথের পথিক আছে। কত যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, পণ্ডিত, নী, মানী, রাজা, গরীব, সাধন-পথের পথিক হইয়াছে, এখনও হইতেছে। বে আর সে পথে যাবার সন্দেহ কি? নিজের হিত পাগলেও বুঝে। দ্ধিমান মানব জানিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়াও যদি সাগরে ডুবিয়া মরে, তজ্জন্য ক দায়ী হইবে? জোর করিয়া মনকে সে পথে লইয়া যাইতে হইবে। মনটা গবচ্চরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তখন স্বচ্ছন্দে সংসারে বিচরণ কর, তখন আর কানও ভয় থাকিবে না।

পুত্র হউক, মিত্র হউক, যে সাধন-পথের বিরোধী, সেই শত্রু। আমাদের ধান শত্রু আমাদের মন। মনই আমাদের সুহৃদ হইয়া রিপুরূপে পরিণত ইতেছে। সে যদি স্ববশে আসিত, তাহা হইলে বস্তুতই সে মিত্র মধ্যে গণ্য ত। কিন্তু সে সংসারে এসে সতত কামিনী-কাঞ্চন-অভিলাষী এবং দুরন্ত অবাধ্য। মনের ঘোর অত্যাচার নিবৃত্ত করা সাধ্যাতীত। সুতরাং তজ্জন্য ভগবানের শরণাগত হওয়া আবশ্যক। তিনি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা, তিনি দয়া করিয়া

দুরন্ত মনকে কুপথ হতে ফিরাইয়া দিলে, আর কোনই ভাবনা থাকে না। যে মন দিয়া সেই মন্মথ-মনোমথ হৃদয়বল্লভকে ধরিব, সেই মন সদাই হাট বাজারে বেড়াইতে থাকিলে, সে মন দিয়া কিরূপে তাঁহাকে ধরিব? যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবে, সেই সরিষাই যদি ভূতে পায়, তবে তাহা দিয়া ভূত ছাড়ান যায় কিরূপে? এজন্য মনে হয় সমস্ত অনুপায়ের সমাধান সেই ভগবানের পায় হইতে পারে। অতএব সর্ব্বতোভাবে তাঁহার চরণে শরণ লওয়াই একান্ত শ্রেয়। শ্রেয়োলাভের দ্বিতীয় উপায় আর নাই।

এ সংসারে মনুষ্য-জীবনের কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই অভাব অভিযোগের তীব্র তাড়না, অতৃপ্তি, ঘোর দুঃখ। সুখ-সাধনের জন্য মানব কত চেষ্টা করে, কিন্তু বিনিময়ে দুঃখই লাভ হয়। মায়ার কি মোহিনী শক্তি! তবুও মানব সেই বিষয়ের দিকে সতত প্রেমপরায়ণ। ভগবান সত্যই বলিয়াছেন "মম মায়া দুরত্যয়া" আমার মায়ার হাত হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না! তবে সেই অব্যাহতি পায়, যে আমার শরণাগত হয়। ভগবানের ঐ আশ্বাসবাক্য নিরুপায়ের উপায়, নিরাশার আশ্বাস, পতনোন্মুখ জীবনের রক্ষা-কবচ। সুতরাং যাহারা ভগবদ্বিমুখ হইবে, তাহারা সংসার-যন্ত্রে মায়ার প্রতারণায় নিষ্পেষিত হইবেই। অনিত্য-দেহ-গেহাদিতে সেই মায়াই নিত্যবোধ জন্মাইতেছে এবং দুষ্পরিহার্য্য আসক্তি জন্মাইতেছে; বলপূর্ব্বক সংসারে প্রবেশ করাইতেছে। আত্মশক্তিহীন মানব মায়াকে পরাজয় করিতে স্বতই অক্ষম। ভগবানের শরণাপত্তিই মায়া-ত্যাগের উপায়, ইহা শাস্ত্র ও গুরুমুখে শুনিয়াও মানব মায়ার প্ররোচনায় কিছুতেই বিশ্বাসী হইতে পারিতেছে না। দুঃখপ্রদ হইলেও বিষয়ীর নিকট বিষয় অতিশয় আনন্দপ্রদ। বিষ্ঠার কৃমি ও শূকর বিষ্ঠা-ভোজনেই অপার তৃপ্তি বোধ করে কোনস্থানের একাংশে ভাগবত পুরাণ ব্যাখ্যা হইতেছে, অপরাংশে সঙ্গীত হইতেছে; যে অংশে সঙ্গীত হইতেছে, সেই অংশেই লোক বেশীর ভাগ হইবে। ভগবদ্‌গুণানুবাদ ও পরনিন্দা এই দুয়ের মধ্যে পরনিন্দা-পক্ষের শ্রোতাই সমধিক হইবে। প্রাণ-বিনিময়েও বিষয়ী কামিনী-কাঞ্চন সংগ্রহ করিতে বদ্ধ-পরিকর।

মদের নেশা কখনও ছুটে, কিন্তু বিষয়-মদিরাপানের নেশা কখনও ছুটে না; বরং ক্রমশঃ গাঢ়তর হয়। এমনই মত্ততা যে, কিছুতেই সংজ্ঞা নাই। পাপ-পথে সহস্র সহস্র জীবন বাসনানলে পতঙ্গবৎ আহুতি দিতেছে, দেখিয়াও

পশ্চাৎবর্ত্তীরা সংযত হয় না। মানব এতই প্রবৃত্তির দাস হইয়াছে যে, পশুরাও মানবকে গুরু বলিয়া স্তব করে। মনে হয় শত শত বার যে, পশুযোনি ভ্রমণ করিয়াছে, সেই সংস্কার লইয়াই যেন মানবদেহ ধারণ করিয়াছে। মানব কি দানব চেনা ভার। অতুল বিভবে মগ্ন হইয়া মানব নিজকে দেবাবতার অসীম ক্ষমতাশালী মনে করে। মৃত্যু, জরা, ব্যাধির চিন্তাটা অন্য ভাব দিয়া ঢাকা দিয়া রাখে। কিন্তু পচা মরা আর কতদিন স্বর্ণ পাতে মুড়িয়া রাখা যায়? মৃত্যু কাহাকেও ক্ষমা করে না। মণি, মন্ত্র, ঔষধ, সুদৃঢ় লৌহ-গৃহ কিছুতেই মৃত্যুকে বারণ করিতে পারে না। মমতার আস্পদ এস্থান অনিচ্ছা-সত্বেও ত্যাগ করিয়া সবাইকেই কৃতান্ত-ভবনের অতিথি হইতে হইবে। মৃতুকে ভুলিয়া থাকিলে সে ভুলে কৈ? যদি কেহ বলেন ক্রমশঃ দুঃখের কারণ দূর করিতে করিতে, পরে জগৎ একেবারে সুখময় হইবে। তাহা অসম্ভব, যে পরিমাণে সুখ আসিবে তাহার চারিগুণ পরিমাণ দুঃখ তৎপশ্চাতে আসিবে। এখনকার সভ্যতার মানে, কতিপয় ধনী ব্যতীত পনর আনা তিন পাই লোক অন্নাভাবে ক্লিষ্ট। কতিপয় লোকের সুখ হইয়াছে বলিয়া জগৎ দুঃখ-শূন্য হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। সংসারের সহিত যাহার সম্পর্ক রহিয়াছে সে কখনও সুখী হইতে পারে না. ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অনন্ত সুখ, অসীম আনন্দের পারাবার একমাত্র ভগবান। তাঁহাকে না পাইলে কোন অবস্থায় কোনও স্থানে মানব সুখী হইতে পারে না। সংসারী ব্যক্তি সুখ বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করে, তাহা অপূর্ণ ও অবিতৃপ্ত। পর পর লোভের সামগ্রী রাশি রাশি বিদ্যমান। সুতরাং এক বস্তুতে আশা মিটে না, তৃপ্তি হয় না, সুতরাং বাসনা অবিতৃপ্ত থাকে। সেই অবিতৃপ্ত বাসনানলে জীব-পতঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে। অযুত বৎসর আয়ু পাইলেও কেহ ভোগে তৃপ্ত হইতে পারে না। বাসনানল ক্রমশই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, দাউ দাউ জ্বলিতে থাকে। সে অনলে ইন্ধন যোগাইতে জগৎ নরকে পরিণত হয়। ভাগ্যবানের ভাগ্যে স্বর্গ-দর্শন ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু নরকের চিত্রই চতুর্দ্দিকে অহরহ দৃষ্টিগোচর হয়। মনে হয় জগতে পাপীই সব, পুণ্যাত্মা দুই একটি। মানবের বাহিরে নরক, মনটাও নরককুণ্ড। মিথ্যায় মিথ্যা-বুদ্ধি, পাপে পাপ-বুদ্ধি হইতে থাকে। তখন আর নিস্তারের পথ থাকে না। মর্ম্মস্পর্শী নির্য্যাতনে পাপী আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। ঐহিক শারীরিক দণ্ড, পারত্রিক যমদণ্ড। সে রুদ্ধবেগ প্রবাহের ন্যায় কখনও অগ্রসর, কখনও পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে থাকে।

হতাশ-প্রাণে আকাশ পানে চেয়ে ভাবে, এ বিশ্ব-মণ্ডলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? হায়! হায়! কি যাতনা! কি দুর্দ্দৈব! তবুও পাপী নরকের পথ হইতে ফিরিতে চাহে না। বিষের কৃমির বিষের কি ভয়? পাপীর আর কি ভয়? এ দৃশ্য বহির্জগতে ও অন্তর-জগতে তুল্য।

ব্যর্থ অভিমান।

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

তোমার কথা ভাব্‌ব নাক'
ভেবেছিলাম মনে মনে,
তাই কি তোমার ছায়া হেরি
নয়ন-কোণে ক্ষণে ক্ষণে!

তোমার হাসির রঙিন আভায়
বিশ্ব হাসে নিত্য উষায়,—
সন্ধ্যা বেলার আলো ছায়ার
উড়ে তোমার অলকরাশি;
তোমার সিঁথির সিঁদূর লেখা
সন্ধ্যা তারায় অবিনাশী।

বর্ষা মেঘে তোমার আঁচল
উড়ে যায় ওই বর্ণ কাজল,
দৃষ্টি তোমার জ্যোছ্‌না-ধবল
ঘুচাও নিশার আঁধার কালো,
তোমার দেহের বর্ণ-ছটায়
গোলাপ বাগান আলোয় আলো।

হেমাঙ্গুলির ছায়া লয়ে
ফুট্‌লে চাঁপা কোরক হয়ে
প্রভাতে তাই সবিস্ময়ে
নয়ন মেলে থাকি চেয়ে!

দীঘির জলে কমল ফুটে
তোমার গালের রঙটী পেয়ে।

তোমারি সে ঠোঁটের আভায়
স্থলপদ্ম পাঁপড়ি রঙায়,—
হর্ষ তোমার মুরতি পায়
কণ্টকিত নীপের দেহে;
শান্তি তোমার নিশীথ রাতে
ঘুমিয়ে থাকে গেহে গেহে।

তোমার কথা ভাব্‌ব নাক
ভেবেছিলাম মনে মনে,
তাই কি তোমার ছায়া হেরি
নয়ন-কোণে ক্ষণে ক্ষণে।

শিক্ষা-সমস্যা।

লেখক—শ্রীদীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালায় অন্যান্য সমস্যার চেয়ে শিক্ষা-সমস্যাটা যে বেশ বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রতি বৎসর বাঙ্গালায় হাজার হাজার ছাত্র বি, এ. আই, এ, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ধারণ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাতে দেশের কি উন্নতি সাধিত হইতেছে? উন্নতির হিসাব লইতে গেলে দেখিবে শূন্য, আর কিছুই নহে। না হইতেছে দেশে নৈতিক উন্নতি, না হইতেছে সামাজিক উন্নতি। এ বিষয়ে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য করিয়াই দুই এক কথা বলিব; কারণ বাঙ্গালার আশা-ভরসা একমাত্র এই একটী শিক্ষায়তন এবং সেই শিক্ষায়তনই ভবকর্ণধাররূপে বাঙ্গালার ছাত্রগণকে পরিচালনা করিয়া থাকে। প্রথম কথা,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা দেশময় এই হাহাকার, অভাব ও দৈন্য কিছুতেই মিটিবে না। আর

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যদি তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করেন, তাহা হইলে দেশনেতৃগণের কর্ত্তব্য দেশময় শিক্ষার আন্দোলন দ্বারা নূতন প্রণালীর শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা।

প্রকৃত শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণতঃ এই বুঝি যে, যে শিক্ষা মানুষের মনকে উন্নত ও মার্জ্জিত করে, মানুষের সমাজ, জ্ঞান ও কর্ম্মকে সংযত ও শৃঙ্খলিত করে, জাতিকে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়,—যে শিক্ষা দ্বারা একটা জাতি দশজনের নিকট পরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা বা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা দ্বারা আমাদের জীবনের কোন অভাবই পূরণ হইতেছে না। কেন হইতেছে না, তাহাই ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হইতেছে, সেগুলির মধ্যে বিদ্যার একটা পবিত্র আদান-প্রদানের ভাব নাই, কেমন যেন একটা ব্যবসায় বা পেশার ক্ষেত্র। বেতনভোগী শিক্ষকগণ বেলা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে কতকগুলি পুস্তক মুখস্থ করাইয়া গেলেন,—ব্যস্, তাঁহাদের সব দায়িত্বই ফুরাইয়া গেল। ছেলেদের মানসিক বা শারীরিক কতটা উন্নতি সাধিত হইল, তাহারা মানুষ হইতে চলিল, কি মেষ হইতে চলিল, সে খোঁজে তাঁহাদের প্রয়োজন নাই; যে শিক্ষা ছাত্রকে প্রদত্ত হইল, সে শিক্ষা তাহার শরীর ও মনের উপর কতটা কার্য্যকরী হইল, তাহা দেখিবার অবসর বা প্রয়োজন যেন শিক্ষকের নাই। শিক্ষক মহাশয় উদরান্নসংস্থানের জন্য বিদ্যা-বিক্রয় করিয়া গেলেন, তাঁহার দোকানদারী ফুরাইয়া গেল। ছাত্রও দেখিল, বিদ্যালয়ে ৬টা ঘণ্টা যখন শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্ক, তখন তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইবার বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইবার ত এমন কোনও প্রয়োজন নাই; তিনি চান—দৈনিক পড়া মুখস্থ,—ব্যস্, তাঁহার আদেশমত দৈনিক পড়া মুখস্থ করিয়া গেলেই হইল, আর তাঁহাকে দিবার কিছুই নাই, বা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার কিছুই নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্লাশের সব ছাত্রের নামও শিক্ষক মহাশয় জানেন না, বা পরিচয়ও অবগত ন'ন। আবার অভিভাবকগণও ছেলেদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত, তাহারা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতেছে কি পশুত্ব অর্জ্জন করিতেছে, বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে কি অবিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে, তাহার কোন খোঁজই তিনি রাখেন

না। আবার এমনও দেখা যায় যে, ছেলে কোন্ ক্লাশে পড়ে, তাহাও অনেক অভিভাবক অবগত ন'ন। আর বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবকগণের ত পরিচয় লাভ ঘটিয়াই উঠে না, উহাকে তাঁহারা নিতান্ত পর করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ করিলে চলিবে না, বিদ্যালয়কে প্রত্যেক অভিভাবক নিজ নিজ গৃহ মনে করিয়া উহাকে নিজেদের সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ মনে করিবেন। বিদ্যালয়ের কোনও ত্রুটি দেখিলে তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহার প্রতিবাদ ও সংশোধন করিয়া তুলিবেন,—মোট কথা, বিদ্যালয়কে একটী চিড়িয়াখানা মনে না করিয়া উহাকে পবিত্র বিদ্যামন্দির মনে করিবেন এবং ছাত্রগণও উহাকে আপনার গৃহ মনে করিয়া ভক্তিপ্রণতচিত্তে পাঠাভ্যাস করিবে, তবেই ঐ সকল বিদ্যালয় ক্রমশঃ প্রাচীন ভারতের—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বা গুরুগৃহে পরিণত হইবে। বর্ত্তমানযুগে যাঁহারা শিক্ষার সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয়গুলির সংস্কার করিতে হইবে। বিদ্যালয়-গুলিকে সর্ব্বসাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিতে হইলে—প্রথমতঃ প্রাচীনকালের গুরুগৃহের মত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রাচীনকালে যেরূপ প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের আত্মীয় পরিবার মধ্যে গণ্য হইয়া জ্ঞান লাভ করিত; সমাজ, দেশ, গৃহ, গুরু সকলেরই সেবা-কার্য্যের মধ্য দিয়া সংসার ও গৃহস্থ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইত, সেইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথমতঃ হয় ত নানা বাধা বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি কালে যে এই প্রণালীই স্থায়িভাবে টিকিয়া যাইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ, শিক্ষক ও ছাত্র যদি পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি বা স্বরূপ চিনিতেই না পারিল, ছাত্র যদি শিক্ষককে বেতনভোগী ভৃত্য মনে না করিয়া পিতা-মাতা বা অভিভাবকের মত ভক্তি করিতেই না শিখিল, শিক্ষকও যদি ছাত্রের সঙ্গে প্রতিপালিত পুত্রের মত স্নেহ ও বাৎসল্যের মধুর সম্পর্কই স্থাপন করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে শিক্ষকের প্রদত্ত শিক্ষা শিক্ষিতের মনের দ্বারে আঘাত করিবে কি করিয়া? নতুবা বিদ্যামন্দির, শিক্ষক সবই পর বলিয়া বোধ হইবে। আমাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহগণ শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন,—"ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ।" কিন্তু ছাত্র বলিতে ত শুধু এক আলমারি পুস্তকই বুঝায় না, রক্তমাংসে গঠিত মানুষ বুঝায়। কাজেই ছাত্রকে শুধু দিবারাত্র পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না, তাহাকে মানুষ নামে অভিহিত হইতে হইবে। মানুষ নামে অভিহিত হইতে হইলে তাহাকে বহির্জ্জগতে আসিতে হবে, বাইরের আলো দেখিয়া গোড়া হইতেই লক্ষ্যপথ নির্ণয় করিতে হইবে। কারণ, ছাত্র কখন চিরকালই ছাত্র থাকিবে না, ভবিষ্যতে তাহাকে দশজনের একজন হইতে হইবে,—

সংসারিরূপে, গৃহস্থরূপে,—পুত্রকন্যা আত্মীয় পরিজনের পালক ও পরিচালকরূপে, দরিদ্র নরনারায়ণের সেবকরূপে, দেশের ও দশের উপকারী বন্ধুরূপে, সমাজের নিয়ন্তৃরূপে তাহাকে ভবিষ্যতে জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে হইবে। কাজেই তাহাকে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি কর্ম্মক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে সে স্বাধীনভাবে আত্মনির্ভরশীল হইয়া দেশের, দশের ও সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে অভ্যস্ত হয়। শিক্ষক ও অভিভাবকগণ তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এই সুযোগ প্রদান করিবেন। অনেকে হয় ত বলিবেন,—ছাত্র ছাত্রই থাকিবে,—তাহাকে ছাত্রজীবনেই সংসারী বা সামাজিক করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কি? যে যেভাবে জীবন গঠন করিবে, তাহাকে পূর্ব্বাহ্লেই সেইভাবেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া গোড়া হইতেই প্রস্তুত হওয়া ভাল। কারণ, লেখাপড়া শেষ করিয়া হাকিম হইব কি ব্যারিষ্টার হইব,—এইরূপ চিন্তা করিতে গিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার চেয়ে—এমন একটী বিষয়ে আত্মনিবিষ্ট হওয়া ভাল, যাহাকে শেষ পর্য্যন্ত মূলমন্ত্ররূপে ধারণ করিয়া জীবনের উপাস্য করিয়া তোলা যায়। ইহাতে শিক্ষার প্রতি একটা আসক্তি ও ভক্তি জন্মে এবং শিক্ষণীয় বিষয়ও মনের প্রত্যেক তারে গাঁথিয়া যায়। ব্যবসায়ী যেমন তাহার গদী ও ধনভাণ্ডারকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে; শিল্পী যেমন তাহার যন্ত্রপাঁতিকে শ্রদ্ধা করে; সেইরূপ শিক্ষার্থীকেও বিদ্যামন্দিরকে ও শিক্ষণীয় বিষয়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা কোন শিক্ষাই সে তাহার কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

আজকাল এক ধূয়া উঠিয়াছে, শিক্ষাকে অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত করা হউক। ইহার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কও অনেক উঠিয়াছে, যথা,—শিক্ষা শিক্ষাই, ইহার সঙ্গে অর্থ রোজগার যোগ করিয়া দিলে ইহার উদ্দেশ্যকে ছোট করা হয়। এ যুক্তি অবশ্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন নহে; কারণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন,—অর্থোপার্জ্জন নহে। শিক্ষার্থী জ্ঞানের উপাসনায় আত্মাকে ডুবাইয়া দিবে; ইহাই তাহার নিকট দেশ ও জাতি চায়। কিন্তু কালভেদে এক্ষণে আর ঐ যুক্তি আদৌ খাটে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ ছাত্রকেই বিদ্যা শিক্ষা শেষ করিয়া কঠোর জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। কাজেই ছাত্র যদি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থার্জ্জনের জন্যও প্রস্তুত না হইতে পারে, তাহা হইলে সারাজীবন তাহাকে দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়, তখন তাহার জীবন বড়ই বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠে। কাজেই শিক্ষার আদর্শ এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে শিক্ষার্থী জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি, চরিত্র, কারিগরী শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে

উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়া তাহার কর্ম্মক্ষেত্রকে ভবিষ্যতে সফল ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে। তবেই এদেশে শিক্ষা-সমস্যার একটা স্থায়ী মীমাংসা হইতে পারে।

বিদ্যামন্দিরেই কিম্বা উহার সংলগ্ন ছাত্রাবাসেই ছাত্রদিগের থাকিবার স্থান হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক শিক্ষকের অধীনেই একদল ছাত্র পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে এক বিষয়ে সুবিধা হইবে এই, শিক্ষক শিক্ষার্থীর নৈতিক উন্নতি, মানসিক উন্নতি, শারীরিক উন্নতি সকল প্রকার উন্নতির প্রতিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন এবং তাহার দৈনিক জীবন-যাপন-প্রণালী স্বাধীনভাবে পরিচালিত করিতে পারিবেন। ইহাতে আরও একটী সুবিধা হইবে এই, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে এবং শিক্ষকও ছাত্রকে নিজ পুত্রনির্ব্বিশেষে আদর্শ মানুষরূপে গড়িয়া তুলিবার সুবিধা পাইবেন। অবশ্য শিক্ষকও এরূপ ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেন, যিনি অধ্যাপনা-কার্য্যকেই জীবনের একমাত্র মিশন বা ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ধৈর্য্য, সংযম, চরিত্রবল ও জ্ঞানবলে আপনার অন্তঃকরণকে মার্জ্জিত করিতে পারিবেন। প্রাচীনকালের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের মত যিনি বিদ্যাদানকেই একমাত্র জীবনের মূলমন্ত্র করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই ইহা সম্ভব। শিক্ষক-নির্ব্বাচন-বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এরূপও ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষকের পরিচালনার দোষে বহু ছাত্রের পরকাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহার উপরে কতকগুলি বালকের পরকাল নির্ভর করিতেছে, তাঁহাকে ত সাধারণ মানুষ হইলে চলিবে না, তাঁহাকে অতি-মানুষ হইতে হইবে; তাহা হইলেই লোকে তাঁহার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া ছেলে মানুষ করিবার ভার ন্যস্ত করিতে পারিবে।

তারপর পুর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষার বিষয় ও প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কারণ, বর্ত্তমানযুগে শিক্ষিত বলিয়া যাঁহারা শিক্ষার বড়াই করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম অভাব লক্ষিত হয়, স্বাস্থ্যের অভাব। ছেলে লেখাপড়া শিখিতেছে,—আচ্ছা শিখুক, তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ, সে কি আহার করিতেছে, তৎপ্রতি অভিভাবকেরও দৃষ্টি নাই, শিক্ষকেরও দৃষ্টি নাই। তারপর ছেলে যখন বি, এ ও এম্, এ পাশ করিয়া লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া আসিয়া সংসারধর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে বসিবে, সেই সময় অভিভাবক দেখিলেন, তাঁহার ছেলের সে নধর কান্তি, প্রফুল্ল বদন, উজ্জ্বল চক্ষু আর নাই। যৌবনেই কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ, জ্যোতির্হীন চক্ষুর উপর একযোড়া চশমা বসাইয়া শ্রীবৃদ্ধ সাজিয়া বসিয়াছে। তখন না আছে তাহার শরীরে কান্তি, না আছে মনে শান্তি; অবসাদ আর জরা আসিয়া তাহার মনের উপর রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে।

তখন অভিভাবকের মনে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। এরূপ করিলে চলিবে কেন? অভিভাবক তুমি, ছেলের কাছে শুধু বিদ্যার ডিগ্রিই আশা করিবে, আর পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার মত মেয়ের বাপের ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকা আদায় করিবে? এই আশায় তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছ, তাহার নিকট আর কোনও উচ্চাশা করিবে না? মনুষ্যত্বই তাহার নিকট তোমার প্রথম ও প্রধান দাবী, যাহার দ্বারা তুমি জগতের কাছে পরিচয় দিতে পারিবে যে, তুমি ছেলের বাপ। নতুবা ছেলের নিকট শুধু অর্থের আশা করিলে যে তাহাকে অকালে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। তাই, ছেলের অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থাও করিতে হইবে। সুন্দর স্বাস্থ্য লইয়া ছেলে যদি বিদ্যামন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারাও শত অভাব অভিযোগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে। সময়ে প্রয়োজন হইলে চাষার ছেলের মত লাঙ্গল ধরিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, জীবন-সংগ্রামের দিনে শত বিপদেও তাহাকে পরের মুখ চাহিয়া উপবাস ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে না। আমাদের দেশে আধুনিক নিম্ন বিদ্যালয়গুলিতে ড্রিল প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু তথাপি দেখা গিয়াছে, ইহা দ্বারা ছেলেদের শারীরিক উন্নতি কিছুই হইতেছে না। শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামকে অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় করিয়া তুলিতে হইবে এবং এই প্রক্রিয়াগুলিকে ছেলেদের মনের মত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে এই ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রতি তাহাদের আসক্তি জন্মিবে। আর উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ত সে ব্যবস্থা আদৌ নাই; বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রদের পক্ষে এগুলি আদৌ প্রয়োজনীয় মনে করেন না, তাই আজ বাঙ্গালায় অকাল মৃত্যুর হার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে, দশ বছরের ছেলে অশীতিপর বৃদ্ধে পরিণত হইতেছে। তবে সুখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালীকে সখের পায়রারূপে আর না রাখিয়া তাহাদিগকে সাহসী জাতিরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য নূতনরূপে সামরিক শিক্ষার আয়োজন করিতেছেন; আশা করি, তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টা ভবিষ্যতে ফলবতী হইবে।

বর্ত্তমানে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আর একটী বড় দোষ দেখিতে পাই। বাঙ্গালার অধিকাংশ শিক্ষার্থী দেশ বিদেশের বহু বিদ্যা ও জ্ঞান সঞ্চয় করে সত্য, কিন্তু এত বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের দেশ, জাতি ও স্বাতন্ত্র্যকেই চিনিতে পারে না। বাঙ্গালার ছাত্র শিক্ষা করে সবই, জানে সবই, চিনিতে পায় সকল দেশকেই, শুধু চেনে না নিজের দেশকে। তাই,

বড় দুঃখ হয় এই ভাবনায় যে, বাঙ্গালী আর দশ বৎসর পরে হয় ত বাঙ্গালী-কেই চিনিবে না। বিশ্ববিদ্যালয় "বাইবেল" অবশ্য-পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত করিয়া-ছেন,— ইংরাজীভাষার পরীক্ষা তিন চারি প্রস্থ করিয়াছেন; গ্রন্থকর্ত্তা বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকে লিখিতেছেন,—ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী অমুক নগরে অমুক মহাত্মা জন্মিয়াছেন;—বাঙ্গালার শিশু বাল্যকাল হইতেই শেখে বাঙ্গালী ভীরু, কাপুরুষ ইত্যাদি; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কোন্ কালে বাঙ্গালীর প্রতিভা, শৌর্য্য, বীর্য্য ও অন্তর্ম্মুখী জ্ঞান কোথায় নিহিত ছিল; ধর্ম্ম ও জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কোন্‌কালে বাঙ্গালীকে আদর্শ জাতিরূপে জগতের সমক্ষে পরিচিত করিয়াছিল, এই সকল অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করাই বাঙ্গালার ছাত্রগণের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। অতএব বাঙ্গালায় শিক্ষার আদর্শকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, যেন তাহারা তাহাদের পিতৃপিতামহগণের পদাঙ্কের অনুসরণ করিতে পারে; বাঙ্গালার সঙ্গীত, বাঙ্গালার কাব্য, বাঙ্গালার সমাজ, বাঙ্গালার শিল্পকলা, বাঙ্গালার স্থাপত্য—বাঙ্গালার সকলপ্রকার জাতীয় আদর্শকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারে, পবিত্র বঙ্গভূমিতে জন্মিয়া যেন বঙ্গজননীকে আগে চিনিতে পারে, আগে প্রাচ্যের ত্যাগের আদর্শকে ভক্তিভরে বরণ করিয়া পরে প্রতীচ্যের নূতন আলোককে বরণ করে। কারণ, প্রতীচ্যকে একেবারে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না; কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের মত, যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মত প্রাচ্যের অন্তর্দৃষ্টি দিয়া প্রতীচ্যকে দর্শন করিতে হইবে; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। স্বর্ণকার যেরূপ খাদ মিশাইয়া স্বর্ণকে উজ্জ্বল ও দৃঢ় করিয়া তোলে, সেইরূপ বাঙ্গালার শিক্ষার্থীও বাঙ্গালার ত্যাগের আদর্শের সঙ্গে ইউরোপের ভোগের আদর্শকে মিশ্রিত করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

বাঙ্গালায় শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আর একটী বড় গলদ দৃষ্ট হয়; ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবহার-শাস্ত্র সকল বিষয়ই ইংরাজীভাষায় অধীত হয়; এমন কি বাঙ্গালার বীজগণিত, পাটীগণিত পর্য্যন্ত। ইহাতে ছাত্রগণের প্রত্যেকটী কঠিন বিষয় অন্তরের সঙ্গে বুঝিবার পক্ষে বড়ই বিঘ্ন হয়। অধিকাংশ ছাত্রই ঐ সকল বিষয় বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া শুধু অনর্গল মুখস্থ করিয়া যায়; কারণ কোন রকমে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেই ত পাশের ডিগ্রি পাওয়া যায়, উহা বুঝিবার জন্য অত চেষ্টা করে কে? ইহার বিষময় কুফল যাহা ফলে, শেষে তাহাই হয়; শুধু গলাধঃকরণ করা আর পরীক্ষার মন্দিরে গিয়া বমন করিয়া ঝাড়িয়া আসা।

মাতৃভাষার সাহায্যে ঐ সকল কঠিন বিষয় শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থী যেমন অনায়াসেই উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, বিজাতীয়ভাষায় শিক্ষা দিলে কি আর অতটা হয়? হয় ত ক্ষণিকের জন্য সে বিষয়টী বুঝিতে পারিল, কিন্তু আনন্দের সঙ্গে—প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করিবার আগ্রহ তাহার কিরূপে জন্মিবে? আর প্রাণের সঙ্গে বিদ্যাকে গ্রহণ করিতে না পারিলে উহা জীবনে কার্য্যকরী হয় না। এইজন্যই দেখা যায়, আমাদের দেশের ছাত্রগণ যাহা শিক্ষা করে, তাহা পরীক্ষকের মনস্তুষ্টির জন্য, কর্ম্মক্ষেত্রে উহাকে প্রয়োগ করিবার জন্য নয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, "নিজের চিন্তাশক্তি দ্বারা নিজের উপযোগী করিয়া লইতে না শিখিলে বইএর কথা মনে লাগে না, আর বিদ্যা জীবনের জিনিস না হইয়া বাহিরের জিনিস বলিয়া বোধ হয়।" এই সব কারণে বাঙ্গালার চিন্তাশীল অধ্যাপকগণ সকলেই এক-যোগে ইংরাজী ভাষা ব্যতীত আর সকল বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই সাধু চেষ্টা ফলবতী হউক।

আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আর একটী বড় গলদ রহিয়াছে—বাৎসরিক-পরীক্ষা-গ্রহণ। এই পরীক্ষা-গ্রহণের জন্য অনেক ছাত্রকেই দেখা যায় শুধু পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য অধ্যয়ন করিতে। ইহাতে হয় কি,—পরীক্ষায় পাশ করিবার দশ বৎসর পরে শিক্ষার্থীকে অধীত বিষয়ের কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে—কিম্বা কোন কঠিন অংশ বুঝাইয়া দিতে বলিলে, সে কিছুতেই পারিবে না। বলিবে,—উহা ত শিখিবার জন্য পড়ি নাই, পরীক্ষার জন্য পড়িয়াছি। বাস্তবিক,—কিছু শিখিব, জানিব এবং পৃথিবীকে কিছু দান করিয়া যাইব, এই উচ্চ ধারণা লইয়া খুব কম ছাত্রকেই আজকাল অধ্যয়ন করিতে দেখা যায়। আর এইরূপ উচ্চ ধারণা শিক্ষার মধ্যে নাই বলিয়াই উহার আদর্শ দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে; ছাত্রগণের স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণও এই একই কারণে আজকাল হইতে পারিতেছে না। টেক্স্‌টবুকের বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এবং পরীক্ষার প্রচণ্ড আঘাতের ভয়ে ভীত হইয়া আমাদের দেশের ছাত্রগণ স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার শক্তি দিন দিনই হারাইয়া বসিতেছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ছাপ গ্রহণ করাই বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি পরীক্ষা-গ্রহণকে একেবারে বাদ দিতে বলিতেছি না। ভাল মন্দ, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বিচার করিতে হইলে পরীক্ষা-গ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু ছাত্রের স্মরণ-শক্তির

বিচার না করিয়া তাহার স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা ও গবেষণা-বুদ্ধির বিচার চাই; তাহাকে যাহা দান করা হইল, সে তাহার সাহায্যে জগৎকে আরও কিছু দান করিতে পারিল কিনা তাহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে; সে Practical fieldএ নামিয়া স্বাধীনভাবে নিজের কাজ গুছাইয়া তুলিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। এই প্রণালীতে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, অর্থাৎ ছাত্রদের বিদ্যা-মন্দিরের চারিপার্শ্বে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে—যথা,—ডিবেটিং ক্লাব, সেবাসমিতি, পুস্তক-ও-পাঠাগার, মাসিক-পত্রিকা-পরিচালন, ব্যায়ামের আখড়া, কারুগিরি শিল্পের কারখানা, সাহিত্য-চর্চ্চার সমিতি ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠান ছাত্রগণ নিজেরাই গড়িয়া তুলিবে, তাহারাই শিক্ষকগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এই কাজ করিবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ডিবেটিং ক্লাব থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐ ডিবেটিং ক্লাবে ছাত্র ও শিক্ষকগণ পরস্পর স্বাধীন-ভাবে নানাপ্রকারের সমস্যা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনা করিবেন; মাসিক পত্রিকার সাহায্যে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিবেন; এইরূপ পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান না হইলে ছাত্রগণের বিচারবুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশ হইবে না। নিরুপায় ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সেবাধর্ম্মের বিস্তার করিতে হইবে। এই সেবাধর্ম্ম দ্বারা ছাত্রগণের পরোপকাররূপ মহৎ বৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। পুস্তক ও পাঠাগার স্থাপন করিয়া ছাত্রগণের জ্ঞানকে দিগন্ত-প্রসারিণী করিয়া দিতে হইবে।

আমাদের দেশে শিক্ষার মধ্যে আর একটী বড় অভাব লক্ষিত হয়, উচ্চশ্রেণীর জন্য শিক্ষার সকলপ্রকার বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু নিম্নবর্ণের শিক্ষার জন্য কোনপ্রকার বন্দোবস্ত নাই; এমন কি এ বিষয়ে কোন মনস্বী ব্যক্তিকে বড় মাথা ঘামাইতে দেখি না। Depressed Classএর জন্য অন্ততঃ প্রাথ-মিক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়—এ কথাটা মনস্বী গোখেল প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ব্যবসায়ী ইংরাজরাজত্বে উহা সম্ভবপর হইবে না। নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ জাতিদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাদের বিবেকবুদ্ধিকে জাগরিত করিয়া তুলিতে হইলে, প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা আজকাল প্রত্যেক মনস্বীই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাই আজকাল বাঙ্গালার দুই একটা নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু দুই একটী গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও আর সারা বাঙ্গালা বা সারা ভারতবর্ষের অভাব

পূর্ণ হইবে না? প্রত্যেক গ্রামেই একটী করিয়া অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ঐ সকল বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষা লেখাপড়া না হইয়া দেশীয় কৃষি, বাণিজ্য, সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় হওয়া উচিত। কারণ—ঐ সকল জিনিস পল্লীগ্রামের নিজস্ব সম্পত্তি,—ওগুলি চাষার তালপাতার কুটীরে, চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায়, পল্লীর মোড়লের আড্ডায়,—রাখাল বালকের ক্রীড়াস্থান—উন্মুক্ত ময়দান হইতেই জন্মস্থান লাভ করিয়াছে। কাজেই ওগুলির সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হইবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিলে তখন তাহাদের দেশবিদেশের খবর জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মিবে। জাপানে হোটেলের ঝি চাকরেরাও বাঙ্গালার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিখ্যাত "গীতাঞ্জলি"র খোঁজ রাখে। কারণ, সেটা স্বাধীন দেশ, সেখানে শিক্ষা আভিজাত্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে,—সেখানে মুটে, মজুর, ধনী, নির্ধন সকলেই অল্পবিস্তর লেখাপড়া শেখে এবং তার জন্য পেশা লইয়া সমাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না। আজ যে বি, এ পাশ করিয়া জুতা সেলাই করিতেছে, কাল হয় ত সে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্‌এর প্রেসিডেণ্ট হইয়া পাঁচজনের সম্মুখে দেশের ভালমন্দ আলোচনা করিতেছে। সে দেশে পেশা বা কর্ম্ম লইয়া কেহ বড় বা ছোট হয় না, বড় ছোটর বিচার হয় কর্ম্মক্ষমতা ও বিদ্যাবুদ্ধির মধ্য দিয়া। আর আমাদের দেশে চাষার ছেলে যদি এক কলম লিখিতে বা এক আধখানা কেতাব পড়িতে শেখে, অমনি সে তাহার চাষ বাস ছাড়িয়া দিয়া লম্বা কোচা ঝুলাইয়া ১৫৲।২০৲ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত হয়। কাজেই এই লেখাপড়া শিখিবার উদ্দেশ্য সরকারের গোলামী করা নয়, কিম্বা বাবু সাজা নয়, লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্য নিজ নিজ পেশা ও ব্যবসায়ের উন্নতি করা। আত্মোন্নতি এবং দেশের ও দশের উন্নতি যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, এই ধারণা নিম্নশ্রেণীর প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইলে উন্নত প্রণালীর কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপরই জোর দিতে হইবে বেশী করিয়া; প্রাথমিক শিক্ষা থাকিবে গৌণ উদ্দেশ্য।

আজকাল দেশের লোকের চক্ষু ধীরে ধীরে ফুটিতেছে, নিজের নিজের দেশের গৌরবকে চিনিবার জানিবার ও বুঝিবার জন্য লোকের মধ্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা জন্মিতেছে। ইহারই ফলস্বরূপ আমরা দেখিতেছি,—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, মাননীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রথিতনামা সাহিত্যিকগণ পল্লীর সঙ্গীত, পল্লীর কাব্য, পল্লীর স্থাপত্য প্রভৃতিকে সাদরে বঙ্গসাহিত্যের আসরে স্থানদান করিতেছেন। কাজেই আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষার ঢেউ এমনিভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে যে, ধীরে ধীরে সকল মীমাংসা ও দ্বন্দ্বের অবসান হইয়া বাঙ্গালায় শিক্ষার আদর্শ চিরজাগ্রত ও চিরসুন্দর হইয়া উঠিবে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড
৯ম সংখ্যা।

পৌষ।

১৩৩২ সাল।
১৮৪৭ শকাব্দাঃ

উচ্ছ্বাস।

(আকাশের প্রতি)

লেখক—সম্পাদক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৪)

হে আকাশ,

প্রকৃতি অক্ষম যদি চৈতন্য বিহনে,
চৈতন্যই সার বস্তু লয় মম মনে,
প্রকৃতির সূক্ষ্মভূত তোমার স্বরূপ—
চৈতন্য-প্রভাবে তুমি ধর নানা রূপ।
অণুতে অণুতে তব চৈতন্য বিরাজে,
তাহার প্রভাবে তুমি সাজ নানা সাজে।
আনন্দ হইতে হয় তোমার বিকাশ,

আনন্দে আনন্দ নাহি থাকে, হে আকাশ!
যতক্ষণ নাহি হয় আদান-প্রদান।
বহু হ'য়ে আনন্দ আনন্দ করে দান॥
আনন্দই হয় এই বিশ্বের কারণ—
আনন্দ হেতুই এই বিশ্বের সৃজন।
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(১৫)

হে আকাশ,
আমার অজানা কোন দেশে যেতে হবে?
অথবা যাহা হ'বার হবে এই ভবে?
জানি না কি ভাব হয় পশ্বাদির মনে,
মানুষ সর্ব্বদা কিন্তু নারাজ মরণে।
যাদের জীবনে কোন সুখ স্বস্তি নাই
তাদেরো বাঁচিতে ইচ্ছা দেখিবারে পাই,
প্রতিদিন বহুলোকে যমালয়ে যায়,
তবু লোকে চিরকাল বাঁচিবারে চায়।
পুছিয়াছি আমি বহু বহু বৃদ্ধ জনে
"সত্য কথা বল, তব কিবা ইচ্ছা মনে,"
শুনিয়াছি সকলেরই মুখে এক বাণী,
মরণের জন্য রাজি নহে এক প্রাণী;
সবাই বাঁচিতে চায় যতক্ষণ সুখ—
মুখেতে মরণ চায় যতক্ষণ দুখ।
দুঃখের ভিতরে থাকে সুখের লালসা,
দুঃখান্তে হইবে সুখ সদা এই আশা।
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(১৬)

হে আকাশ,

প্রাণ মম নাহি চাহে নীরস ঈশ্বর,—
ব্যক্তিত্ব-বিহীন, নিয়মের নামান্তর।
সুধু নিয়মের বলে যদি বিশ্ব চলে
যন্ত্রাদি যেমন চলে কলের কৌশলে,
জীব যদি সুধু অন্ধ নিয়মের দাস,
কিরূপে এড়াবে তেহ কর্ম্ম-ফল-পাশ ?
মানব অপূর্ণ, পদে পদে তার ভ্রম,
কৃপা-পাত্র বিশ্বে নহে কেহ তার সম।
অহরহ হিংসা করে হিংস্র জন্তুগণ—
তাহাতে সন্তপ্ত নহে তাহাদের মন ;
স্বভাব চালায় যথা সেইরূপ চলে,
কভু নাহি জানে কাকে ইচ্ছাশক্তি বলে,
নাহি স্বাধীনতা, নাহি পাপ নাহি পুণ্য,
করুক না কেন কর্ম্ম যতই জঘন্য,
যতই অসভ্য হ'ক মানব-সন্তান,
পাপপুণ্য বলে তার আছে কিছু জ্ঞান।
ইচ্ছাশক্তি আছে তার, আছে স্বাধীনতা ;
প্রকৃতির প্রভু, নাহি মানে অধীনতা ;
অথচ অপূর্ণ, কাম ক্রোধ লোভ মোহ
বিদিকে লইয়া যায় তারে অহরহ।
ক্ষমার বিধান যদি নাহি থাকে তার
এ জীবন তবে তার মহা হাহাকার !

নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(১৭)

হে আকাশ,

নিয়মের বলে পার্থিব ভূপতিগণ—
পৃথিবী করেন সত্য শাসন পালন,

কিন্তু তাহাদেরো আছে ক্ষমার বিধান,
ক্ষমারও আছে নিয়মের মধ্যে স্থান।
পাপ করি অনুতপ্ত হয় যেই জন,
পাপ হতে বিনিবৃত্ত হয় যার মন,
ক্ষমাশীল বিশ্বপতি ক্ষমেন পাপীকে,
ক্ষমাশীল পিতা যথা ক্ষমেন পুত্রকে।
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(১৮)

হে আকাশ,
নিবিড় কাননে দেখিয়াছি শার্দ্দূলী-শার্দ্দূল,
সস্নেহে চাটিছে শাবকের পদাঙ্গুল ;
ভীষণ গর্জ্জন নাই, নাহি হিংসার ফূরতি
অপত্য-স্নেহের যেন দুটী অপূর্ব্ব মূরতি।
কভু বক্ষে, কভু স্কন্ধে, কভু তার শিরোপরে,
শাবকেরা মহানন্দে লম্ফে ঝম্পে খেলা করে ;
শার্দ্দূলীর স্তন্য হ'তে স্নেহ-ক্ষীরধারা ঝরে,
শাবকেরা মহানন্দে তার দুগ্ধ পান করে,
গহন অরণ্য মাঝে নাহি বিপদের ভয়,
তাহারা করিছে খেলা অতি নির্ভয়-হৃদয়।
এ শার্দ্দূল-দম্পতীর অতি সুখের সংসার
অতি নির্ম্মম শিকারী এক করে ছারখার।
সন্ধানে তাহার ধরাতলে পড়িল শার্দ্দূল,
পলায় শার্দ্দূলী দ্রুতবেগে ভয়েতে ব্যাকুল,
শাবকেরা তার নাহি জানে কারে বলে ভয়,
তবু রক্তাক্ত শার্দ্দূল-বক্ষে লইল আশ্রয় ;
আনন্দে শিকারী শার্দ্দূলের দেহ লয়ে যায়,
ছানাগুলি বন্দী ক'রে বিপুল পুলক পায়।

যে নির্দ্দয় শার্দ্দূল হরষে মৃগ-শিশু খায়,
পালনে আপন শিশু স্নেহের মূরতি প্রায় ;
ব্যাঘ্র-শিশু বন্দী ক'রে হরষিত যেই জন,
নিজের সন্তান প্রতি তার অতুল যতন।
দেখেছি সুন্দরবনে মীন খায় মৃগকুলে,
তারা পুনঃ সদা পায় স্থান শার্দ্দূল-কবলে,
মানুষ শার্দ্দূলে মারে, শার্দ্দূল মারে মানুষে—
জীব সব পরস্পরে, মারে অতীব হরষে—
হে আকাশ, বল দেখি, এ তাণ্ডব লীলা যার,
করুণার কণামাত্র আছে কিহে হৃদে তার ?
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(১৯)

হে আকাশ,
যে স্থপতি-চিত্তে বিশ্ব ছিল ভাব-রূপে,
জান যদি বল মোরে তাঁহার স্বরূপে।
কিবা রূপ কিবা গুণ কিবা তাঁর নাম,
খর্ব্ব কিম্বা দীর্ঘকায়—কোথা তাঁর ধাম,
আমাদের দুঃখে তিনি হন কি দুঃখিত,
আমাদের সুখে তিনি হন কি হর্ষিত ?
পুত্র-শোকে মাতা যবে করে হাহাকার,
বক্ষে করাঘাত করে, করয়ে চীৎকার,
আছাড়ি পিছাড়ি খায়, গড়ায় ধূলায়—
"কোথায় গেলিরে তুই, ফিরে চলে আয়,"
অশ্রুনীরে ভাসে বুক, আলু থালু বেশ,
উন্মাদিনী-প্রায় ছিঁড়ে আপনার কেশ,
পাষাণও দুঃখ দেখি দ্রব হয়ে যায়,
তত্ত্বকথা ভেসে যায় শোকের বন্যায়,

যতই তাহাকে তুমি কর না সান্ত্বনা,
ততই বাড়িয়া যায়—হৃদয়-যাতনা ;
অজর অমর আত্মা কখনো মরে না,
মাতার হৃদয়ে কভু এ কথা ধরে না।
দেখিয়াছি আমি বহু জ্ঞানী ভক্তজন,
দেখিয়াছি বহু ত্যাগী সাধু ও সজ্জন।
মৃত্যুর সম্মুখে দেখি সকলি সমান,
শতধা ভাঙ্গিয়া যায় সকলের প্রাণ।
বিশ্বের ক্রন্দনে বল কাঁদেন কি তিনি,
সকলের পিতা এই বিশ্বপতি যিনি ?
আছে কিহে তাঁর হৃদে করুণার লেশ—
ক্লিষ্ট করে নাকি তাঁকে আমাদের ক্লেশ ?
অথবা নৃশংস তিনি অতীব দুর্ম্মতি,
হরষিত করে তাঁকে জীবের দুর্গতি ;
আনন্দ পায়েন যদি করিয়া সৃজন,
কোন্ সুখ পান করি বিনাশ-সাধন ?

নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

(২০)

হে আকাশ,

আজ হায়নের এই প্রথম দিবসে
শত শত চিন্তা মম উদিছে মানসে।
পুঞ্জীকৃত অতীতের স্মৃতি স্তরে স্তরে
হৃদয়-আকাশ মম অধিকার করে।
স্বপনে যেমন, কভু প্রসন্ন হরষে,
পরক্ষণে পুনঃ হই বিষণ্ণ মরশে।
ক্ষুদ্র জীব-অণু এক জন্মি পিতৃ-দেহে
আনন্দে প্রবেশে যদা মাতৃ-গর্ভ-গেহে,

এ বিশাল বিশ্ব তদা হয় মধুময়
ভূলোকে দ্যুলোকে আনন্দের ধারা বয়।
মহা মহীরুহ যথা বীজের অন্তরে,
মানবও সেইরূপ জীবাণু ভিতরে।
কোথা ছিল হস্ত পদ, কোথা ছিল মন ?
কেমনে হইল তার অপূর্ব্ব জনম ?
স্মৃতির প্রকোষ্ঠ আমি কত খুঁজিলাম,
রহস্য-সন্ধান তবু নাহি পাইলাম।
জীবের জনম এই বিধানে যাঁহার
জান কিহে তুমি কিছু সন্ধান তাঁহার ?
নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত।

অমরতা—পূর্ব্বজন্ম ও পরকালবাদ *

লেখক—শ্রীবিনোদলাল ভদ্র এম্, এ, বি, এল্।

গীতাকারের 'জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' এবং বঙ্গের সুসন্তান খ্যাতনামা কবি মাইকেল মধুসূদনের 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে' এই শ্রুতি-মধুর সারগর্ভ বাক্য যখনই আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধ্বনিত হয় বা অকস্মাৎ স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনই স্বতঃ মনে এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জন্ম ও মৃত্যুর বাহিরে কিছু আছে কি না ? এমন কিছু আছে কিনা যাহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই ; যাহা অনাদি, অনন্ত, যাহা দেশকাল ও পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অসীম হইয়া বিরাজ করিতেছে ; যাহা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, যাহা স্বপ্রকাশ, যাহা গুণাতীত, যাহা সর্ব্বশক্তিময়, যাহা মূলাধার ?

এটি বড়ই জটিল সমস্যা। মানব, সভ্যতার প্রাচীন যুগ হইতে মধ্যযুগের

* ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

ভিতর দিয়া এই বর্ত্তমান নবযুগ পর্য্যন্ত প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই জটিল সমস্যার সমাধানে বিব্রত রহিয়াছেন। একই প্রশ্নের কতপ্রকার উত্তর যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা কোথায় যাইব, আমাদের দশা কি হইবে? যে ক্ষণভঙ্গুর বিভ্রমকে আমরা জীবন বলি, তাহার পরিণতি কি? যখন আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া যায়, তখন জড়শক্তি, না চিৎশক্তি জয়লাভ করে? তখন নিত্য জ্যোতির, না অন্ধকারের আরম্ভ হয়?

জীব মাত্রই জন্ম ও মৃত্যুর দাস; কিন্তু জীবের জীবত্ব—জীবের জীবনীশক্তি জন্ম ও মৃত্যুর অতীত। যাহা বিনাশ পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্ততঃ অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করি, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবিনশ্বর—প্রকারান্তর মাত্র। এই সকল অভ্যাসের মূলে এমন কিছু আছে যাহা সনাতন সত্য। জীবদেহ, ভৌতিক জড়দেহ, মৃত্যুর করাল-কবলে নিপতিত হইলে জীবের জীবনীশক্তি—আত্মা কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়? আত্মা সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ—সগুণাত্মাকে জীবাত্মা ও নির্গুণাত্মাকে পরমাত্মা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। জীবাত্মার অবস্থান্তর সম্ভবপর, কিন্তু পরমাত্মা নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প—জন্ম মৃত্যু-সুখ-দুঃখাতীত। দেহমাত্রেরই দেহী আছে; দেহের সঙ্গে সঙ্গে যদি দেহীর বিনাশ হয়, তবে পুনঃ দেহীর আগমন অসম্ভব। যাহা আদি-অন্তশীল, যাহা দেশকালপাত্রে নিবদ্ধ, যাহা কার্য্যকারণ-নিয়মাধীন, তাহার নিয়ন্তাও যদি সমধর্ম্মশীল হয়, তবে একের বিনাশে অন্যের বিনাশ স্বাভাবিক। 'আমি' ও 'আমার' এই দুইটি শব্দ দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সমাধান সহজ-সিদ্ধ হইতে পারে। আমার দেহ, আমার বাড়ী, আমার সংসার—এই সব বাক্যের অন্তরালে এমন কিছু নিত্য সনাতন সত্তার অস্তিত্ব অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়—যাহা দেহ, বাড়ী, সংসার হইতে পৃথক—যাহা দেহাদি নশ্বর পদার্থের অতীত। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর (gross and subtle body) লইয়াই জীবজগৎ গঠিত। স্থূলের প্রকারভেদ-রূপ লয় আছে—সূক্ষ্মের ক্ষয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই। সূক্ষ্মশরীরই জীবাত্মা। জীব দেহ-নাশে পুনর্দেহ ধারণ করে—সুখ-দুঃখ-কর্ম্মফল ভোগ করে। কর্ম্মের সহিত পরমাত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, উহা কর্ম্মফলাতীত। জীবদেহের সংস্পর্শে জীবাত্মা সগুণ হইয়া কর্ম্মফলাধীন হয় এবং মানব জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তিবলে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বাসনা-বিবর্জ্জিত হইলে, মন ও বুদ্ধির অগোচর—জন্ম-মৃত্যুর বহির্ভূত পরমাত্মায়

আশ্রয় লইয়া নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা নিরপেক্ষ সাক্ষিরূপে দেহধারী জীবাত্মার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন, পাপপুণ্য দোষগুণ বিচার করিতেছেন।

বাসনা-সিদ্ধি, আমিত্বের অনুভূতি, পাপপুণ্য-ভেদ-জ্ঞান, স্মৃতি, সংস্কার, সাধন-বলে আত্মোন্নতি, স্বকীয় ভ্রান্তি স্বীয় জ্ঞানে সংশোধন প্রভৃতি দ্বারা সহজেই অনুমান হয় যে বাহ্য স্থূলজগৎ হইতে মানবের চেতনাপ্লুত বিশ্ব—মনোবুদ্ধিপ্রাণময় বিশ্ব উচ্চতর এবং স্বতন্ত্র, অথচ শক্তি-প্রণোদক। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এক সনাতন সচ্চিদানন্দরূপ পরমার্থের অভিব্যক্তি মাত্র—মানব সাধনার ফলে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং ক্রমবিকাশ (Evolution) নীতির পরিণাম স্বরূপ মানব, মানবত্বের চক্র ভেদ করিয়া দেবত্বের রাজ্যে অধিরূঢ় হয়—আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাতীত নির্গুণ ব্রহ্মে লয়-প্রাপ্ত হয়। মানবের বিস্ময়কর প্রতিভার অভিব্যক্তি নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্ম-নীতি ও রাষ্ট্রনীতির ভিতর দিয়া ক্রমশঃ যে অভিনব ভাব ধারণ করিতেছে, তাহাতে নিঃসঙ্কোচে বলা যায়—অমর, অবিনশ্বর কোন পারমার্থিক বাস্তব সত্তা নিজ মহিমা-ঘোষণাকল্পে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া মনোহর নিখিল জগতের দুর্ব্বোধ্য রহস্যজাল বিস্তার করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবকে অসীম শক্তি-লাভের সুযোগ ও অধিকার প্রদান করিয়া জগৎ প্রপঞ্চের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। আত্মমহিমা-কীর্ত্তন—অনাদি অনন্তকালব্যাপী আত্ম-স্ফুরণ আত্মার অমরতার, পারলৌকিকতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

এই আত্মতত্ত্বের—অমরত্বের সন্ধানে যুগ যুগান্তর ধরিয়া কত শত সহস্র মনিষিগণ জীবনব্যাপিনী সাধনায় রত থাকিয়া কতপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার অবধি নাই। জগতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে কি কি ভাবে ঐ প্রশ্নের—ঐ জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছে, তাহার মোটামুটি আভাস এইক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে।

গীতাকার খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতখণ্ডে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা-কল্পে যে সমুদয় সারগর্ভ শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা মানবমাত্রেরই নিতান্ত জ্ঞাতব্য। সঙ্ক্ষেপতঃ আমরা কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া অদম্য ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিব।

গীতাকার বলিতেছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২। ২০

আত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না; কিংবা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইবেন না। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, অপক্ষয়শূন্য এবং পুরাণ—পরিণাম-শূন্য—শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি হত হন না।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২। ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয় মদাহ্যোঽয়ম ক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২। ২৪

শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য এবং অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিরভাব, সদা একরূপ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২। ২২

মানব যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।

শেষোক্ত শ্লোকের সাহায্যে আমরা একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে জীবাত্মা, মুখ্যপ্রাণ, মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের ভিতর দিয়া দেহী সাজিয়া পরমাত্মার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের বিকাশ-কুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই সূক্ষ্ম শরীরী এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-ফলোচিত অন্য দেহ ধারণ করিতেছে—কত শত সহস্র জগৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শঙ্কর বলেন এবং সাংখ্য, বেদান্তও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে পরলোকবাদ সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্বের এবং পরিণতি-প্রকাশের অনুকূল সিদ্ধান্ত। সূক্ষ্ম-শরীরী জীবাত্মা দেহ-পরিবর্ত্তনকালে নিজে অপরিবর্ত্তিতই থাকেন—জন্ম, মৃত্যুতে তাহার কোন অবস্থান্তর হয় না। ঘট কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটের উপরিস্থিত খণ্ডাকাশ যেমন অখণ্ড, অনন্ত আকাশে মিশিয়া যায়—ঘটাকাশ যেরূপ নিজের সত্তা, পরিবর্ত্তনের ছাপ গায়ে না লাগাইয়া,

অনন্তাকাশে মিলাইয়া দেয়, তদ্রূপ বাসনাহীন দেহীর দেহ-নাশে দেহাশ্রয়ী সূক্ষ্ম-শরীরী জীবাত্মা অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া নিজ সত্তা অনন্তাত্মায়, পরমাত্মায় বিলাইয়া দেয়। 'চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্'—বুদ্ধিমান মানব যেমন জগতে বিচরণ করিবার সময় এক পা অগ্রসর হইয়া অপর পায়ের পূর্ব্বাধিকৃত স্থান পরিত্যাগ করে; জলৌকা যেমন নূতন স্থান আঁকড়াইয়া ধরিয়া পুরাতন স্থান ছাড়িয়া দেয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ আতিবাহিক জীবনের সাহায্যে ইহলোক পরলোকে গমনাগমন করে; কর্ম্ম শেষ হইলে ফলাফলের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া—অনিত্য জগৎপ্রপঞ্চের অলীকতা, অসারতা, উপলব্ধি করিয়া Eternal নিত্য পরমার্থ-সত্তায় মিশিয়া যায়। তখন 'একমেব নদ্বিতীয়ং' তত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রকটিত হয়। বেদান্ত বলেন যে জীবদ্দশায় আমাদের অন্তঃকরণে যে সমুদয় প্রবল বাসনা বিরাজ করে মৃত্যু-সময়ে তৎসমুদয় প্রবলতর হইতে প্রবলতম হইয়া মুমূর্ষুকালে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া পারলৌকিক জীবনের ধারা নির্ণয় করিয়া দেয় এবং তদনুসারে দেহী নবদেহ ধারণ করে। জড় ও চিন্ময় জগতে এ ধারার স্রোত অপ্রতিহতভাবে বহিয়া চলিয়াছে। এক ক্ষেত্রজাত সমশক্তিসম্পন্ন দ্বিবিধ বীজ যেরূপ দ্বিবিধ বৃক্ষ উৎপাদন করে, তদ্রূপ একই মায়ের দুইটি সন্তানও প্রায়শঃ বিভিন্ন স্বভাবশীল হইতে দেখা যায়। এই ভেদনীতি পরলোকবাদতত্ত্বের অবলম্বন। ভারতীয় হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রে এই পরলোকবাদ সর্ব্বাগ্রে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রকৃত ও প্রকৃষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে। যদিও প্রতীচ্যদেশীয় মনিষিগণ অনেকেই পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব বিশ্বাস করেন না, তথাপি প্রচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রে, সাহিত্যে, ইতিহাসে ও বিজ্ঞানে এই সনাতনতত্ত্বের অবতারণা ভূয়োভূয়ঃ পরিলক্ষিত হয়। আমরা কতিপয় উদাহরণ-সাহায্যে পূর্ব্ব মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব।

Herodotus বলেন যে মিসরের (Egypt) প্রাচীন সভ্যতা পুনর্জ্জন্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। Pythagorus এবং তাঁহার শিষ্যগণ এই তত্ত্ব গ্রীস ও ইতালীতে সমস্বরে প্রচার করিয়াছিলেন। Pythagorus বলেন সনাতননীতির প্রভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অতীন্দ্রিয় সত্তা সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরাজ করিতেছে। Dryden তাঁহার Ovid গ্রন্থে লিখিতেছেন—

"Death has no power the immortal soul to slay
That, when its present body turns to clay,
Seeks a fresh home, and with unlessened might
Inspires another frame with life and light."

গীতাকারের 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি' এবং 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' ইত্যাদি বাক্য ও Drydenএর উপরিউক্ত মত সমভাবাপন্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই মন্ত্র Platoর দর্শনতত্ত্বের মূল মন্ত্র ছিল। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—'Soul is older than body. Souls are continually born over again into this life'. প্লেটোর Phaedo নামক গ্রন্থে প্রাক্তন এবং পরলোকবাদতত্ত্ব স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—দেহ নাশ হইলে জীবাত্মা তদনুগামী বাসনার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ দেহ ধারণ করে—দেহ-বিচ্ছেদের পুর্ব্বে দেহধারীর যে সমুদয় প্রবৃত্তি সতত অন্তঃকরণে বিরাজ করিতে থাকে, পুনঃ দেহ-ধারণ-কালেও জীবাত্মা তদনুরূপ ধর্ম্মগুণ-বিশিষ্ট জীবদেহে অনুপ্রবেশ করে। দুষ্কর্ম্মপ্রবণ দেহীর আত্মা পুনর্দেহ ধারণ করিবার পুর্ব্বে বায়ুভূত নিরাশ্রয় হইয়া কিছুকাল ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ঐ Phaedo গ্রন্থেই Plato ভারতের পরমার্থতত্ত্বদর্শীর সহিত একসুরে বলিতেছেন যে আত্মা অতীন্দ্রিয় হইয়া "aims at the discovery of that which is."

উপনিষদের যুগেও আমরা দেখিতে পাই যে মানবাত্মা কর্ম্মফলানুযায়ী তদিতর দেহ ধারণ করিয়া থাকে। গ্রীসদেশে Empedocles ঐ মত প্রচার ও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঐ তত্ত্ব মিসরবাসিগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন—না Pythagorus ও তাঁহার গুরু Pherecydes ভারতবর্ষ হইতে ঐ আলোকে আলোকিত হইয়া তৎপর গ্রীসদেশে উহা প্রচার করিয়াছিলেন—এ বিষয় এখনও সঠিক কিছু বলা যায় না। Italian, Celtic, Scythic or Hyperborean প্রভৃতি আর্য্যজাতির মধ্যে metempsychosis তত্ত্ব পরিস্ফুট ছিল। America, Africa এবং Estern Asia খণ্ডের প্রাচীন আদিম অধিবাসিগণ কর্ত্তৃকও যে পরলোকবাদতত্ত্ব স্বীকৃত এবং ঘোষিত হইয়াছিল—এইরূপ প্রমাণ আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে। Plato, Vergil এবং Ovid এর পরে গ্রীসদেশে plotimus-প্রমুখ neoplatonist গণ আত্মার অমরতা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

এই তত্ত্ব Persian Magiর ধর্ম্মতত্ত্বের মূল মন্ত্র ছিল। Alexander the Great হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতগণের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ তত্ত্বে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। Julius Caesar দেখিতে পাইয়াছিলেন যে Gaulগণ পূর্ব্বজন্ম ও পরলোকে বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন Gaulএর গুরুকুল Druidগণ

এবং সমসাময়িক Celt এবং Britongগণ ঐ ভাবের ভাবুক ছিলেন। আরব-দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের বিশেষতঃ সুফি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞদের নিকট উহা বিশেষ আদরের জিনিস বলিয়া আলোচিত হইত। Babylonian Captivityর পরে ইহুদীগণ এই তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন। যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক Alexandriaবাসী Philo হিব্রুগণের মধ্যে Platonic প্রাক্তন ও পরকালবাদতত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। Talmad এবং Kabalaয় এই তত্ত্ব স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। Talmad পাঠে আমরা অবগত হই যে Abelএর আত্মা Sethএর দেহের ভিতর দিয়া পরে Mosesএর দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। Origen-প্রমুখ খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রচারকগণ এই তত্ত্ব বিশ্বাস করিতেন এবং পরলোকবাদতত্ত্ব প্রাচীনকালে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এতদূর বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছিল যে উহার স্রোত ফিরাইবার জন্য Constantinopleএর রাজসভা Justinian আইন পাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ঐ আইন পরলোকবাদতত্ত্বে বিশ্বাস দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। Let him be Anathema' ইহাই ঐ আইনের শাসন ছিল। খৃষ্টধর্ম্মের পরবর্ত্তী যুগে সপ্তদশ শতাব্দীতে Dr. Henry More-প্রমুখ কতিপয় Cambridge Platonists পরলোকবাদতত্ত্ব যথার্থ তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মধ্য এবং নবযুগের German দার্শনিক পণ্ডিতগণ ঐ তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ Kant, Scotus, Schelling, Fichte, Liebnitz, Schopenhaner, Bruno, Goethe, Lessing, Herder প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। খ্যাতনামা নাস্তিক Hume অবশেষে তাঁহার 'The immortality of the Soul'নামক প্রবন্ধে 'The metempsychosis therefore is the only system of this kind that Philosophy can harken to' বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত প্রবন্ধ জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল।

Flammarian এবং Huxley প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পরলোকবাদ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। Huxley বলেন 'Like the doctrine of Evolution itself, that of transmigration has its root in the world of reality'—ক্রমবিকাশ তত্ত্বের ন্যায় পরলোকবাদতত্ত্বও বাস্তব সত্য। 'The Christian doctrine of Sin' নামক গ্রন্থে জার্ম্মাণীর Dr. Julius Muller পরলোকবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। Dr. Dorner,

Ernesti, Puckert, Edward Bucher, Phillips Brooks প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্ম্মতত্ত্বালোচকগণ একবাক্যে সমস্বরে প্রাক্তন ও পরলোকবাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কবি Wordsworthএর 'Cometh from afar,' 'Hath had elsewhere its sitting' প্রভৃতি উক্তি, Tennysonএর 'Two Voices' কথিত তত্ত্ব এবং 'From the Great Deep to the Great Deep he goes' প্রভৃতি উক্তি এই মত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে। Dr. Weisman তাঁহার 'Heredity' নামক গ্রন্থে অবশেষে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন যে পূর্ব্বজন্ম এবং পরকালবাদ বিশ্বাস না করিলে এই জগতের ভেদনীতি—অসামঞ্জস্য-সমস্যা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সমাধান করা যায় না। জ্ঞানীর সন্তান মূর্খ, মূর্খের সন্তান পণ্ডিত, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের আবির্ভাব—Heredity বাদের বিরুদ্ধভাব-পোষক। একটি শিশু জন্মগ্রহণ করা মাত্র রম্যহর্ম্ম্যাট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় বিশ্রাম করিতেছে—অপর একটি শিশু নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মলাভ করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে—যে ব্যক্তি সতত পাপ কার্য্যে লিপ্ত সে হয়ত পার্থিব সর্ব্ববিধ সুখ-স্বচ্ছন্দতার অধিকারী, আর যিনি মহাজ্ঞানী ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত—তিনি হয়ত অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন—এই সব রহস্যময় বিস্ময়কর চাক্ষুষিক ঘটনা দ্বারা পূর্ব্বজন্ম ও পরকাল বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিতে হয়। মেষপালক Mangiamelo পাঁচ বৎসর বয়সে পাটীগণিতের জটিলতত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছিল। শিশু Zerah Colburn আট বৎসর বয়সে অঙ্ক শাস্ত্রের জটিলতত্ত্বসমূহ কোন সংখ্যার সাহায্য না লইয়া পলকের ভিতর অনায়াসে উদ্ধার করিতে পারিত। ছয়টি রাশিযুক্ত যে কোন সংখ্যার বর্গমূল কত, জিজ্ঞাসা করা মাত্র সে বলিতে পারিত। Mozart, the great musician, ৪ বৎসর বয়সে একটি সুন্দর কবিতা এবং ৮ বৎসর বয়সে একটি উপদেশপূর্ণ Opera লিখিয়াছিলেন। মাষ্টার মদনের অদ্ভুত সঙ্গীত-শক্তি—শঙ্করাচার্য্যের ১২ বৎসর বয়সে বেদান্তদর্শনের টীকা-কার্য্য-সমাধান পর্য্যালোচনা করিলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে পরমাত্মা তাঁহার লীলাভূমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ যাবতীয় সৃষ্টি-প্রপঞ্চের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মশরীরী জীবাত্মার অন্তরালে সাক্ষিস্বরূপে বিরাজ করিয়া ক্রমশঃ নিজ মহিমা জগৎবাসীকে অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করাইতেছেন এবং জীবজগৎ ক্রমশঃ সাধনবলে আত্মোন্নতির একস্তর ছাড়িয়া অন্যস্তরে অধিরূঢ় হইতেছে। এক অদ্বয় সত্তা বহু সত্তায় পরিস্ফুরিত হইয়া পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশ

করিয়া পুনঃ নিজ অমর সত্তায় পৌছাইতেছে—এই সর্ব্ববাদিসম্মত মত চিরকাল সর্ব্বত্র আদৃত হইবে। যতদিন পুরুষকারের আদর থাকিবে, যতদিন 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাক্তন ও পরকালবাদ বিশ্বতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া বিদিত ও আদৃত হইবে।

ভক্তি-কথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অসৎ পথের পথিক মানবের ফেরা কঠিন, কারণ পাপ হইতে নিরন্তর পাপই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাপের প্রবল তাড়নায় অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আর পশ্চাৎ ফিরিবার উপায় থাকে না। সেই নিরুপায় পতিতজনের নিস্তারের উপায় নাই দেখিয়া করুণাসিন্ধু ভগবান তাহাদের নিস্তারের জন্য মানবদেহ ধারণ করিয়া স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হন। প্রত্যেক অবতারেরই এই উদ্দেশ্য। কিন্তু মায়া-মুগ্ধ মানব প্রত্যক্ষতঃ দেখিয়াও অবতারকে চিনিতে পারে না। ভগবান প্রকৃতই দয়াসিন্ধু, আমরা অন্ধ, তাই তাঁহার চরণরজঃস্পর্শে কৃতার্থ হইতে পারি না। সুতরাং আমরা পাপ-তাপ হ'তেও নিস্তার পাই না। ভাগ্যে না থাকিলে করতলগত অর্থও নষ্ট হইয়া যায়। আমরা হতভাগ্য, নিজ কুকর্ম্ম-দোষে অদৃষ্টও মন্দ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সৎপথে, সাধুসঙ্গে যাইতে মন সরে না। দোষ দিব কাহার? সবই আমারই দোষ। নিজে খাল কাটিয়া কুমীর ডাকিয়া আনিতেছি। সেই কাল কুম্ভীর জন্মে জন্মে আমায় গ্রাস করিতেছে। পাগলেও নিজের হিত বুঝে, হায়! আমরা তাহাও বুঝি না। আমার জীবনের গুরুভার কে লাঘব করিবে? কে আমায় নিষ্কৃতি দিবে? চিরদিন যাহাদিগকে আপন বলে মনে করিয়াছি, কেহই তো আমায় এ সদুপদেশ দেয় নাই, যে প্রাণের সহিত সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে ডাক, তাহা হলে তুমি সমস্ত যাতনা হইতে মুক্ত হইবে। তাহারা স্বার্থসাধনের জন্য সতত আমায় কুপথে পরিচালিত করিয়াছে।

যাহারা ভগবৎপ্রাপ্তির বিঘ্নস্বরূপ তাঁহারা আত্মীয় হইলেও শত্রু। তফাৎ হইতে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। সে স্ত্রী যথার্থ সহধর্ম্মিণী নহে, যে ধর্ম্মের অনুকূলা না হয়। সে পুত্র পুত্র নহে, যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায় না হয়। সে সুহৃদ সুহৃদ নহে, যে সৎপথে পরিচালিত না করে। জীবন দিয়াও যদি জীবনের জীবনকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেও পরম লাভ। হায়! কবে দুর্দ্দিন ঘুচে যাবে, কবে সুদিন হবে, কবে সতী মতি হবে, যে দিন প্রাণ সেই প্রাণধনের জন্য ব্যাকুল হবে? কবে সে সুদিন হবে, যে দিন পীতবাসের আশায় মন এ গৃহবাস ছেড়ে যাবে? হে অন্তর্যামিন্! হে করুণা-সাগর! হে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর! আমার এ পাপ মতিকে তোমার চরণাভিমুখিনী করিয়া দাও। সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণাগত হই নাই বলে নাথ! কত যাতনা, কত বেদনা পাইতেছি। ভগবন্! যাহাতে এ পাপ-কলুষিত মন তোমার চরণে বাঁধা থাকে, আমার এই সকৃতাঞ্জলি প্রার্থনা প্রভো! তাহাই করিয়া দাও। আমি সাধনভজনহীন, অকিঞ্চন, আমার প্রতি তোমার কৃপা করিতেই হইবে।

ভক্তির লক্ষণে কথিত আছে, ভগবানের প্রতি যে পরম প্রেম অর্থাৎ অনুরাগ তাহাকেই ভক্তি কহে। অনুরাগ ভালবাসা, তারপর পরম—অত্যন্ত ভালবাসা। অত্যন্ত ভালবাসা কিরূপ? তদ্বিরহে পরম ব্যাকুলতা। তাঁহার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুলতা, অর্থাৎ এক মুহূর্ত্ত, এক নিমেষমাত্রকাল যাহাকে না দেখিলে প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠে। স্ত্রী-পুত্রাদির বিরহে যেমন প্রাণ ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ। পুত্রের প্রতি যে স্নেহ তাহাকে বাৎসল্যভাব কহে। শ্রীমতী যশোদা, কৌশল্যা প্রভৃতির বাৎসল্যভাব। আর স্ত্রীর প্রতি যে ভালবাসা, তাহাকে শৃঙ্গারভাব বা মধুরভাব কহে। মধুরভাবে কোন সঙ্কোচভাব থাকে না বা ঐশ্বর্য্য বোধ থাকে না। তবে যিনি বিশ্বপতি, তাঁকে পত্নীভাবে ভাবা ভাব-বিরুদ্ধ। সুতরাং তাঁহাকে প্রকৃতি-ভাব আশ্রয় করিয়া পতিভাবেই ভজনা করা যাইতে পারে। শ্রীমতী ব্রজগোপীদিগের ভাব হৃদয়ে লইয়া তবে সে পথের পথিক হইতে হয়। ভাবই ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে, যেহেতু তিনি ভাবগ্রাহী এবং অন্তর্যামী। যত কিছু বাহ্য অনুষ্ঠান, সব চিত্তশুদ্ধির জন্য। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় না। সত্ত্বগুণের বিকাশ না হইলে মন ভগবদুন্মুখ হয় না। আর চাই দৃঢ় প্রত্যয়। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে একান্ত বিশ্বাসকে দৃঢ়প্রত্যয় কহে। বিশ্বাসের আবশ্যকতা কি? যুক্তি ও তর্ক দ্বারা

বাক্য মনের অতীত বস্তুকে জানা যায় না। মনুষ্যকৃত সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। সুতরাং যাঁহারা ঋষি, ধর্ম্মদ্রষ্টা, তাঁহারা অভ্রান্ত, তাঁহাদের বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। জড়ের পশ্চাতে এক অখণ্ড চৈতন্য আছে, ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সুতরাং তাঁহাদের বাক্য বিশ্বাস্য। অন্ধ বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিয়াও যদি বস্তু মিলে তাহাতে ক্ষতি কি? এই ভীষণ কলিযুগেও দুই একজনকে কৃত-কৃতার্থ হইতে দেখা যাইতেছে। ভারতে দুঃখ-বিমোচনের কারণ বাহিরে না পাইয়া অন্তরে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল এবং তাহাতেই দুঃখ-নিবৃত্তির ঔষধ মিলিয়াছিল। অন্যান্য দেশে এক একটা জাতীয় লক্ষ্য আছে। রাজ-নীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি। ভারতের জাতীয় লক্ষ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, খাদ্যাখাদ্য, শয়ন, ভোজন সব বিষয়ের সহিত জড়িত। তবে আজকাল মূল তত্ত্বটা ফেলিয়া খোঁসা লইয়া বেশী আলোচনা হইতেছে। কোন্ হাতে জল খাইব, কোন্ মুখে বসিয়া খাইব, কাহার সহিত খাইব না ইত্যাদি বিষয় লইয়া বাদ-বিসংবাদ চলিতেছে। এমত চলিতে থাকিলে সব বাতুলালয়ে পরিণত হইবে। যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপর সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করায় আজ বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত আর্য্যজাতি বাঁচিয়া আছে, তাহার সেই ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিলে জগৎ হইতে চির বিলুপ্ত হইবে। যদি কেহ বলেন যে, ধর্ম্মাশ্রয়ে হিন্দুজাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে, সুতরাং গোড়ায় ভুল হইয়াছে। যদি ভুলই হইয়া থাকে, তবে বহু শতাব্দীর সে ভুল এখন শোধ্‌রাইতে গেলে জাতিটা বিলুপ্ত হইবে। পাশ্চাত্য মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা যদি স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেই, তবে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। পাশ্চাত্যের যাহা কিছু ভাল, তাহা নিজের ভাবে আনিয়া গ্রহণ করা উচিত। গুণের অনুকরণ না হইয়া দোষের অনুকরণ অতি ভয়াবহ।

বাহ্য সম্পদ কখনই মানবকে তৃপ্তি বা শান্তি দিতে পারে না। এখনি পাশ্চাত্য ভূমি অশান্তির আগুনে দহ্যমান হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত। অতএব আমাদের এখনিই সাবধান হইতে হইবে। পতঙ্গের ন্যায় বহ্নিমুখে আত্মাহুতি দেওয়া হইবে না। ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ড; তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে, আমরা বাঁচিব না। পাশ্চাত্যদিগের নিকট বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বহু শিক্ষণীয় বিষয় থাকিতে পারে; কিন্তু আমাদিগেরও কিছু দেবার আছে। তাহা অধ্যাত্মতত্ত্ব, যাহা না পাইলে, তাহারা অচিরাৎ ধ্বংস হইবে। সুতরাং এখন আমাদের কূপ-মণ্ডূকের মত কূপের মধ্যে থাকিলে চলিবে না। এখন

গণ্ডীর বাহিরে বাহির হইতে হইবে। পুরাণ পচা পুঁথি এখন জলে ফেলিয় ... হবে। সঙ্কীর্ণতা একদম বিসর্জ্জন দিতে হইবে। মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে ... প্রবল অদম্য উৎসাহ চাই। নতুবা জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠ ... । শুধু ঘরের কোণে বসে, পরস্পর কুকুরের মত খাওয়া-খাি করে এ পর্য্যন্ত কি ফল হইল? কেবল দ্বেষ, হিংসা, খলতা, নীচতা বাড়িতেছে। "আপ্ ভালা, তো জগৎ ভালা" নিজে ভাল না হইলে, কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। আমরা যে জগতের সভ্যজাতির নিকট ঘৃণিত, পদদলিত হইয়া আছি, সে দোষ কাহার? যদি আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের মূল সূত্র না হারাইতাম, তাহা হইলে আমাদের এত অবনতি হইত না।

মূল সূত্র কি দেখুন,—

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ধী বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এই দশটী ধর্ম্মের মূল সূত্র। এই সূত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার হইলে জগতে কেহই কাহার শত্রু হইতে পারে না। প্রথম দেখুন, ধৃতি অর্থে ধৈর্য্য বা সন্তোষ। যাহার চিত্ত সন্তুষ্ট থাকে, সে শান্তপ্রকৃতি ও অলোলুপ হয়। নীতিশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"সন্তোষামৃত-তৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাং, কুতস্তৎ ধনলুব্ধানাং ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাং"। সন্তোষামৃততৃপ্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সুখ ... লোভে চারিদিকে ধাবমান অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিরা সে সুখ কোথায় পাইবে? ... একখণ্ড মাংসের জন্য কুকুরের মত পরস্পর বিবাদ করে। তবেই দেখুন, ধর্ম্মের মূল সূত্রের প্রথমটির অনুশীলনে কত সুখ ও শান্তি। তারপর দেখুন ক্ষমা, প্রতীকারকরণে সমর্থোঽপি অপকারসহনং ক্ষমা। রীতিমত শাস্তি দিতে সমর্থ হইয়াও যে অপকার সহ্য করা তাহাকে ক্ষমা কহে। অনেকে মনে করেন, ক্ষমার অর্থ কাপুরুষতা। তাহা হইলে প্রতীকার-সমর্থ হইয়াও অপকার সহ্য করা এই অর্থ অসঙ্গত হয়। ক্ষমার অশেষ গুণ; ক্ষমা ব্যতীত সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ হয় না। মনে করুন শিশু সন্তান বা স্ত্রী অনবধানতা-বশতঃ একটা মহৎ ক্ষতি করিল, সেস্থলে ক্ষমা না করিয়া তাহাদিগকে কি মারিয়া ফেলিতে হইবে? অতএব ক্ষমা ব্যতীত সংসার ধ্বংস হইতে পারে। তারপর দেখুন, দম, নিন্দিত কার্য্য হইতে মনকে নিবৃত্ত করা। হিংসা, দ্বেষ, অনিষ্টচেষ্টা, পরপীড়ন এ সবই মনের কার্য্য। মনই এই দেহ-রাজ্যের রাজা।

মন ইন্দ্রিয়ের পরিচালক ও সর্ব্বাধ্যক্ষ। মন সৎকার্য্য ও কুকার্য্য সর্ব্ব

অনুষ্ঠান করিতে পারে। নরহত্যা, ব্যভিচার, দস্যুতা সমস্তই মানবের বাসনার পরিণতি। সুতরাং মনকে দমন করিতে পারিলে জগতে আর কোনই বিপদ থাকে না। অতএব দম ধর্ম্মসূত্রের একটি প্রধান গুণ বলিতে হইবে। তারপর দেখুন, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা। জগতে অনেকেই বয়স-বিশেষে কিছু না কিছু চুরি করিয়া থাকেন। ঐ রীতি অভ্যাসে পরিণত হইলে, সমাজের অনিষ্ট, নিজেরও বিপদ। সুতরাং সকলেরই ঐ কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করা উচিত। তারপর দেখুন, শৌচ অর্থাৎ অন্তর বাহির ছাপাই রাখা। স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত বাহ্য শৌচ, স্নান, গাত্র মার্জ্জন, পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি পরিধান অবশ্য-কর্ত্তব্য। সুস্থ-শরীর ব্যক্তির ন্যায় সুখী কেহই নহে। এই সঙ্গে খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্নময় দেহ; অপবিত্র খাদ্যের জন্য দেহ অসুস্থ হয়, মনও বিকৃত হয়। শাস্ত্রকারগণ খাদ্যের বিবিধ দোষ পরিহার করিতে বলিয়াছেন। জাতি-দোষ, যেমন লশুন পলাণ্ডু প্রভৃতি। আশ্রয়-দোষ; মুচি, মুদ্দফরাস প্রভৃতির স্পৃষ্ট খাদ্য আশ্রয় দোষে দূষিত। ঘৃণিত জাতির সংস্পর্শে খাদ্য দূষিত হয়। আর নিমিত্ত-দোষ; ধূলিসংস্পৃষ্ট, অনাচ্ছাদিত, রোগবীজযুক্ত, দূষিত ঘৃত তৈল দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য নিমিত্ত-দোষে দূষিত। খাদ্য-বিষয়ে এই ত্রিবিধ দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। পবিত্র খাদ্য-গ্রহণে মনও পবিত্র হয়। তারপর দেখুন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম করা। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ মানে ইন্দ্রিয়ের বিনাশ নহে। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচালনা জন্য আয়ুঃক্ষয় হয়, এইজন্য ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে বলিয়াছেন। সুশিক্ষিত সারথির ন্যায় স্বেচ্ছাধীন ইন্দ্রিয়-চালনা করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। তাহাতে সকল দিকেই মঙ্গল। অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্যের অকাল মৃত্যু—দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। তারপর দেখুন, ধী, অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞান; জ্ঞান ব্যতীত জীবন পশু-তুল্য। আহার-নিদ্রাদি মনুষ্য ও পশুর সাধারণ; জ্ঞানই পশু হইতে মনুষ্যকে পৃথক করে। তারপর বিদ্যা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান; শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রমেয়-নিশ্চয়ের কারণ, পরোক্ষার্থ-দর্শনের হেতু। তারপর সত্য, সত্যনিষ্ঠা; সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্য শ্রেষ্ঠ। যাহার সত্যনিষ্ঠা নাই তাহার অকার্য্য কিছুই নাই। তারপর অক্রোধ, ক্রোধের রাহিত্য। ক্রোধী কোপন-স্বভাব, আত্ম ও পর বিনাশের নিমিত্ত হয়। সুতরাং তাহার বর্জ্জনেই সুখ। ধার্ম্মিক হইতে হইলে কথিত দশটী গুণ চরিত্রগত হওয়া চাই; নচেৎ ধার্ম্মিক হইতে পারা যায় না। স্বভাব ও মন ঠিক গঠিত না হইলে সত্যের উপলব্ধি হয় না। দর্পণ বিমল না হইলে তাহাতে ঠিক্ প্রতিবিম্ব পড়ে না।

হৃদয়-দর্পণ বিশুদ্ধ না হইলে, তাহাতে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। ধর্ম্মের এই দশটী গুণ চরিত্রগত হইলে তখন কর্ম্ম, জ্ঞান, বা ভক্তি, ইহার যে কোনটী আশ্রয় করিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করিবে। কর্ম্ম নিষ্কাম না হইলে তাহা বন্ধের কারণ হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম করাও খুব শক্ত। কোনদিক্ থেকে অভিমান এসে জুটিলেই সব নষ্ট। জ্ঞানমার্গও খুব কঠিন; ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন বহু জন্মের পর জ্ঞানবান আমায় প্রাপ্ত হয়। ভক্তিপথ নির্ব্বিঘ্ন, প্রত্যবায়ভীতিশূন্য, সহজসাধ্য। আর সিদ্ধাবস্থায়ও যখন অহংভাব যায় না, তখন তুমি প্রভু, আর দাস আমি। এই আমিটুকুই থাক্।

কালদেশ-নিমিত্তের অধীন মানব নির্গুণ ব্রহ্ম ধারণা করিতে পারে না। সে জড়ের সমুদ্রে ডুবিয়া আছে, সুতরাং জড়ের মধ্য দিয়াই সগুণ ঈশ্বর চায়। তাহার এমনটি চাই যে, তাহার ভক্তিদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল সবই তিনি গ্রহণ করিবেন। এবং সে যে মূর্ত্তিতে তাঁহাকে চায়, তিনি সেই মূর্ত্তিতে তাহাকে দেখা দিবেন। সে যদি ভক্ত হয়, তবে সে ভগবানের দর্শন-স্পর্শন-জনিত অপূর্ব্ব সুখ ভিন্ন মুক্তি পর্য্যন্তও লয় না। সে নিত্যলীলার সঙ্গী হইতে চায়। ভাব হতে ভক্তি, ভক্তি হতে প্রেম, উহাই শেষ। প্রেমের অবস্থায় দান প্রতিদান প্রার্থনা কিছুই থাকে না। কেবল রসাস্বাদ। মনুষ্য সাধারণ প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না। কোন কোন ভাগ্যবান ভক্ত কৃপালাভে চরিতার্থ হইয়াছেন। আর কৃপাসিদ্ধ ব্যক্তি প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন। প্রেম যে কি পদার্থ তাহা শ্রীমতী ব্রজগোপীরাই জানিয়াছেন। ভক্তি পর্য্যন্ত অধিকারী হইলেই মানব চরিতার্থ হইতে পারে। পরম প্রেম, যাহাকে জানিনা চিনিনা, যাহার গুণ জানিনা, তাহার প্রতি হওয়া কঠিন। স্ত্রী-পুত্রাদির গুণ জানি, তাহাদের ভালবাসায় আমি বাধ্য, সুতরাং তাহাদের প্রতি অনুরাগ হইতে পারে। ঈশ্বরে তাহা হওয়া অসম্ভব, এইজন্য ভক্তি-শাস্ত্রকারগণ, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি সাংসারিক ভাব জগদীশ্বরে আরোপ করিয়া সাধনা করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীমতী যশোদা নিজ পুত্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেন। কখনও কোনও মাহাত্ম্য দর্শন বা শ্রবণ করিলেও তাহা বিস্মৃত হইতেন। পুত্রভাবে সেবা করিয়াও বস্তু-শক্তি-প্রভাবে তাঁহার ভগবৎ ভজনই সিদ্ধ হইয়াছিল। আমরা যদি পুত্রাদিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করিয়া ভজনা করিতে পারি, তবে তাহাতেই সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা তাহা পারি না, আমরা সাধারণ

মনুষ্য জ্ঞানেই স্নেহ করি। কিন্তু এখন কথা হইতেছে এই যে, ভগবান যদি সগুণ হন এবং আমাদের অন্তরের ভাব তিনি জানিতে পারেন, তবেই ভজন-সাধনের সফলতা আছে, নচেৎ নিষ্ফল। এখানে শাস্ত্রকারগণ বলেন, ভজন-সাধনের আবশ্যকতা কতদূরে? বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকাশকাল পর্য্যন্ত। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হইলে অন্তর্মুখ অন্তঃকরণ বুদ্ধির সাহায্যে জানিতে পারে যে, ভগবান হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন। কেবল মায়া বা প্রকৃতির যবনিকান্তরালে আছেন বলিয়া আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। সাধনবলে সেই যবনিকা ভেদ করা আবশ্যক। যতদিন আমরা সেই যবনিকান্তর্ব্বর্ত্তী জীবন-সখাকে দেখিতে না পাইব, ততদিন ভজন-সাধনের আবশ্যকতা আছে। ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ততদিন দাসভাবে, সখাভাবে, পুত্রভাবে তাঁহার ভজনা চলিবে। রামানুজ বলেন, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নিত্য, সুতরাং সেব্য-সেবকভাব চির-দিনই থাকিবে।

ফল কথা, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভজন-সাধনা করিতেই হইবে। তিনি স্বয়ং পূর্ণ, তিনি ভক্তের বাঞ্ছা পরিপূরণার্থ বিগ্রহ ধারণ করিতে না পারিবেন কেন? যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। তবে, মনঃ সরোবরে না নামিয়া কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রকাশে কোনই লাভ নাই; বরং চিত্তের অবনতি। সাধন-পথে বিদ্বেষ, বৃথা তর্ক, গোঁড়ামি এ সব একদম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দিন দিন চিত্তের উন্নতি হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। কাম ক্রোধাদির বীজ নষ্ট হইতেছে কিনা, বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে কিনা, ভগবানই সত্য, জগৎ মিথ্যা এমত জ্ঞান জন্মিতেছে কিনা, লাভালাভ, শুভাশুভ সব বিষয়ে নিস্পৃহভাব আসিতেছে কিনা, এই সব দিকে দৃঢ় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যখন দেখা যাবে, ক্রমশঃ ঐ সব ভাব জন্মিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। কেবল মালা, তিলক, ঝোলা, পুঁথি লইয়া বিড়াল তপস্বী সাজিলে কি হইবে? মনঃ প্রাণের, জ্ঞানের অতীত বস্তু কি সহজে মিলে? স্ত্রী, পুত্র, দেহ, গেহ, ধন, বিষয় প্রভৃতির উপর আমাদের যে আকর্ষণ আছে, তাহার শতাংশের একাংশ আকর্ষণও ভগবানের প্রতি আছে কি?

শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না, জল চাই। সাধন ভজন চাই, ত্যাগ চাই, বৈরাগ্য চাই। ঢাল তরোয়াল নাই শুধু রাম সিং সর্দ্দার সাজিলেই কি বস্তু মিলিবে? দুখানা উপনিষদ, কি বেদের কোন শাখায় দুটা কথা বলিয়া

পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনে কি ফল আছে? শকুন অনেক উচ্চে উঠে, নজর থাকে ভাগাড়ে, যেখানে মৃত পশ্বাদি ফেলে। কিছুতেই কিছু নাই, সব কথা অন্তর-রাজ্য লইয়া। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, রুচি, বৈরাগ্য ইহার যে কোন একটা গুণ তোমাতে যদি দেখি, তবে তোমার পদানত হইব, নচেৎ নহে। তাহাও বাহ্য নহে, খাঁটি বুঝিলে, তোমার দাস হইয়া থাকিব। এস দেখি, সাধনা চাই, একদিন নাক ধরে বসে থাক্‌লেই কি ঈশ্বর মিলে? তাহা হলে মুনি ঋষি গুলো আর কষ্ট করিত না। ওঃ কি কঠোর সাধনা। জীবন উপেক্ষা করিয়া সাধনা। তবে না ভগবান দেখা দিতেন! এ চিনির পানা আর রসগোল্লা নয়, এ বড় তিক্ত, যদি পার, পথে নাব। না পার, গোল করিও না; চুপ করিয়া থাক। যে ধর্‌তে পারে, ধরা দি তারে, ভগবৎ বাক্য। যতন বিনে রতন মিলে না। সবাই কি সন্ন্যাসী হবে? সে ভাগ্য সবাকার নাই। ভাগ্যবল কৈ? যে বলে ভবসাগর পার হবে? ভাগ্যবান ব্যতীত অন্যে সৎপথের পথিক হইতে পারে না। মানব পথ ভুলিয়া অশেষ যাতনা পাইয়া যখন একান্তচিত্তে ভগবানকে ডাকে, তখন তিনি পৃথিবীতে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হন। অথবা মনুষ্য-দেহে স্বীয় শক্তির বিকাশ করেন; যাঁহার আহ্বানে অসংখ্য লোক তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং তাঁহার বাক্য তাহাদের হৃদয় গ্রহণ করে। তোমার হয়ত অনেক শাস্ত্র পড়া থাকিতে পারে, মানব-সমাজে তুমি অনেক উপদেশ দিতে পার, কিন্তু বক্তৃতামঞ্চ হইতে নাবিলে আর কেহই তোমার কথা মনে রাখিবে না। তাহার কারণ, তোমার বাক্য তাহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নাই। এমত পার্থক্য হয় কেন? ভগবৎশক্তিবলে তাঁহাদের বাক্যের এমনই প্রবল আকর্ষণ শক্তি জন্মিয়াছে যে, মানুষে তাঁহাদের বাক্য অবনতমস্তকে পালন করে। তোমাতে সে ভগবৎ শক্তি কৈ? সুতরাং তোমার বাক্য অশেষ যুক্তিপূর্ণ হইলেও লোকে তাহা গ্রহণ করে না। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানব বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধ, সংস্কৃত বাক্য পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া দেশ-প্রচলিত ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবের প্রতি অসীম দয়া, সহানুভূতি নিষ্ফল হয় নাই। মন্ত্রমুগ্ধবৎ মানব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল।

অতএব ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হউন বা না হউন, তাঁহার অলৌকিক শক্তি মানবের মধ্য দিয়া বিকশিত হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব আমরা ভগবানকে দেখিতে না পাইলেও যে মানবের মধ্যে তাঁহার শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, তাঁহার সেবা পূজাতেও আমাদের ভগবৎ

আরাধনা সিদ্ধ হইতে পারে। অনন্তযুগ ধরিয়া মানব তর্ক করিতেছে, প্রকৃতি যখন সব সৃষ্টি করে, তখন স্বতন্ত্র ঈশ্বর মানিবার আবশ্যকতা কি? যাহা আছে., যাহা সত্যস্বরূপ, নেতি নেতি, ইহা নহে ইহা নহে করি।ঋষিগণ যখন একমাত্র চৈতন্য সত্তা আবিষ্কার করিলেন, বিজ্ঞান যাহা সমর্থন করিল, তাহা না মানিয়া উপায় কি? তুমি যে প্রকৃতি বল, সে প্রকৃতিটা কি বুঝিয়া দেখ। চেতন হতে চেতন, অচেতন দুই হতে পারে, কিন্তু জড় হতে চেতনের উদ্ভব অসম্ভব। অসৎ হতে কখনও সং উৎপন্ন হয় না। সুতরাং চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান সর্ব্বঘটে বিরাজমান, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। মা ব যতদিন তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারিবে, ততদিন দাসভাবে তাঁহার সেবা করিবে, নচেৎ ত্রিতাপের হাত হতে নিস্তারের অন্য কোন পন্থা নাই।

শান্তি।

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পথ চেয়ে কতকাল আছি অপেক্ষায়,
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ মাস, বর্ষ যুগ যায়।
সে কি গো দেবেনা দেখা অন্তরে আমার!
কোথা গেলে পা'ব তারে কোন্ সিন্ধুপার?
একে একে কত ঠাঁই করিনু সন্ধান,
কত নদ, কত নদী গিরি সানুমান।
ঊর্দ্ধমুখী হয়ে কভু উদগ্র তৃষায়,
কাটাইনু চেয়ে চেয়ে নভো নীলিমায়।
ঘুরিলাম কত বন, প্রান্তর উদার,
বিপুল বিস্তার কত শ্যামল শোভার
নির্ঝরিণী-ধ্বনি মাঝে তারে নাহি পাই,
পাখীর কাকলি শুনি ফিরে ফিরে চাই।
সকল (ই) দেয়গো ফাঁকি: দখিন বাতাস,
আশা দিয়ে ফিরে যায় করিয়া নিরাশ।

চাঁদের মধুর মুখে হাসি ঢল ঢল,—
তা'র মাঝে খুঁজে খুঁজে পেনু হলাহল!
নীলাম্বু পারে কি দিতে তাহার তলাস,—
তবে কেন তার বুকে এমন উচ্ছ্বাস?
কেন সে দিবস নিশি করে হাহাকার,
লুটাইয়া পদতলে বালুকা-বেলা ?
নাই সে সেথায় নাই, জানিয়াছি স্থির,
তাই পুন ছুটিয়াছি হইয়া অধীর।
খুঁজিয়াছি কত তীর্থ গয়া বৈদ্যনাথ,
বারাণসী বৃন্দাবন পুণ্য জগন্নাথ।
দ্বারাবতী হরিদ্বার, দূর কনখল,—
প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র পবিত্র চটুল।
বুকভরা আশা লয়ে খুঁজিয়াছি আর,
তন্ন তন্ন করি তারে তীরে যমুনার।
পাবনী গঙ্গার কূলে, ত্রিবেণী জটায়,
সকল সন্ধান মোর গিয়াছে বৃথায়।
বার বার ব্যর্থ হয়ে, আপনার ঘর
ফিরায়ে এনেছি মোর প্রবাসী অন্তর।
ত্যজিয়াছি পথ-চাওয়া বৃথা পর্য্যটন,
যে আমার নহে, তারে কেন অনুক্ষণ
চেয়ে চেয়ে ব্যর্থ হব ? কেন আঁখিজল,
দিবানিশি তার লাগি ঝরা'ব কেবল ?

* * *

বহুদিন করি নাই তা'র অন্বেষণ,
আপনার মাঝে আমি আছিনু মগন।
বহুদিন এইভাবে কেটেছে আমার,
সহসা সেদিন প্রাতে গৃহের দুয়ার
যেমনি খুলিনু, একি হেরিল নয়ন!
যা দেখিনু সত্য সেকি! অথবা স্বপন!
যাহারে খুঁজেছি আমি কত বর্ষমাস,
যার লাগি আঁখিজলে ভিজিয়াছে বাস,

সেই শান্তি মূর্ত্তি লয়ে এল মোর ঘর,
হেরি তারে জুড়াইল সকল অন্তর।
ভুলে গেনু জীবনের যত দুঃখ তাপ,
ঘুচে গেল বুকভরা দারুণ বিলাপ।
কোথা হতে অকস্মাৎ শান্তির ধারায়
ভরে গেল চিত্ত মোর কাণায় কাণায়।
তারি মাঝে মনে হ'ল জননী আমার,
বুঝি ওই এল ফিরে খুলি মৃত্যু-দ্বার।
'মা' বলে ডাকিনু তাঁরে, গলে গেল প্রাণ,
চরণ-উদ্দেশে তাঁর করিনু প্রণাম।

বৈদিক সন্ধ্যায় বৈজ্ঞানিকত্ব।

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতত বিষয়ের চিন্তা করিলে মন আসক্ত, বিলাসী হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। কিন্তু ভগবানের বা ভগবৎশক্তির আরাধনা যতই বা যতবারই করা যাক্ না কেন, তাহাতে লাভ ব্যতীত ঐরূপ কোনও ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই। এইজন্য সকল ধর্ম্মেই ভগবানের নাম বা আরাধনা শুচি অশুচি সকল অবস্থাতেই করার ব্যবস্থা আছে। তবে শুচি হইয়া করিতে পারিলেই ভাল। কেহ দুইবার, কেহ পাঁচবার, কেহ সাতবার, কেহবা "যত-বার পার" ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত হইলেও বিষয়-কর্ম্মে ব্যাপৃত, সাধারণ সংসারী লোকের পক্ষে অতবার ভগবানের আরাধনা প্রকৃত-পক্ষে সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত অতবার উপাসনা বিজ্ঞানসম্মতও নয়। সেইজন্য আর্য্যঋষিগণ দেশ, কাল, দেহ, বিজ্ঞান প্রভৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ত্রিসন্ধ্যার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, হিন্দুর এই ত্রিসন্ধ্যার ব্যবস্থার মূলে কি তথ্য নিহিত আছে।

প্রথমে দেখা যাউক "সন্ধ্যা" কি। সন্ধ্যা বলিতে চলিত কথায় "দিন যায় রাত্রি আসে" এই সময় বুঝায়। কিন্তু 'সন্ধি'শব্দের অর্থ "সংযোগ" বা "সংযোগস্থল বা কাল।" দিবা ও রাত্রির এইরূপ সংযোগকাল আমরা দুইবার

মাত্র পাই। একবার খুব ভোরে (উষায়) যখন "রাত্ যায় দিন আসে," আর একবার যখন "দিন যায় রাত্ আসে।" বাহিরের এই সন্ধ্যা দুইবার হইলেও আমরা বহির্জগতে ও দেহের ভিতরে প্রকৃতপক্ষে চারিটি সন্ধিকাল পাই। ১ম, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে; ২য় মধ্যাহ্নে; ৩য় সূর্য্যাস্তসময়ে ও ৪র্থ মধ্যরাত্রে। এই সকল সন্ধিতে যে উপাসনা হয় তাহাকে সন্ধ্যা বলে। বৈদিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা প্রথম তিন সন্ধিতে—সূর্য্যের গগনমণ্ডলে অবস্থানকালে। আর ৪র্থ সন্ধির অর্থাৎ মধ্যরাত্রের উপাসনা তান্ত্রিকগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এত সময় থাকিতে অত বাঁধাবাধি করিয়া উষা, মধ্যাহ্ন ও সূর্য্যাস্তসময় এই তিন সন্ধিকালে বৈদিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা করা হইল কেন? কেহ কেহ বলেন যে ধর্ম্ম জিনিষটা খুব রুচিকরও নয় এবং মানুষও আপন ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে ভালবাসে; সেইজন্য আর্য্যঋষিরা মানুষকে একটা বাঁধাবাধি নিয়মে কাজ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। কারণ, ভাল কাজ নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি তাই? না।

যাঁহারা সকল বিষয়ই একটু লক্ষ্য করেন, তাঁহারা অবশ্যই অনুভব করিয়া থাকিবেন যে বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতেই (বিশেষতঃ জীবের দেহে ও মনে) একটু ভাবান্তর লক্ষিত হয়। যেমন, বাহিরে অন্ধকার থাকিলে বা আকাশ মেঘযুক্ত থাকিলে মন অবসন্ন হয়; বাহিরে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেহ রসস্থ হয়; ঝড়ের সময় শরীরে বায়ু-বৃদ্ধি হয়; উজ্জ্বল দিবালোকে বা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন প্রফুল্ল থাকে। আবার দেখা গিয়াছে "বেতো" রোগী পাঁজি না দেখিয়াই একাদশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার আগমন বেশ বলিয়া দিতে পারেন। গ্রীষ্মে শরীর উত্তপ্ত ও শীতে উহা শুষ্ক হয়। এইরূপ অনেক বিষয় আছে, যাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বাহ্য প্রকৃতির প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়। মন লইয়াই সমস্ত ব্যাপার। বিশেষতঃ উপাসনা-কার্য্যে মনকে স্থির রাখা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। মন স্থির থাকিলে উপাসনা-কার্য্য সহজ হয়। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা যে সময়ে মন আপনা আপনিই স্থির হয় সেই সেই সময়েই সন্ধ্যার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমরা পরে দেখিব।

বৈদিকসন্ধ্যার ব্যবস্থা উক্ত তিনটি মাত্র সময়ে হওয়ার কারণ এই যে,—

(১) বৈদিকসন্ধ্যা সূর্য্যমণ্ডলস্থা গায়ত্রীশক্তির উপাসনা। সেইজন্য সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যের উদয়কাল হইতে অস্তগমন কালের মধ্যে এই উপাসনা প্রশস্ত।

(২) যে সময়ে মন আপনা আপনিই স্থির হয়, সেই সময়ই উপাসনার প্রশস্ত সময়। মন স্থির না হইলে উপাসনা হয় না।

(৩) দেহস্থ প্রধান তিনটি ধাতুর অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের হ্রাস বৃদ্ধি বা সাম্যাবস্থার সঙ্গে মনের চাঞ্চল্য বা স্থিরতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

এখন উপরিউক্ত কারণ কয়টি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টি কতকটা বোধগম্য হইবে।

(১) সমস্ত দিবানিশি পার্থিব তাড়িৎ উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত থাকে, ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। এইজন্যই একটি লৌহসূচী উত্তর দক্ষিণ-ভাবে কিছুদিন রাখিলে উহা ক্ষুদ্র চুম্বকে পরিণত হইয়া যায়। এই তাড়িত-প্রবাহ উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থা অপেক্ষা শায়িত অবস্থাতে জীবদেহে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। তাই মানব উত্তরশিয়রী হইয়া শয়ন করে না। কিন্তু সূর্য্য গগনমণ্ডলে উদিত হইলে, উগ্রতর সৌর তাড়িতের প্রভাবে এই পার্থিব তাড়িতের শক্তির খর্ব্বতা হয়। তাই দিবাভাগে, জাগ্রত অবস্থায় প্রবলতর এবং সৃষ্টিরক্ষা-শক্তি-সম্পন্ন সৌরতাড়িতের প্রভাবাধীন হইয়া উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(২) উপাসনা-কার্য্যে মন স্থির হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সংসারী-লোকের বিষয়াসক্ত মন স্বভাবতই বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল। দুইটি অবস্থায় স্বভাবতঃ বিক্ষিপ্ত মনকে স্থির হইতে দেখা যায়ঃ—

(১) বলপূর্ব্বক সংযত করিলে আর (২) অবলম্বনহীন হইয়া যখন উহা আপনা আপনি স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে। কিন্তু স্বভাবতঃ চঞ্চল মন বলপূর্ব্বক স্থিরীকৃত হইলে, সুযোগ পাইলেই আবার চঞ্চল হইয়া অধিক-তর বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ইহাতে মন ভিতরে ভিতরে চঞ্চল থাকে। সেইজন্য বহুদর্শী ঋষিগণ যে সময়ে মন আপনা হইতেই স্থির হয় সেই সময়েই ত্রিসন্ধ্যার ব্যবস্থা করিয়া চঞ্চলচিত্ত মানবের ধর্ম্মলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

(৩) এখন দেখা যাউক, মন কোন্ কোন্ সময়ে আপনা হইতেই স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় ও কেন হয়? বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন ধাতু জীব-শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরকে সুস্থ বা অসুস্থ রাখে। যখন বায়ু, পিত্ত, কফ

তিনটিই পরিমিতরূপে ও সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের সাম্যাবস্থার ফলে মন স্থির এবং দেহ নীরোগ ও সুস্থ থাকে। কিন্তু যদি উহাদের একটিরও প্রাবল্য হয়, অমনি শরীরে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া রোগের সৃষ্টি হয়। বায়ু শরীরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে আছে। পিত্ত, কফ ও রক্তের মধ্যে যে কোনও একটির প্রাবল্য হইলেই বায়ুও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হইয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করে। উহাদের প্রকোপ কমিলে বায়ুরও প্রকোপের হ্রাস হয়। বায়ু চঞ্চল হইলে মনও চঞ্চল হয়। পিত্তের আধিক্য হইলে উত্তাপ, জ্বালা ও চাঞ্চল্য (অস্থিরতা) বৃদ্ধি পায়, আর শ্লেষ্মার আতিশয্যে শৈত্য, গৌরব (ভার ভার বোধ) আলস্য ও তন্দ্রালুতা লক্ষিত হয়।

নদী বা সমুদ্রে যেমন জোয়ার ভাঁটা হয়, শরীরের ভিতরেও তেমনি প্রধান তিন ধাতুর (বায়ু, পিত্ত ও কফের) পর্য্যায়ক্রমে জোয়ার বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাহ্য প্রকৃতিতে যেমন দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হয়, দেহাভ্যন্তরেও সেইরূপ দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হয়। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পিত্তের জোয়ার ও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কফের জোয়ার; আর মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে উহাদের ভাঁটা হয়। কিন্তু এই জোয়ার বা ভাঁটা অকস্মাৎ প্রবল না হইয়া ধীরে ধীরে প্রবল বা হীনবল হয়। জোয়ার হীনবল হইলে ভাঁটা প্রবল এবং ভাঁটা হীনবল হইলে জোয়ার প্রবল হয়। জোয়ারের আরম্ভ ও ভাঁটার শেষ এবং ভাঁটার আরম্ভ ও জোয়ারের শেষ, ইহার মধ্যে এমন একটি সময় (স্থিরমুহূর্ত্ত) আসে যখন জল একেবারেই স্থির হয়। এমন স্থির হয় যে বাতাস না থাকিলে, জলে ভাসমান দ্রব্যাদি ঐ সময়ে সম্পূর্ণ স্থিরভাবে ভাসিতে থাকে; এদিকেও যায় না, ওদিকেও যায় না। বাহিরে জোয়ার ভাঁটার সন্ধির সময় যেমন হয়, দেহের মধ্যেও সেইরূপ দুই ধাতুর সাম্যাবস্থার সময়েও এমন একটি স্থিরমুহূর্ত্ত আসে যখন মন আপনা আপনিই স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। এই সকল স্থিরমুহূর্ত্তে জপতপ, ধ্যান ধারণাদি কার্য্য বেশ সুন্দর হয়। মনের এই স্থির অবস্থার সময়ই আর্য্যঋষিগণ সন্ধ্যা-বন্দনার উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই স্থিরমুহূর্ত্ত চারিবার হয়।

১। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে)...পিত্ত-বৃদ্ধি ও শ্লেষ্মা-হ্রাস সময়ে

২। মধ্যাহ্নকালে...পিত্তের হ্রাস ও বায়ুর বৃদ্ধি সময়ে

৩। সূর্য্যাস্তকালে...শ্লেষ্মার বৃদ্ধি ও বায়ু-পিত্তের হ্রাস সময়ে

৪। মধ্যরাত্রে...শ্লেষ্মার হ্রাস ও পিত্ত-বৃদ্ধির সূচনার সময়ে।

মধ্যাহ্নের পর হইতে সূর্য্যের উত্তাপ হ্রাসের সঙ্গে এবং ঈষৎ বায়ু-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে কফের প্রাবল্য হইতে আরম্ভ করে। সেইজন্য মধ্যাহ্নের পর হইতে সূর্য্যের তেজ বেশ প্রখর থাকিলেও আমাদের নিকট উহা কম উগ্র বলিয়া মনে হয়। সূর্য্যাস্তের সময় ঐ কফের জোয়ার প্রবল হয় এবং মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত পূর্ণবেগে প্রবাহিত থাকিয়া, তাহার পর হইতে সূর্য্যোদয়ের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহে পিত্ত-বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঐ বৃদ্ধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত হইয়া পরে হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। মধ্যাহ্নের পর হইতে বায়ুও একটু প্রবল হয়। কিন্তু বায়ু বা পিত্তকে দমন করা একমাত্র কফেরই সাধ্য। তাই নৈসর্গিক নিয়মে অপরাহ্ণে কফও ধীরে ধীরে প্রবল হইতে থাকে। এখন আমরা দেখিলাম যে আমরা দিবারাত্রির মধ্যে চারিবার এমন স্থিরমুহূর্ত্ত পাই, যে সময়ে মন আপনা আপনিই বিনা আয়াসে স্থির হয়। তবে উষাকালে মন যেরূপ স্থির হয়, সন্ধ্যাকালে (মন) তদপেক্ষা কম স্থির থাকে এবং মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যাকাল অপেক্ষাও একটু কম স্থির থাকে। কারণ, সমস্তদিনের কর্ম্মজনিত ক্লান্তি ও উত্তেজনার পরে (সমস্ত রাত্রি সুখ-নিদ্রাভোগ করিবার ফলে) জীবের শরীর সতেজ ও মন প্রফুল্ল থাকে বলিয়াই স্নিগ্ধ উষাকালে মন সর্ব্বাপেক্ষা স্থির থাকে। এই মনোরম উষাকালের এমনই গুণ যে, যে রোগী সমস্ত দিবারাত্র রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়াছে সেও ঐ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কিছুক্ষণের জন্য শান্তভাব ধারণ করে। দিবসের আর কোন সময়েই মন এমন শান্ত থাকে না। সায়ংকালে দিবাভাগের কর্ম্মের উত্তেজনার অবসানে দেহ ক্লান্ত ও মন অবসাদগ্রস্ত হয়। সেই সময়ে বাহিরে শীতলতা ও দেহের মধ্যে শ্লেষ্মা-বৃদ্ধি হওয়ায় উত্তেজিত বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হইয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কাজেই এ সময়েও একটি স্থিরমুহূর্ত্ত আসে যখন মন উষাকালের ন্যায় অত সুস্থির না হইলেও মধ্যাহ্নকাল অপেক্ষা অনেক শান্ত থাকে। আর মধ্যরাত্রি নিদ্রাভোগের সময় বলিয়া সে সময়ে বৈদিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা নাই।

আশা করি, চিন্তাশীল পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, কেন আর্য্যঋষিগণ এত সময় থাকিতে ঐ তিনটি সময়ই বৈদিকসন্ধ্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। উপাসনার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য, আপাতনীরস কার্য্যের জন্য ঐ তিনটি সময় মনোনীত করিয়া আর্য্যমনীষিগণ ভূয়োদর্শন, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার

পরিচয় দেন নাই কি? তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে মনের সঙ্গে দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, দেহের সঙ্গে জড়জগতের নিখিল বস্তুর, এমন কি গগনমণ্ডলস্থ গ্রহাদিরও, যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। তাঁহাদের প্রত্যেক বিধি-ব্যবস্থার আলোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের সমক্ষে আমাদের উদ্ধত মস্তক স্বতঃই ভক্তি-ভরে নত হইয়া পড়ে।

নীলাম্বরের কথা।

মঙ্গল গ্রহ।

লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, এম্, বি, এ, এ।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের অপরদিকে পৃথিবীর পরেই মঙ্গল গ্রহের অবস্থান। মঙ্গলগ্রহ সময়ে সময়ে পৃথিবীর এত নিকটে আসে যে তখন বড় বড় দূরবীণে মঙ্গলের খাল, বিল, স্থল, জল সমস্তই বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে জ্যোতিষ্ক-তত্ত্ববিদ্‌গণ অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা মঙ্গলগ্রহের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগী। তাঁহারা মঙ্গলগ্রহের অসংখ্য ফটো চিত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে ভূচিত্রাবলীর ন্যায় মঙ্গলের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; এবং তাহারই সহায়তায় তাঁহারা মঙ্গলের স্থল জল ও খাল বিলের অবস্থার পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

মঙ্গল গ্রহের ব্যাস ৪২১০ মাইল, আকৃতিতে আমাদের চন্দ্রের প্রায় দ্বিগুণ এবং পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেকের সমান। মঙ্গল সূর্য্য হইতে ১৪১,০০০,০০০ মাইল দূরে আছে। মঙ্গলের আহ্নিকগতির কাল ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৩'৫৬ সেকেণ্ড এবং উহা ৬৮৬.৯৭৯৭ দিনে অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন ছয়শত সাতাশি দিনে একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। আর্য্যঋষিগণ মঙ্গলকে ধরণীগর্ভসম্ভূত, বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ ও লোহিতাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মঙ্গল যে ধরণীগর্ভসম্ভূত, জ্যোতিষশাস্ত্রে আজিও সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; তবে মঙ্গল যে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ অথবা রক্তগৌর-মিশ্রিত বর্ণ তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণে মঙ্গলের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়:—

সৌতিরুবাচ—উপেন্দ্ররূপমালোক্য কামার্ত্তা চ বসুন্ধরা।
বিধায় সুন্দরী বেশমক্ষতা প্রৌঢ়যৌবনা॥
সস্মিতা তস্য তল্পে চ সহসা সমুপস্থিতা।
সুরম্যাং মালতীমালাং দদৌ তস্মৈ বরাননা॥
উপেন্দ্রস্তন্মনো জ্ঞাত্বা কামী মন্মথপীড়িতঃ।
নানাপ্রকার-শৃঙ্গারং চকার চ তয়া সহ॥
তদঙ্গসঙ্গমাসক্তা মূর্চ্ছাং প্রাপ সতী তদা।
মৃতেব নিদ্রিতা বাসৌ বীর্য্যাধানে হরীকৃতে॥
বিহায় তত্র রহসি জগাম পুরুষোত্তমঃ।
উর্ব্বশী পথি গচ্ছন্তী বোধয়ামাস তাং মুনে॥
সা চ পপ্রচ্ছ বৃত্তান্তং কথয়ামাস ভূশ্চ তাম্।
বীর্য্যং সংবরণং কর্ত্তুং সা চাশক্তা চ দুর্ব্বলা॥
প্রবালস্যাকরে ত্রস্তা বীর্য্যন্যাসং চকার সা।
তেন প্রবালবর্ণশ্চ কুমারঃ সমজায়ত॥
তেজসা সূর্য্যসদৃশো নারায়ণসুতো মহান্॥

ইহা হইতেছে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কথা; পুরাণান্তরে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকাও দেখিতে পাওয়া যায়; সে সকল এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

আমাদের পৃথিবী ৩৬৫'২৫৬৪ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, আর মঙ্গল ৬৮৬'৯৭৯৭ দিনে একবার সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মঙ্গল কিঞ্চিন্ন্যূন দুইবৎসর অন্তর একবার করিয়া পৃথিবী হইতে সূর্য্যের বিপরীত দিকে সূর্য্য ও পৃথিবীর সহিত সমসূত্রপাতে আসিয়া থাকে; এই সময়ে মঙ্গলের বক্রগতি হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ এইপ্রকার অবস্থানের নাম opposion of Mars; এবং যেদিন ঠিক সমসূত্রপাতে পতিত হয় সেই দিনকে Day of opposion বলে; ঐ দিন মঙ্গল পৃথিবীর নিকটে আসিয়া থাকে। ঐ সময়ে সূর্য্য সন্ধ্যাকালে পশ্চিম গগনে অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব গগনের দিগ্বলয়ে মঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ দিনকে হিন্দু জ্যোতিষে মঙ্গলের ষড়্ভান্তরে অবস্থিতি বলে, কেননা ঐ দিন মঙ্গল সূর্য্য হইতে ছয় রাশি অন্তরে অবস্থান করে। বক্রগতির সময়ে মঙ্গল পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয় বটে কিন্তু প্রতিবারেই পৃথিবীর নিকটতম হয় না। মঙ্গল ও পৃথিবী উভয়েরই কক্ষা বৃত্তাভাস কিন্তু ঐককেন্দ্রিক নহে। ভূকক্ষার যে স্থান সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী

সেইস্থানের উপর দিয়া সূর্য্য হইতে মঙ্গলের কক্ষা পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিলে উহা যে স্থান স্পর্শ করিবে মঙ্গলের কক্ষায় সেইস্থান সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী নহে। এই কারণে উভয় কক্ষার যে স্থান নিকটতম, বক্রগতির সময়ে মঙ্গল ও পৃথিবীর পরস্পর সেইস্থানে আসিতে বহু বিলম্ব ঘটে। গত বৎসর ১৯২৪ খৃঃ অঃ ২৩শে আগস্ট মঙ্গল পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। আগামী ১৯৩৯ খৃঃ অঃ ও ১৯৪১ খৃঃ অঃ আবার মঙ্গল পৃথিবীর খুব নিকটে আসিবে বটে, কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যত নিকটে আসিয়াছিল, তত নিকটে আসিবে না। বক্রগতির সময়ে মঙ্গলের বিম্ব দূরবীক্ষণে অন্য সময় অপেক্ষা খুব বড় দেখিতে পাওয়া যায়। এবং উহার পরিদৃশ্যমান ব্যাস ৩০″ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অপর সময়ে উহার ব্যাস ১৩″ এর বেশী নহে। এই সময়ে খালিচক্ষেও মঙ্গলকে খুব বেশী উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। গত বৎসর আমরা আমাদের ৩″ দূরবীণে মঙ্গলকে যত বড় দেখিয়াছিলাম, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তত বড় দেখি নাই। উহার জল ও স্থলের চিহ্নগুলি এবং মেরুপ্রদেশের বরফরাশি আমরা সুন্দর দেখিয়াছিলাম।

মঙ্গল অবস্থান-ভেদে কখনও পূর্ণ গোলাকৃতি, কখনও বা কুব্জাকৃতি—Gibbous—দেখায়। যে বারে সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটে আসে সেবারে উহার রক্তবর্ণ জ্যোতির মধ্যে পূর্ণ গোলাকৃতি বিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সময়ে অন্ততঃ ৫ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীণে উহাকে খালিচক্ষে দৃষ্ট চন্দ্রের ন্যায় বৃহৎ দেখায়। কিন্তু অন্য সময়ে এমন কি ৯০° অংশ দূরে গেলেই ম্লান ও কুব্জাকৃতি হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ মঙ্গলের ঐ প্রকার কুব্জাকৃতি অবয়ব দেখিয়াই আর্য্য-ঋষিগণ উহার নাম "কুব্জ" রাখিয়াছিলেন। আধুনিক দূরবীক্ষণের ন্যায় না হইলেও তাঁহারা উপযুক্ত যন্ত্রযোগে গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন বলিয়াই মনে হয়।

বক্রগতির সময়ে যদি আকাশ নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ থাকে, তাহা হইলে দূরবীক্ষণে মঙ্গলের অবয়ব ভূচিত্রের আকারে প্রতিভাত হয়, তখন মঙ্গলের জল ও স্থলের পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জ্যোতিষ্কতত্ত্ববিদ্ সেক্কি মঙ্গলের গাত্রে কমলাবর্ণের উজ্জ্বল অংশে সময়ে সময়ে লোহিত, হরিদ্রা ও নীলবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। জ্যোতিষী সিয়াপেরিলি ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে উহার গাত্রে জালের ন্যায় সূক্ষ্ম রেখা সকল দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন ঐ সকল সূক্ষ্ম রেখা গুলি খাল ও তদন্তর্গত সাদা অংশ গুলি ভূমি। কৃষ্ণ-ধূসর বর্ণের স্থানসমূহে সূর্য্যালোক-প্রতিফলনের অবস্থা দেখিয়া

ঐ সকল স্থান সমুদ্র বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে মঙ্গলের স্থলভাগ জলভাগের অপেক্ষা অনেক বেশী। সিয়াপেরিলিই পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবর্ণের সূক্ষ্ম রেখা সকলকে জলপ্রণালী বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন; ঐ সকল জল-প্রণালী ভূমিভাগকে অসংখ্য দ্বীপে বিভক্ত করিয়াছে; এবং ঐ সকল জল-প্রণালী একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমনের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৮৮১—৮২ খৃষ্টাব্দে সিয়াপেরিলি প্রচার করেন যে ঐ সকল জলপ্রণালীর অনেকগুলি যুগল। তাঁহার এই কথায় জ্যোতিষি-সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং নানা তর্ক বিতর্কের পর নয় জন খ্যাতনামা জ্যোতিষী তাঁহার পক্ষা-বলম্বন করেন। ইহার কিছুদিন পরে লিক মানমন্দিরের * ৩৬ ইঞ্চি দূরবীণে ঐ সকল যুগ্ম জলপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ সকল জলপ্রণালী যে সদা পরিবর্ত্তনশীল, কিছুদিনের পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। উহারা কখনও সূক্ষ্ম কখনও বা প্রশস্ততর দেখায়, এমন কি সময়ে সময়ে এক বা দুইদিনের মধ্যেই ঐ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে তাঁহারা মনে করেন যে মঙ্গলের ঋতুপরিবর্ত্তন ও বারিবর্ষণই ইহার কারণ। ঐ সকল জলপ্রণালী আবার এক হ্রদ বা সমুদ্রকে অন্য হ্রদ বা সমুদ্রের সহিত মিলিত করিয়াছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে W. H Pickering ৪০টী হ্রদের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন; উহাদের কোন কোনটী ৩০ হইতে ১০০ মাইল প্রশস্ত এবং সাধারণতঃ উহারা পূর্ব্বোক্ত জলপ্রণালী গুলির দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্কতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত গুলি যে নির্ভুল ও যে সকল চিহ্নকে প্রণালী, হ্রদ, সমুদ্র ও ভূমিভাগ বলা যাইতেছে তাহাই যে স্থির সিদ্ধান্ত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। যেহেতু পরবর্ত্তিকালে লিনসার, শিবার্লি প্রভৃতি জ্যোতিষিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নগুলি সমুদ্র অপেক্ষা মহাদেশের সুস্পষ্ট-লক্ষণ প্রকাশ করে। শিবার্লি বলিয়াছেন কালি-ফর্ণিয়ায় হ্যামিলটন পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে শানফ্রান্‌সিস্কো উপসাগরের প্রতি দৃষ্টি-

* লিক মানমন্দির জেম্‌স্ লিক নামক জনৈক আমেরিকাবাসী ধনকুবেরের মৃত্যুকালে প্রদত্ত ১,৪০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রাব্যয়ে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। আমে-রিকার ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের সানযোসী নগরের ২৬ মাইল পূর্ব্বদিকে হ্যামিলটন্ গিরিশৃঙ্গের উপরিভাগে সমুদ্র হইতে ৪২৮০ ফুট উচ্চে এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইতে দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। অধুনা এই মান-মন্দির কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। জগতের বৃহত্তম ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের দর্পণযুক্ত দূরবীণ এখানে আছে।

পাত করিলে সন্নিহিত তটভূমি গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন ও বারিরাশি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বহু জ্যোতিষী মঙ্গল গ্রহের কৃষ্ণ চিহ্ন সকল বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অঙ্কিত মঙ্গল গ্রহের বহু চিত্র ইউরোপ ও আমেরিকার বহু গবেষণাগারে বিদ্যমান আছে। ঐ সকল চিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের অধিকাংশই পরস্পর বিরোধী। বিভিন্ন আকৃতির ও শক্তির দূরবীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টিশক্তি, আকাশের এবং আবহাওয়ার অবস্থা এবং চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় পটুতার তারতম্যবশতঃ ঐ সকল চিত্র পরস্পর অমিল হইয়াছে। আরও এক কথা, মঙ্গলের ভ্রমণ-পথের উপর উহার অক্ষদণ্ডের অবনতিবশতঃ কিছুকাল উহার উত্তর মেরুপ্রদেশ এবং কিছুকাল উহার দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ আমাদের দিকে উন্মুক্ত থাকে, অর্থাৎ যে কারণে পৃথিবীতে উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন হয় সেই কারণ মঙ্গলগ্রহেও বিদ্যমান আছে। মঙ্গলগ্রহের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলেও সময়ে সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই সকল কারণেও পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলগ্রহের চিত্রাবলির পার্থক্য ঘটিয়াছে। প্রাচীনকালের জ্যোতিষিগণ মনে করিতেন যে ঐ সকল চিহ্ন সদা পরিবর্ত্তনশীল; এখনকার জ্যোতিষীরাও বলেন যে সমস্ত না হউক কতকগুলি চিহ্ন এখনও পরিবর্ত্তনশীল রহিয়াছে। জর্ম্মাণ জ্যোতিষী Johann Hieronymes Schroter মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে ২২৪টী চিত্র-সম্বলিত একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, উহার নাম "Areographische Fragmente," তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে ঐ পুস্তকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি রাখিয়া যান, সম্প্রতি বেলজিয়ামের লুভের নগরের জ্যোতিষী ডাঃ টারলি ঐ পাণ্ডুলিপিটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে স্ক্রোটার মঙ্গলের ঐ সকল চিহ্নকে মেঘরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তিনি উহাদের যে সকল দ্রুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। স্ক্রোটারের ঐ পুস্তক খানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাকুইজেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল। ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ফ্লামেরিণ মঙ্গলের সম্বন্ধে ফরাসীভাষায় একখানি বৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তিনি ঐ পুস্তকে ৫৭১ খানি চিত্রের দ্বারা এবং কতিপয় মানচিত্রের দ্বারা মঙ্গল গ্রহের বিবরণ অতি বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দূরবীক্ষণ ও অপরাপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু জ্যোতিষী আজ পর্য্যন্ত মঙ্গল গ্রহের যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই বিশদভাবে

ঐ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ছয়শতপৃষ্ঠাব্যাপী বহু তথ্যপূর্ণ ঐ পুস্তকের মূল্য খুব বেশী নহে, কিন্তু ফরাসীভাষায় লিখিত বলিয়া আমাদের বোধগম্য নহে। ফরাসীভাষাভিজ্ঞ কোন বাঙ্গালী যদি ঐ পুস্তকখানির বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করেন তাহা হইলে উহা আমাদের সাহিত্যজননীর অঙ্গের একখানি মূল্যবান্ অলঙ্কার হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। ফরাসীভাষাভিজ্ঞ অনেক বাঙ্গালী বহু ফরাসী গল্পের ও উপন্যাসের অনুবাদ করিয়াছেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে উহাদের আদর নিতান্ত কম নহে। ঐ পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ জ্যোতিষ্কতত্ত্বজ্ঞ ও জ্যোতিষামোদী ব্যক্তিগণের নিকট অনাদৃত হইবে না।

Beer and Modler ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বক্রগতির সময়ে তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তী Kunowsky's আবিষ্কৃত কতিপয় চিহ্ন দেখিয়াছিলেন; তৎপরে ১৮৩২, ১৮৩৪ ও ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দেও ঐ চিহ্নগুলি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও প্রত্যেক বারেই মঙ্গলের একই গোলার্দ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তথাপি তাঁহারা যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ঐ সকল চিহ্ন অপরিবর্ত্তনশীল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী বহু জ্যোতিষী পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ঐ সকল চিহ্ন প্রকৃতই মঙ্গলগ্রহের ভূমিস্থিত, মেঘের নহে। তাঁহারা বলেন যে কোন দূরবর্ত্তী গ্রহ হইতে পৃথিবীকে দেখিলে ঠিক ঐ প্রকারই দেখা যায় এবং আবহাওয়ার, বিশেষতঃ বায়ুমণ্ডলের গাঢ়তার তারতম্যবশতঃ পৃথিবীর গাত্র-স্থিত চিহ্ন সকল কখন সুস্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট দেখাইবে।

অনুকূল আবহাওয়ায় ও অবস্থানে মঙ্গলের সাদা ও কাল দাগ গুলি বেশ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। ৫৷৷০ ইঞ্চি দূরবীণে উহাদিগকে খুব ভালই দেখা যায়। ইহা অপেক্ষা ছোট দূরবীণেও কাল দাগগুলি সময়ে সময়ে বেশ ভাল দেখা যায়। প্রতিকূল অবস্থায় বড় দূরবীণেও ঐ কাল দাগগুলি সময়ে সময়ে ভাল দেখা যায় না। আবার পৃথিবীর একস্থান হইতে যেমন ভাল দেখা যায় অন্যস্থান হইতে তত ভাল দেখা যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মঙ্গল ও পৃথিবী অনৈককেন্দ্রিক বৃত্তাভাস পথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, তজ্জন্য মঙ্গল প্রতি বক্রগতির সময়ে পৃথিবীর সমান নিকটে আইসে না; এই কারণে মঙ্গলের মণ্ডল বা বিম্ব—Disc—প্রত্যেক বক্রগতির সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির দেখিতে পাওয়া যায়। এই অসমতা নিতান্ত কম নহে। ১৮৭৭, ১৮৯২ এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বক্রগতির সময়ে মঙ্গল-বিম্বের পরিদৃশ্যমান ব্যাস ২৪″ হইতে ২৫″ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৪″ দেখা গিয়াছিল। খুব

বৎসর ২৩শে আগুষ্ট উহার বিম্বের পরিদৃশ্যমান ব্যাস ২৫'১" হইয়াছিল। গত বৎসর মঙ্গল বিষুবরেখার দক্ষিণে থাকায় ইংলণ্ড প্রভৃতি উত্তর দেশস্থিত জ্যোতিষিগণ মঙ্গলকে ভালরূপে দেখিতে পান নাই। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মানমন্দির হইতেই মঙ্গলের পর্য্যবেক্ষণ ভাল হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার জ্যোতিষিগণই উহাকে খুব ভাল দেখিয়াছেন। ঐ সময়ে বর্ষাকাল হইলেও আমরা আমাদের ৩" দুরবীণে উহাকে নিতান্ত মন্দ দেখি নাই; উহার সাদা ও কাল দাগগুলি বেশ সুন্দর দেখিয়াছিলাম। ঐ সকল দাগের মধ্যে বিষুব প্রদেশের ত্রিকোণাকার Syrtis Major, তাহার পশ্চিম-দক্ষিণে Mare Acidalium এবং উহাদের দক্ষিণে Sinus Sabaeus বেশ ভাল দেখা গিয়াছিল। আরও কয়েকটী ছোট ছোট দাগ দেখা গিয়াছিল যাহা আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখিতে পাই নাই। দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের বরফরাশিও বেশ স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।

মঙ্গলের দুইটী উপগ্রহ আছে; ১ম ডিমস, ২য় ফোবস। সাধারণ ছোট দুরবীণে উহাদিগকে দেখা যায় না। উহাদিগকে দেখিতে হইলে অত্যন্ত শক্তিশালী দুরবীণ আবশ্যক।

"চণ্ডী ও গীতোক্ত নিষ্কামবাদ।"

লেখক— শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীব শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ সুরত্ব লাভ করিয়া অর্থাৎ Higher Self বা I 'স্ব', স্বাত্মায় অধিকতর পবিত্র হইয়া দেবত্ব লাভ করিয়া (Godly) দেবভাবে, জগতের হিতচিকীর্ষু হইলে, অর্থাৎ 'ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা' ব্রহ্মের ইচ্ছায় ব্রহ্ম-কর্ম্মসাধন-তৎপর হইলে, নিজে পবিত্র উন্নত শ্রেষ্ঠ হইয়া অপরের জন্য আত্ম-নিয়োগ করিলে ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া সুরেশ্বরত্ব লাভ করিয়া সুরেশ দেবেশ দেবেন্দ্র ইত্যাদি সবই হইতে পারে।

সর্ব্বলোকের হিতচিকীর্ষু হইয়া "শিবত্ব" লাভও করিতে পারে। তখন মহাশক্তি লাভ করা ত কোন্ কথা। মহাশক্তি আশ্রয় করিয়া মহেশ্বরত্ব লাভ

করাই বা কোন্ আশ্চর্য্য কথা। "কথং ত্বং জননীভূত্বা বধূস্তং মম দেহীনাং" শ্রীগুরুগীতা দ্রষ্টব্য। মহেশ্বরও বিস্মিত হইয়া মহেশানীকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। "বধূস্তং মম দেহীনাং।"

মানবীই ত মহিষী মহেশ্বরী হইতেছেন, "মহীয়সীত্ব" লাভ করিয়া ? দানবেশ্বরী দেবেশ্বরী ত কোন্ ছার কথা। জেরিণা, কৈসরীন্, কুইন, সুলতানা এ ত সামান্য কথা; নরেন্দ্রত্ব, মানবেন্দ্রত্ব, "জীব" স্ব-বীর্য্যে স্ব-পৌরুষ-বিক্রমে আত্মার মর্য্যাদায় অনায়াসে লাভ করিতে পারে। 'He' 'She' বা আকার ঈকারান্ত পুরুষ-স্ত্রীপদবী; জীবাত্মা ত সর্ব্বদাই আকার 'ঈ'কার পরিবর্ত্তন করিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হ'চ্ছে। নরনারী, মানব-মানবী, মানুষ-মানুষী, অশ্ব-অশ্বিনী বা অশ্বী, কুক্কুর-কুক্কুরী এই সব 'আকার' ঈকারান্ত পদবীও অনায়াস-এবং-সহজলভ্য।

Sound 'শব্দ' হইতে সৃষ্টি সঞ্জাত হইয়াছে, শব্দাত্মিকা প্রকৃতি "শব্দ-ব্রহ্ম," শব্দ-ব্রহ্মের প্রকৃতি হইতে "অক্ষর", যথা বায়ুর শব্দ শন্ শন্ সোঁ সোঁ, ভোঁ ভোঁ ইত্যাদি শব্দ হইতে রূপ অক্ষর ভাষা ইত্যাদি সবই ত পাইতেছি। উহাই শব্দের প্রকৃতি। জলেরও শব্দ অক্ষর ভাষা আছে; যথা ছন্ ছন্, কল্ কল্ ইত্যাদি; তেজ অর্থাৎ রৌদ্রেরও শব্দ অক্ষর ভাষা আছে, যথা রা রা, রণ্ রণ্, ঝাঁ ঝাঁ; ক্ষিতিরও শব্দ অক্ষর ভাষা আছে, যথা—টং টং, ঠং ঠং, টুস্ টাস্, ঠুস্ঠাস্, প্রভৃতি।

শব্দ ব্রহ্ম, ব্যোম হইতে শব্দের উৎপত্তি, ভগবান ব্যোমকেশ। অক্ষর এবং ভাষা শব্দের প্রকৃতি ভাবাধিষ্ঠাত্রী, ভাব শব্দযোগে ভাষা ও অক্ষরে পরিণত হইয়া প্রকাশমান হন। ব্যোমকেশ ভগবান 'ভব', তাঁর প্রকৃতি 'ভবানী', ভাব তাঁরই ভাণ্ডারজাত শক্তি। তবে ? অক্ষরাত্মিকা বীজ, মন্ত্রবীর্য্য হইবে না কেন ? মনন দ্বারা মনকে বলাবদ্ধ করিয়া সংযত করিয়া মনকে জীবাত্মার দিকে বাঁধিয়া দিতে, এবং জীব মন্ত্রবীর্য্য দ্বারা মন্ত্রাক্ষরী বল্গা বাঁধিয়া জীবাত্মাকে "চৈতন্যে" ফিরাইয়া পরমাত্মার আকর্ষণে যুড়িয়া দিতে পারিবে না কেন ?

ঠেকিয়া শেখা যায়, সাবধান হওয়া যায়; Experiences, Sufferings এ সকলও Express করে, চৈতন্য-বিধান এর দ্বারাও মনের হয় বটে, কিন্তু মন ভীরু চঞ্চল কাপুরুষ হয়।

Wisdom জ্ঞান ঐঁ-শক্তি দ্বারা উদ্বোধিত করিয়া জ্ঞানশক্তির উন্মেষ করিলে তদপেক্ষা ভাল হয় নাকি ? ভগবৎশক্তি 'ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকা' মেরু-মজ্জার অন্তর্গত হইয়া মেরুকেন্দ্রে, "বিদ্যুদ্দাম সমপ্রভাং যুগপত্তিস্কন্ধস্থিতাং

ভীষণাং" ইত্যাদি হইয়া জীবন-কেন্দ্রগত হইয়া জীবনীরূপে জীবন্-প্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। এইজন্য এই Channel অর্থাৎ 'নাড়ী'কে জ্ঞানদায়িনী 'বোধিনী' জ্ঞান-নাড়ী বলে।

'প্রাণ' যদি energy হয় তা হ'লে energyকে সংযত সংহত করিয়া সু-প্রয়োগ করিলে energy ভাল ব্যবহারও দিতে পারে। তখন মানুষ, প্রাণের অধীনতায় স্বেচ্ছাধীন হইয়া "প্রাণ যা চায় তা কর্ব্বো" বল্‌বে না। আর "প্রাণ"ও জড়দেহের সেবাদাসরূপে সংস্কারগত Senses সেবার জন্য "ইন্দ্রিয়গুলির" ক্রীতদাস হইবে না। মন স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বৃত্ত হ'য়ে প্রাণের সঙ্গে যোগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের সেবাদাস হইবে না। 'জীব' স্বেচ্ছাচারিণী মনঃ-প্রকৃতির অধীনতায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বারাঙ্গনার সেবাদাস হইবে না; বরং সব উল্টাপথে সোজা হইয়া চলিবে; ঊর্দ্ধমূলগত হইবে। ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ জীব দেহগত 'জীব' ঊর্দ্ধাধঃ অতিক্রম করিবে। 'স্ব' স্বাধীন হইবে। 'স্ব' অধীন নয়, মনঃ-প্রাণ-দেহ 'স্ব' স্বাধীন জীবেরই অধীন ও অন্তর্গত। তখন অন্নময়, প্রাণময়, আশাময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষ "আনন্দহট্ট" হইবে। 'স্ব' আনন্দ-বাজার লুটিবে। তখন জীবগত 'স্ব'র জীবনগত যত কিছু 'ভোগ' সম্ভোগ জগন্নাথের প্রসাদরূপে প্রাপ্ত হইয়া 'উপভুক্ত' হইবে। আসক্তি প্রসক্তি-গত না হইয়া জীব-দেহগত ভোগ-রতি 'উপরতি' হইবে। আনন্দ-ভোগ হইবে, আসক্তি প্রসক্তির আকর্ষণ থাকিবে না। তখন "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্" প্রকৃত 'শ্রী'যুক্তা প্রকৃতি লাভ হইবে, সংসার মনোরম-ভাবে উপভোগ করিবার জন্য।

তখন সংসার সুখ-শ্রী-সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্-সমন্বিত হইয়া উপভোগান্তে 'জীব' বলিবে "তারিণি-দুর্গ-সংসার-সাগরস্যাচলোদ্ভবে। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

চণ্ডীতে, 'জীব' জ্ঞান গুণ ও শক্তিসমন্বিত হইয়া মহাশক্তির প্রসাদে শক্তি-ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত হইয়া সংসারভোগান্তে "মোক্ষ" মার্গাশ্রয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

গীতায় পাণ্ডুনন্দনগণ, দুই জননীতে পঞ্চপুরুষ-সহবাসে এক পতির নির্দ্দেশে পঞ্চপাণ্ডব জন্মগ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মকে অগ্রজ জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ করিয়া, ভীমপরাক্রম, অর্জ্জুনবিক্রম, নকুল সহদেব সাহজাত্য সাহচর্য্য লইয়া জগতে আসিয়া, এক পত্নীতে প্রকৃতিগতভাবে ভ্রাতৃসৌহৃদ্য ও সামঞ্জস্য রাখিয়া, মাতৃনির্দ্দেশে,

মাতৃ আশীর্ব্বাদে, অনেক ক্লেশ তপঃকৃচ্ছ্রসাধনা করিয়া অজ্ঞাতবাস, দেশভ্রমণ, অনেক রাক্ষস অসুর পাতন করিয়া শক্তি ও আয়ুধ (শক্তি ও উপায় সংযোগ করিয়া) পক্ষাপক্ষ বল সংস্থান করিয়া কৃষ্ণানুগত সর্ব্বদা থাকিয়াও বহু ক্লেশ ও কৃচ্ছ্র সাধনা করিয়াও, শেষে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞাসত্ত্বেও 'ক্লৈব্য' অনুভব করিয়াছিলেন।

মায়ামোহে স্বজন বান্ধব রক্তসম্বন্ধীয় হত হইবে ভাবিয়া মোহ বৈরাগ্য হইয়াছিল। অধর্ম্ম নাশ করিয়া ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াও এবং কর্ত্তব্যপথে কুরুক্ষেত্র সমরে এত আয়োজন দুর্ঘটন অঘটন করিয়া আত্মপক্ষ সংস্থাপন করিয়াও মোহাধীন হইয়া 'ক্লৈব্য' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভুক্ষ্যসে মহীং" বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধ দিয়া কর্ত্তব্যের পথে অর্জ্জুনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন 'জীব, কৃষ্ণ আত্মা'; আত্মা জীবকে আকর্ষণ করিলেন—হত যদি হও "জীব," তবুও তুমি "স্ব"র্গ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তোমার "স্ব" ঊর্দ্ধগত হইবে। ভগবানের কায করিয়া 'ধর্ম্ম' পালন করিয়া "আত্মা" ধর্ম্মবলে প্রধূমিত করিয়া 'হত'ও যদি হও, স্বর্গে যাইবে। আর 'জেত' যদি, তাহা হইলে জয়ী হইয়া 'মহী' ভোগ করিবে।

সুতরাং গীতাতেও "ভোগেরই" আশা দিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পিতৃ-স্বসৃপুত্র ও শিষ্য অনুগত এবং সখা "অর্জ্জুনকে" উদ্বোধিত অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।

তা হ'লেও এ ভোগটা কেমন? ভোগের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া ভোগলুব্ধতা-বশতঃ ভোগ নহে। ভোগাসক্ত "আসঙ্গ" ভোগ নহে। ইহাতে ভোগাসক্তি বা ভোগাসঙ্গ নাই। আত্মার দৃঢ়তায় সংযম-সংযত হইয়া, অনেক কঠোর পরীক্ষায় অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ ভোগ প্রসক্তি নাই যে, তাহার প্রমাণ দিয়াছিলেন।

ভয় বা কাপুরুষত্ববশতঃ "অর্জ্জুনের" ক্লৈব্য উৎপন্ন হয় নাই। তাঁর মনে হইয়াছিল, আমরা যখন ভোগের আসক্তিই রাখি না, রাজ্যজনপদ ধন ঐশ্বর্য্য পার্থিব সম্পদ ইত্যাদি কিছুই খুঁজি না, তখন কেন মিছামিছি যুদ্ধ করিয়া, শোণিতপাত করিয়া স্বজন পরিজন জ্ঞাতি-বান্ধব আত্মীয় কুটুম্ব বিনষ্ট করিয়া মরণের বিষাদ তুলিয়া একটা 'কুরুক্ষেত্র' কাণ্ড করি।

কিন্তু, এরূপ অবসাদ বা বৈরাগ্য আসা উচিত হইয়াছিল কি? "স্ব-ধর্ম্মে

মরণং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। এ ভাবটা ত ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত ভাব নয়। শুদ্ধ সত্ত্বরজআত্মিকা হইলেও তাঁর "স্ব"টা ক্ষত্রিয় "স্ব" রাজস। আত্ম-মর্য্যাদার জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য "কর্ত্তব্যে" ক্ষত্রিয় প্রবৃত্তি লইয়া ক্ষাত্রোচিত উপায়ে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

ন্যায় ধর্ম্ম অনুসারে সিংহাসন যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য। সিংহাসন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে যথানিয়মে দেওয়া ত দূরের কথা, পাঁচখানি গ্রামও তাঁহাদের দেওয়া হয় নাই।

অন্যায় অধর্ম্মে অক্ষক্রীড়ায় প্রতিযোগিতা আহ্বানে তঞ্চকতা করিয়া যুধিষ্ঠিরের সত্যপরায়ণতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অধর্ম্ম-ক্রীড়ায় দুর্য্যোধন জয়লাভ করিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের সমক্ষে দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিল জতুগৃহ দাহ করিয়া অতি গর্হিত উপায়ে মাতা পত্নী প্রভৃতিসহ পাণ্ডব-ভ্রাতৃগণকে দগ্ধ করিয়া হত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম্মের সীমা ছিল না। ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে ঐ সকল অন্যায় অধর্ম্মের দণ্ড দিবার জন্য, অন্যায় অত্যাচার অবিচার অধর্ম্ম নিবারণের জন্য ক্ষাত্রতেজে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া স্বাভাবিকভাবে উচিত হইত, কিন্তু, "সত্য-ধর্ম্ম" সত্যপরায়ণতার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য প্রত্যেক অন্যায় অত্যাচার অধর্ম্ম সংযতভাবে সহ্য করিয়া দৃঢ়তা, অবিচলিতচিত্ততা সংযমনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

কিন্তু, নির্দ্দিষ্ট সময়—"সত্য-প্রতিশ্রুতির" নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইবার পরে, ক্ষাত্রবৃত্তি অনুসারে উহার প্রতীকার প্রতিবিধান করা অবশ্যকর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

যশোহর ঝিনাইদহ রেলের সাপ্তাহিক আয়।

সপ্তাহ	বর্ত্তমানবর্ষ	গতবর্ষ
১১।১।২৬	২৭১২৸৵০	১৭৮৯৶৬
১৮।১।২৬	২২১২॥৵০	১৩৯০।৵০
২৫।১।২৬	২৭৩০৸৶৬	১৩৩৩৸৶৬
১।২।২৬	২৮২৬।০	১৪৭২৵৯
৮।২।২৬	৩২১৮॥০	১৫৫৫॥৶৯

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড } মাঘ। { ১৩৩২ সাল।
১০ম্ সংখ্যা। } { ১৮৪৭ শকাব্দাঃ

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন।

অগ্রহায়ণমাসের হিন্দু-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের "শিক্ষা-সমস্যা"-প্রবন্ধ-পাঠে আনন্দলাভ করিলাম। কিন্তু তিনি একটি বিষয় লেখেন নাই মনে হইল। স্তূপাকার পুস্তক, ছোট ছেলেদের পাঠ্য করিয়া, শিক্ষা-বিভাগ যে বালকগণের অনিষ্ট-সাধন করিতেছেন, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? ইহাতে কেবল যে দুঃখী বালকের পিতাকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে, তাহা নহে, বালকের স্বাস্থ্যও চিরদিনের জন্য নষ্ট করা হইতেছে। ১৯।২০ খানি পুস্তক এক একটি ৯।১০ বৎসর বয়স্ক বালকের পাঠ্য করিয়া বালকগণের ভবিষ্যজীবন চিরদিনের মত অন্ধকার করিতেছেন! তাহাতে বালকগণের শিক্ষাও কিছু হয় না, কেবল পুস্তক-প্রণেতার লাভ হয় মাত্র। পাঠ নাই বা হইল, পয়সা ত হইল! পৃথিবী কোথায় ঘুরে? এ সমুদায় কথা ভূগোলে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কল্পনামাত্র। পৃথিবী ঘুরে টাকার মধ্যে;

কিরূপে যে শিক্ষাবিভাগ এত পাঠ্য পুস্তক অনুমোদন করেন তাহা বুঝা কঠিন। তাহা বালকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে কেন? পূর্ব্বে আমাদের বাল্যকালে ৪। ৫ খানি মাত্র পাঠ্য পুস্তক থাকিত, এবং সেই পুস্তক গুলিতে ৩।৪ পুরুষ চলিয়া যাইত; কিন্তু আজকাল বৎসর বৎসর নূতন পুস্তক হইতেছে। গত বৎসরের পুস্তক এ বৎসর চলিবে না। পূর্ব্বে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের তৃতীয়-ভাগ, ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের চারুপাঠ, ৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যপাঠ, ৺প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের First, Second, Third Book of Reading, Lenies ও Hiley's Grammar, Blockman's Geography কেমন সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ পুস্তক ছিল। এখনকার পুস্তকে সেরূপ শিক্ষাপ্রদ বিষয় আছে কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রথম হইতেই পিতামাতাকে ভক্তি করিতে, ভাইভগিনীদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের পুস্তকেও তাই ছিল। কিন্তু এখনকার পুস্তকে সেরূপ সদুপদেশ দেখা যায় না। এত পুস্তকের বিষয়, একটি বালকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে না—ইহাতে মস্তিষ্ক চিরদিনের জন্য অসার হয়, স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। কেবল যে বালকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় তাহা নহে, সে বালকের বংশ-পরম্পরা চিররোগী হয়। তাহার ফল এই যে,—

"——মুষলং কুলনাশনম্॥"

মহাভারতে—মৌষল পর্ব্বণি ১। ১৯

পুত্র লেখা পড়া শিখিলে পুত্রের বিবাহ দিবার সময়ে তাহার পিতা কন্যার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করেন না। কতদিনে যে এই নির্লজ্জতা দূর হইবে তাহা লীলাময়ই জানেন। পিতামাতার কষ্ট দেখিয়া বালিকা-গণও আত্মহত্যা করিতেছে, তথাপি নৃশংস পুত্রের পিতার চৈতন্য নাই! এখানে একটি স্ত্রীলোকের কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমার কনিষ্ঠা কন্যা নরেশনন্দিনীর সম্বন্ধ করিতে আমাদের গ্রামের নিকটে (ঝিক্‌নাড়া গ্রামে) শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর নিকটে গিয়া "কত লইবেন" জিজ্ঞাসা করায় তিনি অনায়াসেই কহিয়াছিলেন "টাকার জন্য কি হচ্চে?" তিনি নেওড়নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথ-নাথ সেন মহাশয়ের পত্নী। প্রমথ বাবু এক্ষণ পাটনায় রেলী ব্রাদার্সের এজেণ্ট। যেমন ধন, তেমন মন। ধন থাকিলেও হয় না—এরূপ অর্থপিশাচ দেখিয়াছি যে আত্মীয়কে একবেলা অন্ন দেন না; কিন্তু প্রমথ বাবু পুত্রশোকাতুরা

আমার পত্নীর মনের শান্তির জন্য তাঁহাকে, আমাকে ও আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে নিজের খরচে লইয়া গিয়া কত তীর্থ দর্শন করাইয়া আনিলেন। হায়! অর্থগৃধ্নু পুত্রের পিতার একটি স্ত্রীলোকের হৃদয়েরও অভাব! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এ উভয়ের তুলনায় দেবও পিশাচ কিম্বা স্বর্গও নরক হয় না কি? স্বর্গ আর কোথায়? যথায় মনের শান্তি তথায়ই স্বর্গ; স্বর্গ বলিয়া কাল্পনিক স্থান নাই কিম্বা পুরাণবর্ণিত স্থান নাই—ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার মাতাকে কহিয়াছিলেন যে এই সংসারেই স্বর্গ ও নরক উভয়ই আছে। যিনি সুখে থাকেন তিনি স্বর্গে ও যিনি দুঃখে থাকেন, তিনি নরকে থাকেন,—

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥

মহাভারতে মৌষল পর্ব্বণি ১১। ১০। ২৬

সুতরাং স্বর্গ বলিয়া পৃথক্ স্থান নাই। যে স্থানে মনের শান্তি, তাহাই স্বর্গ—

দৌর্গ কাচিদথবাস্তি নিরূঢ়া
সৈব সা বলতি যত্র হি চিত্তম্॥

নৈষধ-চরিতে ৫। ৫৭

যে শিক্ষায় পাঠকের স্বাস্থ্যহানি, তাহার বংশপরম্পরায় রোগ, কন্যার পিতাকে পথের ভিখারী করা—সেরূপ শিক্ষার কি প্রয়োজন বুঝি না। তবে পুত্রের পিতা বুঝিবেন, কারণ পুত্র রসাতলে যাউক, কন্যার পিতার নিকট হইতে টাকা আদায় লইয়া বিষয়। তাহাতে কন্যার পিতা পথের ভিখারী হইলেই বা কি? ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র এবং দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল, তাহাতেও ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন—কন্যা দুঃখের জন্য হইয়া থাকে—

কৃচ্ছ্রন্তু দুহিতা কিল।।

মহাভারতে আদিপর্ব্বণি ১৬১। ১১

কন্যা দুঃখের, তাহা অন্যত্রও কথিত হইয়াছে যথা—

সখা হ জায়া কৃপণং হ দুহিতা জ্যোতির্হ পুত্রঃ——।"

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ৭ পঞ্জিকায়াং ৩। ১

কিন্তু যে কন্যা না হইলে লোকের বংশ থাকিবে না—বংশ না দেখিয়া পিতৃপুরুষ চক্ষুর জল ফেলিবেন—

মৎপরং দুর্লভং মত্বা নূনমাবর্জ্জিতং ময়া।
পয়ঃ পূর্ব্বৈঃ স্বনিঃশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে॥

রঘুবংশে ১। ৬৭

অন্যত্র—

অস্মাৎপরং বত যথাশ্রুতি সংহিতানি
কো নঃ কুলে নিবপনানি করিষ্যতীতি।
নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং
ধৌতাশ্রুসেকমুদকং পিতরঃ পিবন্তি॥

শকুন্তলে ৬ অঙ্কে।

সে কন্যার প্রতি এত ঘৃণা কেন বুঝা যায় না। বক্তা কি কোন লোকের কন্যার গর্ভজাত নহেন? কন্যা না হইলে যে সৃষ্টিলোপ হইবে! এতজ্জন্য কন্যাকে বরং যত্ন করাই কর্ত্তব্য। শ্রী ও স্ত্রী। যে গৃহে স্ত্রীলোক নাই, সে গৃহে শ্রীও নাই—

শ্রিয়এতাঃ স্ত্রিয়োনাম সৎকার্য্যা ভূতিমিচ্ছতা।
পালিতা নিগৃহীতা চ শ্রীঃ স্ত্রীভ বতি ভারত॥

মহাভারতে আনুশাসনিক পর্ব্বণি ৪৬। ১৫

অন্যত্র—

শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ।

দক্ষ-সংহিতায়াং ৪ অধ্যায়ে।

যেস্থলে স্ত্রীলোক পূজিত হন, তথায় দেবতাগণও বিহার করেন—

পূজ্যা লালয়িতব্যাশ্চ স্ত্রিয়োনিত্যং জনাধিপ।
স্ত্রিয়ো যত্র চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ॥

আনুশাসনিক পর্ব্বণি ৪৬। ৫

পুত্রের অর্থ-পিশাচ পিতা, যখন নিজের পিণ্ড দিবার জন্য পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, তখন কন্যার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে একটু লজ্জাও হয় না? চক্ষু কি হীন! ভগবন্! এ সব পিশাচের কতদিনে সাধুমতি দিবেন? রাক্ষসী বৃত্তি দূর করিয়া কতদিনে মনুষ্যবৃত্তি দিবেন? পরের পীড়নের টাকায় বড় লোক হইতে সাধ যায়! ধন্য নরপিশাচ! মনুষ্যচর্ম্মাবৃত রাক্ষস! জানিবে একদিন মরিতে হইবে—

What is pomp, rule and reigen, but earth and dust ?
And live we here we can, yet die we must,
Shakspeare, King Henry VI (III Part) Act V, Sec II.

পরকে পীড়ন করিয়া অর্থ-সঞ্চয় করা পাপ, সে পাপ কর্ম্মটি সঙ্গে যাইবে—

যতনে যতেক ধন পাপে বঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥

বিদ্যাপতি—আত্মনিবেদনে।

অন্যত্র—

এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যৎ তু গচ্ছতি॥

মনুসংহিতায়াং ৮। ১৭

এ টাকা সঙ্গে যাইবে না, গেলেও এ টাকা সেখানে চলিবে না। সেখানে যে টাকা চলে, তাহা সঞ্চয় কর।

যমালয় এখান হইতে নিরানব্বই সহস্র যোজন পথ—

যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩। ৩০। ২৪

যদি গৃহ হইতে দুই ক্রোশ দূরে যাও, তাহা হইলে তথায় গিয়া কি খাইবে তাহা সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাও; কিন্তু এতদূর পথ যে যাইতে হইবে, তাহার সঞ্চয় কি করিতেছ, সে চিন্তার উদয় হয় কি ?

গব্যূতিমাত্রং যদি যাতি মানবো
বধ্নাতি কুক্ষৌ যবশক্তু সম্বলম্।
অহোতিমূঢ়ো ন করোতু সম্বলং
গন্তুং নবাশীতি সহস্র যোজনম্॥ (১)

সুতরাং সে পাথেয় সঞ্চয় কর।

মনুষ্য-জীবন ত ক্ষণভঙ্গুর—

অহোহ্যনিত্যং মানুষ্যং জলবুদ্বুদচঞ্চলম্॥

মহাভারতে দ্রোণ-পর্ব্বণি ৭৮ অধ্যায়ে। ১৭

(১) শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন যে, যমালয় এস্থান হইতে ৯৯ সহস্র যোজন, এখানে কহিতেছেন ৮৯ সহস্র যোজন; তাহা হইলে তাহার সমাধান কি ? নবাশীতি = নব + অ + অশীতি; অ = ১০, "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" নিয়মে ৯৯।

অন্যত্র—

মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে ॥

শুদ্ধিতত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনম্ (শোকাপনোদনাদি-প্রকরণে)

এ শরীরও অমেধ্য—

অস্থিস্থূর্ণং স্নায়ুযুতং মাংস-শোণিত-লেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ ॥
জরা-শোক-সমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমসন্নিষ্ঠং ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ ॥ (১)

শান্তিপর্ব্বণি ৩২৯। ৪২-৪৩ ; মনুসংহিতায়াং ৬। ৭৬-৭৭
সাংখ্যদর্শনে ৩। ৭২ সূত্র ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।

অন্যত্র—

মাংসাসৃক্-পূয়-বিন্মূত্র-স্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহেচেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১। ১৭। ৬৩

অন্যত্র—

মেদোঽস্থি মাংসমজ্জাসৃক্-সঙ্ঘাতেঽস্মিন্ ত্বচাবৃতে।
শরীরে ব্রাস্তি কা শোভা সদা বীভৎসদর্শনে ॥

নাগানন্দে ৫ অঙ্কে

অন্যত্র—

ইমং চর্ম্মপুটং তাবৎ স্ববুদ্ধ্যৈব পৃথক্ কুরু।
অস্থিপঞ্জরতো মাংসং প্রজ্ঞা-শস্ত্রেণ মোচয় ॥
অস্থীণ্যপি পৃথক্ কৃত্বা পশ্যমজ্জানমন্ততঃ।
কিমত্র সারমস্তীতি স্বয়মেব বিচারয় ॥

বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকায়াং ৫। ৬২-৬৩

যমালয়ে নরক কল্পনা করিতে হয়, কিন্তু শরীর প্রত্যক্ষ নরক—

কোবাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহঃ ॥

মণিরত্নমালায়াং।

(১) শান্তিপর্ব্বণি "ত্যজ" ; মনুসংহিতায়াং "ত্যজেৎ।" লেখক।

মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের মিলন কিছু সময়ের জন্য ; সুতরাং এ অসার দেহে মায়া করা ও তজ্জন্য পাপ করা কর্ত্তব্য নহে—

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহাদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ ভূতসমাগমঃ॥

শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মে ১৭৪। ১৬

অন্যত্র—

নেহচাত্যন্তসম্বাসঃ কর্হিচিৎ কেনচিৎ সহ।
রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ।

শ্রীভাগবতে ১০। ৪৯। ২০

অন্যত্র—

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥

ঐ ১১। ১৭। ৫৩

অন্যত্র—

নৈকত্র প্রিয়সম্বাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ম্মণাম্।
ওঘেন বুহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা॥

শ্রীভাগবতে ১০। ৫। ২৫

অন্যত্র—

ভূতানামিহ সম্বাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে।
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্ম্মভিঃ॥

ঐ ৭। ২। ২১

সুতরাং নররাক্ষস! এই সমুদায় চিন্তা করিয়া কন্যার পিতাকে পীড়ন না করিয়া, তিনি যাহা দিতে পারেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে। পাপ-ভয় করিবে। কন্যাপক্ষ হইতে কিছুই না লইয়া পার, যাহাতে তাহারই চেষ্টা করিবে ; কারণ পুত্র তোমার মৃত্যুতে তোমাকে খাদ্য ও জল দিয়া শীতল করিবে।

A paper on the chronology of Kalidasa read before the Jessore Literary Association.

লেখক—শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, ই।

I think it is my duty to inform you at the outset that you should not expect any rich dish suited to your palate in my country confectionery. Accustomed to the treat of learned discourses of far worthier men, you are bound to be disappointed if you expect any thing from me which will give you the same amount of pleasure. The subject is comprehensive and the last word has not yet been said about it. But my powers are limited and quite unequal to the task to which they have been employed. Now rising to speak, I am feeling the full weight of the duty imposed upon me. Thus it is with an oppressive sense of diffidence that I stand here to read my paper on the chronology of Kalidasa. But before I commence to read it, I crave your indulgence to allow me to make some introductory remarks which will help you to easily grasp the salient features of the arguments advanced in the essay to establish the age of the poet.

Indian classical poetry can be divided into two distinct sections, viz. natural and atrficial. In the nebulous period of our History, in the remotest period of antiquity which may be called the dawn of human civilisation, our first warblers performed sacrifices, composed and sang their sweet songs, which were the expressions of yearnings of their fluttering hearts for communion with the Eternal. Children of Nature, reared up in its nursery, they were men pure in mind and body, of simple habits and of lofty ideals. There was no touch of artificiality about them and their composition bears the stamp of their environments. This was not done by a man in a day or at a time. It took generations and host of sages to produce what constitutes the Indian natural poetry or vedic literature.

Enormous length of time passed. The old order changed giving place to the new. Civilisation made steady progress, kingdoms with capitals were established and we find onrselves amidst the pomp and glitter of the court life. Habits and customs of the people changed

Seriousness and earnestness gave way to frivolity, gaiety and artificiality. The peoples began to think in lighter vein. It is but natural to expect that national literature should receive the full impact of this rising tide of national sentiment. In the midst of such a surrounding, flourished the great poet, the gifted son of the Muse, whose works are the enduring monument of his undying fame. History tells us that the kings were great patrons of learning and that the artificial court poetry received great impetus from successive sovereigns of different periods, all of whom had their favourite court poets, Standing in the centre of the galaxy of brilliant set of classical poets is Kalidasa whose age we are now going to discuss.

CHRONOLOGY OF KALIDASA.

Kalidasa is undoutbedly "the brightest star in the firmament of Indian artificial poetry" and it is an abiding name in the history of Indian Literature. Naturally every reader of his works wants to know something of the biographical history of the great poet whose productions constitute an integral part of the national literature of our country. But unfortunately very little is known of the great poet whose works are read in original in many civilised countries of the world. The determination of his age has been the subject of unceasing wrangle between the antiquarians of different countries and though no unanimous verdict has yet been pronounced, the trend of general opinion is to place him in the first half of the fifth century A. D, while the Indian tradition puts the date back to first century B. C. We give below a few extracts of opinion bearing on the point.

INDIAN TRADITION,

The Indian tradition holds that there was a King Vikramaditya who founded the era after his name known as Sambat era in the year 57 B. C., the current year of the era being 1982 from its origin, The mighty king was a great patron of learning and nine famous men of genius (gems) representatives of every branch of culture used to grace his court by their presence, and that the poet Kalidasa was one of them.

The Sloka

ধম্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ ররুচি নর্ব বিক্রমস্য ॥

of Jyotirvidavaranam, gives the names of these savants,

DIFFERENT OPINIONS.

(1) The Cambridge History of India tells us that "While it is possible, nay even probable that there may have been a Vikramaditya who expelled the Sakas from Ujjayini in the first century B, C, it is certain that the monarch who finally crushed the Saka power in his reign was the Gupta emperor Chandra Gupta II Vikramaditya (380-414 A, D,) the royal patron of Kalidasa"

Cambridge History of India P, 533

(2) V, A, Smith writes in his history that "it is now established that Kalidasa lived and wrote in the fifth century, his literary activities extending over a long period ; it is probable that he began to write either late in the reign of Chandra Gupta II Vikramaditya or early in the reign of Kumar Gupta I (413—55 A. D.)

(3) Fergusson in his History of Indian Architecture writes that "The Gupta power seems to have given way before the inroads of the Sakas or Huns, * * * * *

The Rajatarangini describes Vikramaditya Harsa of Ujjayini as the sole sovereign of India, the destroyer of the Sakas and patron of poets, who placed Matrigupta on the throne of Kashmir. It is possible that Yasodharman and Vikramaditya are only titles of the same sovereign who may have ruled till 550 A. D. or thereabout. Vol, I, P, 24

Referring to Fleet's memoir in the Journal of the Roya Asiatic Society he says "It now seems almost certain that Kaniskha's reign began in B. C. 58, the epoch of what was once known as the Malava era and later as the Vikramasamyat"

Vol. II. P. 29.

(4) We see from the Encyclopaedia Britanica that " the extremely corrupt form of the Prakrita spoken by the women and the subordinate characters in his plays as compared with certain inscriptions of a certain age led such authorities as Weber and Lassen to agree in fixing on the third century A, D, as the approximate period to which the writings of Kalidasa should be referred,

11th Edn. Vol. 15. P. 641

(5) Max Muller referring to a memoir published by Fleet in Indian Antiquary says " Kalidasa is mentioned with Bharabi as a famous poet in an inscription dated A. D. 585-96 and for the present I see no reason to place him much earlier.

India and what it can teach us Page 91.

(6) Professor Macdonell places Kalidasa in the beginning of the fifth century A. D. He says" A very important inscription dates from the year 529 of the Malava era, or A. D. 473.

A detailed examination of this inscription not only leads to the conclusion that in the fifth century, a rich " Kavya ; literature must have existed, but in particular shows that the poem (of the inscription) has several affinities with Kalidasa's writings.

The reign of Chandra Gupta Vikramaditya II in the beginning of the fifth century A. D. therefore seems in the meantime the most probable approximate date for India's greatest poet.

History of Sanskrit Literature P. 391

He further says that Epigraphy not merely confirms the evidence of Mahavashya that artificial court poetry originated before the commencement of our era but that poetry continued to be cultivated throughout the succeeding centuries.

The researches of late professor Buhler and of Mr. Fleet render untenable professor Max Muller's well-known theory of Renaissance of Sanskrit literature. This renaissance theory is based on Fergusson's ingenious chronological hypothesis that a supposed king Vikram of Ujjayini having expelled the scythians (sakas) from India, in commemoration of his victory founded the Vikram era in 544 A. D. dating its commencement back 500 years to 57 B. C."

History of Sanskrit literature, P. 323.

(7) Sir William Jones accepts the view of the Indian tradition and places Kalidasa in the first century B. C.

(8) Mr. Bentley supposes Kalidasa to have flourished in the 11th century A. D. in the reign of Raja Bhoja surnamed Vikramaditya.

(9) Monseiur Fauche holds that the poet lived in the 8th century B. C.

It is needless to quote more opinion or this nature. Opinions of scholars differ widely and some of their references have very little evidentiary values while most of their opinions destry each other. Opinion such as that of Mr. Bentley who places Kalidasa in the 11 th century of the Christian era and that of the French Savant Fauche who places him in the eigth century before Christ must be regarded with great suspicion. Many of the results of the so-called researches for determining the age of India's greatest poet are mere specimens of chronological inexactitude, do not throw any light upon the subject and rather make the problem more confusing.

The truth underlying the Indian tradition regarding the age of the poet has been challenged on two grounds given below.

(a) The Epigraphical researches disclose the fact that certain inscriptions dated 414 to 612 A. D. discovered at Budha Gaya mention the name of Amardeva who is supposed to be the great lexicographer Amarsinha, one of the nine gems of the king Vikram's court. Amarkosa is thus supposed to have been written in about 500 A.D. so Kalidasa, the contemporary of Amarshinha must have lived in that time.

(b) Barahamihira, the great Astronomer and, Astrologer, the author of বৃহৎসংহিতা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, is said to have died in 587 A. D. by one of his commentators. As he is one of the nine gems of the court of Vikramaditya, Kalidasa being his contemporary must have lived in the sixth century A. D.

It is not at all difficult to show that there is very little force in those agruments.

(a) The name of Amardeva appears in the inscription of Budhagya, but what evidence is there to prove that Amardeva wrote Amarkosa so that he can be identified with Amarsingha ?

(b) Where is the proof that there was no Astronomer of much earlier age of the name Baraha-Mihir who might be the author of any of the four inspired Shiddhanta treatises mentioned by Abul Fazel in his great work "the Institutes of Akber" Viz. ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত and বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত ?

The works of Baraha-Mihir are mostly astrological. His পঞ্চসিদ্ধান্তিকা is a "করণ" treatise indicating that it is a practical compendium, a second class work in order of merit, compiled from the original

Shiddhanta. So he may not be the brilliant Astronomer Royal of the king Vikram and the colleague of Kalidasa. There is no reference in his works that he is a contemporary of Kalidasa.

It may be seen from the opinions quoted above that most of them hardly follow the canons of logical syllogism. Objections can be raised against each of the arguments stated above.

OBJECTIONS AGAINST THE CURRENT THEORIES.

(a) Where is the proof that Vikramaditya of the first century B. C. who defeated the Sakas was not a patron of learning and culture ? On the other hand we have the evidence of Mahavashya that Kavya must have flourished before the beginning of the Christian era. What is the harm then to associate Kalidasa with this king Vikram of the 1st century B. C.

(b) Kalidasa's form of প্রাকৃত was in vogue in the 3rd century A. D. What is the objection to suppose that it existed in the same form 300 years earlier ?

(c) Evidence of Rajtarangini as quoted by Fergusson is a mere belief, so no argument is necessary to refute it.

(d) Kalidasa and Varabi are mentioned in the same inscription dated 585-86 A. D. But will it be very unnatural, if any literary society of the present day builds a memorial obelisk in honour of the great masters of Indian poetry and mention the name of Valmiki and Kalidasa together in an inscription dated 1925 A. D.? Will the future antiquarians be justified in supposing therefrom that both these poets flourished in the twentieth century of the Christian era ?

(e) A Mandasor inscription dated 5th century A. D. contains a poem similar to that of Kalidasa and that a arich Kavya literature flourished at that time, are poor arguments to fix the date of Kalidasa, Is it impossible for a scholar to produce a few slokas in imitation of the style of any poet of however distant age he may be and Is it not clear from the evidence of Mahavashya quoted above that Kavya literature was in flourshing condition before the commencement of the Chrishian era ?

OTHER ARGUMENTS ON THE POINT.

Another objection has been raised as to how Vikramaditya living in the 6th century could inaugurate Samvat era commencing

from 57 B. C. to commemorate his victory over the Sakas. Here Mr. Fergusson comes to the rescue and says that the king Vikram founded the era in 544 A. D. but dated its commencement back from the 1st century B. C. (though the object was to commemorate his victory dated 544 A. D.) Dr. Fergusson's Vikramaditya must have been suffering from mental aberration to act in such a quixotic manner and seems to be quite unlike the great patron of culture and learning.

Professor Max Muller upholds this ingenious hypothesis. But the Epigraphical researches of Mr. Fleet have destroyed Fergussno's theory. From the researches it results that Vikram era of 57 B. C. far from having been founded in 544 A. D. had already been in use for more than a century previous under the name of Malava era and that Sakas were already driven out from western India by the Gupta kings more than a century ago."

Attempts have been made to solve the problem by means of inteternal evidence from the writings of the great poet.

From the remarks of Mallinath in his notes to the fourteenth stanza of পূর্ব্বমেঘঃ ! ending with

স্থানাৎ অস্মাৎ সরসনিচুলাৎ উৎপতোদঙ্‌মুখঃ খং,

দিঙ্‌নাগানাং পথিপরিহরণ স্থূলহস্তাবলেপান্‌ ।

Professor Max Muller thinks that Kalidasa flourished in the middle of the sixth century. The fourteenth century commentator thinks there is a pun in this sloka and writes "রসিকো নিচুলো নাম কবিঃ কালিদাসস্য সহাধ্যায়ঃ—দিঙ্‌নাগাচার্য্যস্য কালিদাস প্রতিপক্ষস্য হস্তাবলেপান্‌" ।

According to Mallinath নিচুল was the friend of Kalidasa who used to defend him from the attacks of দিঙ্‌নাগ a Budhist teacher of the sixth century. If দিঙ্‌নাগ was the antagonist, then why his name has been used in the plural nnmber ? Professor Max Muller's theory has been challenged by professor Macdonell who has shown that if দিঙ্‌নাগ is the Budhist teacher at all he must have lived in an age much earlier to the 4th century A. D. and his argument leaves the question still open.

Referring to sloka 40 in canto XIV of Raghubamsam

অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু

লোকাপবাদো বলবান্‌ মতো মে ।

ছায়াহি ভূমেঃ শশিনো মলত্বে
নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ ॥

it has been said that Kalidasa must have acquired this astronomical knowledge from the writings of Aryabhatta who was born in Pataliputra in 426 A. D. as he tells himself. He wrote a করণ treatise in the fifth century (A. D. 499). As a matter of fact this sloka involves no astronomical knowledge at all. The poet says here that the shadow of the earth upon the moon is taken by the people as the spots of the moon. Similar ideas occur in the Purana.

We find in the Brahma Purana পর্ব্বকালে তু সংপ্রাপ্তে চন্দ্রার্কৌ ছাদয়িষ্যতি ভূমিচ্ছায়াগতশ্চন্দ্রং চন্দ্রগোঽর্কং কদাচন।

We find in আর্য্যভট্টীয়ম্

চ্ছাদয়তি শশীসূর্য্যং শশিনং মহতীচ ভূচ্ছায়া ॥

This is only an echo of the quotation from Brahma Purana, a work quite well-known to the poet as he took the story of Kumar Sambhabam from it. Even if the sloka refers to spots of the moon, the idea is his own and not of Aryabhatta at any rate. So it was not necessary for Kalidasa to be born after Aryabhatta to acquire this so-called astronomical knowledge.

Even supposing that astronomical knowledge was necessary to write this sloka, Kalidasa could have got the information from any of the four inspired Siddhantas mentioned before which are supposed to be very old.

Limited space at our disposal does not permit us to go into further details or to indulge in lengthy disquisition on the other theories on the subject. Any one willing to get fuller information is referred to the introductory notes on the age of Kalidasa of Professor Roy Vidyabinode of Calcutta to his edition of Abhijnana Sakuntalam. It is a pleasure to see the masterly style in which the Veteran Professor has piled evidence upon evidence, forging each link on the anvil of facts, drawing materials from every conceiveable sources viz, Epigraphy, Astronomy, Archaology, History and internal evidence consisting of style, language and grammar of the writing of the great poet. The cumulative effect seems to be conclusive and the inference is irresistible and leaves very little room for doubt that the poet lived in the first or second century B. C.

Internal Evidence.

Of the internal evidences, the learned Professor in his usual critical manner has pointed out instances in the writings of Kalidasa which would be ungrammatical forms, if tested by the rules of Panini, Mahabhashya and Varttika, but would be allowable in ছন্দস্ or Vedic literature. Forms like ত্রিয়ম্বক or মন্দংমন্দং are not sanctioned by the Paninian rules. The expression "প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার" Raghu XIII is another instance of this nature. The affix আম্ comes by the rule "কাস্ প্রত্যয়াদ্ আম অমন্ত্রে লিটি" পা। The Varttika says "কাস্যনে কাজ্ গ্রহণং কর্ত্তব্যম্"। The প্রত্যাহার 'কৃ' is added by the rule "কৃঞ্ চাহনুপ্রযুজ্যতে লিটি" পা।

According to Katyayana the affix only comes after Polysyllabic roots (অনেকাচ) and the প্রত্যাহার rule holds that the sense of the auxilliary and that of the আম্ ending verbs coalesce into one individual sense and that they are syntactically indissoluble The poet has disregarded these injunctions. The evidence of language also corroborates the idea that Kalidasa wrote his epics during the transition period when the ছন্দস্ literature was being cast in the rigid mould of Panini to produce the sanskrit literature.

Professor Cowell referring to parallelism of ideas that occur in Buddha-Charita of Asvaghosh, and in Kalidasa's Raghubamsam and Kumarsambhabam slokas 5 to 10 and 56 to 65 Canto VI & VII respectively holds that Kalidasa borrowed these ideas from the Buddhist poet who lived in the first century A. D.

Professor Roy in an elaborate analysis has established the fact that Asvaghosh took his ideas from Kalidasa and as Asvaghosh lived in the first century A. D. Kalidasa may be placed about a hundred years back in the first century B. C.

The evidence of Bhita medallion given by Professor Roy ought to be conclusive. The beautiful terracotta medallion supposed to belong to the Sunga kings who ruled at Pataliputra in the second century B. C. found by Mr. Marshal at Bhita near Allahabad contains the well known Scene of Sakuntala described by the sloka commencing with ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্।

The king (Dushyanta) and his charioteer are there and being entreated by the hermit not to kill the gazell. There is the hermitage and there is a lady (Sakuntala) watering the plants.

(To be continued.)

উচ্ছ্বাস।

(আকাশের প্রতি)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—সম্পাদক।

(২১)

হে আকাশ,

নহি আমি জাতিস্মর,
নাহি জানি আবির্ভাব,
নাহি জানি কোন্ দিন
হবে মম তিরোভাব। ১

জানি ধ্রুব এ দেহের
মম হইবে পতন,
নাহি জানি সুনিশ্চয়
মম উত্তর জনম। ২

ঐ যে শোভিছে বিটপী,
মম নেত্র-তৃপ্তিকর,
ওকি পাইবে জনম,
পুনঃ মরণের পর ? ৩

একই তরুর দেখি,
শত সহস্র সন্ততি,
একের বিনাশে নাহি,
বুঝি কারো কোন ক্ষতি। ৪

ঐ যে দেখি গাভীটি
দাঁড়িয়ে সম্মুখে মোর,
দেহান্তে জনম পুনঃ
কভু হবে কিহে ওর ? ৫

একের বিনাশে বিশ্বে,
নাহি হয় কোন হানি,
এক দেহ হ'তে দেখি,
জন্মে বহুল পরাণী। ৬

ঐ যে দেখি বিহঙ্গম
বসে আছে তরু-ডালে,
দেহান্তে জনম পুনঃ
আছে কি ওর কপালে ?

সৃষ্টির প্রবাহ তবু
রবে সদা প্রবাহিত
হ'ক না সে বিশ্ব হ'তে,
একেবারে তিরোহিত। ৮

আত্মা কি হে শুধু রাজে—
এই মানব-শরীরে ?
অথবা একই আত্মা
সর্ব্বত্র বিরাজ করে ? ৯

অখিল বিশ্বের মাঝে
শুধু মরে না মানব,
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব
আছে কি হে জানা তব ? ১০

নীরবে শুনিতে তব
প্রভাতী সঙ্গীত,
জেগে আছি সারানিশি
হইয়া স্তম্ভিত। ১১

ব্রহ্মচর্য্য।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তর্কবাগীশ।

কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ-বিক্ষেপ প্রাণিমাত্রকেই দুশ্চিন্তা-নিশাচরীর করাল-কবলে নিষ্পেষণ করিতে থাকে, তাই জীবগণ দুর্দ্দশার জ্বালামালাময় অঙ্কে প্রবেশ করিয়া দারুণ সন্তাপে দহ্যমানহৃদয়ে নিরন্তর ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। অধিকন্তু মর্ম্মোচ্ছেদকর সকরুণ দুঃখময় আর্ত্তনাদে এ জগৎকে দুঃখমহার্ণবের ভয়ঙ্কর সলিল-প্রবাহে মগ্ন করিয়া থাকে। "হায় শান্তি, কোথা শান্তি, কিরূপে শান্তি লাভ করিব, শান্তির শীতল সলিল-সিঞ্চনে দাবদাহময় মরুসদৃশ আমার দগ্ধ হৃদয়কে কে শান্ত করিবে?" ইত্যাদি বিলাপমিশ্রিত উষ্ণাশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত করিয়া তুলে। দুঃখানল-সন্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে জলনিধির প্রশান্ত গম্ভীর হৃদয়কে উদ্বেলিত করে।

আজ মনুষ্য-সমাজ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কঠোর রোগ সকলের অপ্রতিহত প্রভাবে নিতান্ত নিপীড়িত হওয়ায় ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে। আজ শারীরিক শক্তির অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদিগের কুলক্রমাগত কৃষি-সম্পাদন-নৈপুণ্য চিরকালের জন্য ধরাধাম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছে। তাই ভারতীয় শিশুগণ যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই বিগত-যৌবনের ন্যায় আলস্য-বিজড়িত ক্ষীণদেহে নিরাশা ও নিরুৎসাহের একমাত্র আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দৈহিক অসুস্থতা-সোপানে পদবিন্যাস করিয়া দুশ্চিন্তা-পিশাচীও মানব-মনোমন্দিরে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিল। তাই আজ মনুষ্য-সমাজে দারুণ চিত্তবিক্ষেপ সম্যগ্‌রূপে স্বীয় প্রভাব-প্রসারণে অণুমাত্র সঙ্কোচ করিতেছে না। সুতরাং উদ্বিগ্নচিত্ত মনুষ্যমাত্রই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকবিহীন হইয়াছে। তাই তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া নিজেরাও প্রতিপদে অনন্ত দুঃখাম্ভোধির অতলতলে মগ্ন হইতেছে।

তাই আমরা ভর্ত্তৃবিরহবিধুরা কোমলহৃদয়া ষোড়শীবালার হৃন্মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনে মঙ্গলময় বঙ্গভূমির বিমল অপাঙ্গে শোককালিমার মলিন রেখা অঙ্কিত দেখি, লুপ্তশক্তি বিপ্রগণ ত্রয়ীর পর্য্যালোচনা বর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া দ্বিজ-রাজের নির্ম্মলাঙ্কে শশ-অঙ্কের শঙ্কা করিয়া থাকি। শারীর শক্তিক্ষয়টী মান-সিক শক্তিনাশ-সহচর বলিয়াম ানসিক শক্তির বিলোপের পরেই মানুষ শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে। তাই আজ সংসার-পোষণ-ক্ষম যুবকপুত্রের অকালে

লোকান্তরপ্রাপ্তিতে ক্লিষ্ট বৃদ্ধ জনকের দুর্বিবষহ হাহাকারে সমগ্র পৃথিবী শোকময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাই আজ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন্দময় অঙ্ক-মণ্ডন শিশু-সন্তানের অসময়ে সংসার-সম্বন্ধের বিচ্ছেদ উপলব্ধি করিয়া সুতবৎসলা জননী বক্ষে করাঘাত করিয়া দুঃখ-বিলাপে সমগ্র জগৎকে শোকধূলিপটলে মলিন করিতেছে। তাই আজ আপামর সাধারণ ব্যক্তিমাত্রই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সারবত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া শাস্ত্রাঙ্গে স্বকপোল কল্পিত অনার্য্যজন-পরিশীলিত অযশঃ-কালিমা লেপন করিতে অণুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তাই আজ স্মার্ত্ত ও বৈদিকধর্ম্ম কিংবা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্মস্থল-নিহিত সূক্ষ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া লোকায়তিক মতের অনুসরণে "কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত" প্রভৃতি কঠোর বাগ্‌বজ্র নিক্ষেপে ধর্ম্মের অন্তঃকরণের অন্তস্তল ভেদ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। কিন্তু কেহই একটীবার মাত্র চিন্তা করিয়া দেখে না, কেন আজ চিরসুখময় ভারতভূমির পরমানন্দময় অন্তরের অন্তস্তলে দুঃখ-সাগরের বিপুল লহরীমালা প্রবলপ্রতাপে প্রসার লাভ করিল? কেন আজ চিরশান্তিময় সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নির্ম্মল কলেবরে অশান্তির দাবদাহ সহসা জ্বলিয়া উঠিল? কেন আজ চিরপ্রশান্ত গম্ভীরপ্রকৃতি আর্য্যসমাজের অচিন্তনীয় মনঃক্ষোভ উদিত হইল? কেন আজ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিদিগের পবিত্র বংশধরগণের পুণ্য কুটীরে বিশ্বজনমনোমোহন মধুর সামগান আমাদের কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত করে না? কেন তাঁহারা নিজ নিজ যশঃপ্রভাকরকে চিরকালের জন্য প্রভাবিহীন করিয়া দীনতা-সিংহিকাসুতের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিল?

কেন আজ মহাশক্তি আর্য্যগণের শক্তি-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-সন্তানগণের আনন্দময় হৃদয়-কন্দরে নিরানন্দ অন্ধকারের অবিনাশি-প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই? একটু গবেষণা করিলেই উপলব্ধি হইবে ইহার একমাত্র নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য-বস্তুর অভাব। যে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে মানবসমাজে আজ প্রতিগৃহে দুর্দ্দশার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে দর্শকের হৃদয়ে দারুণ বিভীষিকার সঞ্চার হইতেছে, দুঃখের প্রসারিত বিশাল বাহুদ্বয়ের নিষ্পেষণে মনুষ্যমাত্রই ব্যথিতপ্রাণে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনে ধরাতলকে আকুলিত ও ধ্বনিত করিতেছে, যে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আজ লোক-প্রীতিকর আনন্দময় সোণার সংসার ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, সেই ব্রহ্মচর্য্য-বস্তুটি কি? ত্রিকালদর্শী মহর্ষিবৃন্দ অব্যাহতজ্যোতি আর্ষ নয়নে মানবজীবনে প্রকর্ষলাভের জন্য যে সকল বস্তু আদর্শরূপে দর্শন করাইয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গোপেত ব্রহ্মচর্য্য তাহার অবিনাশি-বিশাল-প্রতিষ্ঠা-

স্থাপনের সর্ব্বপ্রধান সাধন ব্রহ্মচর্য্যই বা কি? এই সন্দেহ-তমসাচ্ছন্ন মানসে আনন্দালোক-প্রকাশের জন্য জড়মতি প্রবন্ধকার এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধে নিবন্ধরূপে নির্ণয় করিতে চেষ্টিত হইল। মঙ্গলময় জগন্নিয়ন্তার সকরুণ অপাঙ্গের সুন্দর বিক্ষেপে একজন শ্রোতার হৃদয়েও এই সামান্য বস্তু দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে মাদৃশ অকিঞ্চন জনের পরিশ্রমের সাফল্য সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইবে।

প্রতিদিন স্নান, পবিত্রাচারে অবস্থান, দেবতা ঋষি পিতৃপুরুষের তর্পণ ও অর্চ্চনা, মদ্য ও মাংসাদি সর্ব্ববিধ মাংস, গন্ধ, মাল্য, মত্ততাজনক যাবতীয় বস্তুর পরিত্যাগ, প্রাণিহিংসা, তৈলাভ্যঙ্গ, নেত্রাঞ্জন, চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দ্যূতাদি সর্ব্ববিধ ক্রীড়া, বহুজন-সংসর্গ, পরনিন্দা, মনুষ্যের কথা, মিথ্যাবাক্য, পরকে আঘাত করা, পরের মর্ম্মবেদনাদায়ক বাক্য, মিথ্যাচার, রমণীজন-সন্দর্শন স্পর্শন ও সম্ভাষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ মৈথুন প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের সংযমরূপই ব্রহ্মচর্য্য পদার্থ শাস্ত্রকারদিগের সম্মত। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন— "নিত্যস্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষি-পিতৃতর্পণম্। বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধ্যং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ। শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্। অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষোরুপানচ্ছত্রধারণম্। কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্। দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদস্তথানৃতম্। স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতম্পরস্য চ॥" ইত্যাদি।

চিত্তের দৃঢ়তা-স্থাপনের জন্য পূতসলিলে স্নান ও অবগাহন, পবিত্র আচার, পবিত্রভাবে অবস্থান, পূতবস্ত্র-পরিধান, পবিত্র চরিতাবলীর অনুশীলন, পবিত্র গ্রন্থরাজির অধ্যয়ন, পবিত্র উপদেশ পরম্পরার শ্রবণ ও তাহার যথার্থতার উপলব্ধি করা, নৃত্য গীত ও বাদ্যদূত প্রভৃতি ক্রীড়াসক্ত ব্যক্তিমাত্রের সম্বন্ধ পরিত্যাগ একান্ত প্রয়োজন। বিলাস ও ব্যসনরূপ পিশাচের করাল কবল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিলে কোন মহানুভব ব্যক্তিই চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। বহুক্ষেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসনে বিক্রীতসর্ব্বস্ব নিঃস্ব ব্যক্তিগণও পরানুগ্রহলব্ধ ভিক্ষামুষ্টি বিক্রয় করিয়া ব্যসনের সেই মহামোহময় দেহ সমালিঙ্গনের জন্য মহা ব্যাকুল হইয়া পড়ে। হায়! ব্যসন-পিশাচের কি মোহময়ী ছলনা!!

যে সকল হতবুদ্ধি মানব কলঙ্ক-তমোময়ী মদিরা-রাক্ষসীর সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছে তাহারা চিরকালের জন্য আত্মজ্ঞান, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, পবিত্রতা,

মহত্ব প্রভৃতি সাত্ত্বিক বৃত্তিনিচয়কে সজীব অবস্থায় হত্যা করিয়া নিখিল জীব হইতে আপনার বিশেষত্ব, জাতীয়তা, সদসদ্বিবেক, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত জন্মজন্মান্তরের জন্য যেন চিরনির্ব্বাসিত করিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বহু-লোক-সংসর্গ বারংবার সংঘটিত হইলে হয়ত তাহাদের অন্তঃকরণের অন্তস্তলনিহিত, ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন, অনার্য্যজন-পরিশীলিত, অনাচার-বিজৃম্ভিত, অপবিত্র, নিরর্গল, বর্ব্বরজনোচিত, নিকৃষ্ট ভাবগুলি ক্রমে ক্রমে ব্রততীর ন্যায় মানব-মনোমন্দিরে সুন্দররূপে প্রসার লাভ করিতে থাকে। সুতরাং "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" এই মহাজন-বাক্য চিন্তাপরায়ণ ধীমান ব্যক্তির হৃদয়ে কি অমৃতময় প্রবাহ আনিয়া দেয় তাহা কি আর বলিতে হইবে? যদিও ভগবৎ-পদারবিন্দ-দ্বন্দ্ব-বন্দনা-পরবশ নারায়ণ-স্তবাদি-গীতাবলী-শ্রবণে ভক্তবৃন্দের হৃদয়-মন্দিরে পবিত্র প্রেম-মন্দাকিনীর অমন্দ আনন্দ পীযূষ-ধারা সন্তাপ-সন্তান বিদূরিত করিয়া অবাঙ্‌মনসোগোচর তৃপ্তির প্রশান্ত সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রোদ্ভাসিত করে, তাহলেও প্রায়শঃ ভাব-বিবর্জ্জিত, আভাস-পরিবৃংহিত, তামস-পদসম্বলিত গীতাবলিই কলাকুশলতার নিমিত্ত সমগ্রজনগণের সর্ব্বতোভাবে প্রীতিপ্রদ বলিয়া সমাজে পরিগৃহীত, সমাদৃত, পূজিত ও সম্যগ্‌রূপে অনুশীলিত হইতেছে বলিয়া সর্ব্বথা পরিহার্য্য। তাই কোন কবি গাহিয়াছেন—"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে॥ ইতি"

ভোজনের ফলে ভুক্ত বস্তুর গুণাবলী ক্রমে ক্রমে পাক-পরিণতি-পরম্পরায় আমার দেহে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্ররূপে বিরাজ করে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই, বিজ্ঞানের ইহার বিরুদ্ধে প্রভাব-স্থাপনের ক্ষমতা নাই। ইহা বিশ্বস্রষ্টার অনির্ব্বচনীয় কৌশল। আমরা যদি লোভ-পরবশ হইয়া বা মোহের ছলনায় বঞ্চিত হইয়া রাজস-প্রভাব-বর্দ্ধক কোন মাংসাদি সেবনে নিরত হই, তাহা হইলে আমাদের চিত্তের চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইয়া অবশ্যই আমাদিগকে চিত্তস্থৈর্য্য হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে এবং আমরা অশেষ-পুণ্য-পরিণতি মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও মনুষ্যোচিত কার্য্যকলাপ হইতে বঞ্চিত হইয়া অজ্ঞান, জড়প্রায়, সংস্কারমাত্রজীবী কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদির করাল-কবলে নিষ্পেষিত হইয়া অচিন্তনীয় দুরন্ত হিংস্রাকারে পরিণত হইব। যদিও ঋষিদিগের মধুপর্কে "সমাংসো মধুপর্কঃ" দেখিতে পাই, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্য-পালন দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনে সফলকাম হইয়া যাহারা ভয়ঙ্কর ইন্দ্রিয়-সমূহকে জয় করিয়াছেন, কিংবা সংযম-

সাধনে জিতাত্ম হইয়া বিদ্যা-মহারত্নে ভূষিতশেখরে গুরুগৃহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহাদেরই জন্য উহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তামস-গুণ-বর্দ্ধক বস্তুসকল নিরন্তর পরিসেবিত হইলে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত তমোময়ী জড়তা আসিয়া মানবহৃদয়কে এরূপভাবে আবৃত করিয়া ফেলে যে তখন তাহার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়; যেমন নীলজলধরমালা আচ্ছাদিত নভোমণ্ডলে প্রাবৃষের দারুণ দুর্দ্দিনে সহস্র-ময়ূখ ভাস্করের দর্শন সুদূরপরাহত, তাহার সত্তাও সন্দিগ্ধানুমানের বিষয় বলিয়া মনে হয়। অতএব তাহার বিষয়ে যত্নবান্ ও দৃঢ়সঙ্কল্প না হইলে ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠা বামনের চন্দ্র ধরিবার আকাঙ্ক্ষার ন্যায় সর্ব্বতোভাবেই যে অসম্ভব, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।

বাক্যের সংযম না থাকিলে ব্রহ্মচর্য্য লাভ হইতে পারে না, কারণ মন ও শরীরের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি-সঞ্চয়ের লালসায় উদ্বেলিতহৃদয়ে বদ্ধ-পরিকর হইয়া মানবগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া থাকে, সে শক্তি অনির্ব্বচনীয় তেজঃ ভিন্ন আর কিছুই নহে; মানববৃন্দ যাহার প্রভাবে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার বিশাল প্রভাবকেও অনায়াসে অতিক্রম করিয়া অবলীলাক্রমে অবিচলিতচিত্তে কঠোর কর্ত্তব্যপথে দৃপ্তবল সিংহের ন্যায় উন্নত-কন্ধরে ও স্ফীতবক্ষে বিচরণ করিতে থাকে, সেই তেজোরূপ মহাশক্তি বাক্যের উচ্চারণে নির্গত প্রভঞ্জনের অনুগমন করিবার মানসে বদনরূপ নির্গম-মার্গে নিজের দেহ হইতে অনাবৃতভাবে বহির্গত হইয়া থাকে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ॥" ইতি। কণ্ঠাদি দেশ হইতে সমুৎপন্ন বর্ণাবলী-লক্ষণ বাক্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন যাহা বলিবার ইচ্ছা হয় বা বলা হয় তাহাই দৈবশক্তির কার্য্যকারিণী শক্তি ধারণ করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ যেমন এক বস্তু হইতে নেত্রপলকের মধ্যে বস্ত্বন্তরে সঞ্চারিত হয়, আমাদের অন্তর্নিহিত ওজোরূপ তেজঃশক্তিও সেরূপ সংক্রান্ত হইয়া থাকে। বাক্যের সংযম দুইভাগে সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমটী মিথ্যা কথা ছলনা প্রবঞ্চনা বা প্রতারণাময় বাক্য পরিহার করা। দ্বিতীয় অপ্রয়োজনীয় (অর্থাৎ যাহা না বলিলে না হয় তদতিরিক্ত) কথা পরিত্যাগ করা। প্রথমটী দ্বারা মনের অসঙ্কীর্ণতারক্ষা, দ্বিতীয়টী দ্বারা জীবনশক্তিকে অপচয়-কর্ব্বুরের করাল গ্রাস হইতে প্রতিপালন করা। অনৃতবচন বা প্রতারণাময় বাক্য প্রয়োগ করিলে আপনা হইতেই মনের সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। সেজন্য নিরতিশয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। তাহাতে বহু-পুণ্যফললব্ধ আত্ম প্রসাদ

বিলুপ্ত হয় ও পরিণামে তাহাও পরম্পরায় মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ অসঙ্কীর্ণ উদার হৃদয়ে চিরসঙ্কোচক ক্ষোভ বা দৈন্য উপস্থিত হইলে তাহার জন্য চিন্তায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অধিক পরিমাণে সংঘটিত হওয়ায় আয়ুঃক্ষয় হয়। দ্বিতীয়টী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষরূপে আয়ুঃক্ষয়ের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। যেহেতু আমাদের জীবন পার্থিব স্থূলদেহের অন্তর্গত সূক্ষ্মমূর্ত্তি বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাই প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যানের ভেদে নানা আখ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া প্রাণ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আপ্রলয়কাল বহুত্ব সংখ্যায় পরিগণিত হইয়া থাকে। সমধিক বাক্যবিন্যাসে পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্নপ্রায় হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য-কলাপের সমধিক দ্রুততায় বেগ-চালিত শ্বাস-প্রশ্বাস-নিবহের নির্গমন-উদ্গমনের নিরতিশয় প্রবৃত্তি জীবগণের জীবনী শক্তিকে চিরকালের জন্য বিলোপ-সাগরে মগ্ন করিয়া থাকে, এবং পাণি, পাদ ও পায়ুর সংযম সংসাধিত না হইলে তত্তৎ ইন্দ্রিয়গণের অবৈধ ও বিসদৃশ কার্য্য-কলাপের দুরন্ত প্রভাবে চিন্তাকুলিত অন্তঃকরণের মহাবেগোচ্ছ্বসিত শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রবাহ জীবনী শক্তির অচিন্তনীয় অপচয় সংঘটিত করে।

(ক্রমশঃ)

"প্রতীক্ষা"

লেখক—শ্রীরাসবিহারী দত্ত।

আমি আকুলনয়নে চাহিয়া রহিব,
দিবে না তুমি হে দেখা?
আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইলে,
আসিবে তুমি কি সখা?
ঐ যে ধবল চাঁদিমা হাসিছে,
ঐ যে বিমল তারকা ভাসিছে,
সবার হৃদয় পূর্ণ আছে গো
আমার হৃদয় ফাঁকা॥

আমি মধুপের মত গুন্ গুন্ করে—
মধুর আশায় ঘূরিগো,
আমি পিয়াস-কাতর পরাণ লইয়া—
প্রেমের ধান্ধায় মরিগো,
মান-অপমান বিষয়-বিভব
তুমিই আমার যাহা কিছু সব,
তোমারই তরে প্রাণ তেয়াগিব
এই ত আমার শিক্ষা ॥
অল্প আয়াসে লব্ধ জিনিষ—
দেয় গো ক্ষণিক সুখ।
সারাটা জীবনে লভিব তোমারে
সহিয়া অশেষ দুঃখ ॥
(তাই) হে নিত্য নূতন অতীব সুন্দর
প্রেমের কাঙ্গাল সখা,
হৃদয়ে উদিয়ে প্রেম পিয়াইয়ে
অধমে দাও হে দেখা ॥

——)(*)(——

নীলাম্বরের কথা।

বহুরূপ তারা।

লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম, বি, এ, এ।

বৃষ রাশির S. U. তারাটীর জ্যোতিঃ পুনরায় হ্রাস পাইয়াছে। আমরা ই তারাটীকে ১৮ই নভেম্বর ১৯২৫, ৯'৬ স্থূলত্বে অর্থাৎ উহার স্বাভাবিক জ্যোতিতে দীপ্তিমান্ দেখিয়াছিলাম। ৫ই ডিসেম্বরের পর্য্যবেক্ষণে উহার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সন্দেহ নিরাকৃত না হওয়ায় ই ডিসেম্বর উহাকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখি যে বাস্তবিকই উহার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়াছে। ঐ দুই দিন উহার স্থূলত্ব ১০'৩ ছিল, পরে ১২ই ডিসেম্বর ১০'৫ ও ১৭ই ডিসেম্বর ১১'৯ স্থূলত্বে পরিণত হইতে দেখিতে পাওয়া

যায়। অতঃপর ৯ই জানুয়ারী ১৯২৬, হইতে এ পর্য্যন্ত তারাটী দ্বাদশ শ্রেণি
তারার উজ্জ্বলতা হইতেও ক্ষীণ-জ্যোতিঃ ও আমাদের দূরবীণে অদৃশ্য আছে

হারভার্ড মানমন্দিরের ৮৩০ সংখ্যক বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ যে আমেরিক
ওহিও প্রদেশের ডেল্‌ফো নগর হইতে পেলটিয়ার জানাইয়াছেন যে ৪
ডিসেম্বর ১৯২৫, S. U. তারা উহার পূর্ণ জ্যোতিঃ ৯'৬ স্থূলত্বে জ্যোতিষ্ম
ছিল, ৯ই ডিসেম্বর উহার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়া ১০'৫ এবং ১৮ই ডিসে
১২'৪ স্থূলত্বে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি যদি উহা
উহার পূর্ণ জ্যোতিঃ ৯'৬ স্থূলত্বে দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হই
যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উহার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়া ১০'৩ স্থূলত্বে পরি
হইয়াছিল, যেহেতু ৫ই ডিসেম্বর আমরা উহাকে ১০'৩ স্থূলত্বে দেখিয়াছিলা
উহা প্রায় চারিদিন ঐ স্থূলত্বে বিদ্যমান থাকিয়া আবার কমিতে আ
করে, তিনি ৯ই ডিসেম্বর উহাকে ১০'৫ স্থূলত্বে এবং আমরা ১২ই ডিসে
উহাকে ১০'৫ স্থূলত্বে দেখিয়াছিলাম সুতরাং তারাটী এ কয়েক দিন ১০
স্থূলত্বেই জ্যোতিষ্মান্ ছিল। অতঃপর আমরা ১৭ই ডিসেম্বর উহাকে ১:
স্থূলত্বে দেখিয়াছি ও পেলটিয়ার ১৮ই ডিসেম্বর ১২'৪ স্থূলত্বে দেখিয়াছিলে
সুতরাং ঐ দুই দিনের মধ্যেই তারাটী হ্রাস পাইয়া অদৃশ্য হইয়া যা
১৩ই হইতে ১৬ই ডিসেম্বর এই পাঁচ দিন আমরা কেহই উহার পর্য্যবেক্ষণ এ
করিবার সুযোগ পাই নাই, অপরাপর স্থানের পর্য্যবেক্ষণের বিবরণও আমা
হস্তগত হয় নাই ; হইলে বুঝিতে পারা যাইবে কিরূপ ভাবে ঐ কয়দিন S.
তারার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়াছিল। আমরা আমাদের পর্য্যবেক্ষণের বি
৩০শে ডিসেম্বর হারভার্ড মানমন্দিরে পাঠাইয়া দিয়াছি, এখনও তাহার প্রা
সংবাদ পাই নাই।

গত পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২৪ খৃঃ অঃ ৩০শে আগষ্ট S. U. তারার জ্যো
হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর ১২'৪ স্থূলত্বে পরিণত হয়,
সময়ের বিবরণ ১৩৩১ সালের পৌষ ও ১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসের হি
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যাইবে
যে তারাটী গতবার ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইতে পূর্ণ জ্যোতিঃ লাভ ক
মাত্র ২৫০ দিন পূর্ণ জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ ছিল এবং গত বারে
জ্যোতিতে পরিণত হওয়ায় ৪৬৩ দিন পরে পুনরায় ক্ষীণ জ্যোতি
পরিণত হইয়াছে। গত বারে ক্ষীণ জ্যোতিতে পরিণত হইতে বার

লাগিয়াছিল, এবারে ১৪ দিন সময় লাগিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ১৯১৭ খৃঃ অঃ হইতে ১৯২৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত উহা ৭ বৎসর পূর্ণ জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ ছিল। এই তারাটীর পূর্ব্ব বিবরণ সঙ্ক্ষেপে দেওয়া হইল:—১৮৯১ খৃঃ অঃ ক্ষীণ জ্যোতিতে পরিণত হওয়ার ৮ বৎসর পরে ১৮৯৯ খৃঃ অঃ দ্বিতীয়বার, ৫ বৎসর পরে ১৯০৪—৫ খৃঃ অঃ তৃতীয় বার, ৩ বৎসর পরে ১৯০৮—১১ খৃঃ অঃ চতুর্থ বার, এই সময়ে তারাটী প্রায় তিন বৎসর ক্ষীণ জ্যোতিতে অদৃশ্য ছিল, এক বৎসর পরে ১৯১২ খৃঃ অঃ পঞ্চমবার, একবৎসর পরে ১৯১৩—১৪ খৃঃ অঃ ষষ্ঠবার, তিন বৎসর পরে ১৯১৬—১৭ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম বার, সাত বৎসর পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম বার এবং কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে বর্ত্তমানবর্ষে নবম বার ক্ষীণ জ্যোতিতে পরিণত হইয়াছে।

মিথুন রাশির U তারাটী ১৯২৫ খৃঃ অঃ ৫ই ডিসেম্বর ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ১৩'০ স্থূলত্ব হইতে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন ৬ই ডিসেম্বর ৯'৯ স্থূলত্বে ও ৭ই ডিসেম্বর ৯'২ স্থূলত্বে উপনীত হয় এবং দুইদিন মাত্র, ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর; আমরা উহাকে পূর্ণ স্থূলত্বে জ্যোতিষ্মান্ দেখিয়াছিলাম। ঐ সময়ে আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় তিন দিন উহাকে আর পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাই নাই। ১২ই ডিসেম্বর উহাকে ১০'৫, ১৩ই ডিসেম্বর ১১'১ ও ১৪ই ডিসেম্বর ১২'৫ স্থূলত্বে দেখিয়াছিলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তারাটী নয় দিনের মধ্যেই ১৩'০ স্থূলত্ব হইতে বৃদ্ধি পাইয়া, পূর্ণ স্থূলত্বে উপনীত হইয়া পুনরায় ক্ষীণ জ্যোতিতে পরিণত হইয়াছিল, ১৫ই ডিসেম্বর তারাটী ১২'৫ স্থূলত্বের তারা হইতেও ক্ষীণ জ্যোতিঃ ও আমাদের দূরবীণে অদৃশ্য হইয়া যায়।

ব্রহ্মরাশির S S তারাটীর জ্যোতিঃ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারীর পরে বা অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন সময়ে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়া ৫ দিনের মধ্যে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইয়া পুনরায় ক্ষীণতম জ্যোতিতে পরিণত হয়। আমরা উহাকে ৬ই ফেব্রুয়ারী ১১'৬ স্থূলত্বের তারা হইতেও ক্ষীণ জ্যোতিঃ ও আমাদের দূরবীণে অদৃশ্য দেখিয়াছি; পরে ৭ই ফেব্রুয়ারী আকাশ ভাল না থাকায় উহাকে দেখিতে পারি নাই, ৮ই ফেব্রুয়ারী উহাকে ১০'৯, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১০'৯, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১১'৭ ও ১২ই ফেব্রুয়ারী ১১'৬ স্থূলত্বের তারা হইতেও ক্ষীণ জ্যোতিঃ ও অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। পর্য্যবেক্ষণের ফলে বুঝা যাইতেছে যে মিথুন রাশির U তারা ও ব্রহ্মরাশির S S

তারা উভয়েই এবার একদিনের মধ্যেই অকস্মাৎ জ্যোতিষ্মান্ হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই আবার অদৃশ্য হইয়া যায়।

স্কুটাম্ রাশির R তারাটীও এবার ক্ষীণ জোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আম উহাকে ১৯২৫ খৃঃ অঃ ২১শে জুলাই ৫'২৫, ১৬ই আগষ্ট ৫'৭২, ২৫শে আগ ৫'৪৫, ৮ই সেপ্টেম্বর ৫'৭২, ২১ শে সেপ্টেম্বর ৫'৮০, ৪ঠা অক্টোবর ৬'০৮, ১৬ অক্টোবর ৭'০৭, ২১শে অক্টোবর ৭'১৯, ৫ই নভেম্বর ৭'৪০, ১৩ই নভেম্বর ৭'২ ১৭ই নভেম্বর ৭'১৮, ২৪শে নভেম্বর ৬'৮১ ও ৫ই ডিসেম্বর ৫'৮৪ স্থূলত্বে জ্যোতি ষ্মান্ দেখিতে পাই। অতঃপর তারাটী সূর্য্য-সান্নিধ্য লাভ করিয়া অদৃশ্য হই যায়। পরে ১৯২৬ খৃঃ অঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী উহাকে শেষ রাত্রে পূর্ব্ব গগ প্রথম দেখিতে পাই ; তখন তারাটী উহার পূর্ণ স্থূলত্ব ৪'৮২তে জ্যোতিষ্মান্ ছিল পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যাইতেছে যে তারাটী জুলাই মাসের শেষ ভা হইতে হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং ৫ই নভেম্ব ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ৭'৪০ স্থূলত্বে পরিণত হয়। ক্ষীণতম জ্যোতিতে পরিণ হইতে যত সময় লাগিয়াছিল, স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইতে তদপেক্ষ অনেক কম সময় লাগিয়াছে।

ধনু রাশির R Y তারা ও উত্তর কিরীট রাশির R তারাদ্বয় অনেক দি হইতে উহাদের পূর্ণ স্থূলত্বে জ্যোতিষ্মান্ রহিয়াছে।

হরকুলেশ রাশির W তারাটী বহুদিন উহার পূর্ণতম জ্যোতিঃ ৭'৮ স্থূলত্বে উপনীত হয় নাই। এবারে ১৯২৬ খৃঃ অঃ ১লা মার্চ্চ উহাকে উহার পূর্ণতম জ্যোতি ৭'৮ স্থূলত্বে উপনীত হইতে দেখা গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ঐ তারাটী ১৯২০ খৃঃ অ ১৭ই নভেম্বর ৮'৪০, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট ৮'৪৫ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মে ৮'২০, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ৮'৫০, ৭ই নভেম্বর ৮'২ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট ৮'৩০, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে ৮'৪০ স্থূলত্বে উপনীত হইতে দেখা গিয়াছিল।

হ্রদসর্প রাশির V তারাটীর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এক বৎসর নয় মাস কাল এই তারাটী ক্ষীণতম জ্যোতিতে বিদ্যমান ছিল ১৩৩১ সালের পৌষ ও ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের হিন্দু-পত্রিকায় উহা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৫ খৃঃ অঃ নভেম্ব মাস হইতে এই তারাটী সাময়িক হ্রাস ও বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে জ্যোতিষ্ম হইতেছে ; উহার স্থূলত্ব ১৯২৫ খৃঃ অঃ ১৫ই নভেম্বর ১১'৯, ২৫শে ডিসেম

১১'৮, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ১১'৩, ১৭ই জানুয়ারী ১০'৮, ২০শে জানুয়ারী ১০'৭, ২৩শে জানুয়ারী ১০'৮, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১১'০, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১১'৩, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১১'২, ৪ঠা মার্চ্চ ১০'৬ ও ৯ই মার্চ্চ ১০'২ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় তারা-পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্য এবারে বেশ ভালরূপ করিতে পারা যায় নাই।

—০ঃ(*)ঃ০—

চণ্ডী ও গীতোক্ত নিষ্কামবাদ।

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ক্ষাত্রবীর্য্যে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে দণ্ডায়মান হওয়াও তাঁদের "কর্ত্তব্য-ধর্ম্ম," আর সেই ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য ইচ্ছা, বাসনা, প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, আয়োজন করিতে যথেষ্টরূপে অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধমনোরথ হইয়া যখন সব প্রস্তুত, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া স্বজন-বান্ধবের অপমৃত্যু-ভয়ে শোণিতপাত-নিবারণের জন্য নানাবিধ কথা বলিয়া মোহজনিত ক্লৈব্য-ভাব দেখাইলেন।

"আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা। শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।" ইত্যাদি গীতা প্রথমোধ্যায় ২৬ শ্লোক হইতে ৪৬ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। স্বজন বলিয়া অহিতাচারী অধর্ম্মপরায়ণ দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধনকেও নিহত করিতে অনিচ্ছুক "কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যভোগাঃ সুখানি চ॥" ৩২॥ ইহা অর্জ্জুনের—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যের মুখে শোভা পায় না। এখনও সকাম ভাব, ভোগকে ভোগ করিবার পূর্ব্ব সংস্কারজাত অজ্ঞান-বুদ্ধি হইতে একথা বলিতেছেন। রাজ্য কি আত্ম বা স্বজন-বান্ধবের ভোগের জন্য জয় করিবার প্রয়োজন? রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, প্রকৃতিবৃন্দের জন্য, উৎপীড়িত ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য, অধর্ম্ম-নাশ করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য, ভগবৎ কার্য্য-সাধনের জন্যও ত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য-জয়-আশা করা উচিত?

কিন্তু, প্রত্যাখ্যাত, ভোগাশাবঞ্চিত হইয়া, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাস অজ্ঞাত-বাস

করিয়া, তখন ইহার যথাসময়ে প্রতিশোধ লইয়া প্রতিবিধানের জন্য ক্ষাত্র-স্মৃতি অনুসারে অসাধ্য-সাধন-তৎপর হইয়া আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, অবস্থার অধীন হইয়া বনবাসী যতি-ধর্ম্মব্রতী হইয়া সংযত হইয়া চলিতে চলিতে এবং ঋষি মুনি ব্রাহ্মণাদির সহবাস সংসর্গ করিয়া যতি-ধর্ম্মীর ন্যায় ত্যাগ বৈরাগ্য, মোহ-জনিত অবসাদফলে আসিয়াছিল। অপি "ত্রৈলোক্য-রাজস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে। নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন॥ পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ। তস্মান্নার্হাবয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্। স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধবঃ॥" ৩৬॥ একি ভয়ানক মোহাবস্থা? আততায়ী পাপী হইলেও স্বজন বলিয়া ইহাদিগকে ন্যায় যুদ্ধে ধর্ম্মার্থে বধ করিলেও পাপ হইবে? ইহা ত ক্ষাত্রধর্ম্মের বিচার নয়। তার পর কুলক্ষয়াদি যে সকল যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, উহাও এস্থলে বাজে যুক্তি, ও যুক্তি সঙ্গতভাবে গণ্য করা যায় না। উহাও মোহজনিত অবসাদ।

তখনও পর্য্যন্ত মনে হয় নাই, কে কাকে মারে? সব্যসাচী নিমিত্ত মাত্র, উহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট আত্মভ্রষ্ট হইয়া 'আত্মাপহত' হইয়া আছে। সব্যসাচী 'কর্ত্তব্য ধর্ম্মে' নিমিত্তমাত্র হইয়া ক্ষাত্র ধর্ম্ম পালন করিবেন।

গীতায় পাণ্ডবদের ভোগ-বাসনা পরিসমাপ্ত হয় নাই, অবস্থায় বাধ্য হইয়া ভোগ ত্যাগ করিয়া সংযমের পথে চলিতে হইয়াছিল অবস্থা ফিরাইবার জন্য।

চণ্ডীতেও ঠিক এই অবস্থা। রাজা 'সুরথ' এবং 'বণিক' ঠিক এমনই ভাবে অতৃপ্ত-ভোগবাসনা থাকিতে ভোগ-বিতাড়িত হইয়া 'মুমুক্ষু' হইয়া আসিয়াছিলেন।

সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে, ভগবান মেধস্-মুনি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভোগের দাঁড়া সুধরাইয়া (সুধারায়) প্রবর্ত্তিত করিয়া, ভোগ-কামনা নিবৃত্তিপথে অতৃপ্তি তৃপ্তিতে আনিয়া দিবার উপায় করিয়াছিলেন।

'গীতা ও চণ্ডীতে' বিশেষ কিছু পার্থক্য ত দেখা যায় না। শুধু অবস্থার পার্থক্য এবং ঘটনা-পরম্পরায় গল্পটা এ এক রকম, ও আর এক রকম; কিন্তু আসলে তফাৎ কি?

নিষ্কাম! নিষ্কাম কি? সঙ্কল্প মাত্রেই ত কামনা? পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঘোরতর সঙ্কটে পড়িয়াও কি কম উদ্যোগ আয়োজন প্রযত্ন করিয়া যুদ্ধোদ্যম করিয়াছিলেন? যুদ্ধ-জয়কামনা, অপমানের প্রতিশোধ লইবার স্পৃহায় ভীমের ভীম সংকল্প রাক্ষসী জিঘাংসায় প্রতিজ্ঞা-প্রপূরণ করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান, দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ-এ সবই করিয়াছিলেন। কীচক-বধ

ইত্যাদি জিঘাংসা-বৃত্তিও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তায় করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন জয়দ্রথ-বধে নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাকালের মধ্যে অসমর্থ হইয়া আত্মনাশ, আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ক্ষাত্র-স্বভাবে স্বধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম, ক্ষাত্র প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য মানবীয় ভাবে সকল বৃত্তিগুলিরই পরিচালন করিয়াছিলেন। এ সকলের একটাও ত অকাম নয়? নিষ্কামও নয়। প্রতিজ্ঞাগুলি যখন করিয়াছিলেন তখন সকাম অবস্থায়ই করিয়াছিলেন, তবে তখন সক্ষম অবস্থায় ছিলেন না। সক্ষমতা স্ব-ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া, তখন একেবারে ক্ষমাশীল নিষ্কাম হওয়াটা মোহ নহে কি? তবে কীচক দুঃশাসন দুর্য্যোধনাদি স্বীয় অনাচার অন্যায় অধর্ম্মাচরণে স্ব স্ব নিয়তি নির্ণয় করিয়াছিলেন। উহাই তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের reaction প্রতিক্রিয়ায় লব্ধ নিয়তি। নিয়তিরূপে সব্যসাচীকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবৎ ইচ্ছা সাধিত হইয়াছিল। উহাঁরা তাহার উপলক্ষ্য। যখন সব্যসাচী তাঁহার অন্তর্নিহিত দিব্যজ্ঞান ও দৃষ্টিতে ইহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিলেন তখন ভগবানের অনুগত হইয়া 'বিধিনির্দ্দেশিত' কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। তখন সখা ভ্রাতা শ্যালক সম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান জ্ঞানে শ্রীভগবানের আদেশ উপদেশ মন্ত্রণা আনুগত্য করিয়া ভগবানের কার্য্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। কামনার 'আমিত্ব', ভোগের 'আমিত্ব,' রিপু-প্রবৃত্তির 'আমিত্ব' ঘুচিয়া ভগবদীয় ইচ্ছা-কল্পিত হইয়া অনুপ্রেরণায় ভগবৎ কর্ম্ম সাধনায় তৎপর হইয়াছিলেন। কর্ত্তব্য ধর্ম্মে ভগবৎ কার্য্য নির্দ্দেশে কর্ত্তব্য পালন করিয়া ক্ষাত্রোচিত "স্বধর্ম্ম" পালন করিয়াছিলেন।

সুরথ রাজা শত্রু ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া মৃগয়া-ব্যপদেশে বিচরণ করিতেছিলেন, শত্রু ও দুষ্ট অমাত্যগণ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও অমাত্যগণের দুর্ভাবনা, রাজকোষের অপব্যয়-নিবন্ধন, (কৃপণের ধনব্যয়ের ন্যায়) দুশ্চিন্তা-মগ্ন হইয়া চলিতে চলিতে মেধস্ মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন।

সমাধি বৈশ্যও অসাধুবৃত্ত ধনলোভী পুত্র-কলত্রের অত্যাচারে বিতাড়িত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে 'বন' অভিমুখে যাইতে যাইতেও পুত্র-কলত্রদিগের কুশল-চিন্তা, ধন-চিন্তা ইত্যাদি বিষয়-চিন্তায় মগ্ন হইয়া চলিয়াছিলেন। রাজা ও বণিক্ উভয়ে মিলিত হইয়া মেধস মুনির আশ্রমে যাইয়া উপনীত হইয়া আত্মদুঃখ বিবৃত করিলে মহাত্মা মেধস মুনি উভয়কেই 'ভোগস্বর্গাপবর্গদা' ভোগ-স্বর্গ-অপবর্গ-মুক্তি-লাভার্থ পরমেশ্বরীর পুজার উপদেশ দিলেন। ফলতঃ

সুরথ রাজা ভগবতীর উপাসনায় সাধন-সিদ্ধি লাভ করিয়া বর গ্রহণ করিলেন, 'ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি। অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হত-শত্রু-বলং বলাৎ।"

আর ধন-সৌভাগ্য-বঞ্চিত পুত্র-কলত্রাদি হইতে নিগৃহীত বৈশ্য মমতা-বশে পুত্র-কলত্রাদির দুর্ভাবনায় চিন্তিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ঋষির আশ্রমে সমাগত ও উপদেশ পাইয়া তপস্যা করিয়া তাহার মনের অবস্থা হইয়াছিল এমনি যে, তিনিও ভোগ-স্বর্গ ও মোক্ষফল-বিধাত্রী ভগবতীর উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বরলাভ-কালে প্রার্থনা করিলেন "সোঽপি-বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্নমানসঃ। মমেত্যহমিতিপ্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্।" পুত্র-কলত্র-দেহাদির প্রতি আসক্তি-উন্মূলক পরম জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনাফলে সুরথ রাজা প্রার্থিত বর লাভ করিলেন। আর সমাধি বৈশ্যও প্রার্থিত বর লাভ করিলেন। "তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।" "বৈশ্য" তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিলাভের জন্য প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন।

সুরথ রাজার রাজ্য-ভোগবাসনা ছিল, বৈরি-নিধন-প্রবৃত্তি ছিল, প্রবৃত্তি-অনুযায়ী 'বর' লইয়াছিলেন। ইহজন্মে ইহজন্মের বৈরি-পীড়নে বিষয়-বঞ্চিত যাহা হইয়াছিলেন তাঁহা প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিলেন, জন্মান্তরেও রাজ্যভোগ-লালসা মন্বন্তরাধিপত্য লাভ করিয়া 'সাবর্ণি-মনু' হইয়া মানব-শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভোগবাসনায়ও সুরথ রাজার সেই জীবনের অবশিষ্টকাল পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মলব্ধ কর্ম্মোপার্জিত গ্রহফেরে শত্রু-কর্ত্তৃক কৃতঘ্ন অমাত্য সৈন্য সেনাপতি কর্ত্তৃক হৃত-রাজ্য পুনরধিকারলাভ, এবং জন্মান্তরের জন্য শ্রেষ্ঠ ভোগ মন্বন্তরাধিপত্য মনু-ত্ব লাভ করিলেন। মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত মানব-মনের উপর 'ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার দণ্ডাধিপত্য লাভ করিয়া 'মনু-দেব' দেবত্ব-লাভ করিয়াছিলেন।

আর বিষয়-বিরক্ত-চিত্ত বৈশ্য, পুত্র-কলত্রাদির মায়িক স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া মায়ায় আবদ্ধ হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন, তত্ত্বজ্ঞ হইয়া মায়ামুক্তি লাভ করিয়া মোক্ষমার্গগামী হইয়াছিলেন।

ইহাঁরা একইরূপ উপদেশ, একই আচার্য্যের নিকট এক সময়ে পাইয়া প্রকৃতি ও ধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব বাসনানুযায়ী ফল লাভ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড
১১শ সংখ্যা।

ফাল্গুন।

১৩৩২ সাল।
১৮৪৭ শকাব্দাঃ

বাঙ্গালা বনাম উর্দ্দু।

উর্দ্দুর ঐতিহাসিক বিবরণ।

(দৈনিক বেঙ্গলীতে প্রকাশিত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর C. I. E. এম্, এ, বি, এল্ মহোদয়ের লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।)

ভারতবর্ষে বহুভাষা প্রচলিত। গত আদম সুমারিতে ভারত সাম্রাজ্যে ২২২টী ভাষা প্রচলিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান ভাষার নাম ও তদ্ভাষী জনসংখ্যা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

পশ্চিমা হিন্দী ৯৬৭১৪০০০; বাঙ্গালা ৪৯২৯৪০০০; তেলিগু ২৩৬০১০০০; মহারাষ্ট্রী ১৮৭৯৮০০০; তামিল ১৮৭৮০০০০; পঞ্জাবী ১৬২৩৪০০০; রাজস্থান ১২৬৮১০০০; কানারিজ ১০৩৭৪০০০; উড়িয়া ১০১৪৩০০০; গুজরাটী ৯৫৫২০০০; বর্ম্মিজ ৮৪২৩০০০; মালয়ালম্ ৭৪৯৮০০০; লাহন্দু বা পশ্চিমা পঞ্জাবী ৫৬৫২০০০।

এই হিসাবে উর্দ্দুর নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই, কারণ উর্দ্দু একটি স্বতন্ত্র ভাষা নহে।

প্রাদেশিক অবস্থা।

প্রথমে, মান্দ্রাজের কথা ধরা যাউক। এই প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী দ্রাবিড়জাতীয় এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান দ্রাবিড়ী ভাষা—তামিল ও তেলিগু—প্রচলিত। তামিল ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৮০০০০০০ ও তেলিগু ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৬০০০০০০। উক্ত প্রদেশে প্রতি সহস্র অধিবাসীর মধ্যে ৪১০ জন তামিল ভাষায়, ৩৭৭ জন তেলিগু ভাষায়, ৭৫ জন মালয়ালম্ ভাষায়, ৩৭ জন উড়িয়া ভাষায়, ২৫ জন কানারিজ ভাষায় এবং ২৩ জন হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

বোম্বাই প্রদেশে ৪টী প্রধান ভাষা প্রচলিত, যথা হিন্দী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী ও কানারিজ।

মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশে ও পূর্ব্বাংশে হিন্দী, বেরারপ্রদেশে এবং মধ্য-প্রদেশের মধ্যাংশে ও পশ্চিমাংশে মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রচলিত। শতকরা ৫৬ জন অধিবাসী হিন্দীভাষায় এবং ৭ জন গন্দ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে।

যুক্তপ্রদেশে পশ্চিমা হিন্দী, পূর্ব্ব হিন্দী, ও বিহারী এই তিনটী ভাষাই অধিকাংশ অধিবাসীর ভাষা। উর্দ্দু একটী স্বতন্ত্র ভাষা নহে; উহা পশ্চিমা হিন্দীর একটী শাখা মাত্র। উহাতে মুসলমান রাজত্বকালে বহু পরিমাণে আরবী, পারসী ও তুরস্ক ভাষার শব্দ মিশ্রিত করা হইয়াছে। উর্দ্দুর সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ বা ব্যবহারিক ভাষা হইবার যোগ্যতা ও দাবি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

পঞ্জাবপ্রদেশে প্রধান ভাষা পঞ্জাবী। উক্ত প্রদেশের অর্দ্ধাংশেরও অধিক-সংখ্যক লোকে উক্ত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। কখনও কখনও পশ্চিমা পঞ্জাবীকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া গণ্য করা হয়; তখন উহাকে লাহুড ভাষা বলা হয়। ঐ ভাষা পঞ্জাবপ্রদেশের উত্তর ও পূর্ব্বাংশে প্রচলিত। পঞ্জাবীর পরেই নিম্ন-লিখিত ভাষাগুলি পঞ্জাবপ্রদেশে বহুল প্রচলিত। (১) পশ্চিমা হিন্দী; উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী এই ভাষার অন্তর্গত। (২) পাহাড়ী; এই ভাষা পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত। (৩) রাজস্থানী—রাজপুতানার ভাষা; পঞ্জাবপ্রদেশের যে অংশ রাজস্থানের সন্নিহিত, তথায় এই ভাষা প্রচলিত। (৪) বেলুচি, পুস্তু এবং সিন্ধি—পঞ্জাবপ্রদেশবাসী কিয়দংশ লোকে এই ভাষাগুলি ব্যবহার করে।

পুস্তু উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের প্রধানতম ভাষা। উহা পাঠানগণের মধ্যে প্রচলিত। এই প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই পাঠান এবং উহারা

ভারতবর্ষ ও আফ্‌গানিস্থানের মধ্যবর্ত্তী ডুরাণ্ড সীমানা পর্য্যন্ত সমস্ত শাসিত ও অশাসিত প্রদেশে বিস্তৃত।

বিহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশের প্রধান ভাষা দুইটী—পূর্ব্ব হিন্দী ও উড়িয়া। ছোট-নাগপুরে ও সাঁওতাল পরগণায় যথাক্রমে মুণ্ডা ও সাঁওতালী ভাষা প্রচলিত; কিন্তু এক্ষণে ঐ দুই ভাষা হিন্দী কর্ত্তৃক ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইতেছে। এই প্রদেশে বাঙ্গালা-ভাষাভাষী লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

আমাদের নিজপ্রদেশ বাঙ্গালায় শতকরা ৯২ জন লোকে বাঙ্গালা ভাষায় এবং মাত্র ৩'৮ জন লোক হিন্দু ও উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। প্রায় তিন লক্ষ লোকে উড়িয়া ভাষা এবং দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় এক লক্ষ লোকে নেপালী বা গুর্খা ভাষা ব্যবহার করে।

উর্দ্দুর উৎপত্তি।

উর্দ্দু ভাষার (যাহাকে অনেক সময়ে হিন্দুস্থানী বলা হয়) উৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে একটী ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষের নবাগত মুসলমান রাজগণ উর্দ্দু নামক একটী "আনকোরা নূতন" ভাষার আমদানি বা সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ তাহা নহে। মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া দেখিলেন যে ব্যবহারিক কার্য্য চালাইবার জন্য যে সকল অধিবাসিগণের সংস্রবে তাঁহারা আসিয়াছিলেন তাহাদের ভাষা গ্রহণ করা আবশ্যক। উর্দ্দু ভাষার গঠন-প্রণালী সংস্কৃতানুযায়ী, এবং দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হইলে উহার সহিত হিন্দী ভাষার পার্থক্য এইটুকু মাত্র যে উহাতে কতকগুলি আরবী, পারসী ও তুরস্ক ভাষার শব্দ গৃহীত হইয়াছে। মুসলমান শাসকেরা নিজেদের লিপিপ্রণালী গ্রহণ করা অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিলেন; উর্দ্দু শব্দের অর্থ সৈন্যদল, সৈন্যাবাস বা সৈন্যের ছাউনি স্থান, হাট বা বাজার। এই উর্দ্দু শব্দ হইতে উর্দ্দু ভাষার নাম-করণ হইয়াছে। যদি উর্দ্দুকে আরবী বা পারসী ভাষা বলা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষাকেও আরবী বা পারসী ভাষা বলা যাইতে পারে; কারণ, বাঙ্গালা ভাষাতেও বহুল পরিমাণে আরবী ও পারসী শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা পৃথিবীর ভাষা-সমূহের মধ্যে অন্যতম সুসম্পন্ন উন্নতিশীল ভাষা। মুসলমান-শিক্ষার বিস্তারকল্পে অন্তবর্ত্তী বা সাহায্যকারী ভাষাস্বরূপ ইহা উর্দ্দু বা পশ্চিমা হিন্দী অপেক্ষা কিসে অযোগ্য বিবেচিত হইল, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন।

উর্দ্দু কি হিন্দী হইতে স্বতন্ত্র ভাষা ?

স্যর আবদর রহিম ভাষাতত্ত্ববিৎ কি না, আমরা জানি না। কিন্তু যদি তিনি ভাষাতত্ত্বানুসন্ধায়ী হন, তবে তিনি অবশ্যই জানিতে পারিয়াছেন যে উর্দ্দু প্রকৃতপক্ষে আর্য্য-পরিবার-ভুক্ত প্রতীচ্য হিন্দী বই স্বতন্ত্র ভাষা নহে। কেবল উহাতে কতকগুলি আরবী পারসী ও তুরস্ক ভাষার শব্দ সংমিশ্রিত করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু উহাতে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের বিভক্তি সকল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় গৃহীত হইয়াছে। উর্দ্দুকে হিন্দী হইতে স্বতন্ত্র ভাষা বলিলে ভাষা-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে মস্ত ভুল করা হয়। মুসলমান শাসনকালের ঐতিহাসিক ও কাব্য সাহিত্যে উর্দ্দু সম্পৎশালী হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উর্দ্দু ও বাঙ্গালা এতদুভয় ভাষায় যাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তিনি এতদুভয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গালাকেই যে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করিবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নে আর্য্য-ভাষা-সমূহের বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত বীমস্ সাহেবের "Comparative Grammar of Aryan Laugages" নামক পুস্তক হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইহা একটী অদ্ভুত খেয়াল যে হিন্দী ভাষায় আরবী শব্দ গৃহীত হইলে উহাকে "উর্দ্দু" এই স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়; কিন্তু পঞ্জাবী বা সিন্ধী ভাষায় আরবী শব্দ মিশ্রিত হইলে, তাহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা হয় না।"

পুনরায় যখন স্যর আবদর রহিম উর্দ্দুকে প্রবেশিকাপরীক্ষার (Medium) বাহন করিবার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইবেন, তখন তাঁহার উপকারে আসিবে ভাবিয়া Vincent Smith সাহেবের পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। "উর্দ্দুর উৎপত্তি ও বিকাশ।" মুসলমান ও হিন্দু নানাবিধ প্রয়োজনের জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল; এইরূপ মিলন হইতেই একটী সাধারণ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দী শিখিলেন এবং এমন কি, উক্ত ভাষায় পুস্তকাদি লিখিতে লাগিলেন;—যথা সম্রাট হুমায়ুনের সময় জৈসের মালি মহম্মদ। বহু হিন্দু নিশ্চয়ই পারসী ভাষায় কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। এই দুই ভাষার সুবিধাজনক সংমিশ্রণে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইল। দিল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে উর্দ্দ ভাষা কথিত হয়, উহা পশ্চিমা হিন্দীর পারসীক-প্রভাবাপন্ন আকার

মাত্র। উহার ব্যাকরণ ও রচনাপ্রণালী প্রধানতঃ হিন্দী, অথচ উহার শব্দগুলি বহুল পরিমাণে পারসীক।

মুসলমান বিজয়ের পর পারসীক ভাষায় বহুপরিমাণে আরবী শব্দ মিশ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং উর্দ্দু ভাষাতেও বহু আরবী শব্দ গৃহীত হইয়াছে। উর্দ্দুর উৎপত্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দেশ করা যায় না। উহা অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে হিন্দীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে সুলতান-দিগের শাসন-সময়ে বিজেতা ও বিজিত উভয় জাতির বোধগম্য একটী ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ অবিরাম-গতিতে চলিতেছিল। উর্দ্দু ক্রমশঃ ভারত-বর্ষীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা হইয়াছিল এবং উহা ক্রমশঃ সাহিত্যে পরিণত হইয়াছিল। আমীর বা মীর খসরু ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি কখনও কখনও একজন উর্দ্দু লেখক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন; ইঁহার লেখায় বহু হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

Vincent A. Smith কৃত India in Mahomedan Period ২৫৯—৬০ পৃষ্ঠা।

ইহা কি স্যর আবদরের রাজনৈতিক চাল?

মুসলমানদের জন্য উর্দ্দু প্রচলনের প্রস্তাব কি স্যর আবদারের রাজনৈতিক চা'ল? এতদ্দ্বারা তিনি কি মুসলমানদিগকে ভারতের জাতীয় জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিতে চাহেন? ১৮ই মার্চ্চ তারিখের Englishman পত্রিকায় নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি বড়ই সন্দেহজনক। "ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে বাঙ্গালা যদি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সাধারণ ভাষা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শাসনপ্রণালী নিছক হিন্দু শাসনে পরিণত হইবে। এরূপ হইলে তখন পরিষ্কাররূপে বা অভ্রান্তরূপে মুসলমান বলিয়া চেনা যায় এমন কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সত্তা থাকিবে না। অতএব ভবিষ্যৎ ভারত রাজ্যে মুসলমানেরা যদি নিজেদের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে যাহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী বা বাহক ভাষা বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু বা পারসিক হয় তজ্জন্য মুসলমানদিগের চেষ্টাবান্ হওয়া পরামর্শসিদ্ধ।"

স্যর আবদর রহিমের "ইংলিশম্যানের" মত সুহৃদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নহে; কিন্তু যদি তিনি উহা গ্রহণ করেন, তবে স্যর আবদরের ন্যায়

বন্ধুর নিকট হইতে দূরে অবস্থান করা বঙ্গের মুসলমানদিগের পরামর্শসিদ্ধ হইবে।

বঙ্গের মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন হিন্দুধর্ম্ম-ত্যাগে মুসলমান হইয়াছেন। এতকাল ধরিয়া বাঙ্গালা তাহাদের মাতৃভাষা থাকায়. তাহাদের মুসলমানত্বের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। এক্ষণে তাহাদের মাতৃভাষা—বাঙ্গালা—যদি প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত অথবা উচ্চতর কোন পরীক্ষায় অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাতেও তাহাদের মুসলমানত্বের কোন অপচয় নিশ্চয়ই হইবে না।

খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল—পুরাতন ও নূতন উভয় ভাগ—যথাক্রমে হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় লিখিত; কিন্তু তাহা হইলেও হিব্রু বা গ্রীক সভ্যতার খাতিরে "ইংলিশম্যানের" স্বদেশবাসীরা নিজেদের মাতৃভাষা ইংরেজী ছাড়িয়া হিব্রু বা গ্রীক ভাষার প্রবর্ত্তনে কখনই সম্মত হইবেন না।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক; উর্দ্দুও সংস্কৃতমূলক। সার্ আবদর রহিমের মতে উর্দ্দু যদি মুসলমান শিক্ষা ও সভ্যতার বিশিষ্টভাব প্রকাশে অক্ষম না হয়, তবে তদপেক্ষা উন্নততর বাঙ্গালা ভাষাও অক্ষম হইবে না। প্রত্যেক প্রদেশেই মুসলমানেরা তৎপ্রদেশের প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করে, কেবল বাঙ্গালা দেশে যাহারা সম্প্রতি পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে, সেই সকল মুসলমানেরা উর্দ্দু ব্যবহার করে। বাঙ্গালার মুসলমান অধিবাসীরা বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে; উর্দ্দুর প্রচলন করা হইলে তাহাদের উপর বিশেষ অন্যায় অবিচার করা হইবে। বঙ্গের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান গ্রন্থকারেরা কোরাণের যে সকল উৎকৃষ্ট অনুবাদ করিয়াছেন, আমরা স্যর আবদর রহিমকে সেইগুলি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

উপাসনা।

লেখক—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

(বঙ্কিম-সম্মিলনীতে পঠিত)

উপাসনা—উপ-নিকটে আসন-অবস্থিতি। পরমাত্মাকে অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করা এবং জীবাত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থানই উপাসনা। সরলভাবে বুঝিতে হইলে বলিতে হয়, উপাস্যে চিত্তের যে স্মরণাত্মক জ্ঞান-প্রবাহ—তাহাই উপাসনা। ধ্যেয় উপাস্যে তৈলধারাবৎ চিত্তের বৃত্তি অবিচ্ছিন্না রাখাই উপাসনার কার্য্য। মুক্তি, শ্রীভগবানে আত্মলীনতা উপাসনার ফল।

ভক্তি, * বেদন, স্মরণাত্মক জ্ঞান, ধ্যান, যোগাদি উপাসনার প্রকারভেদ মাত্র। অবিদ্যা ও তৎকার্য্য রাগ-দ্বেষাদি নাশ করা উপাসনারই সাধ্য। "উপাসীত" উপাসনা সর্ব্ব মানবের অবশ্য-পালনীয় ধর্ম্ম। উপাসনাই ব্রহ্মপুরী-প্রবেশের দ্বার। ত্রিলোকপতি পরমেশ্বর সেই পুরীর অধিষ্ঠাতা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই পুরীর সশস্ত্র প্রহরী। অবসাদ, চিত্তদৌর্ব্বল্য, বিষয়াসঙ্গ, জন্মান্তরীণ সংস্কার ইহার দুরুত্তীর্য্য পরিখা। অবিবেক, অনভ্যাস, অননুষ্ঠান, কামনায় আসক্তি ইহার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। রূপরসাদি বিষয়, কর্ণ-নাসা-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অবিদ্যাচ্ছন্ন মানবের শত্রু-স্থানীয় সেনাদল। ঐ শত্রুদিগকে আয়ত্তে আনিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করাই কর্ম্ম-কৌশল। ধর্ম্মবীর জ্ঞানবীর বিবেকীরা উপাসনা-তরবারির সাহায্যে বিঘ্ন দূর করিয়া সেই পুরী-জয়ে সমর্থ হন।

কেহ কেহ বলেন, "উপাসনা দ্বারা চিত্তের মালিন্য কাটিয়া তাহার নির্ম্মলতা সাধিত হয়। সেই নির্ম্মল দর্পণবৎ চিত্তেই আত্মজ্যোতির প্রতিফলন দেখা যায়।" উপাসনা-সংস্কৃত মনই যখন জ্ঞান-জ্যোতি ধারণে সক্ষম, তখন প্রকারান্তরে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, উপাসনাকে মুক্তির কারণ বলা যাইতে পারে।

উপাসনার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, ভূমি, দিক্‌, কাল প্রভৃতির উপাসনাই প্রথম প্রচলিত হয়। নদীর কুলু কুলু ধ্বনি, সাগরের ভীষণ গর্জ্জন, বাতাসের অশ্রান্ত গতি, সূর্য্যের নিয়মিত উদয়াস্ত প্রভৃতি কার্য্যই উপাসনার বিষয় ছিল। উপাসনা দ্বারাই ঐ ভিন্ন

---

* বেদান্ত-বাক্যের নিরন্তর আলোচনা।

ভিন্ন কার্য্যের মধ্যে একেরই সত্তা ফুটিয়া উঠিল। জড়-কার্য্য এক অদ্বিতীয় চৈতন্যের প্রতিভাস মাত্র বলিয়া প্রচারিত হইল।

উপনিষদে অগ্নি বায়ু জল সূর্য্য চন্দ্র দিক্ কাল বৃষ্টি মেঘ প্রভৃতি দৃশ্যমান্ তেত্রিশটি দেবতার কথা শোনা গেল। "ত্রয়স্ত্রিংশত্যেব দেবাঃ (বৃহদারণ্যক), ঐ তেত্রিশটি উপনিষদের দেবতাই ক্রমশঃ ছয়টি, তিনটি, পরিশেষে একটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কার্য্যের মধ্যে কারণের, জড়ের মধ্যে চৈতন্যের উপাসনা হইতে লাগিল; আবার কার্য্যাতীত কারণের, জড়াতীত চৈতন্যের উপাসনাও ব্যবস্থিত হইল। মানবের চিত্তবৃত্তিভেদে উপাসনার ক্রমশঃ বহুবিধ ভাগ দেখা গেল। একই মন্দাকিনী শত ধারায় বিভক্ত হইয়া ধরার বক্ষে নামিয়া আসিলেন।

উপাসনা প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাউক। (১) নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা। (২) সাকার ঈশ্বরোপাসনা। (৩) রূপকোপাসনা। (৪) প্রকৃতি-উপাসনা।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা উত্তম অধিকারীর জন্য, অতি উচ্চাঙ্গের, আদর্শের, অলৌকিক কল্পনার সামগ্রী সে। "প্রাণস্য প্রাণং মনসো মনো যৎ" সে অজ্ঞেয় বস্তুর ধারণা সাধারণে করিতে পারিল না। সে "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং" মন্ত্র হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে পারিল না। রূপ নাই, আকার নাই, আলম্বন নাই—সে চিন্তার অভ্যাস করা সাধারণের বাস্তবিকই সাধ্যাতীত। সান্ত সসীম পরিচ্ছিন্নচিত্তে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসম্ নিত্যমগন্ধবচ্চ তৎ" এ অদ্বয়তত্ত্ব প্রতিফলন মানব-সাধারণের একরূপ অসম্ভবই।

অদ্বৈতবাদিমতে মায়োপাধিক ব্রহ্মোপাসনাই ঈশ্বরোপাসনা। নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সগুণ সাকার সবিশেষ পরমেশ্বর-রূপে উপাস্য হইলেন। † সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, কর্ম্মফলে বাসনা না রাখিয়া ঈশ্বরের উপাসনাই জগদ্বাসীর প্রতিপাল্য ধর্ম্ম। জগতের স্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি—তাঁহাকে লাভ জীবের সার পুরুষার্থ।

রূপকোপাসনা।

সারূপ্যমূলক উপাসনার নাম রূপকোপাসনা। ব্রহ্মের সহিত অভেদ দৃষ্টিতে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতির যে উপাসনা তাহা সারূপ্যমূলক উপাসনা নহে। ভেদদৃষ্টি রাখিয়া

† নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম অনেকে মানেন না।

পরস্পরের সাদৃশ্য-কল্পনাকেই সারূপ্য বলে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক ভেদে এই সারূপ্য তিনপ্রকার। আধ্যাত্মিক যথা—"মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত ইতি অধ্যাত্ম।"। মনের চারিটি পাদ—বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ। আধিদৈবিক যথা—"আকাশ ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত ইত্যাধিদৈবিক"। আকাশের চারিটি পাদ—অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও দিক্।"

পৃথিবী প্রভৃতিকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা আধিভৌতিক। রূপকের ধর্ম্ম এই; ভেদ সত্ত্বেও তাদাত্মবুদ্ধি করিতে হইবে। উপাসক সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি পৃথিবী প্রভৃতিকে ব্রহ্মের সহিত ভিন্ন ভাবিয়া অথচ সূর্য্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিবে। রূপকোপাসনাচ্ছলে "সূর্য্য ব্রহ্ম নহে," "আদিত্য ব্রহ্ম নহে" এইরূপ ধারণাই হওয়া চাই। ভেদজ্ঞানসত্ত্বেও সাধর্ম্ম্যবশতঃ তাদাত্মবোধই রূপক। বলা বাহুল্য আমাদের প্রতিমা-পুজা রূপকোপাসনা নহে। কেননা প্রতিমায় ব্রহ্মের পূজাই প্রতিমা-পুজা। প্রতিবিম্বই প্রতিমা শব্দের অর্থ। ব্রহ্মের সহিত প্রতিমার ভেদবুদ্ধি করিয়া উপাসনা ব্যবস্থিত নহে। ব্রহ্মের আলম্বন অবলম্বন বা আশ্রয় মনে করিয়া প্রতিমাধারে ব্রহ্মের উপাসনায়—ব্রহ্মের সহিত প্রতিমার অভেদবুদ্ধিই সূচিত হয়। দুর্গা কালী কৃষ্ণ রাম শিব গণেশাদিকে পরমেশ্বরেরই মূর্ত্তিভেদ ভাবিয়া আমাদের যে উপাসনা—তাহার সহিত রূপক উপাসনার মৌলিক প্রভেদই বর্ত্তমান। ভেদবুদ্ধি—পরমেশ্বর নানা—এই প্রকৃতি-পার্থক্য মনে রাখিয়া যদি প্রতিমা-পুজা করা যায়, তাহাকে রূপকোপাসনা বলা যাইতে পারে। ইয়ুরোপ আরবাদি দেশে ঐ রূপকোপাসনার মত প্রতিমা-পূজা (যাহার নাম পুতুল-পূজা বলাই উচিত) দেখা যাইত বলিয়াই যীশু মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ ঐ পুতুল-পূজার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বেদোপনিষদের রূপকোপাসনা এক্ষণে প্রচলিতই নাই।

প্রকৃতি-উপাসনা।

প্রকৃতি জড় ও চিন্ময়ী। চৈতন্যের সহিত পৃথক্ করিয়া দেখিলেই প্রকৃতিকে জড়, অভিন্ন দেখিলেই চিন্ময়ী। চৈতন্য বা পরমেশ্বরের সহিত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবিয়া ভিন্নবোধে উপাসনাই জড় প্রকৃতির উপাসনা। ভেদ-বুদ্ধিসত্ত্বেও সারূপ্যবোধ বা সাদৃশ্য-বুদ্ধি রূপকোপাসনার ধর্ম্ম। জড় প্রকৃতির উপাসনায় ঐ সারূপ্যবোধ বা সাদৃশ্যবুদ্ধি নাই—ইহাই পরস্পর পার্থক্য। তবে প্রকৃতিকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া, চিন্ময়ীও যে, পরম পুরুষও সেই ইহা মনে

রাখিয়া উপাসনা করিলে সে উপাসনা জড় প্রকৃতির উপাসনা হইল না। জড় প্রকৃতির উপাসনাই প্রকৃতি-উপাসনা। চিন্ময়ী প্রকৃতিই ব্রহ্মশক্তি, পুরাণের মহামায়া। অগ্নিও যে, দাহিকাশক্তিও সে। বস্তুগত্যা এক্ষণে জড় প্রকৃতির উপাসনার প্রচলনও দেখা যায় না।

জগন্মাতা উপনিষদের আত্মজ্ঞান-প্রচার সর্ব্বসাধারণে ঠিক অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী উপাসনা করিতে পারিল না। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিময়ী ভগবদ্গীতা, আখ্যায়িকা-অবলম্বনে ধর্ম্মোপদেশক পুরাণ, কলিযুগের সরল সাধনা-পথনির্দ্দেশক তন্ত্র প্রণীত হইয়া সাধারণ উপাসনার সৌকর্য্য সম্পাদিত হইল।

বেদোপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, দর্শন প্রভৃতি নানাশাস্ত্রের মত সমন্বয় করিয়া অধিকারী অনধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান উপাসনা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা এক্ষণে সাধারণতঃ প্রচলিত নাই, রূপকোপাসনা জড় প্রকৃতির উপাসনা ত উঠিয়াই গিয়াছে। এক্ষণে যে উপাসনা বিহিত আছে তাহার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনার মহীয়ান্ ভাব আছে। গায়ত্রী, যাহা ব্রাহ্মণের নিত্য পাঠ্য, তাহা ব্রহ্মোপাসনা। সূর্য্যেরও বরেণ্য সেই স্বপ্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মের তেজ ধ্যান করি,—ইহা ব্রহ্মেরই উপাসনা। বর্ত্তমান প্রতিমা-পূজার মধ্যে ঐ রূপকোপাসনা ও প্রকৃতি-উপাসনারও বিশুদ্ধ ভাবটি যে একেবারে লওয়া হয় নাই, তাহাও বলা যায় না। অতীতের বিষয়কে একেবারে ত্যাগ না করিয়া কোন না কোন প্রকারে তাহাকে বর্ত্তমানের মধ্যে গ্রহণ করিয়া সমন্বয়-বিধান করাই আর্য্য-মনীষীদের উদ্দেশ্য ছিল।

প্রতিমা-পূজা।

অবতারবাদ প্রতিমা-পূজা ঈশ্বর-উপাসনারই প্রকারভেদ মাত্র। পরিপূর্ণতার ইয়ত্তা করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে, তজ্জন্য খণ্ডশঃ বিভক্ত করিয়া পরিপূর্ণতার উপদেশ করা হইয়াছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা করিতে হইলে মানচিত্র দেখা আবশ্যক হয়।

কার্য্য-কারণেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র মানিলে কার্য্যোপাসনাও কারণেরই উপাসনা। আর কার্য্যকে কারণ হইতে পৃথক্ ভাবিলে কার্য্যদৃষ্টেই কারণের জ্ঞান, কার্য্য-লিঙ্গেই কারণের অনুমান। সাগরে যাইতে (অবশ্য জলপথে) হইলে নদীমুখ দিয়াই যাইতে হয়। সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতে হইলে স্থূল লক্ষ্যভেদের শিক্ষাই অগ্রে আবশ্যক হয়

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

অনুষ্ঠান ও ভাবমূলক উপাসনা।

উপাসনা অনুষ্ঠান ও ভাবাত্মক। সাধারণতঃ উপাসনা প্রথমে অনুষ্ঠানাত্মিকা হওয়াই কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা, গায়ত্রী, জপ, তপ, ব্রত, যাগ, যজ্ঞ, প্রাণায়ামাদি যোগ, অনুষ্ঠানমূলক উপাসনা। পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস, বিষয়ে অননুরক্তি, ঈশ্বরে কর্ম্মফলার্পণ, বাক্যবিচার—এ সমস্ত ভাবমূলক উপাসনা। অনুষ্ঠানের মধ্যে ভাব থাকা চাই। আবার ভাবের মধ্যে অনুষ্ঠান থাকাও চাই। উত্তম-শ্রেণীর সাধকের লোক-সংগ্রহের জন্যও অনুষ্ঠান ত্যাগ করা উচিত নহে। চিত্তজয়ের দুইটি উপায়ই আচার্য্যেরা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। একটি যোগাদি অনুষ্ঠান, অপর বাক্যবিচারাদি ভাব। অধিকারি-ভেদ-অনুসারে কেহ অনুষ্ঠানকে, কেহবা ভাবকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিবেন।

যাহাদের আসক্তি প্রবল, চিত্তের বেগ প্রখর, অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত, প্রাণ চঞ্চল, ইন্দ্রিয় অশান্ত, তাঁহারা মুখ্যতঃ অগ্রে যোগাদি অনুষ্ঠানটিকে আশ্রয় করিবেন। ভাব গৌণভাবে অবলম্বন করিলেই চলিবে। আর যাঁহাদের আসক্তি সর্ব্বদা সমভাব, চিত্তবেগ স্তিমিত, অন্তঃকরণ বিষাদাচ্ছন্ন, নিস্তেজ, তাঁহাদের পক্ষে প্রধানভাবে বাক্যবিচারাদি ভাব অবলম্বনই শ্রেয়স্কর।

উপনিষদের ভাবমূলক উপাসনার একটি স্থল দেখাইতেছি—

"দমধ্বং দয়ধ্বং দত্তধ্বমিতি ত্রিবিধোপাসনা।"

দম—ইন্দ্রিয়-সংযম। দয়া—পরদুঃখ-দূরীকরনেচ্ছা। দান—দেশকালপাত্র-ভেদে অনুপকারীকে অনুগ্রহ। দয়াবৃত্তি যাহার স্ফুরিত হয় না সেই নীরস কঠোর চিত্তে ভক্তি-শস্য ফলে না। ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস যে না করে, সে ব্যক্তির শ্রীভগবানে মতি জন্মে না। দান কলিযুগে মহাধর্ম্ম। দরিদ্রকে ধন-দান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়-দান যিনি করেন, তিনি শ্রীভগবানের প্রিয় হন। জীবসেবায় শ্রীভগবানের সেবা।

মানবের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। রুচি প্রবৃত্তি সকলের একপ্রকার নহে। কাজেই উপাসনাও সকলেরই পক্ষে একরূপ হয় না। উপাসনার প্রণালী তজ্জন্য পৃথক্ পৃথক্।

"নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

নদী সকলের গম্যস্থান একই সমুদ্র। জীববৃন্দের মূল লক্ষ্য একই শ্রীভগবান্। কাল-দেশ-অবস্থাভেদে অধিকারীর তারতম্যানুসারে উপাসনার বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে কাহারও নিন্দা করা চলে না। অনুশীলন না করিলে বিদ্যার্জ্জন হয় না। একমনে প্রাণ ভরিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা না করিলে শান্তি-লাভ ঘটে না। উপাসনার ক্রমবিকাশ বিশ্বের পক্ষে স্বাভাবিক। ইহাও শ্রীভগবানের ইচ্ছা।

গীতা ও চণ্ডী।

লেখক—শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

(১)

গীতা, চণ্ডী, দুই ভগ্নী, যমজ জনম,
দুইজনে চিরশান্তি, মোক্ষের আকার।
বাহিরে প্রলয়-গাথা, বিক্রম-করম,
ভিতরে অমৃত-ধারা, পাষাণ-আকার॥

(২)

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম যাঁর মূলে অধিষ্ঠান
তিনিই দেখেন দুঃখে ব্রহ্ম মূর্ত্তিমান।
সে মূর্ত্তি দেখিবামাত্র ঘটে পরিত্রাণ,
এই নীতি শিক্ষা দিতে দুয়ে বিদ্যমান॥

(৩)

"পোড়ায় অনল যদি, ডুবায় সলিল,
বল কি তাদের পাপ হয় এক তিল?"
এই তন্ত্রে, এই মন্ত্রে যার ঘটে মিল
সেই ত করয়ে জয় ব্রহ্মাণ্ড নিখিল॥

(৪)

ত্রিজটা-লম্বিত অই পথিকের তরে
একে একে সাবধানে ধরি সব গুলি
উঠিবে বলিয়া অই কৈলাস-শিখরে—
অনন্ত শয়ান তাই ভোলানাথ ঢলি।

(৫)

ভোলানাথ,—ভোলানাথ, সবি ভুলে রয় ;
কেবলি জটার ধারা রাখেন বিস্তার ।
সে জটাতে মহামায়া কতই আশায়
দিতেছেন ব্যর্থ কর, তরে পরিষ্কার ॥

(৬)

ব্রহ্মের উপাধি মায়া, আত্মার আকার
এ দুই বিফল ওগো শিব-জটা-পাশে ।
মহামায়া, জটাধর, দুয়ে অনিবার
আহা কি অব্যক্ত তত্ত্ব নিগূঢ়ে বিকাশে ॥

(৭)

জটার সে জোট্ কভু খোলা নাহি যায় ;
একইরূপে একাকার পড়ে সদা রয় ।
মহামায়া কত যত্নে সেবিছেন তায়—
তবুও জটার জোট একই ভাবময় ॥

(৮)

দেব-দেব মহাদেব, এইরূপে অই,
মহামায়া বামে লয়ে বিরাজিত সদা ।
তা দেখে দেবতা যত ধ্যান মগ্ন হই,
পিইছেন মহাসুখে সৃষ্টিতত্ত্ব-সুধা ॥

(৯)

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-যোগ, এই তিন খাঁড়া,
জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু আর,
মন-অসুরের সাথে করি ফাঁড়া ফাঁড়া,
ব্রহ্মকুণ্ডে নিমজ্জিয়া করয়ে সংহার ।

(১০)

এই তত্ত্ব প্রচারিতে চণ্ডী আর গীতা
মর্ত্ত্যভূমে বিরাজিতা অতুল-গৌরবে ।
সাধক বিনম্রশিরে ভাবি পরিত্রাতা
লভুক আশ্রয় তায় ; জন্ম ঘুচে যাবে ॥

ব্রহ্মচর্য্য ।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তর্কবাগীশ ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপস্থ ইন্দ্রিয়ের সংযম সমধিক-পরিমাণে সংসাধিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইদানীন্তন যুগে ষোড়শবর্ষীয় বালক হইতে আরম্ভ করিয়া জরা-কবলিত পরিণত-বয়স্ক স্থবির পর্য্যন্ত সকলের মুখেই জননেন্দ্রিয়ের অসংযম শব্দের বিশাল প্রসার দেখিয়া তাহাই বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য এবং উপকারিতা ও অপ-কারিতা শ্রোতা ও পাঠকবর্গের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রোথিত করিবার জন্য তাহাকেই প্রধানভাবে ব্রহ্মচর্য্যরূপে বিবৃত করিতেছি। বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য। শাস্ত্রকারগণও এই গীত গাহিয়াছেন,—"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্"। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় এই বীর্য্যধারণের অভাবে মনুষ্যশক্তির অপচয় হয় কেন ? আমরা শরীর-রক্ষার জন্য যে সকল বস্তু আহার করিয়া থাকি সেই ভুক্ত বস্তু সকল গলদেশ হইতে কণ্ঠনালী দ্বারা ক্রমে ক্রমে আমাশয়ে যাইয়া পরে পক্বাশয়ে উপস্থিত হয়, সেস্থানে জঠরানলের উত্তাপে সেগুলি পক্বতা লাভ করিয়া দুই অংশে বিভক্ত হয়। তাহাদের নাম প্রসাদ ও অসার। তাহার সারাংশটী প্রসাদ ; ঐ প্রসাদ রসে পরিণত হয় ; ঐ রস স্রোতোবাহী শিরা দ্বারা যকৃৎ (Liver) স্থানে যাইয়া উপস্থিত হয় ; তথায় রঞ্জক পিত্ত কর্ত্তৃক অশুদ্ধাংশাপসারণে পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া পুনরায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হৃদয়বাহী ধমনী দ্বারা হৃদয়ে উন্নীত হইয়া শ্বাস বায়ু দ্বারা লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হয় ; উহা গাঢ় হইয়া রক্ত-সংজ্ঞা লাভ করে। অসার অংশটী তরল ও কঠিন এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া তরল অংশ মূত্রাশয়ে যাইয়া মূত্ররূপে পরিণত হইল এবং কঠিন অংশ মলা-শয়ে যাইয়া বিষ্ঠারূপে পরিণত হইল। এই স্থলে দেখা যায় যতটা রস থাকে তাহার এক চতুর্থাংশ শোণিতও তাহা দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। ঐ রক্ত পরে মাংসে পরিণত হয় ; এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত অংশ নিয়মিতভাবে রক্ষিত হয়। পরে ঐ মাংসই মেদঃস্বরূপাবস্থা ধারণ করে, ঐ মেদঃ ক্রমান্বয়ে অস্থিতে পরিণত হয়, এবং ঐ অস্থিই মজ্জারূপে পরিণত হয় ও ঐ মজ্জাই শুক্ররূপে পরিণতি লাভ করে। এই শুক্রই মনুষ্যের একমাত্র জীবনী শক্তি এবং ঐ শুক্র হইতে ওজঃ কান্তি লাবণ্যাদি কোমল গুণ সকলের উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবতারাও সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণপাতে অশেষ ক্লেশ অঙ্গীকার করিয়া ঐ অমূল্য শুক্র লাভ করিবার জন্য কঠোরতপশ্চরণ করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে এই বিষয়ে প্রভূত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশ বলিতেছেন—

"রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততোমজ্জা তস্যাঃ শুক্রং প্রজায়তে॥
তস্মাদোজঃ সমুৎপন্নমিত্যাদি——"

অশেষতত্ত্বদর্শী যোগশাস্ত্র-প্রণেতাও বহু গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ" শুক্র-নাশ হইলে মানুষের মৃত্যু এবং শুক্র-ধারণে মানুষের জীবন নিশ্চিত আছে। শরীরের সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে স্নায়ু, পাকস্থলী, হৃদয় এবং মস্তক চারিটী যন্ত্রই প্রধান। শুক্র নাশ হইলে যন্ত্র-চতুষ্টয়ের উপরেই কঠিন আঘাত লাগিয়া থাকে। তুচ্ছ কামজনিত সুখ ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুর চাঞ্চল্যের জন্য হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করিলে তাহারা নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরের স্নায়ু-সমূহে ভূয়োভূয়ঃ আঘাত লাগায় সমস্ত দেহই একদা সমধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতার ফলে সমস্ত শরীরের যাবতীয় স্নায়ু এরূপ বলহীন হইয়া পড়ে যে তখন তাহাদের বীর্য্য-ধারণের শক্তি যেন চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন সামান্য কামভাবের উদয় হইলেই এরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, যাহাতে তৎক্ষণেই রেতঃপাত হয় ও অল্প অল্প করিয়া ভয়ঙ্কর ধাতুদৌর্ব্বল্য আসিয়া উপনীত হয়। ক্রমে ক্রমে প্রমেহ স্বপ্নমেহ মধুমেহ প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি সকল আসিয়া তাহার শরীরকে আক্রমণ করে। তাহার পরেও যদি স্নায়ুর উপরে অধিক পরিমাণে আঘাত লাগে তবে পক্ষাঘাত, গ্রন্থিবাত ও অপস্মার প্রভৃতি অতি কঠোর রোগ সকল তাহার সে ক্ষীণ কলেবরকে চির-কালের জন্য অকর্ম্মণ্য করিয়া ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করে। কেবল ইহাতেই ইহার পর্য্যবসান নহে, মনুষ্যগণ যে বিষয়-সুখ-লালসায় আকুল হইয়া বাক্য ও মনের অগোচর অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দকেও তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া থাকে, ব্রহ্মচর্য্য-পালন না করিলে কখনও তাহার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারে না। ধাতুদৌর্ব্বল্য-পীড়িত বীর্য্যধারণে অসমর্থ ব্যক্তির কথা আর কি বলিব? শুক্রের তারল্য-নিবন্ধন স্নায়বিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে সামান্য সঙ্কল্পমাত্রে কিংবা স্ত্রীলোক দর্শনমাত্রে রেতঃপাত হওয়ায় বিষয়-সুখ বা গার্হস্থ্য-সুখ সমূলে উন্মূলিত হয়।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাবী বংশধরগণের চিত্তের দুর্ব্বলতা, শক্তি-শূন্যতা, অসৎ প্রবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখতা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি গুলি চিরকালের জন্য আভরণ হইয়া দাঁড়ায়, তাই তাহারা অনার্য্যজন-জুষ্ট দুষ্কর্ম্ম-সাধনে অনুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে দেখা যায় "সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক-ক্রিয়াঃ॥ দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ উৎসন্ন-কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুমঃ॥" অন্যদিকে অপান বায়ুর সহিত প্রাণ বায়ুর এবং প্রাণ বায়ুর সহিত শুক্রের সম্বন্ধ থাকায় অপান বায়ুর সহিত শুক্রের সম্বন্ধ হইয়াছে, এবং অপানবায়ুর সহিত পাকযন্ত্র ও উপস্থ যন্ত্রের সম্বন্ধ আছে। অপানবায়ু সমাবস্থ হইলে ভুক্ত বস্তু অন্নাদি যথাযথভাবে পাক-প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কখনও অজীর্ণ রোগের উদ্ভব হয় না। কিন্তু বীর্য্য-নাশ-জনিত চাঞ্চল্য অপানবায়ুর ক্রিয়াকে বিকৃত করে বলিয়া ভুক্ত বস্তু পরিপক্ক হয় না, তাই অজীর্ণরোগাক্রান্ত হইয়া মনুষ্যমাত্রই অম্লরোগে ও উদরাধ্মান প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রবকর ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া শূলাদিরোগের একমাত্র আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়। অজীর্ণের পরিণতিই বহুমূত্র শিরোরোগ ধাতুরোগ দৃষ্টিহীনতা রক্তবিকার অর্শ ক্ষয় প্রভৃতি যাবতীয় রোগের উৎপাদক হইয়া থাকে। এই সকল গুরুতর দুঃখদায়ক ব্যাধির করাল-কবলে নিরন্তর নিষ্পেষিত হওয়ায় হৃদয় এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, মনুষ্যমাত্রেরই শরীর ধারণ করা অতিশয় ভারযুক্ত দুঃখাবহ ও দারুণ অশান্তিময় বলিয়া মনে হয়। এবং একটু চিন্তা করিলে অপান বায়ুর বিকার হইতে পায়ুযন্ত্রেও বিবিধরোগের উদ্ভব দেখা যায়। যথাসময়ে পুরীষ ত্যাগ না করিলে অধিক পরিমাণে দাস্ত হয়, অথবা দাস্ত বন্ধ হইয়া যায়; তাই উদরে শূলানিখাতবৎ বেদনা হইয়া থাকে। যাদৃশ উত্তাপ থাকিলে ভুক্ত অন্নাদি সম্যগ্রূপে পরিপাক-প্রাপ্ত হয়, বীর্য্য-নাশ হইলে শারীরিক সেই উত্তাপের অভাব হয় বলিয়া পিত্তের শক্তি বিনষ্ট হয় ও কফের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং পাকযন্ত্রের কার্য্যকারিতা না থাকায় দুর্ব্বলপিত্ত ব্যক্তির অজীর্ণ ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়।

শুক্র-নির্গমনকালে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে, যেহেতু হৃদয়ই রক্তের মূলস্থান। যেরূপ দুগ্ধের সার নবনীত, সেরূপ রক্তের সার শুক্র। ঐ শুক্রের নাশের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের সারবত্তা পূর্ণ করিবার জন্য হৃদয়-যন্ত্র হইতে প্রবাহ-রূপে

রক্ত নির্গত হয়। ঐ রক্তপ্রবাহ নির্গত হওয়ায় হৃদ্‌যন্ত্রে যে দারুণ আঘাত লাগে তাহাতে ক্ষয়-কাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে মৃত্যুর মুখে উপনীত করে। অন্যদিকে শুক্রের অভাব হইলে মজ্জা আসিয়া ঐ স্থান পূর্ণ করে ও অস্থি আসিয়া মজ্জার স্থান পূর্ণ করে, এবং মেদ আসিয়া অস্থির স্থান পূর্ণ করে ও মাংস আসিয়া মেদ-স্থান পূর্ণ করে এবং রক্ত মাংসরূপে আসিয়া মাংসের স্থান পূর্ণ করে ও রস আসিয়া রক্তের স্থান পূর্ণ করে। এই ক্রমে উত্তরোত্তর অপরিপক্ক ধাতু আসিয়া প্রত্যেক ধাতুর স্থান পূর্ণ করায় সকল ধাতুই পরিপাকের অবসর না পাওয়ায় ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই নিদানকার বলিয়াছেন—"অতিব্যবায়িনোবাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ। ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ ॥" বীর্য্য-নাশে মস্তিষ্কযন্ত্রে অতিশয় আঘাত লাগে, মস্তিষ্ক যন্ত্র সকল শরীরের উত্তমাঙ্গ বলিয়া শরীরের যাবতীয় পদার্থের সারাংশ দ্বারা উহা পরিপূর্ণ এবং উক্ত যন্ত্রই স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থান। তাই শুক্রের অপচয় হইলে মস্তিষ্ক সারশূন্য ও দুর্ব্বলতার আধার হইয়া পড়ে। সুতরাং স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি ও প্রতিভা সকলই নাশ-প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য অকিঞ্চিৎকর সামান্য পরিশ্রমেই অবসন্ন হয় ও মস্তক-ঘূর্ণন আরব্ধ হয়। অনেক সময় পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই মনোনিবেশ করিতে পারে না। কোন কথাই বহুকাল পর্য্যন্ত স্মরণ রাখিতে পারে না। সামান্য কথাতেই বিরক্তি উপস্থিত হয়। ধৈর্য্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বভাবটী সাতিশয় রুক্ষ, ক্রোধন ও ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে; এবং অন্তঃকরণটী উন্মাদ-রোগগ্রস্তের ন্যায় সর্ব্বদা অত্যন্ত চঞ্চলতাকে আশ্রয় করে। উন্মাদ-চিকিৎসাগারে রোগীদিগের যেরূপ চিত্তের চাঞ্চল্য থাকায় তাহারা কোন একটা কার্য্যও বিশেষ অভিনিবেশের সহিত সম্যক্ সম্পাদন করিতে অশক্ত—সেইরূপ নষ্টশুক্র ব্যক্তিও মনোনিবেশ করিয়া কোন একটী কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারে না। উন্মাদ-রোগীদিগকে পরীক্ষা করিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি হয় শুক্রের অভাবই তাহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ। সুতরাং শুক্রের অভাব সকলকেই ঐ অবস্থায় উপস্থিত করে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মস্তিষ্ক সকল স্নায়ুর কেন্দ্রস্থান বিধায় মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে সকল স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এবং ইন্দ্রিয় সকলও তখন আপনা হইতেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহার কারণ এই যে প্রত্যেক স্থূলেন্দ্রিয়েরই স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধ, সুতরাং মস্তিষ্ক সবল থাকিলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারে।

কিন্তু দুর্ব্বল-মস্তিষ্কের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গুলিই বিকৃত হয় বলিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যেন অসামান্য দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা একমাত্র শুক্রনাশের ফল ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। আজ যে ভারতবর্ষে সনাতন আর্য্যশাস্ত্রে নানাবিধ সন্দেহ হওয়ায় অনন্ত মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে ইহার প্রধান কারণ ভারতবাসীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে স্মৃতিশক্তির অপচয় সংঘটিত হইলে গুরুমুখ-পরিশ্রুত শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্মৃতিপথে উদিত না হওয়ায় প্রতিভাবান্ পণ্ডিতমণ্ডলী স্বকীয় বুদ্ধি-প্রভাবে নূতন নূতন সিদ্ধান্ত করায় সহস্র সহস্র মতভেদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টিদ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তের অপলাপ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।

শুক্রের মধ্যে তৈজস অংশ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, যাহার সঙ্গে নিয়মিতরূপে জীবনী শক্তি, দৈহিক উত্তাপ ও চাক্ষুষ তেজ এই তিনটী সম্বন্ধ। সুতরাং শুক্রের অপচয় হইলে এই তিনের শক্তি বিকারগ্রস্ত বা বিলুপ্ত হয়। প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হইলে মুখচ্ছবি, তেজ, কান্তি ও শ্রী হীন হয়, সমস্ত শরীর রুক্ষ ও পরুষ-আকৃতি বলিয়া মনে হয়। চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট হয়, মুখ ভাঙ্গিয়া যায় ও শরীর অতিশয় কৃশ হয়, এবং সমস্ত শরীর যেন শক্তিহীন বলিয়া প্রতীত হয়। শব্দ-ও-মন্ত্রোচ্চারণ-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। গলা বসিয়া যায় ও কণ্ঠস্বর-ভঙ্গ হয়।

(ক্রমশঃ)

ভবানী পাঠক ও রামকৃষ্ণ।

[লেখক—শ্রীদীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।]

ভবানী পাঠক

তুমি পরমহংস, তুমি কামিনী-কাঞ্চনকে একবারে বাদ দিতে পার, কিন্তু আমার মতে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইলে দুইই জগতে অমূল্য বস্তু হয়,—মোক্ষপথের সন্ধানদাতা হয়। জগতে আমরা কিছুই বাদ দিব না, সবই ব্যবহার করিব, কিন্তু স্বার্থে নয়, পরার্থে; কোনও মহান্ ব্রত সাধনের জন্য; ভোগের জন্য নয়। তাই আমি প্রফুল্লকে ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও কঠোর সাধনা দ্বারা এমনি-

ভাবে তৈয়ারী করে তুলিলাম যে, শেষে সে অগণিত ধন লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতে শিখিল; অবশেষে সব ঐশ্বর্য্য নর-নারায়ণকে অর্পণ করিয়া নিজে মুক্তিলাভ করিল।

রামকৃষ্ণ

বুঝিলাম,—তোমার কথা সবই মানিলাম। কিন্তু যেস্থানে অল্প জলে নামিলেই কাদা লাগিবার সম্ভাবনা, সেস্থলে না নামাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে কি? স্বয়ং তুলসীদাস পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—

"দিন্‌কা মোহিনী রাত্‌কা বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউড়া হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥"

অনেকে জনকরাজার আদর্শকে স্মরণ করেন, কিন্তু জনক রাজা হওয়া কি মুখের কথা? সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে বাস করিলেও সময়ে সময়ে নির্জ্জনে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হয়।

ভবানী পাঠক

আমি ওভাবে মুক্তির প্রয়াসী নই, আমি মুক্তির প্রয়াসী—সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, কঠোর সংযম প্রভৃতি দ্বারা ভারতের প্রাচীন আর্য্য-শক্তিকে অর্জ্জন করিয়া সেই শক্তির ব্যবহার দ্বারা। এই শক্তিকে একবার যে লাভ করিবে, তাহাকে সংসারে রাখ, অরণ্যে রাখ, রাজভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে রাখ,—সর্ব্বত্রই সে সমভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিবে; কোন ধর্ম্মেরই অপব্যবহার করিবে না। তাহার প্রমাণ দেখ,—আমার স্বহস্তে শাণিত অস্ত্র প্রফুল্ল। প্রফুল্লকে শিক্ষা-দীক্ষায় এমনি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলাম যে, তাহার শক্তির নিকট শক্তিমান্ বৃটীশ সিংহকেও সময়ে সময়ে পরাস্ত হইতে হইয়াছে। তাই প্রফুল্ল সময়ে "ওপি, ও প্রফুল্ল! ও পোড়ার মুখী! আবার সময়ে রাজরাণীবেশে—দেবীচৌধুরাণী। বৈদিকযুগে রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণের কঠোর জিতেন্দ্রিয়তার আদর্শই অবশেষে ইন্দ্রজিৎ বধে সমর্থ হইয়াছিল। যে রোগী ঔষধ ব্যবহার করিতে জানে না, সে সর্ব্বনাশের পথই পরিষ্কার করে, আর যে উহা ব্যবহার করিতে জানে, সে মুক্তি পায়।

রামকৃষ্ণ

তুমি অবশ্য প্রকৃতিকে যেভাবে গড়িয়া তুলিয়া তারপর তাহাকে পার্থিব ভোগ-সুখের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলে, তদ্দ্বারা একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইয়াছ। আমিও পুরুষকে যে শক্তি দান করিয়াছিলাম, সেই শক্তির বলে সে বিরাট্ ভোগবিলাসী জাতিকে স্তম্ভিত ও পরাস্ত করিয়া আসিয়াছে। তোমার বাক্য ও মতও ভ্রান্ত নয়; প্রকৃতি ও পুরুষ, কামিনী ও কাঞ্চন ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কঠোর তপস্যা একান্ত প্রয়োজনীয়; একথা আমিও স্বীকার করিব।

চরিত্র-বল।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

জগতে সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্র-বলই প্রধান। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ব্রহ্মচর্য্য, সৎ শিক্ষা এবং সৎ সঙ্গ ব্যতীত চরিত্র গঠিত হয় না। পাঠ্যাবস্থাই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা। ঐ সময় ইন্দ্রিয়ের অসংযম, বিলাসিতা, গন্ধমাল্য-ব্যবহার, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, দিবানিদ্রা, কুৎসিত আলাপ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বেশভূষা এসব একবারে নিষিদ্ধ। কঠোরতার মধ্যদিয়া চিত্তবল সঞ্চয় করাইয়া ছাত্র-দিগকে সংসারে প্রবেশ করানই শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের উদ্দেশ্য। সংসারে অনেক আঘাত সহ্য করিতে হয়, তাহা সহ্য করিবার শক্তি-সঞ্চয়ের জন্যই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রহ্মচারীর জীবন এমতভাবেই গঠিত হইত যে, সাংসারিক আঘাত তাহার নিকট গুরুতর বোধ হইত না। আর সংযম-বলে দেহ, মন এত সবল হইত যে, সহসা জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিত না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ব্রহ্ম-চারীকে প্রতিনিয়তই গুরুর নির্ম্মম আদেশ পালন করিতে হয়। ভূমিশয্যায় বা কুশ-শয্যায় বাহু-উপাধানে শয়ন করিতে হয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে ছত্র ও জুতার ব্যবহার নিষিদ্ধ। কত কঠোরতা বুঝুন, কিন্তু তবু তাহার তাহাতে অসন্তোষ নাই, শান্তিময় জীবন। পূর্ব্ব হইতে কঠোরতা সহ্য না হইলে, একবারে কেহ কঠোরতা-সাগরে পতিত হইলে, সহন-শক্তির অভাবে তাহার মৃত্যুও হইতে পারে। যাহার পাঁচ সের ভার বহনের ক্ষমতা নাই, তাহার স্কন্ধে এক মণ

ভার দিলে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়। সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ ছাত্রজীবনেই ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া যাহা কিছু ঘাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহার বিশেষ কষ্টকর হয় না। যে এক সময় বিনা ছত্রে প্রচণ্ড রৌদ্রে, বিনা জুতায় কুশাঙ্কুর-সঙ্কুল উত্তপ্ত ভূমিতে ৪। ৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছে, তাহাকে যদি ছত্র ও জুতা লইয়া এক ক্রোশ পথ যাইতে হয়, সেটা তাহার পক্ষে কষ্টকর নহে। যে এক সময় জীবন-রক্ষার উপযোগী হবিষ্যান্ন-ভক্ষণে জীবন-যাপন করিয়াছে, সংসারাশ্রমে, তাহার যদি খাদ্যের কিছু ত্রুটী হয়, তবে সেটা তাহার পক্ষে কিছুই নহে। যে এক সময় কঠোরভাবে ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়াছে, ধর্ম্মপত্নীসহায়ে সে সমধিক প্রফুল্ল ও সুখী। গুরু-সমীপে বাস ও ব্রহ্মচর্য্য, অন্তেবাসীর চরিত্র সুগঠিত করিয়া তুলে। জীবনের অপার সুখশান্তি, সবল ইন্দ্রিয় মন, মধুময় জীবন, অপার্থিব সংযোগ। হিন্দুরাজার রাজত্ব গিয়াছে, দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রবেশ করিয়াছে। আর সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই। "শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং"—শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, এখন যৌবনেঽভ্যস্তবিদ্যানাং" "প্রৌঢ়েতু বিষয়ৈষিণাং"। এখন সংযম নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই, বিলাসিতা-বর্জ্জন নাই, যোষিৎ-প্রসঙ্গ-বর্জ্জন নাই, গন্ধমাল্য-ত্যাগ নাই, বেশভূষা-পরিহার নাই, এখনকার পাঠ্যাবস্থা বিলাসিতার পরিপোষক। দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ সবল। অল্পবয়সেই ইন্দ্রিয়শক্তি হীনতাপ্রাপ্ত, কুব্জপৃষ্ঠ, দেহ শক্তিহীন, কষ্ট মাত্রেই অসহ্য। এমন কি শারদ শশীর কিরণও অসহ্য। নিজেই অসমর্থ, সে আর পরের উপকার করিবে কি? বিদ্যা শেষ হতে হতেই, যমের খাতা বাহির হয়। সন্তান যদি দুই একটি হয়, তাহারা অকালেই সংসারধাম ত্যাগ করে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, স্বদেশভক্তি, স্বজাতিপ্রীতি পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত!

এখন দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য সৌখিন বিলাস-দ্রব্য ঢুকেছে, আর কি রক্ষা আছে? বেশভূষায়, আহারে, গমনে, উপবেশনে, আলাপে পাশ্চাত্য অনুকরণ চলিতেছে। দরিদ্রের ছেলেও যদি কলিকাতায় পড়িতে যায়, সেও যে মতে হোক্ কল্‌কাত্তাই সাজিতে সচেষ্ট। শিব গড়িতে সে বানর হয়। তখন বাপ মার অনুতাপ নিষ্ফল হইয়া উঠে। অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত শিক্ষা, অদ্ভুত চালচলন, দেখিলেই বিস্মিত হইতে হয়। তখন মনে হয়, হায় রে! এরাই ভাবী সমাজের কর্ণধার! চরিত্র-বল না থাকিলে মানব কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সমাজের অনুকরণ-প্রিয়তাই দুর্দ্দশার কারণ। যে

দেশের যেমত জলবায়ু, মানব-প্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলেই হিতে বিপরীত হইবে। অধিকন্তু, বৈদেশিক অনুকরণের ফল, বৈদেশিকদিগের ঘৃণাস্পদ হওয়া। চীন, জাপান প্রভৃতি, বিদেশ হতে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া, সেই সব স্বজাতীয়দিগকে জাতীয় ভাষায় জাতীয় বেশভূষায় শিক্ষা দিতেছে। জগতে বাঙ্গালী জাতি বুদ্ধিমত্তায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু অনেকগুলি দোষ স্বভাবগত হওয়ায় উন্নতির অন্তরায় ঘটিতেছে। পরস্পর বিদ্বেষ, বিবাদ, অনুৎসাহ, আলস্য, বিশ্বাসহন্তৃত্ব, সহানুভূতির অভাব, তজ্জন্য একতার অভাব, বিলাসিতা, আত্ম-বিশ্বাসহীনতা, প্রত্যেকের স্বাধীন হবার ইচ্ছা, নেতার অধীনতায় থাকিতে অনিচ্ছুকতা, অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি দোষ পরিহার না করিলে, জাতির উন্নতি দুরাশা। মানবের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে জাতীয় উন্নতি ক্রমশঃ অগ্রসর হয়।

যদিও বঙ্গবিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটি উজ্জ্বলরত্ন মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন সত্য কিন্তু ছয় কোটির পক্ষে উহা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুতুল্য। দিন দিন ছাত্রদিগের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইতেছে। নায়ক নায়িকার বিচিত্র চরিত্র-চিত্র, নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি, অশ্লীল পুস্তক, ছাত্রসমাজে আজকাল খুব সমাদৃত। সুতরাং চতুর ব্যক্তিরা এই সুযোগে দু'পয়সা রোজগার করিয়া লইতেছে। অনেকে তাহাদের উপর খড়গহস্ত; কিন্তু এ মাহেন্দ্রক্ষণ তারা ছাড়িবে কেন? ইহার পর আর গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিয়া লেখনী মলিন করিতে ইচ্ছা করি না। পাশ্চাত্যেরা মদ খায়, সর্ব্বদা স্ত্রী লইয়া বেড়ায়, তাহারা জিতেন্দ্রিয় নহে সত্য, কিন্তু যাহাতে সমাজের ক্ষতি হয়, তাহারা সেইরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দেয় না। যখনই সমাজের দোষ দৃষ্ট হয়, তখনি তাহারা তৎপ্রতীকারে মনোনিবেশ করে। পূর্ব্বে পাশ্চাত্যদেশে অনেক শিশু-হত্যা হইত, এখন সে দোষ নিবৃত্ত হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রেরই চক্ষু কর্ণের দোষ দেখা যায়। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই তাহার কারণ। পূর্ব্বে অশীতিপর বৃদ্ধেরাও স্ববশ ইন্দ্রিয়ে কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। নৈতিক জীবন চরিত্রবলের উপর নির্ভর করে, সুতরাং চরিত্রবল একান্ত বাঞ্ছনীয়। চরিত্রবলের অভাবে নিজের জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব। তার অসুস্থতা, অশান্তি, সব আছেই। ছাত্রসমাজে চরিত্রবল বর্দ্ধিত না হইলে, ভবিষ্যৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অবশ্য ইহা ভাবিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুসন্ধানেও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ছাত্রসমাজে শতকরা সত্তর জনের স্বাস্থ্য সন্তোষপ্রদ নহে। এই সব কারণে

কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয়-সমূহে ব্যায়ামের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যায়াম, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা এসব চিত্তকে কুপথ হ'তে নিবৃত্ত করে। গৃহে অগ্নি সংযোগ যেমন ভীষণ ব্যাপার, কুসঙ্গও তদ্রূপ ছাত্রদিগের সর্ব্বনাশের হেতু। পাশ্চাত্যেরা ওবিষয়ে খুব সতর্ক, তবে বয়ঃপ্রাপ্তের কথা স্বতন্ত্র। এদেশের ছেলের অভিভাবকগণ, বিদ্যালয়ের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াই মনে করেন কর্ত্তব্য-শেষ হইল। পরে অনবধানতার ফল তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ফল কথা, বাঙ্গালী জাতির উন্নতি প্রার্থনীয় হইলে ছাত্রসমাজের চরিত্রবল যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেদিকে সবাইকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভীম ও কান্ত গুণের দ্বারা সবাইকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য। নিজেদের দোষ নিজেরা দূর না করিলে, পরের দোষ কি? দিন থাকিতে সাবধান হওয়া আবশ্যক। আবশ্যক বোধ হইলে এ বিষয়ে পরে আরও বলা যাইবে।

:০:-

চণ্ডী ও গীতোক্ত নিষ্কামবাদ।

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডুনন্দনদিগকে হৃতরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্য-ভোগ করাইয়া অশ্বমেধাদি রাজসিক যজ্ঞ করাইয়া বাসনা-সংপ্রাপ্তি করিয়া দিয়া ভোগের পথেই মোক্ষমার্গগামী করিয়া দিয়াছিলেন। সশরীরে পাণ্ডুনন্দনগণ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ব-র্গ-গমনেও 'স্ব' 'স্ব' সামর্থ্যানুযায়ী অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ স্বর্গ-গমন করিয়াছিলেন জানা যায়। 'মোক্ষ'-সংপ্রাপ্তি 'নির্ব্বাণ' লাভ ভোগ-কলেবরে হয় নাই বলিয়াই জানি। তবে নিষ্কাম কর্ম্মে কাম্য-বিড়ম্বনা-মুক্ত হইয়াছিলেন মোক্ষ-মার্গাশ্রয়ী হইয়া। আসিয়াছিলেন ভোগ-পথ একটু ফিরাইয়া ভগবদীয় প্রসাদরূপে ভোগ গ্রহণ করিয়া 'ধর্ম্মের' জন্য; ভগবানের উদ্দিষ্ট ধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্যের সহায় হইয়া ভগবানের কার্য্য সাধন করিয়াছলেন।

এস্থলে অবান্তরভাবে একটা কথা মনে হইল। একালের ন্যায় সেকালে ত্যাগ-বৈরাগ্য-সন্ন্যাস-মোক্ষলাভ এত সহজ ও সুলভ হয় নাই। ভগবান

মেধসমুনি, সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্যকে ভেক সন্ন্যাস দণ্ড কমণ্ডলু দিয়া মোক্ষমার্গে অনয়াসলভ্য আশ্রয় দেন নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডুপুত্রগণকে ভেক সন্ন্যাস দণ্ড কমণ্ডলু দিয়া মোক্ষমার্গাশ্রয়ী করিয়া দিতে পারেন নাই। বরং গাণ্ডীব প্রভৃতি লাভ করাইয়া একটা 'কুরুক্ষেত্র' কাণ্ড বাধাইয়া রাজ্য-সম্পদে বসাইয়া দিয়াছিলেন।

একালে শিশু যুবা বৃদ্ধ, সমর্থ অসমর্থ, পুরুষার্থ-সম্পন্ন বা বিপন্ন যে প্রকারেরই হউক, সকলের পক্ষেই ভেক-বৈরাগ্যাশ্রয় দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারণে ত্যাগ সন্ন্যাস ব্রত, এবং অনায়াসলভ্য জীবিকায় জীবন-যাপনে মোক্ষ-মার্গাশ্রয় সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। মোক্ষফল হাতে হাতে প্রাপ্তি হইতেও দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ে জীবিকা-সঙ্কট জীবন-সমস্যার দিনেও জীবিকা-সমস্যায় উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষলাভ হইতেছে। খাদ্য পানীয় ত কোন্ ছার ; মদ্ ভাং গাঁজা পর্য্যন্ত প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বর্ষাধারার ন্যায় অতি সুলভ। বরং ভগবান্ 'ইন্দ্র' বারিবর্ষণেও দরিদ্র কৃষকের প্রতি কার্পণ্য করেন, কিন্তু একালের ধার্ম্মিক দাতারা আলস্য-পোষণ, নেশা ভাং সংস্থান জীবিকা সমস্যায় মোক্ষমার্গাশ্রয়ী বৈরাগ্য-উপজীবি-সাধুসেবায় 'ইন্দ্র' অপেক্ষা 'মুক্ত'হস্ত।

মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য মহাশয়দিগেরও সেস্থানে গিয়া 'ধন্না' দিয়া নেশা-বারণ মাদকদ্রব্য-ভোগ নিবারণ করিবার সাধ্য বা দুঃসাহস নাই।

সেকালে 'শুক', 'প্রহ্লাদ' 'ধ্রুব' ঋষ্যশৃঙ্গ; বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ কালে-ভদ্রে ক্বচিৎ কদাচিৎ জন্মাইয়াছেন, একালে বালসন্ন্যাসীর সংখ্যা করা যায় না। হয় ত আর কিছুদিন বাদে ঘরে ঘরে জন্মাইবে। অথচ এই কালটাকে বলে কলিকাল, ত্রিপাদ অধর্ম্ম! এত অধর্ম্মেও ধার্ম্মিকের সংখ্যাও ত কম নয়!

আরও দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার—পূর্ণাবতার হইয়াও, ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, প্রচারক হইবার দুষ্প্রবৃত্তি অথবা অনধিকারচর্চ্চার সাহস হয় নাই বলিয়া নাকি?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসৃপুত্র ভ্রাতা, শ্যালক, সখাকে তত্ত্বোপদেশ দিয়া উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমূল্য তত্ত্বোপদেশ মহর্ষি ব্যাসদেব ঈশ্বরবাক্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ঈশ্বর স্বয়ং ঋষি মুনিদের নিকট অথবা ব্রজভূমে রাখাল গোপাল গোপ-গোপিনীদের নিকট তত্ত্বপ্রচার করেন নাই। 'রাজা' হইয়া দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণও 'গীতা' প্রচার করেন নাই। 'ঋষি' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধোদ্যম-সময়ে প্রচারিত (স্ব-গত-ভাবে) গীতাবাক্য

কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তিনিই জানেন; লোকসমাজে প্রচার করিয়া-দিলেন। শ্রীভগবান রামচন্দ্রও 'রামগীতা' সহোদর অনুগতজনের নিকট তত্ত্বোপদেশক্রমে প্রচার করিয়াছিলেন। জনসাধারণে প্রচার করেন নাই। মুনি ঋষি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা প্রচার হইয়াছিল। শ্রীভগবানের 'অবতার' এবং 'রাজা' হইয়াও তাঁহারা কাহারও অধিকারে হস্তার্পণ করেন নাই। চাতুর্বিণ্য সমাজ-ধর্ম্ম মান্য করিয়াই, সম্ভবতঃ, অনধিকারচর্চ্চা করতঃ "আচার্য্য" বা "প্রচারক" পদ গ্রহণ করেন নাই। একালে 'প্রচারক' এবং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের সংখ্যা করা যায় না। চাতুর্বিণ্যাধিকারেরও সম্মান ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াও যে উহা সংস্থাপিত তাও সব সময়ে বুঝা যায় না। সিগারেটের দোকানেও সুলভ গীতা প্রচার মাহাত্ম্য 'নিষ্কাম-ধর্ম্মী'র দল বাড়িতেছে নয় ত?

নিষ্কাম ধর্ম্ম কি? নিষ্কাম ধর্ম্মী হ'লে, সংসার-প্রবৃত্ত হবে না? মনুষ্যঋণ পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ ইত্যাদি 'ঋণ' পরিশোধ করিতে হইবে না?

(ক্রমশঃ)

-—:০:-

A paper on the chronology of Kalidasa read before the Jessore Literary Association.

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, টি।

The common sense would suggest that Sakuntala had been written before the medallion was struck. But it has been suggested by the Archaeological Department that the scene is old and perhaps Kalidasa saw it in an old book of an old poet and introduced it into his great drama. What is this argument but a mere personal belief, a dogma which should have no place in any scientific memoir?

It may be seen from the opinions quoted above that personal belief and imagination play more important part in many of the findings of the Antiquarians than sound reasoning. Scholars obsessed with the idea that Kalidasa lived in the fifth century A.D.

refuse to admit the force of any evidence however strong it may be, which goes against their belief. Hitherto no positive evidence has been adduced in support of the age of Kalidasa. Let us try to do so by some quotations from the treatise called Jyotirbidabharanam, written by the great poet himself.

In the concluding portions of the last chapter of the book the poet writes,—

মন্ত্রোঽধুনা কৃতিরিয়ং সতি মানবেন্দ্রে
শ্রীবিক্রমার্ক-নৃপরাজবরে সমাসীৎ।

When Vikramaditya is the king of Malava I write this book.

ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহ-মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

Names of the nine gems of the court of Vikramaditya.

যত্রাধিপাঽজ্জয়িনী মহাপুরী
সদা মহাকাল মহেশ-যোগিনী।
সমাশ্রিত প্রাণ্যপবর্গদায়িনী
শ্রীবিক্রমার্কেঽবনিপো জয়ত্বপি॥

His capital is Ujjayini

Glory to the king Vikrama

যো রুমদেশাধিপতিং শকেশ্বরং
জিত্বা গৃহীত্বোজ্জয়িনীং সমাহবে।
আনীয় সম্ভ্রাম্য মুমোচযত্বহো
সবিক্রমার্কো সমসহ্যবিক্রমঃ॥

He, king Vikrama defeated the king of the Sakas of the country of Rum and brought him as prisoner to Ujjayini and then released him.

শঙ্ক্বাদি পণ্ডিতবরাঃ কবয় স্বনেকে
জ্যোতির্ব্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহ-পূর্ব্বাঃ
শ্রীবিক্রমার্ক-নৃপ-সংসদি মান্যবুদ্ধেঃ
তৈরপ্যহং নৃপসখা কিল কালিদাসঃ॥

There were many learned men like Sanku and Barahamihira etc. in his court and myself the king's counsellor and friend, the poet Kalidasa was also there.

কাব্যত্রয়ং সুমতিকৃদ্রঘুবংশ পূর্ব্বম্
পূর্ব্বং ততোনন্থ কিয়চ্ছ্রুতি কর্ম্মবাদঃ।
জ্যোতির্ব্বিদাভরণ কালবিধানশাস্ত্রং
শ্রীকালিদাস কবিতোহিততো বভূব।

Myself the author of the great Kavyas, Raghubamsam and others, the treatise Jyotirbidabharanam came from the Poet Kalidasa.

বর্ষৈঃ সিন্দুর দর্শনাম্বর গুণৈর্যাতে
কলৌসম্মিতে।
মাসে মাধবসজ্ঞিতে চ বিহিতে
গ্রন্থোপক্রমঃ

In the Kali era of 3068 or 3028 in the month of Baisak, the work (Jyotirbidabharanam) was commenced.

Jyotirbidabharanam. Ch. XXII.

The present kali era being 5026, the poet wrote his work about .33 B. C. taking word দর্শন to indicate 6. But taking the word দর্শন to symbolise 2, the date would be 73 B. C.

This ought to be conclusive. These autobiographical fragments throw a flood of light upon the dark chapter of his age. The name of the poet is there. There is the king Vikrama, the conqueror of the Sakas of the country of Rum and the names of the nine Savants are there with the date.

But some fastidious critics have scented something wrong in such clear statements. They say that this Kalidasa is a different person of comparatively recent date, probably a poet of king Bhoaj's court of the 11th century, The style and language all differ from that of the great poet and that Kalidasa of Jyotirbidabharanam made a false statement in ascribing the authorship of the great epics to him.

The Antiqurians are sometimes inconsistent in their *principles*, Much has been made out of the mention of Amarshinha and Barahamihira in the second sloka quoted above. Attempt has been made on the strength of this sloka and on the supposed dates of these two classics to place Kalidasa in the 5th century A. D. But the succeeding sloka which gives the actual date of the poet is to be disbelived because of some hypothetical objections. Let us examine them in details.

Regarding style and language, it may be said that even a casual reader will not fail to see the hand of a poet in this composition. A glance through the opening chapters will enable the reader to find that the author has used no less than ten different kinds of metres within a space of twice as many pages. There are উপজাতি ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থ বসন্ত তিলক and অনুষ্টুপ all favourate metres of Kalidasa, besides শার্দ্দুলবিক্রীড়িত, দ্রুতবিলম্বিত, শালিনী and many others. The slokas, where no figures have been indicated by symbols, have the true ring of Kalidasa's incomparable diction and style. In fact it seems to be a book written by a poet to illustrate different metres.

Again, supposing that the style differs does it follow as a rule that the hand must be different? Is it impossible, unnatural or

difficult for a versatile genius like the great poet to write in a different style specially when the subject is different altogether? নলোদয় is a Kavya written by কালিদাস। It is full of "artificiality and jugglery of words" and is written in style and diction which is the direct antithesis of that of Kumara or Raghu. I may be excused if I cannot resist the temptation of illustrating what I mean by few extracts. দময়ন্তী was roaming in the forest when forsaken by নল & the extracts express her wailings :—

করমা করমা করমা করমা কলয় বাসনং মম পাহি হরে।
দরতো দরতো দরতো দরতো বিরুতৈর্মরুতাং সুকর! ত্বমপি। (নলোদয়)

Which may be construed as follows :—

ক! রমাকর! মাকরম্ আকরম্ আকলয় ——
দরতঃ অদরতো দরতো দরতঃ বিরুতৈঃ মরুতাং ——

হে রমাকর! লক্ষ্মীপ্রদ! ক! ব্রহ্মন্ মম বাসনং বিপদং মাকরম্ মকরাণাম্ অয়ং তাদৃশ আকরম্ খনিম্ আকরম্ শোকং সমুদ্রং জানীহি। মকরাণাং তস্যা আকরম সমুদ্রং। অপরো অনল্পে যঃ তোয়ো দুঃখং তস্য রতণ উদরন্ অন্ত, ত্বং রক্ষ তাদৃশাং দরতঃ ভয়াৎ বিরুতৈঃ আশ্বাস-বচনৈঃ পাহি রক্ষ।

Similar illustrations are : —

সুন্দরি নিষধেশ! সমূৰ্দ্ধমনা রময়া রময়া রময়া রময়া
ব্যসনঃ উনুপৈমি কদাতু সভীশ না শমন শমনা শমনাঃ।
যমন যমনা যমনা যমনা গভিবীক্ষ্য রতঃ প্রবতীত পরঃ।
সরুষে নিষধ-ক্ষিতিনাথ গমন্নবম নবমা নবম নবমাঃ।
নয়মা নয়ম নয়মা নয়মা ——

Gentlemen, do not think that I have picked up a few isolated slokas from the book for serving the purpose of illustration. The entire book is full of stanzas like this, and every stanza is composed in this wiered style. Where is the usual elegance of style and diction of Kalidasa in this composition? Where is the sweet flow & rich harmony of expressions so essentially characteristic of the poet's other writings? This is the burden of the whole song. You may know that a considerable discussion arose among the critics regarding the witches' scene in Macbeth, witches engaged in brewing their charm in a cauldron. Some said the scene was an interpolation but the competent critics have given their verdict to the effect that the rich

vocabulary, prodigal fancy and terse diction of that scene indicated the hand of a master. I advance the same argument and say that the wiered style, so intensely original and compositionof such a magnitude displaying such consummate scholarship and command over the resources of the language indicate the hand of a master and I hesitate to ascribe the authorship to any one but *the* master himself. So I say, in what respect does Nalodaya resemble Raghubamsam though the author is supposed to be the same in both the cases. The king Bhoja lived in the 11th century A. D. and was a great patron of learning. An astronomer of his court claims that he is the author of Raghubamsam. The audacious statement is swallowed by the great king and his court probably because they have never heard or seen the great work before though it was supposed to have been written in the sixth century according to those critics. Mention of Kalidasa has been made by Banabhatta in his Harsacharita written in the 7th century A. D. in the sloka

নির্গতাসু নবা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু
প্রীতিঃ মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে ॥

But the king Bhoja and his court had no knowledge of it in the 11th century A. D. It is hardly possible and is not worth serious notice.

Another objection has been put forth to the effect that from the rule for finding অয়নাংশ it is clear that the work must have been written at least seven centuries after the Samvat era, meaning probably after the commencement of the Samvat era.

The rule for determining অয়নাংশ or precession of the equinox as given in Jyotirbidabharanam is

শাকঃ শরাম্ভোধি যুগোনিতো হৃতে
মানং খতর্কৈঃ অয়না শকাঃ স্মৃতাঃ ॥

The number indicating saka year less 445 and divided by 60 gives the অয়নাংশ in degree and the remainder is the কলা or minute portion of the অয়নাংশ। The present Saka is 1845, so অয়নাংশ according to this rule is $\frac{1845-445}{60} = \frac{1400}{60} = 23°-20'$ whereas the same according to current Almanacs in Bengal is 21°—20" to 22° 39"

It may be remembered that Indian astronomy is divided into 4 parts, সংহিতা, তন্ত্র, করণ & সারিণী। Jyotribidavaranm is a book of composite structure containing astronomical and astrological matters as well.

It is intended as a guide book for the performances of different rituals and in this respect it differs widely from the Shidhantas which are true Astronomical treatises. So rigid accuracy of the rules should not be expected in such a book.

However let us try to understand the true import of the formula given by the poet. It assumes that in the year 445 of the saka era, the অয়নাংশ was zero and it also assumes the change of precession of the equinox at the rate of 60″ per annum. The above formula expressed in symbols stands thus $\frac{N-445}{60}=X$ when N is the number indicating the particular Saka year and X the অয়নাংশ। So N−445 must be the total number of minutes or কলা of অয়নাংশ। which is only possible if the rate of change is a minute per annum.

Now any person who whould like to give a formula for the determination of অয়নাংশ in such a manner must refer it to some Saka where it would be Zero. According to সূর্য্যসিদ্ধান্ত this year is 421 of Saka era. Other astronomers have referred it to different years where this quantity would be zero. Their rate of precession is also different. Suryya Shidhanta takes it as 54,″ our poet takes it as 60″. "Others have taken it as 58″. A careful study of these different opinions leads to the conclusion that the অয়নাংশ was 'O' sometime in the first half of the fifth century of the Saka era. The complete cycle of the precession of the equinoxes comes about in about 25 thousands years at the rate of 50·24″ as we find in modern treatises on astronomy. So it is but natural that all astronomers would refer it to the nearest zero point available to them. Even an astronomer of the present time, who would like to frame a formula of this nature must refer to the zero point of the fifth century of the Saka era, so there is no justification for the supposition that Jyotirbidhabharanam was written in the 5th century of the same era on the above ground.

It will be evident from the above that theories which eac Kalidasa in the earlier centuries of the Christian era are untenable andmany of them destroy each other. It may also be evident that the orientalists of Europe are very slow in accepting any proof of Kalidasa's age which puts the date back before the Christian era. Reasonings such as those advanced in connection with the Bhita medallion may be regarded as based upon the fallacy of petitio principii, in so much as they presuppose the

conclusion to build up the premises The cumulative effect of the internal evidences is also sufficiently strong to justify the view of the Indian tradition and finally the strong positive evidence as disclosed in the preceeding paragraph in the extracts from Jyotirbidhabharanam leaves no doubt that Kalidasa wrote his immortal dramas and epics in the 1st century B. C. There is no reason why the statement of the poet and astronomer Kalidasa should be disbelieved.

Kalidasa—His life, birth place and early history.

Unfortunately nothing is known of his life and birth place. Epigraphical researches have not yet supplied any information about his parentage, early life or birth place. From internal evidence it has been suggested that he might have lived some where in the neighbourhood of Mandasor. Tradition says that he was an illiterate man in his early life. Scholars of his time after sustaining defeat at the hands of the learned daughter of the king of Gaur (Bidyabati) who took a vow that she would marry one who would excell her in learning, played a trick upon her and managed to make her marry this ignorant and foolish youngman only out of spite. His wife was not to wait long to find out her mistake and a separation took place. Kalidasa afterwards obtained the blessings of the Goddess Saraswati and became the famous poet as we know him now. He returned to his wife and knocked at her door. His wife still under the impression she had before, refused admittance and put the question "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্ বিশেষঃ?" "Have you anything special to say?" Kalidasa, then the adopted son of the Goddess Muse, at once replied to his wife with the extempore composition of his three immortal poems কুমার-সম্ভবম্, মেঘদূতম্ and রঘুবংশম্, each of which begins with each of the three words of the question of his wife respectively i .e. অস্তি, কশ্চিৎ and বাক্। Need I say with what ecstasy of feeling the reconciliation took place?

ভুল।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান কাব্যতীর্থ।

সহস্র লোচন দিয়ে গগনের গায়
চেয়ে থাক মোরে তুমি কত মমতায়
ইসারায় ইসারায় কি কথা জানাও
প্রাণের পরতে কভু পরশিয়া যাও।
ভুলে কেন যাই প্রভু, ভুলে কেন যাই
এই দেখি, এই ভুলি, একিরে বালাই !

মোরে তুমি নিয়ে যাও হাতে ধরে হাত
চিরদিন চিরদিন থাক মোর সাথ,
আমার দুয়ারে নিতি কর আনাগোনা
বুঝি তাহা, দেখি তাহা, নহে শুধু শোনা,
ভুলে কেন যাই প্রভু, ভুলে কেন যাই
এই দেখি, এই ভুলি, একিরে বালাই।

আমারে ছাড়িয়া তুমি নাহি থাক নাথ,
তুমি মোর দুঃখে সুখে রয়েছ সাক্ষাৎ,
আমার বিহনে তুমি না পার থাকিতে
আমার বিহনে তুমি না পার খেলিতে।
ভুলে কেন যাই প্রভু, ভুলে কেন যাই
এই দেখি, এই ভুলি, একিরে বালাই।

——:o:——

খবর রাখিবেন

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গ কেশরী।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

প্রধান সম্পাদক—

বেদান্ত—বাচস্পতি শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল ; সি, আই, ই।

প্রকাশস্থান—

কলিকাতা— ৫৪। ৩ নং কলেজষ্ট্রীট, দাসগুপ্ত এণ্ড কোং

আমরা কি চাই ?

চাই———বঙ্গের গৃহে গৃহে বীর ও বীরনারী।

চাই——ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ভক্তি-প্রেম, জ্ঞান-বৈরাগ্যে, সন্ধি-বিগ্রহে কৃষি-বাণিজ্যে, শিল্প-বিজ্ঞানে শিক্ষা-দীক্ষায় বীর ও বীরনারী।

চাই———কি রণ-ক্ষেত্রে, কি মন্ত্রণা-গৃহে, বঙ্গের ঘরে ও বাহিরে নির্ভীক নিঃস্বার্থ ও সহিষ্ণু যুবক-যুবতী। কি সমুদ্র-তরণে, কি পর্ব্বত-লঙ্ঘণে, কি তত্ত্বাবিস্কারে, কি সামাজিক ও রাজনৈতিক-সংস্কারে——চাই আত্ম-শক্তি, চাই স্থির-সঙ্কল্প ও চাই জ্বলন্ত উৎসাহ।

জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে—কি হিন্দু, কি মোস্লেম, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টান, কি শিখ, কি আর্য্য আমরা বঙ্গের সমস্ত অধিবাসীকেই দেখিতে চাই—

সত্য-সেবক, স্বদেশবৎসল, ব্রহ্মবাদী, ত্যাগী কর্ম্মবীর।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩২শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড
১২শ সংখ্যা।

চৈত্র।

১৩৩২ সাল।
১৮৪৭ শকাব্দাঃ

অপরোক্ষানুভূতিঃ।

শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতা।

লেখক—সম্পাদক।

শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্॥ ১।
অপরোক্ষানুভূতির্বৈ প্রোচ্যতে মোক্ষসিদ্ধয়ে।
সদ্ভিরেষা প্রযত্নেন বীক্ষণীয়া মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ২।
স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ।
সাধনং প্রভবেৎপুংসাং বৈরাগ্যাদিচতুষ্টয়ম্॥ ৩।
ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্॥ ৪।
নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্বিপরীতগম্।
এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যগ্বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ॥ ৫।

সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোঽয়মিতি শব্দিতঃ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে॥ ৬।
বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতির্হি সা।
সহনং সর্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভা মতা॥ ৭।
নিগমাচার্য্য-বাক্যেষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা।
চিত্তৈকাগ্র্যং তু সল্লক্ষ্যে সমাধানমিতি স্মৃতম্॥ ৮॥
সংসারবন্ধ-নির্মুক্তিঃ কথং মে স্যাৎ কদা বিভো।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধির্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা॥ ৯॥
উক্ত-সাধন-যুক্তেন বিচারঃ পুরুষেণ হি।
কর্ত্তব্যো জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ শুভমিচ্ছতা॥ ১০॥
নোৎপদ্যতে বিনা জ্ঞানং বিচারেণান্যসাধনৈঃ।
যথা পদার্থভানং হি প্রকাশেন বিনা ক্বচিৎ॥ ১১॥
কোঽহং কথমিদং জাতং কোবা কর্ত্তাঽস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১২॥
নাহং ভূতগণো দেহো নাহং চাক্ষগণস্তথা।
এতদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১৩॥
অজ্ঞানপ্রভবং সর্বং জ্ঞানেন প্রবিলীয়তে।
সংকল্পো বিবিধঃ কর্ত্তা বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১৪॥
এতয়োর্যদুপাদানমেকং সূক্ষ্মং সদব্যয়ম্।
যথৈব মৃদ্ঘটাদীনাং বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১৫॥
অহমেকোঽপি সূক্ষ্মশ্চ জ্ঞাতা সাক্ষী সদব্যয়ঃ।
তদহং নাত্র সন্দেহো বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১৬॥
আত্মা বিনিষ্কলো হ্যেকো দেহো বহুভিরাবৃতঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥ ১৭॥
আত্মা নিয়ামকশ্চান্তর্দেহো বাহ্যো নিয়ামকঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥ ১৮॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ পুণ্যো দেহো মাংসময়োঽশুচিঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥ ১৯॥
আত্মা প্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্তামস উচ্যতে।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্। ২০॥

আত্মা নিত্যো হি সদ্রূপো দেহোঽনিত্যো হ্যসন্ময়ঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥ ২১॥
আত্মনস্তৎ প্রকাশত্বং যৎপদার্থাবভাসনম্।
নাগ্ন্যাদিদীপ্তিবদ্দীপ্তির্ভবত্যান্ধ্যং যতো নিশি॥ ২২॥
দেহোঽহমিত্যয়ং মূঢ়ো মত্বা তিষ্ঠত্যহোজনঃ।
মমায়মিত্যপি জ্ঞাত্বা ঘটদ্রষ্টেব সর্ব্বদা॥ ২৩॥
ব্রহ্মৈবাহং সমঃ শান্তঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ২৪॥
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিরবদ্যোঽহমব্যয়ঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ২৫॥
নিরাময়ো নিরাভাসো নির্ব্বিকল্পোঽহমাততঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ২৬॥
নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নিত্যমুক্তোঽহমচ্যুতঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ২৭॥
নির্ম্মলো নিশ্চলোঽনন্তঃ শুদ্ধোঽহমজরোঽমরঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ২৮॥
স্বদেহে শোভনং সন্তং পুরুষাখ্যঞ্চ সম্মতম্।
কিং মূর্খ শূন্যমাত্মানং দেহাতীতং করোষি ভোঃ॥ ২৯
স্বাত্মানং শৃণু মূর্খ ত্বং শ্রুত্যা যুক্ত্যাচ পূরুষম্।
দেহাতীতং সদাকারং সুদুর্দ্দর্শং ভবাদৃশৈঃ॥ ৩০॥
অহং শব্দেন বিখ্যাত এক এব স্থিতঃ পরঃ।
স্থূলস্ত্বনৈকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩১॥
অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহো দৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩২॥
অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩৩॥
যস্মাৎ পরমিতি শ্রুত্যা তয়া পুরুষলক্ষণম্।
বিনির্ণীতং বিমূঢ়েন কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩৪॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেতি সূক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে।
অপ্যুচ্যতে যতঃ শ্রুত্যা কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩৫॥

অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকেঽপিচ।
অনন্তমলসংস্পৃষ্টঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩৬॥
তত্রৈব চ সমাখ্যাতঃ স্বয়ং জ্যোতির্হি পুরুষঃ।
জড়ঃ পরপ্রকাশ্যোঽয়ং কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩৭॥
প্রোক্তোঽপি কর্ম্মকাণ্ডেন আত্মা দেহাদ্বিলক্ষণঃ।
নিত্যশ্চ তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে দেহপাতাদনন্তরম্॥ ৩৮॥
লিঙ্গং চানেকসংযুক্তং চলং দৃশ্যং বিকারিচ।
অব্যাপকমসদ্রূপং তৎ কথং স্যাৎ পুমানয়ম্॥ ৩৯॥
এবং দেহদ্বয়াদন্য আত্মা পুরুষঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোঽহমব্যয়ঃ॥ ৪০॥
ইত্যাত্মদেহভাবেন প্রপঞ্চস্যৈব সত্যতা
যথোক্তা তর্কশাস্ত্রেণ ততঃ কিং পুরুষার্থতা। ৪১
ইত্যাত্মদেহভেদেন দেহাত্মত্বং নিবারিতম্
ইদানীং দেহভেদস্য হ্যসত্বং স্ফুটমুচ্যতে। ৪২
চৈতন্যস্যৈকরূপত্বাদ্ ভেদোযুক্তো ন কর্হিচিৎ
জীবত্বং চ মৃষা জ্ঞেয়ং রজ্জৌ সর্পগ্রহো যথা। ৪৩
রজ্জ্বজ্ঞানাৎ ক্ষণেনৈব যদ্বদ্ রজ্জুর্হি সর্পিণী
ভাতি তদ্বচ্চিতিঃ সাক্ষাদ্ বিশ্বাকারেণ কেবলা। ৪৪
উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ। ৪৫
ব্যাপ্যব্যাপকতা মিথ্যা সর্ব্বমাত্মেতি শাসনাৎ
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্ত্বে ভেদস্যাবসরঃ কুতঃ। ৪৬
শ্রুত্যা নিবারিতং নূনং নানাত্বং স্বমুখেন হি
কথং ভাসো ভবেদন্যঃ স্থিতেচাদ্বয়কারণে। ৪৭
দোষোঽপি বিহিতঃ শ্রুত্যা মৃত্যোর্মৃত্যুং স গচ্ছতি
ইহ পশ্যতি নানাত্বং মায়য়া বঞ্চিতো নরঃ। ৪৮
ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ।৪৯
ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ
কর্ম্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জ্জগৌ। ৫০

সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বং চ তথা ভবেৎ। ৫১
স্বল্পমপ্যন্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ
যোঽবতিষ্ঠতি মূঢ়াত্মা ভয়ং তস্যাভিভাষিতম্। ৫২
যত্রাজ্ঞানাদ্ ভবেদ্ দ্বৈতম্ ইতরস্তত্র পশ্যতি
আত্মত্বেন যদা সর্ব্বং নেতরস্তত্র চাণ্বপি। ৫৩
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি হ্যাত্মত্বেন বিজানতঃ
ন বৈ তস্য ভবেন্ মোহো ন চ শোকোঽদ্বিতীয়তঃ ৫৪
অয়মাত্মাহি ব্রহ্মৈব সর্ব্বাত্মকতয়া স্থিতঃ
ইতি নির্দ্ধারিতং শ্রুত্যা বৃহদারণ্যসংস্থয়া। ৫৫
অনুভূতোঽপ্যয়ং লোকো ব্যবহারক্ষমোঽপি সন্
অসদ্রূপো যথা স্বপ্ন উত্তরক্ষণবাধতঃ। ৫৬
স্বপ্নোজাগরণেঽলীকঃ স্বপ্নেঽপি নহি জাগরঃ
দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়োঽপি হ্যুভয়োর্ন চ। ৫৭
ত্রয়মেবং ভবেন্মিথ্যা গুণত্রয়বিনির্ম্মিতম্
অস্য দ্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যোহ্যেকশ্চিদাত্মকঃ। ৫৮
যদ্বন্মৃদি ঘটভ্রান্তিঃ শুক্তৌ বা রজতস্থিতিম্
তদ্বদ্ ব্রহ্মণি জীবত্বং ভ্রান্ত্যা পশ্যতি ন স্বতঃ। ৫৯
যথা মৃদি ঘটোনাম কনকে কুণ্ডলাভিধা
শুক্তৌ হি রজতখ্যাতির্জীবশব্দস্তথা পরে। ৬০
যথৈব ব্যোম্নি নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে
পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্ বিশ্বং চিদাত্মনি। ৬১
যথৈব শূন্যে বেতালো গন্ধর্ব্বাণাং পুরং যথা
যথাকাশে হিচন্দ্রত্বং তদ্বৎ সত্যে জগৎস্থিতিঃ। ৬২
যথা তরঙ্গকল্লোলৈর্জ্জলমেব স্ফুরত্যলম্
পাত্ররূপেণ তাম্রং হি ব্রহ্মাণ্ডৌঘৈস্তথাত্মতা। ৬৩
ঘটনাম্না যথা পৃথ্বী পটনাম্না হি তন্তবঃ
জগন্নাম্না চিদাভাতি জ্ঞেয়ং তত্তদভাবতঃ। ৬৪
সর্ব্বোঽপি ব্যবহারস্তু ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ
অজ্ঞানান্ন বিজানন্তি মৃদেব হি ঘটাদিকম্। ৬৫

কার্য্য-কারণতা নিত্যমাস্তে ঘটমৃদোর্যথা
তথৈব শ্রুতিযুক্তিভ্যাং প্রপঞ্চব্রহ্মণোরিব। ৬৬
গৃহ্যমাণে ঘটে যদ্বন্ মৃত্তিকা ভাতি বৈ বলাৎ
বীক্ষ্যমাণে প্রপঞ্চেঽপি তথৈবাভাতি ভাস্বরম্। ৬৭
সদৈবাত্মা বিশুদ্ধোঽপি হ্যশুদ্ধো ভাতি বৈ সদা
যথৈব দ্বিবিধা রজ্জুর্জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনোঽনিশম্ ৬৮।
যথৈব মৃন্ময়ঃ কুম্ভস্তদ্বদ্দেহোঽপি চিন্ময়ঃ
আত্মানাত্মবিভাগোঽয়ং মুধৈব ক্রিয়তে বুধৈঃ। ৬৯
সর্পত্বেন যথারজ্জু রজতত্বেন শুক্তিকা
বিনির্ণীতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা। ৭০
ঘটত্বেন যথা পৃথ্বী পটত্বেনেব তন্তবঃ
বিনির্ণীতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা। ৭১
কনকং কুণ্ডলত্বেন তরঙ্গত্বেন বৈ জলম্
বিনির্ণীতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা। ৭২
চোরত্বেন যথা স্থাণুর্জলত্বেন মরীচিকা
বিনির্ণীতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা। ৭৩
গৃহত্বেনেব কাষ্ঠানি খড়গত্বেনেব লোহতা
বিনির্ণীতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা। ৭৪
যথা বৃক্ষবিপর্য্যাসোজলাদ্ ভবতি কস্যচিৎ
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ। ৭৫
পোতেন গচ্ছতঃ পুংসঃ সর্ব্বং ভাতীহ চঞ্চলম্
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ। ৭৬
পীতত্বং হি যথা শুভ্রে দোষাদ্ ভবতি কস্যচিৎ
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ। ৭৭
চক্ষুর্ভ্যাং ভ্রমশীলাভ্যাং সর্ব্বং ভাতি ভ্রমাত্মকম্
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ। ৭৮
অলাতং ভ্রমণেনৈব বর্ত্তুলং ভাতি সূর্য্যবৎ
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ। ৭৯
মহত্বে সর্ব্ববস্তূনাং অণুত্বং হ্যতিদূরতঃ
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ। ৮০

সূক্ষ্মত্বে সর্ব্ববস্তূনাং স্থূলত্বঞ্চোপনেত্রতঃ
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ । ৮১
কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ । ৮২
যদ্বদগ্নৌ মণিত্বং হি মণৌ বা বহ্নিতা পুমান্
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ । ৮৩
অভ্রেষু সৎসু ধাবৎসু সোমো ধাবতি ভাতি বৈ
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ । ৮৪
যথৈব দিগ্‌বিপর্য্যাসো মোহাদ্ ভবতি কস্যচিৎ
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ । ৮৫
যথা শশী জলে ভাতি চঞ্চলত্বেন কস্যচিৎ
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ । ৮৬
এবমাত্মন্যবিজ্ঞাতো দেহাধ্যাসোহি জায়তে
স এবাত্মা পরিজ্ঞাতো লীয়তে চ পরাত্মনি । ৮৭
সর্ব্বমাত্মতয়া জ্ঞাতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্
অভাবাৎ সর্ব্বভাবানাং দেহানাং চাত্মতা কুতঃ । ৮৮
আত্মানং সততং জানন্ কালং নয় মহামতে
প্রারব্ধমখিলং ভুঞ্জন্ নোদ্বেগং কর্ত্তুমর্হসি । ৮৯
উৎপন্নেঽপ্যাত্মবিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি
ইতি যচ্ছ্রূয়তে শাস্ত্রে তন্নিরাক্রিয়তেঽধুনা । ৯০
তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে
দেহাদীনামসত্যত্বাদ্ যথা স্বপ্নোবিবোধতঃ । ৯১
কর্ম্ম জন্মান্তরকৃতং প্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্
তত্তু জন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ । ৯২
স্বপ্নদেহো যথাধ্যস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ
অধ্যস্তস্য কুতোজন্ম জন্মাভাবে হি তৎ কুতঃ । ৯৩
উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্‌ভাণ্ডস্যেব কথ্যতে
অজ্ঞানং চৈব বেদান্তৈস্তস্মিন্ নষ্টে ক বিশ্বতা । ৯৪
যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্লাতি বৈ ভ্রমাৎ
তদ্বৎ সত্যমবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মূঢ়ধীঃ । ৯৫

রজ্জুরূপে পরিজ্ঞাতে সর্পভ্রান্তির্ন তিষ্ঠতি
অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শূন্যতাং ব্রজেৎ। ৯৬
দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ
অজ্ঞানিজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ। ৯৭
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে
বহুত্বং তন্নিষেধার্থং শ্রুত্যা গীতঞ্চ যৎ স্ফুটম্। ৯৮
উচ্যতেঽজ্ঞৈর্বলাচ্চৈতত্ তদানর্থদ্বয়াগমঃ
বেদান্তমতহানঞ্চ যতো জ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ। ৯৯
ত্রিপঞ্চাঙ্গান্যথো বক্ষ্যে পূর্ব্বোক্তস্য হি লব্ধয়ে
তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সদা কার্য্যং নিদিধ্যাসনমেবতু। ১০০
নিত্যাভ্যাসাদৃতে প্রাপ্তির্ন ভবেৎ সচ্চিদাত্মনঃ
তস্মাদ্ব্রহ্ম নিদিধ্যাসেজ্ জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়সে চিরম্। ১০১
যমোহি নিয়মস্ত্যাগোমৌনং দেশশ্চ কালতঃ
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্‌স্থিতিঃ। ১০২
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গনি বৈ ক্রমাৎ। ১০৩
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়োমুহুর্ম্মুহুঃ। ১০৪
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ
নিয়মোহি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ। ১০৫
ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ
ত্যাগোহি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যোমোক্ষময়ো যতঃ। ১০৬
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ
যন্মৌনং যোগিভির্গম্যং তদ্ভজেৎ সর্ব্বদা বুধঃ। ১০৭
বাচোযস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং কেন শক্যতে
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ। ১০৮
ইতি বা তদ্ভবেন্মৌনং সতাং সহজসংজ্ঞিতম্
গিরা মৌনং তু বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ। ১০৯
আদাবন্তে চ মধ্যে চ জনো যস্মিন্ ন বিদ্যতে
যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ। ১১০

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টো হ্যখণ্ডানন্দ অদ্বয়ঃ। ১১১
সুখেনৈব ভবেদ্ যস্মিন্ অজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্
আসনং তদ্বিজানীয়াৎ নেতরৎ সুখনাশনম্। ১১২
সিদ্ধং যৎসর্ব্বভূতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্
যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টাস্তদ্বৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ। ১১৩
যন্মূলং সর্ব্বভূতানাং যন্মূলং চিত্তবন্ধনম্
মূলবন্ধঃ সদাসেব্যো যোগোঽসৌ রাজযোগিনাম্। ১১৪
অঙ্গানাং সমতাং বিদ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে
নোচেন্নৈব সমানত্বম্ ঋজুত্বং শুষ্কবৃক্ষবৎ। ১১৫
দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ ব্রহ্মময়ং জগৎ
সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাসাগ্রাবলোকিনী। ১১৬
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রাবলোকিনী। ১১৭
চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে। ১১৮
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচকাখ্যঃ সমীরণঃ
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকোবায়ুরীরিতঃ। ১১৯
ততস্তদ্বৃত্তিনৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ
অয়ং চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নম্। ১২০
বিষয়েষ্বাত্মতাং দৃষ্ট্বা মনসশ্চিতি মজ্জনম্
প্রত্যাহারঃ স বিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ ১২১
যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ
মনসোধারণং চৈব ধারণা সা পরা মতা। ১২২
ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী। ১২৩
নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ। ১২৪
এবং চাকৃতিমানন্দং তাবৎ সাধু সমভ্যসেৎ
বশ্যো যাবৎক্ষণাৎ পুংসঃ প্রযুক্তঃ সম্ভবেৎ স্বয়ম্। ১২৫

ততঃ সাধননির্ম্মুক্তো সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট্
সৎস্বরূপং নচৈকস্য বিষয়ো মনসো গিরাম্। ১২৬
সমাধৌ ক্রিয়মাণেতু বিঘ্না আয়ান্তি বৈ বলাৎ
অণুসন্ধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসম্। ১২৭
লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা
এবং যদ্ বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং ব্রহ্মাবিদা শনৈঃ। ১২৮
ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা
পূর্ণবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ। ১২৯
যে হি বৃত্তিং জহত্যেনাং ব্রহ্মাখ্যাং পাবনীং পরাম্
বৃথৈব তে তু জীবন্তি পশুভিশ্চ সমাঃ নরাঃ। ১৩০
যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি যে জ্ঞাত্বা বর্দ্ধয়ন্ত্যপি
যে বৈ সৎপুরুষা বন্দ্যাঃ ধন্যাস্তে ভুবনত্রয়ে। ১৩১
যেষাং বৃত্তিঃ সমাবৃদ্ধা পরিপক্কাচ সা পুনঃ
তে বৈ সদ্ব্রহ্মতাং প্রাপ্তাঃ নেতরে শব্দবাদিনঃ। ১৩২
কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ
তে হ্যজ্ঞানিতমা নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ। ১৩৩
নিমেষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ। ১৩৪
কার্য্যে কারণতায়াতা কারণে নহি কার্য্যতা
কারণত্বং ততোগচ্ছেৎ কার্য্যাভাবে বিচারতঃ। ১৩৫
অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্
দ্রষ্টব্যং মৃদ্‌ঘটেনৈব দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ। ১৩৬
অনেনৈব প্রকারেণ বৃত্তির্ব্রহ্মাত্মিকা ভবেৎ
উদেতি শুদ্ধচিত্তানাং বৃত্তিজ্ঞানং ততঃপরম্। ১৩৭
কারণং ব্যতিরেকেণ পুমানাদৌ বিলোকয়েৎ
অন্বয়েন পুনস্তদ্ধি কার্য্যে নিত্যং প্রপশ্যতি। ১৩৮
কার্য্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাৎ কার্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ
কারণত্বং ততোপশ্যেৎ অবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ। ১৩৯
ভাবিতং তীব্রবেগেন বস্তু যন্নিশ্চয়াত্মনা
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ। ১৪০

অদৃশ্যং ভাবরূপঞ্চ সর্ব্বমেতচ্চিদাত্মকম্

সাবধানতয়া নিত্যং স্বাত্মানং ভাবয়েদ্ বুধঃ। ১৪১

দৃশ্যং হ্যদৃশ্যতাং নীত্বা ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ

বিদ্বান্নিত্যসুখে তিষ্ঠেদ্ ধিয়া চিদ্রসপূর্ণয়া। ১৪২

এভিরঙ্গৈঃসমায়ুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ

কিঞ্চিৎ পক্বকষায়াণাং হঠযোগেন সংযুতঃ। ১৪৩

পরিপক্বং মনো যেষাং কেবলোঽয়ং চ সিদ্ধিদঃ

গুরু-দৈবতভক্তানাং সর্ব্বেষাং সুলভো জবাৎ। ১৪৪

ইতি শ্রীশঙ্করভগবৎকৃতা অপরোক্ষানুভূতিঃ

সমাপ্তা।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের

অপরোক্ষানুভূতি।

(বঙ্গানুবাদ)

পরমানন্দ উপদেষ্টা ঈশ্বর সর্ব্বলোক-ব্যাপক ও কারণ শ্রীহরিকে নমস্কার করি। ১।

মোক্ষসিদ্ধির জন্য অপরোক্ষানুভূতি ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা মুহুর্মুহু সজ্জনগণ প্রযত্নসহকারে আলোচনা করিবেন। ২।

টীকা—। অনুভূতি দুই প্রকার—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। অন্যের নিকট হইতে লব্ধ অনুভব পরোক্ষ, এবং স্বীয় জ্ঞান হইতে যে অনুভূতি উদিত হয় তাহাই অপরোক্ষানুভূতি। পরঃ + অক্ষ = পরোক্ষ, অর্থাৎ অক্ষাৎ পরঃ—চক্ষুর বাহিরে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভূত নয়। অপরোক্ষ ইহার বিপরীত অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে অনুভব লাভ করা যায় তাহা। ইহা দ্বারা কেহ বুঝিবেন না যে ব্রহ্মানুভূতি ইন্দ্রিয়-সাধ্য বা ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। বাস্তবপক্ষে ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি অতীন্দ্রিয় পদার্থ।

স্বীয় স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, শ্রীহরির প্রীতি সাধন দ্বারা মানবগণের বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় উৎপন্ন হয়। ৩।

টীকা—। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, শমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই চারিটীর নাম সাধনচতুষ্টয়। কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহার সম্যক্ জ্ঞানকে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বলে। ঐহিক এবং পারলৌকিক ফলভোগে বিরক্তি বা তদ্বাসনাত্যাগই ইহামুত্রফলভোগবিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা এই ছয়টী শমাদি ষট্‌সম্পত্তি। মনোনিগ্রহ শম, ইন্দ্রিয়সংযম দম, বিষয় হইতে পরা নিবৃত্তি উপরতি, সহিষ্ণুতাসহকারে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইত্যাদি সাংসারিক ত্রিবিধ তাপক্লেশ সহ্য করার নাম তিতিক্ষা, সদ্বস্তুর প্রতি চিত্তের একগ্রতা-স্থাপন সমাধান, গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। মুমুক্ষুত্ব—ব্রহ্মভাবলাভের অভিপ্রায়।

কাকবিষ্ঠার প্রতি যেরূপ বৈরাগ্য (অনুরাগাভাব) হয়, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থে তাদৃশ বিরাগভাব উপস্থিত হইলে উহাই প্রকৃত বৈরাগ্য নামে কথিত হয়। ৪।

আত্মস্বরূপই নিত্য পদার্থ এবং দৃশ্য (বাহ্য জগৎ) তাহার বিপরীত অর্থাৎ মিথ্যা, এই প্রকার সম্যক্ নিশ্চয়কে বস্তুসম্বন্ধে সম্যক্ বিবেক বলা যায়। ৫।

টীকা—। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞানকে সম্যক্ বিবেক বলা যায়।

সর্ব্বসময়ে বাসনা-ত্যাগকেই শম বলা যায়, আর বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিগ্রহকে দম বলা যায়। ৬।

বিষয় হইতে মনকে বিশেষরূপে ফিরাইয়া আনাই পরম উপরতি। সকল-দুঃখ-সহিষ্ণুতাই শুভকরী তিতিক্ষা। ৭।

নিগমে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রে এবং আচার্য্যের বাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা, সদ্বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতাই সমাধান নামে কথিত হয়। ৮।

হে প্রভো, কত দিনে এবং কিরূপে আমার সংসার-বন্ধ হইতে মুক্তি-লা[ভ] হইবে? এইরূপ সুদৃঢ় বুদ্ধিকে মুমুক্ষুতা বা মুমুক্ষুত্ব বলা যায়। ৯।

যে মানব আত্মার মঙ্গল-কামনা করেন, তাঁহার উপর্য্যুক্তরূপ সাধন-সম্পন্ন হইয়া জ্ঞানলাভার্থে (আত্মতত্ত্বের) বিচার করা কর্ত্তব্য। ১০।

ঐরূপ বিচার ভিন্ন অন্য সাধন দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যেমন প্রকাশ (আলোক) ভিন্ন পদার্থ-ভান (প্রকাশ বা প্রত্যক্ষতা) হয় না, তদ্রূপ। ১১।

আমি কে, এই বিশ্ব কিরূপে উৎপন্ন হইল? ইহার (এই বিশ্বের) কর্ত্তা কে? ইহার উপাদানই বা কি?—বিচার এই ভাবেই করিতে হইবে। ১২।

টীকা—। ব্রহ্মে উপনীত হইতে হইলে প্রথমে জগৎ ও জীবের তত্ত্ব নিরূপণ

করিতে হইবে। জগৎ কোথা হইতে আসিল, জগতের উপাদান কি, জগতের কর্ত্তা কে, আমিই বা কোথা হইতে আসিলাম, আমিই বা কে, এই বিচারে জগৎ হইতে জগৎ-কারণ ব্রহ্মে পৌঁছা যায়। ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রথম সোপান এই শ্রেণীর বিচার।

আমি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত নহি, আমি দেহ নহি, আমি ইন্দ্রিয়গণও নহি, আমি এই সমুদয় হইতে স্বতন্ত্র কিছু—বিচার এই ভাবেই করিতে হইবে। ১৩।

টীকা। জ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সকলেই বিষয়; আমি অর্থাৎ চিন্মাত্র আত্মা ঐ সকলের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা বা বিষয়ী; বিষয় ও বিষয়ী চিরকালই স্বতন্ত্র। দেহাদি বিষয়কে 'আমি' বা 'বিষয়ী' মনে করা ভ্রম। বিষয় হইতে বিষয়ীকে অর্থাৎ দেহাদি হইতে দ্রষ্টা আত্মাকে পৃথক করিয়া চিনিতে হইবে——ইহাই বিচাররীতি। যে স্বয়ং দ্রষ্টা, সে কখনও দৃশ্য হয় না, শ্রোতা কখনও শ্রুত হয় না—ইহাই এখানকার চিন্তনীয়।

অবিদ্যাজাত সমস্ত পদার্থই বিদ্যা বা জ্ঞানের উদয়ে বিলীন হইয়া যায়। মানুষের নানাবিধ সঙ্কল্প উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার মূলে এক কর্ত্তা আছেন—বিচার এই ভাবেই করিতে হয়। ১৪।

টীকা। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান-জাত সমস্তই বিনষ্ট হয়। মানবের বিবিধ সংকল্প মনোরচনাবিশেষ; তাহারা অনিত্য। কেবল সেই সঙ্কল্প-সমূহের মূলে এক নিত্য কর্ত্তা বা আত্মা আছেন—এই ভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য।

এই উভয়ের উপাদান এক সূক্ষ্ম সৎ অব্যয় পদার্থ, তাহার সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ যেমন মৃত্তিকা ও ঘটাদির সম্বন্ধ—এই ভাবেই বিচার করিতে হইবে। ১৫।

টীকা। ব্যবহারিক জগতে ঘটের সত্তা আছে, কিন্তু ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, সুতরাং কার্য্য অসৎ এবং কারণ সৎ—অর্থাৎ ঘট শরাব কলস প্রভৃতি ব্যবহারিকভাবে অসৎ এবং কারণাত্মরূপে মৃত্তিকাভাবে সৎ, ইহাই তত্ত্ব। ঘট হইতে মৃত্তিকা, তাহা হইতে আরও সূক্ষ্মতর কারণে পৌঁছিতে পৌঁছিতে অনবস্থা-ভয়ে যে স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে হয়, তাহাই চরম কারণ। ঐ চরম কারণই নিত্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং ইত্যাদি স্থলে অনিত্য কার্য্য হইতে নিত্য কারণে উপনীত হইবার প্রণালী দেখান হইয়াছে, এখানে তাহাই বলা হইতেছে। ইহাই বিচার-প্রণালী।

আমি এক অথচ সূক্ষ্ম জ্ঞাতা, সাক্ষী, সৎ ও অব্যয়, আমিই সেই সদ্বস্তু ইহাতে সন্দেহ নাই—বিচার এইরূপই হইবে। ১৬।

আত্মা নিষ্কল ও এক, দেহের বহু আবরণ আছে অর্থাৎ দেহ সবিকার বা

সকল। এই দুই বিভিন্ন পদার্থে যে ঐক্য-দর্শন, তাহা অপেক্ষা অন্য অজ্ঞান আর কি আছে? ১৭।

আত্মা অন্তর্নিয়ামক (অন্তর্যামী) এবং দেহ বাহ্য নিয়ামক। এই উভয়ের যে ঐক্যদর্শন, তদপেক্ষা অজ্ঞান আর কি হইতে পারে? ১৮।

টীকা। আত্মা অন্তর্যামী, অন্তরে থাকিয়া সকলের নিয়মন করেন, মনে থাকিয়া মনের নিয়মন করেন, কিন্তু মন তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না—ঐরূপ ইন্দ্রিয়াদিতে থাকিয়া আত্মা তাহাদের নিয়মন করেন। দেহ বাহ্য জগতের নিয়ামক অর্থাৎ আমরা যে বাহ্য জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করি, তাহা দেহের সাহায্যে। দেহ অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত শরীর না হইলে বাহ্য জগতের কোনও সংবাদই আমর জানিতে পারি না।

আত্মা জ্ঞানময় ও পবিত্র, আর দেহ মাংসময় ও অপবিত্র। এইউভয়ের একত্ব-দর্শন অপেক্ষা অজ্ঞান আর কি হইতে পারে? ১৯।

আত্মা প্রকাশক স্বচ্ছ এবং দেহ তামস,——এই উভয়ের একত্ব-দর্শন ভিন্ন অজ্ঞান আর অন্য কি হইতে পারে? ২০।

আত্মা নিত্য ও সদ্রূপ, দেহ অনিত্য ও অসদ্রূপ, এই উভয়ের একত্ব-দর্শন অপেক্ষা অজ্ঞান আর অন্য কি হইতে পারে? ২১।

সমস্ত বস্তুর অবভাসন বা প্রকাশের হেতুভূত পদার্থই আত্মা, এবং প্রকাশ করাই আত্মার স্বভাব। আত্মদীপ্তি অগ্নি-সূর্য্যাদি পদার্থের দীপ্তির ন্যায় নয়, কেন না যাহা হইলে রাত্রিতে অন্ধতা উপস্থিত হইত। ২২।

টীকা। সমস্ত বাহ্য পদার্থই অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির সাহায্যে প্রকাশিত হয়। জ্যোতির সাহায্য ভিন্ন চক্ষুর দর্শন-সামর্থ্য থাকে না। অন্ধকারে দেখা যায় না, মন্দ অন্ধকারে অল্প জ্যোতি থাকায় কিঞ্চিৎ দেখা যায়, সুতরাং চক্ষুরাদির দৃষ্টিশক্তি অগ্ন্যাদি-দীপ্তির উপর নির্ভর করে। আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ এবং সকল বস্তুর প্রকাশক। আত্মা অগ্ন্যাদির অপেক্ষা করেন না। আত্মার দৃষ্টিশক্তি দিবারাত্রি সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যাদির অভাবে তাহার দৃষ্টিশক্তির তিরোধান হয় না, যদি হইত, তবে সূর্য্যাদি জ্যোতির অভাবে রাত্রিতে অন্ধকারে যেমন বস্তুদর্শন অসম্ভব হয়, তদ্রূপ বস্তুপ্রকাশও অসম্ভব হইত। কিন্তু আত্মা সতত প্রকাশশীল ও সর্ব্বদা প্রকাশক।

ঘটদ্রষ্টা যেমন ঘট তাহার—ইহা জানে, তদ্রূপ পুরুষ 'এই দেহ আমার' ইহা জানিয়াও 'আমি এই দেহ' এইরূপ মনে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে; ইহা

অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইবে ? ২৩।

পণ্ডিতগণ সেই জ্ঞানকেই "যথার্থ জ্ঞান" বলেন, যেজ্ঞান দ্বারা জীব বুঝিতে পারে যে আমিই ব্রহ্ম, পরিবর্ত্তন-রহিত, শান্ত, সৎ চিৎ ও আনন্দ—এই ত্রিবিধ লক্ষণান্বিত এবং আমি দেহ নহি, অসদ্রূপও নহি। ২৪

পণ্ডিতগণ সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলিয়া মনে করেন, যে জ্ঞান হইতে জীব জানিতে পারে যে আমি নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিরবদ্য, (উৎকৃষ্ট, নির্দোষ) অব্যয় (ব্যয়শূন্য, অক্ষয়) এবং আমি দেহ নহি, অসদ্রূপও নহি। ২৫।

পণ্ডিতগণ সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলেন, যদ্দ্বারা জীব বুঝিতে পারে যে আমি নিরাময় (রোগশূন্য,) নিরাভাস (পরজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ নহে,) নির্ব্বিকল্প (বিকল্পহীন, একতান) ও আতত (সর্ব্বব্যাপী) এবং আমি দেহ নহি, অসদ্রূপও নহি। ২৬।

বুধগণ সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান মনে করেন, যদ্দ্বারা জীব বুঝে যে "আমি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নিত্যমুক্ত ও অচ্যুত (অক্ষয়)" "আমি দেহ নহি, অসদ্রূপও নহি।" ২৭।

বুধগণ সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান মনে করেন, যদ্দ্বারা জীব বুঝে যে "আমি নিশ্চল নির্ম্মল অনন্ত শুদ্ধ অজর ও অমর, আমি দেহ নহি, অসদ্রূপও নহি।" ২৮।

হে মূর্খ! তোমার নিজের দেহে শোভন সৎ পুরুষাখ্য সম্মত দেহাতীত আত্মাকে কি শূন্যে পরিণত করিতে চাও ? ২৯।

টীকা। শূন্যবাদীরা সমস্ত জগৎ শূন্যময় মনে করেন, তাঁহারা আত্মাকেও শূন্য-স্বরূপ বলেন। এখানে বলা হইতেছে যে, স্বীয় দেহে সদ্রূপে বিদ্যমান পুরুষ-নামে সর্ব্ব-সম্মত দেহাতিরিক্ত আত্ম-তত্ত্ব কখনও শূন্য অভাব বা অসদ্রূপ নহে। উহা সদ্রূপেই প্রকাশ পায়। মূর্খ শূন্যবাদীরা ঐ সদ্বস্তুকে অসৎ বলিয়া মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়।

হে মূর্খ! শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা স্বীয় আত্ম-পুরুষের বিষয় শ্রবণ কর। ঐ পুরুষ দেহাতীত সদ্রূপ ও তোমাদের ন্যায় অবিবেকিগণের পক্ষে সুদুর্দ্দর্শ। ৩০।

পর (আত্মা) একাই আছেন, তিনি 'অহং' এই শব্দ দ্বারা বিখ্যাত হন। সেই পুরুষ কিরূপে দেহ হইতে পারেন ? কারণ, দেহ স্থূল ও অনেক। ৩১।

অহং অর্থাৎ আত্মা দ্রষ্টা (বিষয়ী) ও তদ্ দ্বারা (দ্রষ্টৃত্ব নিবন্ধন) তাঁহার সিদ্ধি (প্রতীতি) হয়, এবং দেহ দৃশ্য (বিষয়) রূপে অবস্থিত হয়। 'এই দেহ আমার' এই নির্দেশ হেতু পুরুষ বা আত্মা কিরূপে দেহ হইতে পারেন ? ৩২।

"আমি বিকারহীন (দেহী) ও দেহ সতত বিকারযুক্ত।" এইরূপ সাক্ষাৎ প্রতীতি হইতেছে, সুতরাং পুরুষ অর্থাৎ আত্মা কিরূপে দেহ হইতে পারেন? ৩৩।

যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু নাই—এই শ্রুতি দ্বারা যে পুরুষের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেই পুরুষকে মূঢ়গণ কিরূপে দেহ বলিয়া নির্ণয় করিবে? ৩৪।

'পুরুষ-সূক্ত' নামক সূক্তে যে পুরুষকে বলা হইয়াছে যে 'ইনিই সকল' আর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে 'যাঁহা হইতে সকল উৎপন্ন হইয়াছে' সে পুরুষ কিরূপে দেহ হইবেন? ৩৫।

বৃহদারণ্যকে যে পুরুষকে অসঙ্গ (বিকারহেতু-সংযোগ-রহিত) অনন্ত ও অসংস্পৃষ্ট বলা হইয়াছে তিনি কিরূপে দেহ হইবেন? ৩৬।

ঐ বৃহদারণ্যকে যে পুরুষকে 'স্বয়ং জ্যোতি' বলা হইয়াছে, সেই পুরুষ কিরূপে পর-প্রকাশ (অপরের দ্বারা প্রকাশিত) জড়দেহ হইতে পারেন? ৩৭।

কর্ম্মকাণ্ডেও আত্মাকে দেহাদি হইতে বিলক্ষণ নিত্য বলা হইয়াছে, এবং তিনি দেহ-পতনের পর কর্ম্মফল ভোগ করেন—ইহাও বলা হইয়াছে। দেহ চিহ্নযুক্ত, অনেক, সংযুক্ত, সচল, দৃশ্য (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বিকারী, অব্যাপক ও অসদ্রূপ। ঐ দেহ কিরূপে পুরুষ হইতে পারে? ৩৮।৩৯।

এই লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীরের অতিরিক্ত আত্মা,—তিনি পুরুষ, তিনি ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বাত্মা, তিনি অব্যয়। ৪০।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের

অপরোক্ষানুভূতি।

লেখক—সম্পাদক।

পরমানন্দ উপদেষ্টা ঈশ্বর সর্ব্বলোক ব্যাপক ও কারণ শ্রীহরিকে নমস্কার করি। ১

মোক্ষসিদ্ধির জন্য অপরোক্ষানুভূতি ব্যাক্ষাত হইতেছে, সজ্জনগণ ইহা মুহুর্ম্মুহু প্রযত্নসহকারে আলোচনা করিবেন। ২

টীকা।—অনুভূতি দুইপ্রকার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, অন্যের নিকট হইতে লব্ধ অনুভব পরোক্ষ এবং স্বীয় জ্ঞান হইতে যে অনুভূতি উদিত হয় তাহাই অপরোক্ষানুভূতি। পরঃ অক্ষ=পরোক্ষ অর্থাৎ অক্ষাৎপরঃ—চক্ষুর বাহিরে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভূত নয়। অপরোক্ষ ইহার বিপরীত অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে অনুভব লাভ করা যায় তাহা। ইহা দ্বারা কেহ বুঝিবেন না যে ব্রহ্মানুভূতি ইন্দ্রিয় সাধ্য বা ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ। বাস্তব পক্ষে ব্রহ্মোয় অপরোক্ষানুভূতি অতীন্দ্রিয় পদার্থ।

স্বীয় ২ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা, তপস্যা দ্বারা ও শ্রীহরির প্রীতিসাধন দ্বারা মানবগণের বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয় উৎপন্ন হয়। ৩

টীকা।—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, শমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই ৪ টীর নাম সাধন চতুষ্টয়। কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্ বস্তু অনিত্য তাহার সম্যক্ জ্ঞানকে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক বলে। ঐহিক এবং পারলৌকিক ফলভোগে বিরক্তি বা তদ্বাসনত্যাগই ইহামুত্রফলভোগ বিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা এই ৬টী শমাদি ষট্ সম্পত্তি। মনোনিগ্রহ, শম ইন্দ্রিয়সংযম, দম বিষয় হইতে পরানিবৃত্তি, উপরতি সহিষ্ণুতাসহকারে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সাংসারিক ত্রিবিধ তাপক্লেশ সহ্য করার নাম তিতিক্ষা। সদ্বস্তুর প্রতি চিত্তের একাগ্রতা স্থাপন সমাধান। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। মুমুক্ষুত্ব ব্রহ্মভাবলাভের অভিপ্রায়।

কাক বিষ্ঠার প্রতি যেরূপ বৈরাগ্য (অনুরাগাভাব) হয়, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থে, তাদৃশ বিরাগভাব উপস্থিত হইলে উহাই প্রকৃত বৈরাগ্য নামে কথিত হয়। ৪

আত্মস্বরূপই নিত্য পদার্থ এবং দৃশ্য (জগৎ) বাহ্য তাহার বিপরীত অর্থাৎ মিথ্যা এই প্রকার সম্যক্ নিশ্চয়—তাহাই বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ বিবেক বলা যায়। ৫

টীকা।—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞানকে সম্যক্ বিবেক বলা যায়। সর্ব্বসময়ে বাসনাত্যাগকেই শম বলা যায়, আর বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিগ্রহকে দম বলা যায়। ৬

বিষয় হইতে মনকে বিশেষরূপে ফিরাইয়া আনাই পরম উপরতি। সকল দুঃখ সহিষ্ণুতাই শুভঙ্করী তিতিক্ষা। ৭

নিগমে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রে এবং আচার্য্যের বাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা, সদ্বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতাই সমাধান নামে কথিত হয়। ৮

হে প্রভো, কতদিনে এবং কিরূপে আমার সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইবে? এইরূপ সুদৃঢ়বুদ্ধিকে মুমুক্ষুতা বা মুমুক্ষুত্ব বলা যায়। ৯

যে মানব আত্মার মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার উপযুক্ত রূপ সাধন সম্পন্ন হইয়া জ্ঞানলাভার্থে (আত্মতত্ত্বের) বিচার করা কর্ত্তব্য। ১০

ঐরূপ বিচার ভিন্ন অন্য সাধন দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যেমন প্রকাশ (আলোক) ভিন্ন পদার্থ ভান (প্রকাশ বা প্রত্যক্ষতা) হয় না তদ্রূপ। ১১

আমি কে, এই বিশ্ব কিরূপে উৎপন্ন হইল? ইহার (এই বিশ্বের) কর্ত্তা কে? ইহার উপাদানই বা কি?—বিচার এই ভাবেই করিতে হইবে। ১২

টীকা। ব্রহ্মে উপনীত হইতে হইলে প্রথমে জগৎ ও জীবের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইবে, জগৎ কোথা হইতে আসিল জগতের উপাদান কি, এবং জগতের কর্ত্তা কে, আমিই বা কোথা হইতে আসিলাম, আমিই বা কে, এই বিচারে জগৎ হইতে জগৎ কারণ ব্রহ্মে পৌঁছান যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম সোপান এই শ্রেণীর বিচার।

আমি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত নহি, আমি দেহ নহি, আমি ইন্দ্রিয়গণও নহি আমি এই সমুদয় হইতে স্বতন্ত্র কিছু—বিচার এইভাবেই করিতে হইবে। ১৩

টীকা।—জ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সকলেরই বিষয়, আমি অর্থাৎ চিন্মাত্র আত্মা ঐ সকলের দ্রষ্টা জ্ঞাতা বা বিষয়ী, বিষয় ও বিষয়ী চিরকালই স্বতন্ত্র, দেহাদি বিষয়কে আমি বা বিষয়ী মনে করা ভ্রম, বিষয় হইতে বিষয়ীকে অর্থাৎ দেহাদি হইতে দ্রষ্টা আত্মাকে পৃথক করিয়া চিনিতে হইবে ইহাই বিচার রীতি, যে দ্রষ্টা সে স্বয়ং কখনও দৃশ্য হয় না, শ্রোতা কখনও শ্রুত হয় না ইহাই এখানকার চিন্তনীয়।

অবিদ্যাজাত সমস্ত পদার্থই বিদ্যা বা জ্ঞানের উদয়ে বিলীন হইয়া যায়। মানুষের নানাবিধ সঙ্কল্প উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার মূলে এক কর্ত্তা আছেন বিচার এই ভাবেই করিতে হয়। ১৪

টীকা।—জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানজাত সমস্তই বিনষ্ট হয়। মানবের বিবিধ সংকল্প মনোরচনা বিশেষ তাহারা অনিত্য, কেবল সেই সংকল্প সমূহের মূলে এক নিত্য কর্ত্তা বা আত্মা আছেন—এই ভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য।

এই উভয়ের উপাদান যে এক সূক্ষ্ম সৎ অব্যয় পদার্থ, যেমন মৃত্তিকা ও ঘটাদির সম্বন্ধ—এই ভাবেই বিচার করিতে হইবে। ১৫

টীকা।—ব্যবহারিক জগতে ঘটের সত্তা আছে, কিন্তু ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, সুতরাং কার্য্য অসৎ এবং কারণ সৎ অর্থাৎ ঘট শরাব কলস প্রভৃতি ব্যবহারিক ভাবে অসৎ এবং কারণাত্মরূপে মৃত্তিকাভাবে সৎ ইহাই তত্ত্ব। ঘট হইতে মৃত্তিকা, তাহা হইতে আরও সূক্ষ্মতর কারণে পৌছিতে পৌছিতে অনবস্থা ভয়ে যে স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে হইবে, তাহাই চরম কারণ। ঐ চরম কারণই নিত্য, ছান্দোগ্যোপনিষদে বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং ইত্যাদি স্থলে অনিত্য কার্য্য হইতে নিত্য কারণে উপনীত হইবার প্রণালী দেখান হইয়াছে, এখানে তাহাই বলা হইতেছে, ইহাই বিচার প্রণালী।

আমি এক অথচ সূক্ষ্ম জ্ঞাতা, সাক্ষী সৎ ও অব্যয়, আমিই সেই সদ্বস্তু ইহাতে সন্দেহ নাই——বিচার এইরূপেই হইবে। ১৬

আত্মা নিষ্কল ও এক, দেহের বহু আবরণ আছে অর্থাৎ দেহ সবিকার বা সকল, এই দুই বিভিন্ন পদার্থে যে ঐক্যদর্শন তাহা অপেক্ষা অন্য অজ্ঞান আর কি আছে? ১৭

আত্মা অন্তর্নিয়ামক (অন্তর্যামী) এবং দেহ বাহ্য নিয়ামক, এই উভয়ের যে ঐক্যদর্শন, তদপেক্ষা অজ্ঞান আর কি হইতে পারে। ১৮

টীকা।—আত্মা অন্তর্যামী, অন্তরে থাকিয়া সকলের নিয়মন করেন, মনে থাকিয়া মনের নিয়মন করেন কিন্তু মন তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না—ঐরূপ ইন্দ্রিয়াদিতে থাকিয়া আত্মা তাহাদের নিয়মন করেন, দেহ বাহ্যজগতের নিয়ামক অর্থাৎ আমরা যে বাহ্যজগতের উপর প্রভাব বিস্তার করি তাহা দেহের সাহায্যেই দেহ অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত শরীর না হইলে বাহ্যজগতের কোনও সংবাদই আমরা জানিতে পারি না।

আত্মা জ্ঞানময় ও পবিত্র আর দেহ মাংসময় ও অপবিত্র, এই উভয়ের একত্ব দর্শন অপেক্ষা অজ্ঞান আর কি হইতে পারে? ১৯

আত্মা প্রকাশক স্বস্থ এবং দেহ তামস—এই উভয়ের একত্ব দর্শন ভিন্ন অজ্ঞান আর অন্য কি হইতে পারে? ২০

আত্মা নিত্য ও সদ্রূপ, দেহ অনিত্য ও অসদ্রূপ এই উভয়ের একত্বদর্শন অপেক্ষা অজ্ঞান অন্য আর কি হইতে পারে। ২১

সমস্ত বস্তুর অবভাসন বা প্রকাশের হেতুভূক্ত পদার্থই আত্মা, এবং প্রকাশকরাই আত্মার স্বভাব, আত্মদীপ্তি অগ্নি সূর্য্যাদি পদার্থের দীপ্তির ন্যায় নয়, কেননা তাহা হইলে রাত্রিতে অন্ধতা উপস্থিত হইত। ২২

টীকা।—সমস্ত বাহ্যপদার্থই অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির সাহায্যে প্রকাশিত হয়, জ্যোতির সাহায্য ভিন্ন চক্ষুর দর্শন সামর্থ্য থাকে না। অন্ধকারে দেখা যায় না। মন্দ অন্ধকারে অল্প জ্যোতি থাকায় কিঞ্চিৎ দেখা যায়। সুতরাং চক্ষুরাদির দৃষ্টিশক্তি অগ্ন্যাদিদীপ্তির উপর নির্ভর করে। আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ এবং সকল বস্তুর প্রকাশক, আত্মা অগ্ন্যাদির অপেক্ষা করেন না। আত্মার দৃষ্টিশক্তি দিবারাত্রি সমানভাবে বিদ্যমান থাকে, জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যাদির অভাবে তাহার দৃষ্টিশক্তির তিরোধান হয় না, যদি হইত তবে সূর্য্যাদি জ্যোতিরঅভাবে রাত্রিতে অন্ধকারে যেমন বস্তুদর্শন অসম্ভব হয়, তদ্রূপ বস্তুপ্রকাশও অসম্ভব হইত, কিন্তু আত্মা সতত প্রকাশশীল ও সর্ব্বদা প্রকাশক।

ঘটদ্রষ্টা যেমন ঘট তাহার—ইহা জানে তদ্রূপ পুরুষ এই দেহ আমার ইহা জানিয়াও আমি এই দেহ এইরূপ মনে করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইবে? ২৩

পণ্ডিতগণ সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলেন যে জ্ঞান দ্বারা জীব বুঝিতে পারে যে আমিই ব্রহ্ম, পরিবর্ত্তন রহিত, শান্ত, সৎচিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধলক্ষণান্বিত, এবং আমিই দেহ নহি, অসদ্রূপও নহি। ২৪

পণ্ডিতগণ সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞনা বলিয়া মনে করেন যে জ্ঞান হইতে জীব জানিতে পারে যে আমি নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিরবদ্য অব্যয় (ব্যয় শূন্য অক্ষয়) এবং আমি দেহ নহি, অসদ্রূপও নহি। ২৫

পণ্ডিতগণ সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলেন, যদ্দ্বারা জীব বুঝিতে পারে যে আমি নিরাময় (রোগশূন্য) নিরাভাস (পর জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ নহেন)

নির্ব্বিকল্প (বিকল্পহীন, একতান) ও আতত (সর্ব্বব্যাপী) এবং আমি দেহ নহি অসদ্রূপও নহি। ২৬

বুধগণ সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান মনে করেন যদ্দ্বারা জীব বুঝে যে আমি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নিত্যমুক্ত ও অচ্যুত (অক্ষয়) আমি দেহ নহি অসদ্রূপও নহি। ২৭

বুধগণ সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান মনে করেন যদ্দ্বারা জীব বুঝে যে আমি নিশ্চল নির্ম্মল অনন্ত শুদ্ধ অজর ও অমর, আমি দেহ নহি, অসদ্রূপও নহি। ২৮

হে মূর্খ! তোমার নিজের দেহে শোভমান পুরুষাখ্য সম্মত দেহাতীত আত্মাকে কি শূন্যে পরিণত করিতে চাও? ২৯

টীকা।—শূন্যবাদীরা সমস্ত জগৎ শূন্যময় মনে করেন, তাঁহারা আত্মাকেও শূন্যস্বরূপ বলেন। এখানে বলা হইতেছে যে স্বীয় দেহে সদ্রূপে বিদ্যমান পুরুষ নামে সর্ব্বসম্মত দেহাতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব কখনও শূন্য অভাব বা অসদ্রূপ নহে, উহা সদ্রূপেই প্রকাশ পায়। মূর্খ শূন্যবাদীরা ঐ সদ্বস্তুকে অসদ্ বলিয়া মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়।

হে মূর্খ! শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা স্বীয় আত্মপুরুষের বিষয় শ্রবণ কর, ঐ পুরুষ দেহাতীত সদ্রূপ ও তোমাদের ন্যায় অবিবেকিগণের পক্ষে সুদুর্দ্দর্শ। ৩০

পর (আত্মা) একাই আছেন, তিনি অহং এই শব্দ দ্বারা বিখ্যাত হন। সেই পুরুষ কিরূপে দেহ হইতে পারেন? কারণ দেহ স্থূল ও অনেক। ৩১

অহং অর্থাৎ আত্মা দ্রষ্টা (বিষয়ী) এবং তদ্দ্বারা (দ্রষ্টৃত্ব নিবন্ধন) তাঁহার সিদ্ধি (প্রতীতি) হয়, এবং দেহ দৃশ্য (বিষয়) রূপে অবস্থিত হয়, এই দেহ আমার এই নির্দ্দেশহেতু পুরুষ বা আত্মা কিরূপে দেহ হইতে পারেন? ৩২

আমি বিকারহীন (দেহী) ও দেহ সতত বিকারযুক্ত। এইরূপ সাক্ষাৎ প্রতীতি হইতেছে সুতরাং পুরুষ অর্থাৎ আত্মা কিরূপে দেহ হইতে পারেন? ৩৩

যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছু নাই এই শ্রুতি দ্বারা যে পুরুষের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেই পুরুষকে মূঢ়গণ কিরূপে দেহ বলিয়া নির্ণয় করিবে? ৩৪

'পুরুষসূক্তে' নামক সূক্তে যে পুরুষকে বলা হইয়াছে যে 'ইনিই সকল' আর শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে 'যাঁহা হইতে সকল উৎপন্ন হইয়াছে' সে পুরুষ কিরূপ দেহ হইবেন? ৩৫

বৃহদারণ্যকে যে পুরুষকে অসঙ্গ (বিকারহেতুসংযোগ রহিত) অনন্ত ও অসংস্পৃষ্ট বলা হইয়াছে, তিনি কিরূপে দেহ হইবেন? ৩৬

ঐ বৃহদারণ্যকে যে পুরুষকে স্বয়ং জ্যোতি বলা হইয়াছে সেই পুরুষ কিরূপে পরপ্রকাশ (অপরের দ্বারা প্রকাশিত) জড় দেহ হইতে পারেন? ৩৭

কর্ম্মকাণ্ডেও আত্মাকে দেহাদি হইতে বিলক্ষণ নিত্য হইয়াছে, এবং তিনি দেহ পতনের পর কর্ম্মফল ভোগ করেন—ইহাই বলা হইয়াছে, দেহ চিহ্নযুক্ত, অনেক সংযুক্ত, সচল দৃশ্য (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বিকারী, অব্যাপক ও অসদ্রূপ, ঐ দেহ কিরূপে পুরুষ হইতে পারে? ৩৮।৩৯

এই লিঙ্গ শরীর ও স্থূল শরীরের অতিরিক্ত আত্মা, তিনি পুরুষ, তিনি ঈশ্বর তিনি সর্ব্বাত্মা, তিনি অব্যয়। ৪০

জগৎ প্রপঞ্চ এই আত্মার দেহ এইরূপে যে তর্কশাস্ত্রে প্রপঞ্চের সত্যতা কথিত হইয়াছে, তাহা হইতে কি পুরুষার্থ লাভ হয়? ৪১

টীকা।—প্রপঞ্চ সত্য হইলে দ্বৈত চিরস্থির প্রমাণিত হয়, অদ্বৈতাত্মভাব স্বীকৃত হয় না। বস্তুতঃ অদ্বৈতাত্মভাবেই পরমপুরুষার্থের প্রতিষ্ঠা, সুতরাং প্রপঞ্চ সত্যত্ববাদীর পরমপুরুষার্থলাভের সম্ভাবনা কোথায়?

(শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধ) আত্মা ও দেহের ভেদ জ্ঞান হইতে দেহে আত্মবুদ্ধির অপগম হয়, ইদানীং দেহভেদের অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের অসত্য বা মিথ্যাভাব পরিস্ফুটরূপে কথিত হইল। ৪২

চৈতন্যের একরূপতাহেতু (জীব ও ব্রহ্মের) কোনও প্রকার ভেদ যুক্তিযুক্ত নহে। জীবভাব মিথ্যা বলিয়া জানিবে, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান মিথ্যা তদ্রূপ। ৪৩

টীকা।—জীব ও ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ বিধায় অভিন্ন, জীবভাব অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে আরোপিত হয়, যেমন অজ্ঞান হেতু রজ্জুতে সর্পত্বারোপ, তদ্রূপ ব্রহ্মে জীবত্মারোপ ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।

রজ্জুর জ্ঞান না হওয়ায় যেমন ক্ষণকাল মধ্যে রজ্জু সর্পিণীরূপে প্রকাশ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপের যথার্থ বোধ না হওয়ায় কেবল চিন্ময় ব্রহ্মই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হন। ৪৪

ব্রহ্ম ভিন্ন এই প্রপঞ্চের অন্য উপাদান নাই, তজ্জন্য সমস্ত দৃশ্যমান প্রপঞ্চই ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ৪৫

(কারণ) ব্রহ্ম ব্যাপক এবং (কার্য্য) বিশ্ব ব্যাপ্য—এই বুদ্ধি মিথ্যা। সমস্তই ব্রহ্ম এই শ্রুতিশাসন বলে পরমতত্ত্ব অবগত হইলে (কার্য্য কারণের) ভেদবুদ্ধির অবসর কোথায়? ৪৬

টীকা।—ঐ তদত্মামিদং সর্ব্বম্ এই শ্রুতি দ্বারা জানা যায় প্রপঞ্চ কারণ ব্রহ্মমাত্র, প্রপঞ্চের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহা স্থিরীকৃত হইলে ব্যাপ্যব্যাপক ভাবের অসত্যত্বই নিরূপিত হয়। শ্রুতি স্বমুখে নানত্বি নিবারণ করিয়াছেন—ইহা নিশ্চিত। অদ্বিতীয় কারণ ব্রহ্মস্বত্বে অন্য সত্তার অবভাস কিরূপে সম্ভব হয়? ৪৭

টীকা।—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নানাত্বের নিষেধ হয়, একমাত্র অদ্বয় কারণ পরব্রহ্ম সত্তাই ঘোষিত হয়, সুতরাং ব্রহ্মসত্তাষ অতিরিক্ত কার্য্যসত্তা কিরূপে স্বীকার করা যায়?

যে মায়া দ্বারা প্রতারিত মানব নানাত্ব দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মরণ প্রাপ্ত হয় এইরূপে শ্রুতি নানাত্বদর্শনের দোষ কীর্ত্তনও করিয়াছেন। ৪৮

টীকা।—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি এই শ্রুতি নানাত্ব-দর্শনের অধঃপতনের কথা বলিয়াছেন, সুতরাং নানাত্বদর্শন সর্ব্বনাশের কারণ।

পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, সুতরাং এতৎ সমস্তই (কার্য্যের বাচারম্ভণতা হেতুক) ব্রহ্ম হইতেই এইরূপ নিশ্চয় করিবে। ৪৯

টীকা।—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতি বলেন এই ভূতগণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মেস্থিত ও ব্রহ্মেই বিলীন হয় সুতরাং ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই স্থিরীকৃত হয়। শ্রুতি গাহিয়াছেন—ব্রহ্মই সকল নাম, বিবিধরূপ, সমগ্র কর্ম্ম ধারণ করেন। ৫০

সুবর্ণ হইতে জাত বলয় কুণ্ডল প্রভৃতির সুবর্ণত্বমাত্র যেমন সত্য ব্রহ্ম উৎপন্ন প্রপঞ্চের ও তদ্রূপ ব্রহ্ম মাত্রত্বই সিদ্ধান্ত। ৫১

জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বল্প ভেদও ধারণা করিয়া যে মূঢ়মতি অবস্থান করে তাহার ভয় হয় এই শ্রুতির ঘোষণা। ৫২

টীকা।—যে স্থলে অজ্ঞান বশতঃ দ্বৈতবুদ্ধি হয় সেখানে জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, কিন্তু যেখানে সমস্তই আত্মরূপে দর্শন করে, সেখানে সে নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অণুমাত্র ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে না। ৫৩

টীকা।—যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরং ইতরঃ পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত তৎ কেন কং পশ্যেৎ এই শ্রুতির অর্থ এখানে শ্লোকে বলা হইতেছে।

সমস্ত ভূতেই আত্মরূপে দর্শনকারী পুরুষের মোহ থাকে না, শোকও থাকে না, কারণ তাহার অদ্বয় আত্মভাবের উপস্থিত হয়। ৫৪

টীকা।—দ্বৈতেভয়, অদ্বৈতে ভয় শোক মোহ নাই। শ্রুতি বলেন দ্বিতীয়া বৈ ভয়ং ভবতি, আরও বলেন কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে এই আত্মাই ব্রহ্ম-ব্রহ্মই সর্ব্বাত্ম ভাবে অবস্থিত। ৫৫

এই লোক (প্রপঞ্চ) অনুভূত ও ব্যবহার নিষ্পাদন সমর্থ হইয়া পরবর্ত্তিক্ষণে বাধিত হয় বলিয়া স্বপ্নবৎ অসৎ। ৫৬

জাগরণে স্বপ্ন মিথ্যা, স্বপ্নে জাগরণ মিথ্যা, সুষুপ্তিতে স্বপ্ন ও জাগ্র উভয়ই নাই (সুতরাং ঐ উভয়ই মিথ্যা।) আবার স্বপ্ন জাগ্রতে সুষুপ্তি মিথ্যা। ৫৭

টীকা।—যাহার ত্রৈকালিকসত্তা নাই তাহা বস্তুতই মিথ্যা।

ত্রিগুণ রচিত (জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) তিনটীই মিথ্যা, ইহার (অবস্থাত্রয়ের) দ্রষ্টা ত্রিগুণাতীত এক চিদ্রূপ আত্মাই নিত্য। ৫৮

মৃত্তিকায় যেরূপ ভ্রমবশতঃ ঘটভ্রম, শুক্তিতে যেমন ভ্রমহেতুই রজতভান, তদ্রূপ ব্রহ্মে ভ্রমহেতুই জীবত্ব দর্শন হয়, স্বভাবতঃ নহে। ৫৯

যেমন মৃত্তিকায় ঘট এই নাম, স্বর্ণে 'কুন্তল' এই আখ্যা, শুক্তিতে 'রজত' সংজ্ঞা, সেইরূপ পরব্রহ্মে 'জীব' এই সংজ্ঞা। ৬০

যেমন গগণে নীলতা, যেমন মরুভূমিতে জল, যেমন স্থাণুতে পুরুষত্ব তদ্রূপ চিদ্রূপ আত্মায় এই বিশ্ব। ৬১

টীকা।—মরীচিকাস্থলে যেমন তেজে জল কল্পিত হয়। নীরূপ আকাশে যেমন নীলরূপ কল্পিত হয় শুক্তিতে যেমন রজত কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে বিশ্ব কল্পিত হয়, বস্তুতঃ বিশ্ব বলিয়া কিছু সত্য জিনিষ নাই।

যেমন শূন্যে বেতালগণ ও 'গন্ধর্ব্বনগর' নামক ভ্রান্তির উত্থান (ভ্রমহেতুই) দেখা যায়, যেমন (ভ্রমহেতুই) আকাশে দুইটীচন্দ্র দেখা যায়, (বস্তুতঃ সে সকল তথায় নাই, কেবল অজ্ঞান বশতঃ ঐরূপ ভ্রম হয়) তদ্রূপ ব্রহ্ম জগতের অবস্থান (ভ্রমহেতুই) কল্পিত হয়। ৬২

যেমন তরঙ্গ কল্লোল দ্বারা জলই স্ফুরিত হয়, আর ঐ জল পাত্রেররূপে তাম্রবর্ণও দেখা যায় তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড সমূহের দ্বারা আত্মভাবই স্ফুরিত হয়, আর অধিষ্ঠান চৈতন্যের ভাব গ্রহণ করিয়া জগৎ চেতনবৎ প্রতীত হয়। ৬৩

'ঘট' নামে যেমন মৃত্তিকাই প্রতিভাত হয়, তন্তু সকলই যেমন 'পট' নামে প্রতীত হয়, তদ্রূপ 'জগৎ' নামে চিৎই প্রকাশ পান, মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট নাই, তন্তু ভিন্ন পট নাই, ঐরূপ ব্রহ্ম ভিন্নও বিশ্ব নাই। ৬৪

সকল ব্যবহারই লোকে ব্রহ্মদ্বারা সম্পাদন করে। কিন্তু অজ্ঞান বশতঃ তাহা তাহারা জানে না। (যেমন ঘট শরাব প্রভৃতি নামে এক মৃত্তিকা দ্বারাই তাহার ব্যবহার নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ঘট শরাব ইত্যাদি যে মৃত্তিকাই তাহা তাহারা বুঝে না।) বস্তুতঃ ঘটাদি মৃত্তিকাই, জগৎ ও ব্রহ্মই। ৬৫

যেমন ঘট ও মৃত্তিকার নিয়ত কার্য্য কারণ ভাব আছে, তদ্রূপ শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা জগৎ ও ব্রহ্মের কার্য্য কারণ ভাব সিদ্ধ হয়। ৬৬

টীকা।—কার্য্য ঘট কারণ মাটী, কার্য্য জগৎ, কারণ ব্রহ্ম।

ঘট পর্য্যালোচনা করিলে যেমন তাহাতে মৃত্তিকাই আপনা হইতেই প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ জগৎ পর্য্যালোচনা করিলেও তাহাতে তেজোময় ব্রহ্মই প্রকাশ পান। ৬৭

টীকা।—বিচার করিলে ঘট মৃত্তিকামাত্রে পর্য্যবসিত হয়, জগৎ ও ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

([illegible]নীর নিকট) আত্মা সতত বিশুদ্ধ (অজ্ঞানীর নিকট) আত্মা সর্ব্বদা [illegible] প্রতিভাত হন, যেমন জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর নিকট রজ্জু দুইরূপে [illegible] তদ্রূপ। ৬৮

[illegible]—জ্ঞানীর দৃষ্টিতে রজ্জু রজ্জুই, অজ্ঞের দৃষ্টিতে রজ্জু সর্প। জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম বিশুদ্ধ ব্রহ্মই, অজ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম অশুদ্ধ জগৎ।

বস্তুতঃ কুম্ভ যেমন মৃণ্ময়, দেহও তদ্রূপ চিন্ময়। বুধগণ আত্মাও অনাত্মার যে বিভাগ করেন তাহা সুতরাংই বৃথা। ৬৯

টীকা।—ঘট ও মাটী পৃথক নয়, ঘট মাটীই দেহ। জড় নয়, চিন্ময়ই। যখন কার্য্য মিথ্যা, এক কারণমাত্রই সত্য; তখন আত্মা ও অনাত্মার বিভাগ কিরূপে সম্ভবে? অনাত্মা বস্তুতঃ নাই, যাহাকে 'অনাত্মা' বলি, তাহা যথার্থতঃ আত্মাই। বিমূঢ় মানব কর্ত্তৃক যেমন রজ্জু সর্পরূপে এবং শুক্তিকা রজতরূপে বিবেচিত হয়, তদ্রূপ আত্মাও দেহরূপে নিরূপিত হয়। ৭০

যেমন বিমূঢ় মানব কর্ত্তৃক মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তুগণ বস্ত্ররূপে স্থিরীকৃত হয়, তদ্রূপ আত্মাও দেহরূপে বিবেচিত হয়। ৭১

বিমূঢ় মানব যেমন স্বর্ণকে কুণ্ডলরূপে ও জলকে তরঙ্গরূপে নির্ণয় করে, তদ্রূপ তাহারা আত্মাকেও দেহরূপে নির্ণয় করে যেমন বিমূঢ় জনকর্ত্তৃক স্থাণু (শাখাহীন শুষ্কবৃক্ষ) চৌররূপে নির্নীত হয়, মরীচিকা (সূর্য্য কিরণ) খড়্গরূপে নির্নীত হয় সেইরূপ আত্মাও দেহরূপে নিরূপিত হয়। ৭৩

কাষ্ঠাদি দ্রব্য যেমন মূঢ় কর্ত্তৃক গৃহরূপে নির্ণীত হয়, লৌহ খড়গরূপে নিরূপিত হয়, সেইরূপ আত্মাও দেহরূপে নির্ণীত হয়। ৭৪

যেমন জল হইতে জলে (প্রতিবিম্বিত হওয়ায়) বৃক্ষ বিপরীত (উল্টা) ভাবে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানহেতু মূঢ় জীব আত্মাকে দেহরূপে দর্শন করে। ৭৫

পোতের সাহায্যে গমমনকারীর কাছে যেমন সমস্ত (অচঞ্চল) বস্তুই চঞ্চলবৎ প্রতীত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞ জীব দেহাতীত আত্মায় দেহভাব দর্শন করে। ৭৬

যেমন (চক্ষুর) দোষ বশতঃ কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্বেত বস্ত্রতে পীততা প্রকাশ পায়, সেরূপ (অজ্ঞজীব) অজ্ঞান বশতঃ আত্মায় দেহভাব দর্শন করে। ৭৭

যেমন ভ্রমশীল চক্ষুদ্বয় দ্বারা সমস্টই ভ্রমাত্মক প্রতীত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃ (জীব) আত্মার দেহভাব দর্শন করে। ৭৮

যেমন দ্রুত ভ্রমণহেতু অলাত (জ্বলন্ত দ্রব্য) সূর্য্যবৎ গোলাকার (চক্রাকার) ধারণ করে, তদ্রূপ অজ্ঞানহেতু (জীব) আত্মার দেহভাব অবলোকন [illegible] ৭৯

অতিদূরতাহেতু যেমন স্থুল বস্তু সকল ও সূক্ষ্ম অনুরূপে প্র[illegible] তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃ আত্মায় (ভ্রান্তজীব) দেহভাব দর্শন করে। [illegible]

যেযন উপনেত্র বা চশমার দ্বারা লোকে সূক্ষ্ম দ্রব্যকে স্থুলর[illegible] দৃষ্ট [illegible] তদ্রূপ অজ্ঞানযোগে (ভ্রান্তজীব) আত্মায় দেহভাব দর্শন করে। ৮১

যেমন (অজ্ঞান বশতঃ) কাচে জলের প্রতীতি হয়, এবং জলে কাচের প্রতীতি হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানহেতু (জীব) আত্মায় দেহভাব দর্শন করে। ৮২

যেমন অগ্নিকে মূঢ় মানব জ্যোতির্ম্ময় মণিরূপে দর্শন করে এবং জ্যোতির্ম্ময় মণিকে অগ্নিরূপে অবলোকন করে, তদ্রূপ অজ্ঞানহেতু জীব আত্মায় দেহভাব দর্শন করে। ৮৩

মেঘ সমূহ দ্রুতগমন করিলে যেমন চন্দ্র ধাবিত হইতেছে বোধহয়, তদ্রূপ অজ্ঞানহেতু জীব আত্মায় দেহভাব দর্শন করে। ৮৪

যেমন মোহবশতঃ লোকের দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হয় (লোকে একদিক্‌কে অন্যদিক্‌ বলিয়া মনে করে) তদ্রূপ ভ্রান্তজীব অজ্ঞানহেতু আত্মায় দেহভাব দর্শন করে। ৮৫

যেমন চঞ্চল জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞজীব অজ্ঞানহেতু আত্মায় দেহভাব দর্শন করে। ৮৬

এইরূপ অবিদ্যাবশতঃ আত্মায় দেহাধ্যাস উৎপন্ন হয়, আর সেই আত্মা

বিজ্ঞাত হইলে উক্ত অধ্যাস আত্মায় বিলীন হয় অর্থাৎ দেহের অধ্যাস থা[illegible] না, উহা আত্মস্বরূপে পর্য্যবাসিত হয়। ৮৭

যখন সমস্ত চরাচর সংসার আত্মস্বরূপে বিজ্ঞাত হয়, সঙ্কল্প পদার্থের অভ[illegible] উপস্থিত হয়, তখন আবার দেহাদির আত্মতা কোথায় থাকে? ৮৮

টীকা।—দেহাদির আত্মাতিরিক্ত সত্তা না থাকায় বস্তুতঃ আত্মাই [illegible] দেহাদি মিথ্যা এইরূপ স্থির হওয়ায় দেহ আত্মা কিনা—এ প্রশ্নের উদ[illegible] অসম্ভব হয়।

হে মহামতে সতত আত্মাকে জানিয়া প্রারব্ধ ফলভোগ করিতে করি[illegible] কালযাপন কর; উদ্বেগ সম্পন্ন হইও না ৮৯

আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম জীবকে ত্যাগ করে না এই [illegible] কথা শাস্ত্রে শ্রুত হয়, অধুনা তাহার নিরাকরণ করিতেছি। ৯০

টীকা।—যে কর্ম্মের ফলভোগ আরব্ধ হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম, ভো[illegible] উহার ক্ষয় না, শাস্ত্রে আছে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা অর্থ সম্পৎস্যতে। আচার্য্য ব[illegible] ইহা [illegible]দৃষ্টির কথা তত্ত্বদৃষ্টিতে ইহা বৃথা।

[illegible] জ্ঞানের উদয় হইলে পরে দেহাদির অসত্যতা বোধ হওয়ায় প্রা[illegible] [illegible]ক না। যেমন জাগরিত হইলে পরে স্বপ্নের বা স্বপ্ন দৃষ্ট[illegible] [illegible] থাকে না তদ্রূপ। ৯১

জন্মান্তরীণ কর্ম্মই প্রারব্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, আত্মার জন্মমরণাদি [illegible] থাকায় কখনও জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম বা প্রারব্ধ থাকিতে পারে না। ৯২

টীকা।—যে দৃষ্টিতে আত্মার জন্মাদি নাই, সে দৃষ্টিতে প্রারব্ধ থা[illegible] কিরূপে?

স্বপ্নের দেহ যেমন (অজ্ঞান বশতঃ) অধ্যস্ত (মিথ্যা) এই (জাগ[illegible]) দেহও তদ্রূপ অধ্যস্ত বা কল্পিত অধ্যস্তের জন্ম কোথায়? জন্মের অভাবে [illegible] বা কোথায়? ৯৩

টীকা।—অধ্যস্ত অর্থ ভ্রান্তি বশতঃ প্রতীত মরীচিকায় জল নাই, [illegible] জলের প্রতীতি হয় মাত্র। আত্মার জন্ম-কর্ম্ম নাই, অবিদ্যাবশতঃ জ[illegible] ভ্রান্ত প্রতীতি হয়। ঐ প্রতীতি হইতে প্রকৃতপক্ষে উহার জন্ম কর্ম্ম[illegible] অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্ম ও দেহ দুইই মিথ্যা। [illegible] উপাদান যেমন মৃত্তিকা, তদ্রূপ বেদান্তমতে অজ্ঞানই প্রপঞ্চের উপাদা[illegible] কথিত হয়। সেই অজ্ঞান (জ্ঞানোদয়ে) বিনষ্ট হইলে বিশ্বভাব [illegible] থাকে? (বস্তুতই থাকে না) ৯৪

যেমন ভ্রম বশতঃ লোক রজ্জু পরিত্যাগ করিয়া সর্প দর্শন করে, সেইরূপ সত্য আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত মানব জগৎ দর্শন করে। ৯৫

রজ্জু স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে যেমন সর্পভ্রম থাকে না, বিশ্বের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেও তদ্রূপ জগৎপ্রপঞ্চ বিলীন হয়। ৯৬

দেহও প্রপঞ্চ, সুতরাং প্রারব্ধ—ক্ষয় পর্য্যন্ত দেহের অবস্থান হয় ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? (যদি বল যে "তবে শ্রুতি প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত শরীরস্থিতির কথা বলেন কেন" তাহার উত্তরে বলিব) শ্রুতি অজ্ঞগণের বোধের জন্যই প্রারব্ধের কথা বলিয়াছেন। ৯৭

সেই পরাবর আত্মার দর্শন (সাক্ষাৎকার) হইলে পরে, জীবের কর্ম্ম-সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—এইস্থলে স্বয়ং শ্রুতি কর্ত্তৃক তাহার নিষেধের জন্য বহুত্ব (কর্ম্মাণি) সুস্পষ্ট গীত হইয়াছে। তথাপি যদি অজ্ঞগণ জোর করিয়াই এই কথা বলে যে আত্মদর্শনের পরে দেহ ও প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে ২টী অনর্থ উপস্থিত হয়, প্রথম অদ্বৈতমত-হানি, দ্বিতীয় শ্রুতিবিরোধ। ৯৮।৯৯

টীকা।—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে এইশ্রুতি আত্মসাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়গ্রন্থিভেদ সংশয়চ্ছেদ ও সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ের কথা বলিয়াছেন। এখানে কর্ম্মাণি, এই বহুবচনে লভ্য কর্ম্মবহুত্বের কথা বলিয়া শ্রুতি কর্ম্মসকলের ক্ষয়ের কথা বলিয়াছেন। প্রারব্ধ 'কর্ম্ম' থাকিলে 'কর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে' সঙ্গত হয় না। যদি বিপক্ষ বলেন যে কর্ম্মাণি অর্থ প্রারব্ধ ভিন্ন অপর কর্ম্মসকল, তাহা হইলে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বজায় থাকেনা, কারণ আত্মসাক্ষাৎকারের পরে যদি দেহ বা প্রারব্ধকর্ম্ম থাকে, তবে ত দ্বৈতই রহিল। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অদ্বয়—এই শ্রুতিসিদ্ধান্তও স্থির রহিল না, সুতরাং জ্ঞানোদয়ে প্রারব্ধকর্ম্মের বা দেহের সত্তা স্বীকার করা যায় না।

অধুনা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য ত্রিপঞ্চ অঙ্গের কথা বলিতেছি। তাহাদের দ্বারা সর্ব্বদা নিদিধ্যাসন করিবে। ১০০

টীকা।—আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন বেদান্তমতে ৩টী, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রুতিবাক্যসমূহের অদ্বিতীয়-ব্রহ্মে তাৎপর্য্যনির্ণয়ের নাম শ্রবণ যুক্তি-বিচারদ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণের নাম মনন পুনঃপুনঃ অবিচ্ছিন্ন আত্মধ্যান বা আত্মচিন্তনই নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসন সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ-

সাধন। শাস্ত্র বলেন—শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ, মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।

নিত্য অভ্যাস ভিন্ন সচ্চিদানন্দ আত্মার প্রাপ্তি হইতে পারে না সুতরাং জিজ্ঞাসু মানব শ্রেয়োলাভের জন্য চিরকাল যাবৎ ব্রহ্মের নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিবে। ১০১

যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্‌-স্থিতি, প্রাণ-সংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান, সমাধি—এই (ত্রিপঞ্চ ১৫) গুলি নিদিধ্যাসনের অঙ্গ বলিয়া কথিত আছে। ১০১।১০৩

"সকলই ব্রহ্ম"—এই বিজ্ঞান-বলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে সংযম তাহাই যম নামে কথিত হয়। ঐ যমের অভ্যাস করিতে হইবে। ১০৪

বিজাতীয় প্রবাহের বিলয় ও সজাতীয় প্রবাহের উদয়ই পরমানন্দরূপ নিয়ম। পণ্ডিতগণ যথানিয়মে নিয়মের অনুষ্ঠান করিবেন। ১০৫

চিদাত্মার দর্শন-হেতুক জগৎপ্রপঞ্চের যে ত্যাগ তাহাই ত্যাগ। ত্যাগ মহামতিগণের পূজনীয়, যেহেতু ত্যাগ সদ্যো মোক্ষময়। ১০৬

যাহা হইতে মনের সহিত বাক্-সমূহ না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, তাহাই মৌন। বিজ্ঞ মানব সতত সেই মৌনের ভজনা করিবেন। ১০৭

বাক্ সকল যাহা হইতে নিবৃত্ত হয় তাহা কে বলিতে পারে—প্রপঞ্চ যদি বক্তব্য হয় তাহা হইলে সেও শব্দ বর্জ্জিত, সুতরাং বলিবার কিছুই নাই, ঐ ভাবে যে সজ্জনগণের সহজ বা স্বাভাবিক মৌন অথবা বালক-গণের বাক্যবিষয়ক মৌন (কথা না বলা) তাহাও ব্রহ্মবাদিগণ প্রয়োগ করিতে পারেন। ১০৮।১০৯

যাহার আদিতে মধ্যে ও অন্তে জন নাই ছিল না থাকিবে না, যাহা কর্তৃক এই সমস্তই সতত ব্যাপ্ত, তাহাই বিজন দেশ নামে কথিত হয়। ১১০

নিমেষে ব্রহ্মাদি সমস্ত প্রাণীর কলন-হেতুক অদ্বয় অখণ্ডানন্দ ব্রহ্মই কাল-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হন। ১১১

যাহাতে সুখে অবিরত ব্রহ্মচিন্তন সংঘটিত হয় তাহাই আসন বলিয়া জানিবে। অন্য অসুখকর (কষ্টসাধ্য) উপবেশনরূপ আসন আসনই নহে। ১১২

বিশ্বের অধিষ্ঠান সর্ব্বভূতের আদি যে অব্যয় সিদ্ধ বস্তু, যাহাতে সিদ্ধগণ সমাবিষ্ট, তাহাই সিদ্ধাসন বলিয়া জানিবে। ১১৩

যাহা সর্ব্বভূতের মূল, যাহা চিত্তবন্ধনের মূল, সেই মূলবন্ধ সতত সেবা করা কর্ত্তব্য। ইহা রাজযোগিগণের যোগ। ১১৪

সমব্রহ্মে লীন হওয়াই অঙ্গসমূহের সমতা বলিয়া জানিবে। যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ সমব্রহ্মে লীন না হয়। তবে শুষ্কবৃক্ষবৎ রজ্জুভাব উপস্থিত হইলেও প্রকৃত সমতা বা দেহসাম্য হইবে না। ১১৫

জ্ঞানময়ী দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া জগৎ ব্রহ্মময় দর্শন করিবে—ইহাই পরোমাদারদৃষ্টি বা দৃক্‌স্থিতি। যোগমতে নাসাগ্রদৃষ্টি প্রভৃতি দৃক্‌স্থিতি নহে। যেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই তিনের বিরাম সংঘটিত হয়, তাহাতেই দৃষ্টি স্থাপন করিতে হইবে। নাসাগ্রদর্শন প্রকৃত দৃক্‌স্থিতি নহে। ১১৬-১১৭

চিত্ত প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মরূপে ভাবনা করার ফলে সর্ব্ববৃত্তির যে নিরোধ উপস্থিত হয় তাহাই প্রাণায়াম কথিত বলিয়া হয়। ১১৮

প্রপঞ্চের নিষেধই রেচক বায়ু, "আমিই ব্রহ্ম"—এইরূপ যে বৃত্তি তাহাই পূরকবায়ু. অনন্তর সেই বৃত্তির যে নিশ্চলতা-সম্পাদন তাহাই কুম্ভক প্রাণায়াম। প্রবুদ্ধগণের প্রাণায়াম এইরূপই। নাসিকাপীড়ন (নাক টেপা) অজ্ঞগণেরই প্রাণায়াম। ১১৯।১২০

সকল বিষয়ে আত্মভাব দর্শন করিয়া মন যে চিদ্রূপ আত্মায় নিবদ্ধ হয় তাহাই প্রত্যাহার বলিয়া জানিবে। মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা উ[illegible]ভ্যাস করিবেন। ১২১

যেখানে যেখানে মন যায়, সেই সেইখানেই ব্রহ্ম দর্শন হয়[illegible] ব্রহ্মে মনের যে ধারণা তাহাই পরা ধারণা বলিয়া জানিবে। ১২[illegible]

আমি 'ব্রহ্মই'—এই সদ্‌বৃত্তির সাহায্যে নিরালম্বভাবে অবস্থান [illegible] শব্দে বিখ্যাত। ঐরূপ স্থিতিই পরমানন্দদায়িনী হয়। ১২৩

নির্ব্বিকারতাময়ী ব্রহ্মাকারা বৃত্তি দ্বারা ইতরবৃত্তিসমূহের যে বিস্মরণ বা সম্যক্‌তিরস্কার তাহাই জ্ঞান-সংজ্ঞক সম্যক সমাধি। ১২৪

যাবৎকালে প্রযুক্ত হইলে পুরুষের আত্মভাব স্বয়ং সম্পন্ন হয় এই আকারের আনন্দ তাবৎকাল সুন্দরভাবে অভ্যাস করিবে। ১২৫

তৎপরে যোগিরাজ যখন সাধনপাশ হইতে মুক্ত হইবেন, তখন তাহার স্বরূপ মনের ও বাক্যের অবিষয় হইবে। ১২৬

সমাধি অবলম্বন করা সত্ত্বে বলপূর্ব্বক বিঘ্ন সকল আগমন করিবে অনুসন্ধানরাহিত্য, আলস্য, ভোগ—লালসা, লয়, তমঃ বিক্ষেপ, রসাস্বাদ ও শূন্যতা এই সকল বিঘ্নকে ব্রহ্মবিৎ ক্রমে ২ ত্যাগ করিবেন। ১২৭-১২৮

ভাববৃত্তিতে ভাবত্বের প্রকাশ, শূন্যবৃত্তিতে শূন্যতার আবির্ভাব, আর পূর্ণ

বৃত্তিতে পূর্ণতার উদয় উপস্থিত হয়। ব্রহ্মবিৎ সতত পূর্ণতার অভ্যাস করিবেন। ১২৯

যে সকল নর পরা পাবনী ব্রহ্মাত্মিকা বৃত্তি পরিত্যাগ করে, তাহারা বৃথাই জীবন ধারণ করে, তাহারা পশুতুল্য। ১৩০

যাঁহারা ব্রহ্মাখ্যা বৃত্তি অবগত হন, এবং উহা বর্দ্ধিত করেন, যাঁহারা বন্দনীয় সাধু পুরুষ, তাঁহারা ত্রিভুবনে ধন্য। ১৩১

যাঁহাদের ব্রহ্মাখ্যা বৃত্তি সম্যক্ বর্দ্ধিত ও পরিপক্ব হয়, তাঁহারা সংস্বরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করেন, শব্দমাত্রবেত্তা ব্রহ্মবৃত্তিশূন্য মানবেরা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন না। ১৩২

যাহারা ব্রহ্মবিষয়ক কথায় কুশল ও রাগসম্পন্ন, যাহারা ব্রহ্মাখ্যা বৃত্তি লাভ করে নাই, তাহারা অজ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নিশ্চয়ই তাহারা (সংসারে) আগমন ও গমন করে—অর্থাৎ জন্মমরণের মধ্যে ভ্রমণ করে। ...

জ্ঞানিগণ নিমেষার্দ্ধ কালও ব্রহ্মময়ী বৃত্তি ভিন্ন অবস্থান করেন না, ব্রহ্মাদি সনকাদি ও শুক প্রভৃতি সতত অবস্থান করেন তাঁহারাও বাক্ সংস্থান করেন ১৩৪

যদি কার্য্যে কারণভাব উপস্থিত হয় না, এজন্য বিচারপূর্ব্বক কার্য্যভাব পরিত্যাগ করিয়া কারণভাব লাভ করিবে। ১৩৫

অনন্তর বাক্যের অগোচর বস্তু শুদ্ধ হইবে, মৃত্তিকা ও ঘটের দৃষ্টান্তে পুনঃ পুনঃ কারণই যথার্থ বস্তু—এইরূপ দর্শন করিতে হইবে। ১৩৬

এই প্রকারেই ব্রহ্মাত্মিকা বৃত্তির উদয় হয়, শুদ্ধচিত্ত সাধুকর বৃত্তির উদয়ের পর বৃত্তিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। ১৩৭

পুরুষ প্রথমে কারণে কার্য্যের ব্যতিরেক দর্শন করিবে, পরে নিয়ত কার্য্যে কারণের অন্বয় দর্শন করিবে, কার্য্যে কারণ দর্শন করিবে, পরে কার্য্য বিসর্জ্জন করিবে, তৎপরে কারণও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, কার্য্য কারণ উভয় চলিয়া গেলে আত্মস্বরূপ মুনি অবশিষ্ট থাকিবেন। ১৩৭।১৩৮।১৩৯

নিশ্চয়াত্মকভাবে তীব্র বেগে যে বস্তু ভাবিত হয় পুরুষ শীঘ্র সেই জ্ঞেয়স্বরূপই হইবেন যেমন ভ্রমরকীট ভাব্যস্বরূপে আকারিত হয় তদ্রূপ। ১৪০

টীকা—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি এই কথা এখানে বলা হইতেছে। যাহা

তীব্র বেগে ভাবা যায় নিজের সেই ভাব উপস্থিত হয়। যেমন তৈলপ কীট কাচকীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে তদ্রূপ লাভ করিয়া থাকে তদ্রূপ।

মানব অদৃশ্য অথচ ভাবরূপ এই চিৎস্বরূপ আত্মাকে সাবধান হই ভাবনা করিবে। ১৪১

বিদ্বান্ বিবেকী নিত্যসুখে অবস্থিত থাকিয়া চিদ্রসপূর্ণ বুদ্ধি দ্বারা দৃশ্যে অদৃশ্যতা দান করিয়া ব্রহ্মাকারে চিন্তা করিবে। ১৪২

যাহাদের কষায় বা চিত্তদোষ সকল পরিপাক প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদে পক্ষে হঠযোগযুক্ত এই সকল অঙ্গযুক্ত রাজযোগ সিদ্ধিদায়ক হইবে। ১৪৩

যাহাদের মন পরিপক্ক হইয়াছে, কেবল এই রাজযোগই তাহাদের পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। গুরু দৈবত ভক্তগণের সকলেরই ইহা সুলভ ও শীঘ্র ফলপ্রদ জানিবে। ১৪৪

অপরোক্ষানুভূতি সমাপ্ত।